ইতিহাসের ইতিহাস

গোলাম আহমাদ মোর্তজা

ইতিহাসের ইতিহাস

(গবেষণামূলক, উদ্ধৃতি ও তথ্যবহুল গ্রন্থ)

গোলাম আহমাদ মোর্তজা

Reupload by www.almodina.com

মদীনা পাবলিকেশান্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, ৫৫/বি পুরানা পল্টন, (২য় তলা) ঢাকা-১০০০

ইতিহাসের ইতিহাস
(গবেষণামূলক, উদ্ধৃতি ও তথ্যবহুল গ্রন্থ)
গোলাম আহমাদ মোর্তজা

প্রকাশক
মদীনা পাবলিকেশান্স-এর পক্ষে–
মোর্তুজা বশীরউদ্দীন খান
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন : ৭১১৯২৩৫

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর২০০৭ ইংরেজী

৪র্থ সংস্করণ
এপ্রিল ২০১২ ইংরেজী

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২৫০·০০ টাকা মাত্র

ISBN-984-8367-74-6

ভূমিকার ভূমিকা

ভূমিকা সাধারণত গ্রন্থকারকেই লিখতে হয়। যদি বলি রাতেস্বপ্ন দেখলাম একজন আমায় বলছেন–'আমিএকটা নতুন ইতিহাস তোমায় বলছি তুমি লিখেনাও আমি তাই লিখে ফেললাম। কিছু প্রশ্নও করেছিলাম,যেমন আমাদের দেশের খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণ যে তথ্য দিয়েছেন আপনার সঙ্গে তার যে অনেক অমিল। শ্রী বিনয় ঘোষকে আমরা তো শ্রদ্ধাই করি তাঁর প্রতিভার জন্য। কিন্তু আপনি যা বলছেন তাতে তাঁর ওপর পাঠক-পাঠিকাদের মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠবে না কি? উত্তরে তিনি বললেন, 'বিনয় ঘোষ যে পণ্ডিত ও ইতিহাসজান্তা অধ্যাপক, ধর তা মেনেই নিলাম কিন্তু সরকারের তরফ হতে তাঁকে ঐ ইতিহাস লেখানো হয়েছে, তিনি স্বাধীনভাবে লিখতে পারেননি। প্রমাণস্বরূপ ঐ "ভারতজনের ইতিহাস"-এর ভূমিকায় সাত পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, "ভারতজনের ইতিহাস" উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য বই। পাঠ্য বই মাত্রেরই কতকগুলো বাঁধা ধরা নিয়ম মেনে চলতে হয়, লেখক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে লিখতে পারেননি। এই সব নিয়মের বন্ধন মেনে এবং নির্দিষ্ট পাঠ্যবস্তুর মধ্যে আবদ্ধ থেকে যতদূর সম্ভব এই ইতিহাস রচনা সুখপাঠ্য, সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠ্য বইয়ের বন্ধনের ইতিহাসের জন্য হয়তো সম্পূর্ণ সার্থক হয়নি, কিন্তু মনে হয় কিছুটা হয়েছে..।" তা হলে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তাঁর এই উক্তিই প্রমাণ করে যে, সরকারের আদেশ মত তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁকে লিখতে হয়েছে এই ইতিহাস। তাই তাঁর মতেও খাঁটি সত্য ও প্রকৃত তথ্যপূর্ণ নয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম, আমরা যদি পরীক্ষার খাতায় আপনার দেওয়া তথ্য লিখে যাই তাহলে কি পাস করতে পারবো? উত্তরে তিনি বললেন– যদি সূর্যের মত আলোকময় ও সত্য সুন্দর প্রমাণসহ লেখা যায় আর তা যদি কোন দেশের পরীক্ষকগণ গ্রহণ না করেন তাহলে ইতিহাস নিয়ে প্রহসন কেন? অতএব তাঁদের সারা দেশ হতে ইতিহাসের উচ্ছেদ করাই উত্তম। আগামী মুদ্রণে ভালভাবে ভূমিকা লেখার ইচ্ছা রইলো, আজ তাড়াতাড়ি নাই বা লিখলাম?

গোলাম আহমাদ মোর্তজা

মেমারী, বর্ধমান

মহারানী কাশীশ্বরী বিদ্যায়তনের প্রখ্যাত শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম গড়াই (M.A.B.T. কোবিদ, কাব্যতীর্থ) মহাশয় বলেন-

সম্পূর্ণ নতূন দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং নতুন আঙ্গিকে রচিত 'ইতিহাসের ইতিহাস' পঠিত হল। গ্রন্থকারের বিশ্লেষণী প্রতিভা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁর নবতম প্রয়াস ও সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিকে অভিনন্দন জানাই। "মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ যুগে যুগে সকলকেই, সবকিছুকেই সাদরে বরণ করে নিয়েছে, পর বলে কাকেও দূরে সরিয়ে দেয় নাই।" এই উদার মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিই ভারতীয় আত্মার বাণী। হৃদয় পাঠক ও সুধী সমাজ গ্রন্থখানির উৎকর্ষ বিচারেও তাই খুঁজে পান এক মহানআদর্শ এক নতুন চিন্তার দিগন্ত, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব মহাকালের রথচক্রে কখনওহবে না নিষ্পেষিত। পাণ্ডিত্য ও তথ্য পবিবেশন পটুতা এক অপূর্ব বাণীরূপ লাভ করেছে। গ্রন্থকারের সাবলীল বিশ্লেষণী গতিভঙ্গির সাথে সাথে কোথাও জড়তা বা ভাবাবেগের এতটুকু আতিশয্য নেই। মুসলিম শাসকগণ যত অত্যাচারীই হোন না কেন, তাঁদের অনেকে যে প্রজাহিতৈষী ছিলেন তাদেখানোর ব্যাপারে লেখকের লেখনীকে স্বাগত না জানিয়ে পারা যায় না। বলাবাহুল্য মুসলিম জাতি ও সমাজকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্বক উচ্চস্থান দেওয়ারব্যাপারে লেখকের আন্তরিক প্রচেষ্টার কোনরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত এই গ্রন্থ খানিতে হয়নি।

শ্রী রাধাশ্যাম গড়াই (এম,এ,বি,টি)
শিক্ষক যবগ্রাম মহারানী কাশীশ্বরী স্কুল
পোঃ যবগ্রাম, জেলা বর্ধমান

জনাব আবদুল্লা হিল কাফি সাহেব M.A. (Triple) B.T. (হেডমাস্টার, চাটরা বীরভূম) বলেন–

মোর্তজা সাহেবকে প্রথমে একজন তার্কিক তাত্ত্বিক বক্তারূপে আত্মপ্রকাশ করতে দেখি। পরের ভূমিকায় দেখলাম তাঁর লেখা বিখ্যাত 'পুস্তক সম্রাটের' গ্রন্থকাররূপে। তাঁর অন্যান্য পুস্তকের মলাট পেজে এবং অনেক সভায় তাঁর বক্তব্যের ভেতর 'ইতিহাসের ইতিহাস' গ্রন্থের কথা জানতে পারি। দীর্ঘ কয়েক বছর পর এত দিনে তা প্রকাশ হচ্ছে। আমার মতে এই গ্রন্থের প্রত্যেক বাক্য মন দিয়ে পড়ার প্রয়োজন আছে কিন্তু অত্যন্ত কাজের চাপে আমার পক্ষে তা হয়ে না উঠলেও মোটামুটিভাবে শুধু চোখ কেন, মন বুলিয়ে বুঝেছি আমার মত অনেকেই এটা পড়ে আনন্দ পাবেন ও অবাক হবেন। আমি যখন ইতিহাসে এম এ দিই তখন থেকে মনে হত দক্ষ শিল্পীর হাতে একটি মাতৃ ভাষায় এমন রচনা প্রয়োজন যেটা সংমিশ্রিত সত্য ও মিথ্যা ইতিহাসের মধ্যে সত্যকে পৃথক করতে সক্ষম। লেখকের পরিশ্রমশীলতা ও শিল্প চাতুর্যকে সাদর সম্ভাষণ জানাই। লেখক অত্যন্ত কর্মব্যস্ত জেনেও বলছি তাঁর বইগুলোর যেমন সুন্দর নামকরণ, সুন্দরভাবে তথ্য প্রয়োগ পদ্ধতি এবং উদ্ধৃতি উদাহরণের অপূর্ব সমন্বয়, তেমনি কিন্তু আশাতিরিক্ত প্রিন্টিং মিসটেক। তাই আমাদের অনুরোধ 'বক্তা সম্রাটে'র বইগুলো আগামী মুদ্রণে যেন তিনি নিজেই প্রত্যেক পাতার প্রুফ দেখতে শৈথিল্য না করেন।

ইতি- এ কাফি বীরভূম

গোলাম মওলা (M. Sc.) বলেন-

'বক্তা সম্রাট' মোর্তজা সাহেবের প্রায় প্রত্যেকটি বই পুস্তকের পাতায় আমার নামটি যুক্ত থাকায় আমি সত্যই আনন্দবোধ করি। যদিও আমরা বিজ্ঞানের ছাত্র কিন্তু ইতিহাস এমন একটি বই, যা বাদ দিয়ে কোন মানুষ বড় হতে পারে না। তা জানতেই হবে, তাতে বই পড়েই হোক বা শুনেই হোক, আমাদের ভাল-মন্দ বাছাই করার ক্ষমতা না রাখলে উপায় নেই। কারণ যাকেআমাদের সামনে বড় বলে তুলে ধরা হয় তার ডাকসাইটেও তুলে ধরা উচিত কিন্তু ধামাচাপাদেওয়ার পদ্ধতি যেন আমাদের পুরাতন ব্যাধি, ফলে ভালো লোকদের মন্দ জেনে এসেছি যুগ যুগ ধরে, আর মন্দ লোকদের অনেককে এতবড় মনে করানো হয়েছে যে মানব ও দেবতায় একাকার। ক্যালেণ্ডারের ছবিতে দেখতে পাই ঠাকুর দেবতা ও নেতার দল এক হয়ে গেছেন। গ্রন্থকারের সাথে আমার অনেক কারণে যথেষ্ট যোগাযোগ আছে। আমাদের মত এমএসসি, এমকম, এমএ তাঁর গুণমুগ্ধ তা বলার দরকার নেই, যেহেতু তিনি পণ্ডিতবাগ্মী হিসেবে ক্যালিফোর্নিয়া হতে আমন্ত্রণপ্রাপ্ত, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত, ভারত ও বহির্ভারতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পুষ্ট শিল্পী ও কবি এবং বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের বৃহত্তম মাদরাসা মেমারী জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলূম মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা, যেখানে কারিগরি শিক্ষার প্রচলন পঃ বঙ্গে প্রথম পদক্ষেপ। বারবার এমপি ও এমএলএ হয়ে বা প্রত্যক্ষ রাজনীতিবিদ হওয়ার আমন্ত্রণে তাঁকে যাঁরা বাধা দিয়েছেন আমি তাঁদেরই একজন। আমরা চাই তাঁর কাছ হতে আরও গ্রন্থ, পুস্তক, পুস্তিকা আর তার চেয়েও বেশি চাই একটি সর্বাধুনিক আদর্শ পত্রিকা।

ইতি - গ্রন্থকারের গুণমুগ্ধ
গোলাম মওলা (বর্ধমান)

অধ্যাপক সাজ্জাদুর রহিম সাহেব (খুজুটীপাড়া চণ্ডীদাস কলেজ, বীরভূম) বলেন-

মোর্তজা সাহেবের লেখা 'ইতিহাসের ইতিহাস' জাতির জন্য একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যা কিছু ঠিক তাই সুন্দর। এই সুন্দরের আদর্শকে তাই মানতে হয় আমাদের। এক্ষেত্রে এই সুন্দর গ্রন্থটিকে সুন্দর বলে আমিও মানতে বাধ্য। আমার মত অনেক অধ্যাপক এবং আমার সত্য সুন্দর প্রিয় ভারতের চিন্তাশীল ছাত্রছাত্রী মণ্ডলী মুগ্ধ হবে। এক সুচিন্তার খোরাক সংগ্রহে সক্ষম হবে বলে ধারণা করি। এটা একাধিকবারঅধ্যায়ন করে আগামীতে যে মন্তব্য লিখিত হবে সম্ভবত তা চরম চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ হবে।

ইতি-
সাজ্জাদুর রহিম
লক্ষীপুর বড় শ্যামবাজার, বর্ধমান

সৈয়দ মুহম্মদ মসউদ সাহেব (M. A. LL. B) বলেন-

বন্ধুবর মোর্তজা সাহেবের 'ইতিহাসের ইতিহাস' একটি অপূর্বগ্রন্থ। আমার মনে হচ্ছে আমাদের উকিলবা ব্যারিস্টার মহলেও বইটা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠবার অন্যতম কারণ। এতে চাপা পড়া অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে এবং ইতিহাসের অনেক নায়ক মিথ্যা দুর্নাম হতে মুক্তি লাভ করেছেন। তাই এর মূল্য দেওয়া যায় না। আশা রাখি আগামীতে তিনি এই প্রকারআরও অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ রচনা করে আমাদের বাসনা পূর্ণ করবেন। গ্রন্থকারের সাথে সর্ব বিষয়ে সহযোগিতা করতে আমিবা আমরা গর্ববোধ করি।

ইতি- **সৈয়দ মুহম্মদ মসউদ**
জর্জকোট, বর্ধমান।

ডাঃ হুসাইনুর রহমান (M.B.B S (Cal)
সাহেব বলেন–

'পুস্তক সম্রাটে' লেখক জনাব গোলাম আহমাদ মোর্তজা সাহেব আমাদের বাংলার নির্ভীক ও সুবক্তা হিসেবে বিশেষ সুপরিচিত। এতদিন সারা দেশেরপ্রতিটি প্রাঙ্গণে বিশাল জনসমুদ্রের সামনে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে তাঁকে নির্ভীক প্রয়াস চালাতে দেখেছি। "ইতিহাসের ইতিহাস" প্রণয়নে লেখনীর মাধ্যমে সত ইতিহাস প্রকাশনায় তাঁর বলিষ্ঠ প্রয়াসকে স্বাগত জানাই।বদ্বেষ প্রসূত লেখা বা চাপের কাছে নতিস্বীকার করে সত্যকে বিকৃত করে লেখা একটা দেশ ও তার মহান জাতির ইতিহাস হতে পারে না, সেটা হয় ইতিহাসের পরিহাস। আজ পর্যন্তএই পরিহাসই গোটা ভারতবাসীর মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ, সন্দেহ ও অবজ্ঞার বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করে চলেছে। "ইতিহাসের ইতিহাস" পাঠের পর বর্ধমান ইউনিভারসিটির বন্ধুবর আবদুস্ সামাদ . Sc. (Lecturer B. U) ও আমি উভয়েই একমত যে, দেশ ও জাতির কল্যাণে প্রকৃত ঘটনার প্রতি সম্মান জানিয়ে সত্য ইতিহাস রচিত হোক। প্রভূত পরশ্রমে নানা মূল্যবান উদ্ধৃতি সহযোগে মোর্তজা সাহেব যে ইতিহাসের অলিখিত সত্যকে বলিষ্ঠ প্রয়াসে তুলে ধরেছেন, তার জন্য মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দন জানাই। আশা করছি, সত্য সন্ধানী সুধী সমাজ তথাকথিত বর্তমান ইতিহাসের নব মূল্যায়নে ব্রতী হবেন। আল্লাহপাক এই লেখকের সদুদ্দেশ্যকে কবুল করুন!!!

ইতি- হুসাইনুর রহমান

প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার শেখ মতিউল ইসলাম (North Bengal University) বলেন ঃ-

শ্রদ্ধেয় মোর্তজা সাহেবের "ইতিহাসের ইতিহাস" গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করতে আমি কিছু দুর্লভ পত্র-পত্রিকা যুগিয়ে সহযোগিতা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। লেখকের নিজস্ব অধ্যয়ন কক্ষের পাণ্ডুলিপি পড়ে অনেক কিছু অজানাকে জেনে অকল্পনীয় আনন্দিত হয়েছিলাম। আমি আশাকরি আমার মত অনেকেই "ইতিহাসের ইতিহাস" ও লেখকের ঐতিহাসিকতাকে শিক্ষিত সমাজ স্বাগতম জানাবে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থা থেকেই লেখকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ।

ইতি-শেখ মতিউল ইসলাম

চব্বিশ পরগনার কৃষ্ণচন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের আদর্শ শিক্ষক মুহাম্মদ সিরাজুল হক সাহেব বলেন-

শ্রদ্ধেয় জনাব মোর্তজা সাহেবের বলিষ্ঠ লেখনীর "ইতিহাসের ইতিহাস" বইখানি ভূয়সী প্রশংসার যোগ্যতা রাখে। নিরপেক্ষ বিচার-বিবেচনা ও তত্ত্ববহুল মননশীলতা পাঠক সমাজে জাতীয় চেতনার নতুন দিগন্তের আশা ও ভাষার গতিপথ নির্দেশ করবে-এইআশা রাখি। বইখানি জাতীয় গণমানসকে নতুনভাবে রাঙিয়ে দিতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইতি- সিরাজুল হক

বৈজ্ঞানিক শচীদানন্দ ত্রিবেদী

(M.Sc.p.H.D.)

স্বর্ণপদক ও পুরস্কারপ্রাপ্ত, দিল্লি ইউনিভারসিটি।

আমি একজন বিজ্ঞানের বাঙালি ছাত্র। যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানের সমস্ত পুরাতন ও পুরাতন পদ্ধতি নতুন যুগে টিকিয়ে রাখা যায়নি। অবশ্য মত ও পথের পরিবর্তন পরিবর্জন তখনই সম্ভব হয়, যখন নতুন যুক্তি, পুরাতন যুক্তি অপেক্ষা অধিকতর সুদৃঢ়, সুচিন্তিত, নির্ভুল এবং বিশ্ব বিজ্ঞানের বা বিশ্ব কল্যাণের অনুকূল হয়।' ইতিহাসের ইতিহাস' পড়ে যদি অপেক্ষাকৃত, উন্নততর উদ্ধৃতি ও প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা পুরাতন ধ্যান-ধারণার কিছু বদল করতে হয় তো ক্ষতি কি? আবার আগামীতে যদি এই মতামত গুলোকেই নিষ্প্রভ করে দেন কোন ঐতিহাসিক তাঁর আরও বেশি জোরালো প্রমাণাদি দিয়ে, তাতেই বা লেখকের কী আসে যায়? বিজ্ঞানের ছাত্ররা পুরাতনকে সবসময় সববিষয়ে আবার ধরে বসে থাকার বিরোধী।তাই বিখ্যাত লোকদের অখ্যাত আর অখ্যাতদের বিখ্যাত করার চক্রান্ত ব্যূহ ভেদ করে নতুনের সন্ধান দিয়ে 'ইতিহাসের ইতিহাস' অগ্রসর হলে তা বড়ই গর্বময় ও তৃপ্তিকর পদক্ষেপ সন্দেহ নেই। গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের উন্নতি কামনা করি। লেখকের লেখায় দেশে প্রকৃত সমতা, সাম্যের বিজয় ডঙ্কা বেজে উঠুক।

ইতি—শচীদানন্দ ত্রিবেদী

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ১৫
'ইতিহাস'-এর শব্দ সমীক্ষা ১৬
বিদ্বেষ বীজ বপন ১৯
আর্যদের ভারত আগমন ২৩
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ২৭
মহা মানবের পদার্পণ ৩১
বিশ্ব মুসলিমের ভারত প্রেমের কারণ ৩৩
প্রকৃত ইতিহাস ও ঐতিহাসিকগণ ৫২
সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধনে
দ্বিতীয় অধ্যায় ৬১
মুসলমান আগমনের পূর্বে ভারতের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক অবস্থা-
তৃতীয় অধ্যায় ৭৪
মুসলমানদের ভারত আগমনের পূর্ণ তথ্য- ৮২
সত্যের অপপ্রচার-
চতুর্থ অধ্যায় ৯২
সম্রাট আকবর ও আওরঙ্গজেব সম্পর্কিত বিকৃত ইতিহাসের পর্যালোচা- ১০২
মহামতির স্বধর্মে বিরোধিতা- ১০৭
মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব- ১৪৭
'দীনি ইলাহী' ও আকবরের বিদায় পর্ব
পঞ্চম অধ্যায় ১৫৫
আওরঙ্গজেব ও মারাঠা শক্তির উত্থানে শিবাজী-
ষষ্ঠ অধ্যায় ১৬৯
মহীয়সী জেবন্নেসা, বিকৃতি চরিত্রের আসল তথ্য
সপ্তম অধ্যায় ১৭৪
সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরবর্তী মুঘল বাদশাহ-
অষ্টম অধ্যায় ১৭৭
সম্রাট বাবর ১৭৮
হুমায়ূনের আগমন ১৮০

শেরশাহ	১৮৪
শাহজাহান	
নবম অধ্যায়	১৮৮
ভারতীয় রাষ্ট্রমঞ্চে গজনী, ঘুর শাসকদের অভিযান-	১৮৮
সুলতান মামুদ	
দশম অধ্যায়	১৯২
দাস বংশের প্রতিষ্ঠা কুতুবউদ্দিন আইবক	১৯২
ইলতুৎমিস	১৯৪
সুলতানা রাজিয়া, সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ	১৯৫
সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন	১৯৫
বলবনের চরিত্র	১৯৬
কায়কোবাদ	
একাদশ অধ্যায়	১৯৬
খলজী বংশের উত্থান-	১৯৬
জালাল উদ্দিন খলজী	১৯৭
সুলতান আলাউদ্দিন খলজী	১৯৮
আমীর খসরু	
দ্বাদশ অধ্যায়	১৯৯
তুঘলক বংশের আবির্ভাব-	১৯৯
গিয়াসুদ্দিন তুঘলক	১৯৯
মুহম্মদ বিন তুঘলক	২০৬
ফিরোজ শাহ তুঘলক	২০৭
বীর তৈমুর	২০৮
তুঘলক বংশের পতন	
ত্রয়োদশ অধ্যায়	২০৯
প্রাদেশিক মুসলিম রাজ বংশ- বঙ্গদেশ	২১১
জৌনপুর, মালব	২১২
গুজরাট, কাশ্মীর, বাহমনী রাজ্য	
চতুর্দশ অধ্যায়	২১৪
ভারতের ইতিহাসের পীরদের অবদান-	২১৪
হযরত ইমদাদুল্লাহ আল ফারুখী থানবী মোহাজেরে মক্কী (রহ.)	২১৭
হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া (রহ.)	২১৯
শাহ ইসমাইল গাজী (রহ.)	২২০

হযরত আহমাদ ফারুকী সারহিন্দী মোজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ.) ২২১
হযরত হামীদ বাঙালি দানেশমন্দ (রহ.) ২২৩
হযরত কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাফী (রহ.) ২২৪
হযরত মাওলানা মঈনউদ্দিন চিশতী (রহ.) ২২৪
হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) ২২৫
সংক্ষিপ্ত পরিচয়
পঞ্চদশ অধ্যায় ২৩০
বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্দৌলার দুর্লভ ঐতিহাসিক তথ্য ২৩৪
সিরাজের ইতিহাসে জগৎশেঠদের ভূমিকা ২৩৬
সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন ২৪৩
সিরাজের ঐতিহাসিক নিমজ্জন
ষষ্ঠদশ অধ্যায় ২৪৬
সিরাজোত্তর সংক্ষিপ্ত বাংলা-

সপ্তদশ অধ্যায়

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা বিপ্লবী শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবী ২৫৩
(রহ.) ও পরবর্তী মুসলিম মুজাহিদগণ– ২৫৭
বঙ্গে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের ভূমিকা ২৭৩
সিপাহী বিদ্রোহ না স্বাধীনতা বিপ্লব? ২৮০
১৫৮৭ খৃস্টাব্দে সৈন্য বিক্ষোভের ধারাবাহিকতা
অষ্টাদশ অধ্যায় ৩১৯
ঐতিহাসিক নেতাদের গুপ্ত ঐতিহাসিক রহস্য-
মিঃ ডেভিড হেয়ার, লেভিজ সোসাইটি ফরনেটিভ ফিমেল এডুকেশন, ৩৩০
জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষণে বিবিধ পত্রিকা, ৩৩০
ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত- ৩৩৪
বঙ্কিম- ৩৪৩
রাজা রামমোহন রায় ৩৫৬
অক্ষয় কুমার দত্ত ৩৫৮
কেশবচন্দ্র সেন ৩৫৯
করম চাঁদ গান্ধী ৩৬২
গান্ধী কি সত্যই জাতির জনক? ৩৭২
শ্রী অরবিন্দ ৩৭৫
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ৩৭৬
স্বামী বিবেকানন্দ ৩৭৯
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৮৮

জহরলাল নেহরু	৩৯৪
চিত্তরঞ্জন দাস	৩৯৮
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৪০১
মুহম্মদ আলি জিন্নাহ	৪০২
স্যার সৈয়দ আহমদ খান	
উনবিংশ অধ্যায়	৪০৫
বিখ্যাত হয়েও অখ্যাত যাঁরা-	৪২৭
মাওলানা শওকত আলী	৪২৮
মাওলানা মুহম্মদ আলী	
অস্পৃশ্য সম্প্রদায় ও আম্বেদকর	৪৩৩
শেষের কথা	

>Goto List

ইতিহাসের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

'ইতিহাস'-এর শব্দ সমীক্ষা

আমরা জানি ইতিহাস অতীতের ঘটনাবলিকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য আমাদের কাছে মূর্তিমান হয়ে চির জীবন্তের অভিনয় করে চলে। আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তা ধারার উৎকর্ষ সাধন করে। এক কথায় ইতিহাস আমাদের যাত্রা পথের পাথেয় প্রদানে দৃষ্টান্তবিহীন সামগ্রী সম্ভার। এর অভাবে আমাদের সবই যেন অচল। বরণীয়, মাননীয়, স্মরণীয় সুধীবৃন্দের কথা আমরা বিস্মৃত হব আর পুরাতন অভিজ্ঞতার অভাবে আমাদের হতে হবে শোচনীয়ভাবে সর্বস্বান্ত ও বিভ্রান্ত।

ইতিহাসের নাম বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রূপ। যেমন বাংলায় 'ইতিহাস', ইংরাজিতে 'History' (হিষ্ট্রি), আরবীতে 'তা-রিখ', উর্দুতে 'তা-রিখ', হিন্দিতে 'ইতিহাস' প্রভৃতি।

ইংরাজিতে 'H' অর্থে 'তার' 'Hi' (হাই) অর্থে 'এই' (Word calling), 'His' অর্থে 'তার' (Possessive form of he), 'Story' অর্থে 'ইতি কথা', 'বানানো গল্প', Tale (an account of past event)। তাহলে His+Story=History. এবার যদি কেউ প্রতিবাদের সুর তুলে বলেন যে, History-এর বানান Hisstory হল না কেন? তাহলে প্রত্যুত্তরে বলতে হয়, 'Hiss মানে বিষাক্ত সাপের হিস হিস শব্দ (Sharp sound that of a snake. আর যদি `His+tory" রূপে সন্ধি বিচ্ছেদ করা হয় তাহলেও কম মারাত্মক হবে না। 'tory' মানে A conseauative Member of England, ইংলন্ডের রক্ষণশীল দলের সভ্য, (বিলেতের সংকীর্ণমনা সাম্প্রদায়িক দলীয় স্বার্থপর একটি অতি গোড়া দল)।

তাহলে 'History' কথাটি বহু তথ্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। আমাদের রাষ্ট্র ভাষা হিন্দি এবং বাংলাতেও 'ইতিহাস' কথাটি নিরর্থক নয়। ইতিহাসের 'ই' বাংলা বর্ণমালার তৃতীয় অক্ষর; 'ই' মানে কামদেব (ঠাকুর দেবতা), 'ইত' মানে 'গত', 'ইতি' মানে এই, ইতিহ' মানে লোক পরম্পরাক্রমে প্রচলিত কথা' (সত্য বা অসত্য যাই হোক), 'হাস' মানে 'হাস্য করা, 'ইতিহাস' মানে 'পুরাতন কথা', এখানেও নিরপেক্ষ তাত্ত্বিক বিচারে আমরা ইতিহাসের অর্থ পাই কামদেব, গত, খতম করা, অর্থশূন্যতা কিংবদন্তী বা লোক কথা, পুরাতন কথা, হাসি, তামাসা ইত্যাদি।

বর্তমান সভ্যতার ইতিহাস মঞ্চে সঠিক তারিখ ও সাক্ষী-প্রমাণ থাকলে তাকেই বলে 'ইতিহাস', নচেৎ তা রূপকথা, ভূত, রাক্ষস প্রভৃতি পুরান পচা কাসুন্দির ন্যায় মন মাতানো গল্প বই কিছু নয়। আরবী ও উর্দুতে ইতিহাস অর্থে 'তা-রিখ' যে শব্দটি এটি আমাদের বাংলা ভাষায় সর্বজন ব্যবহৃত শব্দ। অতএব দিনপঞ্জি, তারিখ, কাল, সময় প্রভৃতি সম্বন্ধে সমীক্ষান্তে আরবদেরও ইতিহাসের চরিত্র সহজেই অনুমেয়।

পৃথিবীতে বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও মত থাকলেও ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান সকলেরই নেই। আমাদের ভারতের ইতিহাস জানতে হলেও ভারতীয় ভাষায় ইতিহাস পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাতে Reference বা উদ্ধৃতি যা পাওয়া যাবে তা বেশির ভাগ ইংরেজি। আর বাংলা ও ইংরেজি ইতিহাস পড়লে পাওয়া যাবে সেইসব ইতিহাসের উদ্ধৃতি–ঐতিহাসিকদের মন্তব্য যা আরবী, ফারসি, উর্দু প্রভৃতি ভাষাকেন্দ্রিক। এই গোড়ার কথাগুলো না জানলে আমরা বক্ষ্যমাণ স্রোতঃস্বতীর আলোচনা স্রোতে সাঁতার দিয়েও পাব না পর্যাপ্ত তৃপ্তি আর আনন্দের অকৃত্রিম স্বাদ।

বিদ্বেষ বীজ বপন

বর্তমানে আমাদের দেশে ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানে (যা দেশ বিভাগের পূর্বাহ্নে ছিল অবিভক্ত ভারতবর্ষ) যেসব ইতিহাস পড়া বা পড়ানো হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা ইংরেজি প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত। সুচতুর ইংরেজরা ভারতবর্ষে যখন সুচ হয়ে ঢুকেছিল তখন ভারতবর্ষ ছিল মুসলমানদের শাসনাধীন এবং যখন ইংরেজরা ছলে বলে, কলে-কৌশলে মহা শক্তিধর হয়ে আত্মপ্রকাশ করে ভারতকে নিজেদের বুটের তলে চেপে ধরতে চেয়েছিল সেও মুসলমানদের শাসনকালে। কীভাবে ও কেমন করে তা সম্ভব হয়েছিল সে আলোচনা পরে আসছে। তবে ইংরেজরা বুঝেছিল মুসলিম জাতি মণিহারা ফণির মত দিশেহারা হয়েছে এবং যে মাটি, যে যশ, যে সুযোগ, যে কৃতিত্ব তাদের হাত ছাড়া হয়েছে তারা প্রতি মুহূর্তে তার প্রতিশোধের প্রতিক্ষায় থাকবেই।

ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান মূল জাতি দুইটি ভারতের ইতিহাসে, ভারতের আকাশে-বাতাসে, অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে প্রাণ আর দেহের মত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল বা আছে। অন্যান্য জাতি বা উপজাতি ভারতে বহু আছে স্বীকার করলেও অনেকের মতে সেগুলো এই দুইটিরই শাখা-প্রশাখা মাত্র।

চতুর ইংরেজরা জানত, শরীরের সর্বত্রই রোগের প্রকাশ যত ব্যাপকই হোক না কেন, সাধারণত হাতে ইনজেকশন দিলেই সব জায়গায় ঔষধ পৌঁছায়। তাই ভারতবর্ষকে পদানত রাখার জন্য আবিষ্কার করল এক মহৌষধ। সাম্প্রদায়িকভাবে ভেদবুদ্ধি। যদি দুইটি জাতিকে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত করতে পারা যায় তাহলে মুসলমান জাতি মাথা তুলে স্বাধীনতার চেষ্টা করতে পারবে না। প্রথমত সব সময় নিজেদের মধ্যে বিবাদ, কলহ আর প্রতিশোধ প্রবণতায় সময় ও শক্তির

ক্ষয় হবে। দ্বিতীয়ত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতিকে ইংরেজরা মিত্র বা বন্ধুরূপে পেতে পারবে। ইংরেজরা এও বিশ্বাস করত যে, হিন্দু জাতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা লড়াই করতে যাবে না, কারণ মুসলমান শাসকদের অধীনে থাকা বা ইংরেজ শাসকদের অধীনে থাকা একই কথা। বরং অমুসলমান ভারতীয়দের মানস পটে এই ধারণাই বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছিল যে মুসলমান শাসনাধীন থাকার চেয়ে ইংরেজ শাসনাধীন থাকা অধিক সুখকর হবে। কিন্তু এ ধারণার অবসান হয়েছিল তখন, যখন ভারতের হিন্দু মুসলমান এক মন, এক পণ ও এক শপথ নিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে গিয়ে শক্ত হাতে ধরেছিল স্বাধীনতার হাতিয়ার।

ইংরেজরা এটাও অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তেই জানতো যে সারা বিশ্বের সমস্ত মুসলমান ছিলেন মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন শরীফ আর বিশ্ব ত্রাতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) তথা তদানীন্তন আরব সভ্যতার উপর শ্রদ্ধা ও আস্থাশীল। তাই ভারতে মুসলমান আমলে ভাষার ক্ষেত্রে আরবী, ফারসি ও উর্দু সভ্যতার সংমিশ্রণে নতুন এক সংস্কৃতি ও সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। কোর্ট-কাছারি আইন আদালতের ক্ষেত্রে দলিল দরখাস্ত প্রভৃতি ফারসি ভাষায় হত আর ব্যক্তিগত আদান প্রদানে হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকেই রাজকীয় ভাষা আরবী ফারসি ও উর্দু মিশ্রিত সভ্যতা বহন করতেন। তাতে দুঃখ লজ্জা কিংবা ঘৃণা ও দ্বিধার দ্বন্দ্ব তো ছিলই না; বরং প্রকাশ পেত আভিজাত্য আর শিক্ষাসুলভ যোগ্যতা।

ইংরেজরা এই ঐতিহ্যবাহক চলন্ত উজ্জ্বল ধারাটিকে চাইল ম্লান করতে, চাইল ধ্বংস ও চিররুদ্ধ করতে। আর সর্বাগ্রে তারই প্রথম প্রয়োগ বা প্রয়াস স্বরূপ সৃষ্টি হলো ইতিহাসে ভেজাল প্রদান; এমনভাবে ইতিহাস রচিত হলো, যা পড়লে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে উঠে যেন মুসলমান জাতি হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করেছিল। নতুন ইতিহাসে যেন মুসলমানদের চিরশত্রু এবং হিন্দু বিদ্বেষীরূপে চিত্রিত করা হলো এবং এই ধারণার উৎপত্তি সাধন করা হলো যে, যে বাদশাহ বা শাসক যত বেশি ইসলাম ধর্মের ভক্ত তিনিই তত বেশি পরিমাণে হিন্দু বিদ্বেষী।

এর কারণ ছিল মোটামুটি দুটি। প্রথমত এর ফলে সহজেই অমুসলমান পাঠকবর্গ মুসলমানদের ওপর প্রতিশোধ প্রবণ ও শত্রু হয়ে উঠবে। আর দ্বিতীয়ত, আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম সমাজ ধর্মের ওপর ঘৃণা ভাব পোষণ করবে এবং অনাস্থা আসবে তাদের ধর্মভীরুতার ওপর যার ফলে তারা সোনার পাথরবাটির মত মুসলমান নামধারী খৃষ্টান অথবা অন্য কিছু অদ্ভুত নতুন খৃষ্টান দল হবে, যা ইংরেজ শক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে দিনের পর দিন।

মুসলমান রাজা বাদশাদের মধ্যে অনেকেরই স্বধর্মের বিরুদ্ধাচরণ এবং চরিত্রহীনতার চরম পরিচয় প্রদান সত্ত্বেও ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ ও তাঁদের পোষ্যপুত্রগণ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রঙ বেরঙের উপাধির মালা পরিয়ে তাঁদেরই ইতিহাসে হিরো (Hero), মহামতি (The great) ইত্যাদি ভূষণে ভূষিত করার চেষ্টা করেছেন। তার ফলে মুসলিম শিক্ষিত সমাজধর্মে এবং সংস্কৃতি ও

ঐতিহ্য লাথি মেরে অথবা উপেক্ষার বাণ হেনে উদার চেতার উৎকট উপাধি পাওয়ার অভিযানে যেন উঠেপড়ে লাগতে চায়।

সারা বিশ্বে মুসলমান জাতি কম বা বেশি তাদের মূলগ্রন্থ পবিত্র কোরআন শরীফ এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ আর বাণীকেই পুঁজি করে শিক্ষার ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে, কর্মের ক্ষেত্রে এবং চিন্তা ধারণা ও জীবনের যেকোন সাধনার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বকে চমক লাগিয়ে দিয়েছে। শুধুমাত্র নিজেরাই উন্নত হয়ে ধন্য হয়নি বরং সে যার ওপর কোমল কঠিন আঘাত করেছে সেও উপকৃত, সভ্য ও সুন্দর হয়েছে। আবার মুসলমানদের যারা ধ্বংস করার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে আঘাত করতে গেছে, ইতিহাস প্রমাণ করে শুধু প্রতিঘাত ছাড়াও তাঁরা বহু দিকে লাভবান হয়েছেন। আঘাতকারী দল কলা-কৌশল, আক্রমণ, প্রতিরোধ গেরিলা পদ্ধতি ইত্যাদি শিখে অবশ্যই লাভবান হয়েছেন।

পূর্বোক্ত বক্তব্য প্রমাণোদ্দেশ্যে শ্রী অবিনাস ভট্টাচার্য, এম এ পি এইচ ডি এবং অনিল কুমার দাস, এমএ বি-টি মহোদ্বয়ের লেখা থেকে কিছু অংশ গভীর শ্রদ্ধার সহিত তুলে ধরছি। "…. ভারতীয় সমাজ, ধর্ম, শিল্প প্রভৃতির ওপর ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, কালক্রমে বহু হিন্দু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ইহাদের মারফত হিন্দু আচার রীতিনীতি মুসলিম সমাজে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে যেমন প্রভাবিত করিল তেমনি ইসলামের সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দু সমাজ অধিকতর হিন্দু ধর্ম ও সমাজ অধিকতর উদার ও সাম্যভাবাপন্ন হইয়া উঠিতে থাকে।"

অবশ্য এ কথাও মনে রাখতে হবে, মুসলমান বাদশাগণ ভাল-মন্দ যা কিছু করেছেন তা-ই কোরআন-হাদীসের নির্দেশ নয়। যেখানে অত্যাচার, অনাচার, অবিচার সেখানে আইনের দোষ নয়; বরং সেখানে তাঁদের ব্যক্তিগত অপরাধ, ত্রুটি ও চারিত্রিক কলঙ্ক ছাড়া অন্য কিছু মনে করা চলে না।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ইংরেজদের প্রয়োজন ছিল হিন্দু ও মুসলিম জাতির মধ্যে বৈরিতা বা শত্রুতা সৃষ্টি করা। তাই মুসলমান মাওলানা, মৌলভী, মোল্লা, মুফতি কাজী প্রমুখ পণ্ডিতদের সম্মানীয় উপাধিকে ছোট করে দেখার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। অবশ্য তাঁরা জয়ীও হয়েছিলেন অনেকাংশে। আজও আমাদের দেশে মোল্লা যেন একটা ঘৃণ্য শব্দ, 'কাজী' উপাধিও মনে করিয়ে দেয় খামখেয়ালি অন্যায় বিচারের কথা, সাধারণ সমাজের অনুমান কাজীর বিচার মানেই অবিচার; অথচ কাজী, মৌলভী, মাওলানা, মোল্লা উপাধিধারী মনীষীগণ ছিলেন নানা ভাষা ও অভিজ্ঞতায় পণ্ডিত। আবার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ইংরেজরা মুসলমান রাজা-বাদশাহদের প্রশংসা করতেও ভোলেনি, কারণ শুধু যদি দুর্নাম আর দোষ বর্ণনা করা হয় তাহলে বর্ণনাকারীকে নিরপেক্ষ মনে নাও হতে পারে। তাই বোধহয় আজ বর্তমান ইতিহাস মণ্ডপে প্রশংসার দুগ্ধ বর্ষণ শেষে সামান্য গোমূত্র প্রয়োগ।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, ভারতের দুটি বিশিষ্ট জাতি হিন্দু ও মুসলমান যদি ইংরেজদের ঐ ঔষধ সেবন না করত তাহলে অনেকের মতে আমাদের সাধের ভারতবর্ষ আজ তিন খণ্ডে খণ্ডিত হত না এবং শত সহস্র নয় বরং লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান প্রমুখ ভারতবাসী টুকরো টুকরো হয়ে রক্তাক্ত মৃত্যুর কোলে ছিটকে পড়ত না।

এখন এদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়িত। কিন্তু তাদের খাওয়ানো ঔষধ আমাদের পেটে আছে তাই সাম্প্রদায়িকতা এবং ইতিহাসে ভেজাল দেওয়ার ভয়াবহ ব্যাধি হতে আজও ভারতবাসী মুক্ত বলে মনে হয়নি?

আজও মুসলমান জাতিকে যদি বিদেশী মনে করা হয় তবে নিঃসন্দেহে তা ত্রুটিপূর্ণ ধারণা। কেননা যারা বাইরে থেকে আক্রমণ করে লুটপাট করে ক্ষণিক পরেই করেছে পলায়ন, তাদের বিদেশী নামে অভিহিত করা যায়। কিন্তু এদেশের আর্য সভ্যতা এবং মুসলমান সভ্যতা ভারতের বাইরে হতে এলেও এই উভয় জাতি ভারতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন; এ দেশকে নিজের দেশ বলে স্বীকৃতি দিয়ে ও নিয়ে এই দেশেরই সার্বিক উন্নতির জন্য শক্তি ও শ্রম, সময় ও অর্থ সবই ব্যয় করেছেন। বংশপরম্পরায় এখানে জন্মে এই ভারতেরই মাটিতে যাঁরা নিজের দেহকে দিলেন মিশিয়ে তাঁদের বিদেশী বলে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলে তা হবে চরম সংকীর্ণতার পরিচয়। আর যদি একান্তই কালের চক্রান্তে এটাই হয় চূড়ান্ত, তা হলে মুসলিম সভ্যতা ও আর্য সভ্যতা দুটিকেই একই কষ্টি পাথরে বিচার করা দরকার। তাতে প্রমাণিত হবে এ দুটি সভ্যতা হয় স্বদেশী নতুবা বিদেশী।

আর্যদের ভারত আগমন

বর্তমান ভারতে সরকার অনুমোদিত নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের ইতিহাস হতে আর্য জাতি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে কিঞ্চিৎ তুলে ধরছি–

"পণ্ডিতদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া আর্যদের আগমনকাল ও বসতিকেন্দ্র লইয়া তর্ক চলিতেছে। কেহ বলেন, পূর্ব ইউরোপ হইতে, কেহ বলেন দক্ষিণ রাশিয়া বা উত্তর মেরু হইতে আর্যরা আসিয়াছেন। বিগত উনিশ শতকের মাঝামাঝি হইতে পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার এবং তাঁহার মত আরও কয়েকজন ভাষাতত্ত্ববিদ প্রচার করিতে থাকেন যে, মধ্য এশিয়ার কোন স্থানে আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল, সেখান হইতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বা অন্য কোন কারণে পশ্চিমে ও দক্ষিণে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েন। কয়েকটি দল যান ইউরোপে এবং সেখানে রুশ, গ্রীক, জার্মানী, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশে উপনিবিষ্ট হন। এইসব দেশে স্লাব, গ্রীক, ইতালীয়, টিউটন ও কেল্ট জাতীয় লোকেরা আর্যদের বংশধর। যাহারা দক্ষিণ দিকে আসেন তাঁহারা পারস্যে উপনিবিষ্ট হন এবং পরে পারস্য হইতে এক দল ভারতে আসেন। কেহ কেহ মধ্য এশিয়ার বদলে পূর্ব ইউরোপকে আর্যদের আদিবাসকেন্দ্র বলেন। তাঁহাদের মতে আর্যরা সেখান হইতে প্রথমে

>Goto List

মেসোপটোমিয়া আসেন এবং পরে তাঁহাদের কয়েকটি দল পূর্ব দিকে পারস্যে ও ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।”

“সম্প্রতি পণ্ডিতরা বলিতেছেন, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ বছরের দিকে মধ্য বা পূর্ব ইউরোপের কোন অংশে অথবা রুশ দেশের উরাল পর্বতমালার সমতল ভূ-ভাগে ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য জাতির উৎপত্তি হয়। অত্যধিক শীতের জন্য হোক বা অন্য জাতির আক্রমণের ফলে হোক এই আর্যরা পিতৃভূমি হইতে পূর্বে, দক্ষিণে, ও পশ্চিমে ছড়াইয়ে পড়িতে বাধ্য হন। বাস্তব সভ্যতায় ইহারা যে খুব উন্নত ছিলেন তাহা নহে।”

প্রসঙ্গত আর একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করা গেল না। তিনি বলেন, “খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ আজ হতে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্গম গিরিপথ পার হয়ে আর্য জাতির এক শাখা পশ্চিম পাঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হয়। তাদের পূর্বে এদেশে কোল ভীল-সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতি এবং দ্রাবিড় নামক সুসভ্য জাতি বাস করত।

(বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ ডি ফিল অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

এতদ্বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত উদ্ধৃতি কয়টিতে একটি বর্ণও যোগ বা বিয়োগ করার দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করা হয়নি। অতএব এখানে পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে যে, আর্য জাতি মানেই বিদেশী বিলেতি জাতি; এই ছোট্ট কথাটি মনে রাখলে তখনই মুসলমান স্বদেশী কী বিদেশী পার্থক্য বুঝতে বিঘ্ন ঘটবে না। উপর্যুক্ত পারস্যকে ইরান বলা হয়, আর আরবেরা পারস্যকে ফারস বলে এবং পারস্যের ভাষাকে ফারসি বলে। ‘প’ কে ‘ফ’ বলার একটা কারণও হচ্ছে এই যে, আরবী বা আরব বর্ণমালায় ‘প’ বলে মোটেই কোন অক্ষর নেই; তৎপরিবর্তে আছে ‘ফে’ বা ‘ফ’। আর পারস্যের ভাব, ভাষা, চরিত্র ও রক্তের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট সম্পর্ক আছে। এতদ্ব্যতীত গবেষণান্তে এও প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, আরবী ভাষী; পারসী ভাষী ও আর্যগণ পরস্পর নিকটবর্তী একই অঞ্চলে বাস করেছিলেন এবং বহুকাল পর তাদের পরস্পরের ভাষা ও শব্দের সঙ্গে পারস্পরিক সংমিশ্রণ ঘটে।

তখনকার দিন হিন্দু আর্যগণ আরবী ও পারসী শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহশীল ছিলেন, তার প্রমাণস্বরূপ শাস্ত্রের কিছু বাণীর উদ্ধৃতি দেওয়া হলো–

“জ্যৈষ্ঠা শ্লেষা মঘা মূলা রেবতী ভরণীদ্বয়ে।
বিশাখা চোওরাষাঢ়া শতর্ভে পাপ বাসরে॥
লগ্নে স্থিরে সচন্দ্রেচ পারসী মারাবীং পঠেত॥”
ইতি–
গণপতি মুহূর্ত চিন্তামণি
(**শব্দ কল্পদ্রুম** ও বিশ্বকোষ হতে উদ্ধৃত)

>Goto List

অর্থঃ–জ্যৈষ্ঠা, অশ্লেষা, মঘা, মূলা, রেবতী, ভরণী, বিশাখা উত্তরষঢ়া ও শতভিষা নক্ষত্রে, শনি, রবি ও মঙ্গলবারে সচন্দ্রস্থির লগ্নে আরবী ও পারসী পড়াশোনা করবে।

"আর্য ও পারসিকেরা বহুদিন হইতে যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহা এই উভয় জাতির ভাষা ও আচার ব্যবহার দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।"

(বিশ্বকোষ কর্তা প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের লেখা হতে)

পারসীদের ন্যায় অতটা ঘনিষ্ঠ সংশ্রব না থাকলেও আরবদের সাথেও তাদের যে পারিবেশিক সংশ্রব ছিল তাও স্বতঃপ্রমাণিত হয়ে আছে। উপরিল্লিখিত সত্য দুইটির যথার্থতা প্রমাণে নিম্নে যথাক্রমে সংস্কৃত ও ফারসি শব্দের এবং সংস্কৃত ও আরবী শব্দের সমার্থবোধক তালিকা প্রদত্ত হল।

ক। সংস্কৃত ও ফারসি সমার্থবোধক তালিকা-

সংস্কৃত ফারসি সংস্কৃত ফারসি

১। শত ছদ
২। সপ্তাহ হফতা
৩। শৃগাল শেগাল
৪। মাস মাহ্
৫। সপ্তসিন্দু হপ্তসিন্দু
৬। উষ্ট্র শুতর
৭। মেষ মিশ
৮। গ্রীবা গ্রেবা
৯। দেব দেও
১০। আম্র আম
১১। শর্করা শাক্কর
১২। এক য়াক (ইত্যাদি)

খ। অনুরূপ সংস্কৃত ও আরবী শব্দের সমার্থক তালিকা-

সংস্কৃত আরবী সংস্কৃত আরবী

১। আপর্দ আফং
২। ছত্র ছতর
৩। মা উম্মা
৪। কর্পূর কাফুর
৫। হলাহল হলাহল
৬। গান গেনা
৭। আর্য আরিয়া
৮। সর্দি ছার্দি

৯। দ্রাবির দ্রায়িদ

১০। চন্দন সন্দল

১১। শীত শিতা

১২ অল্ল আল্লাহ (ইত্যাদি)

অল্ল মানে 'পরমেশ্বর' পরম দাতা' (বাংলা অভিধান)।

হিন্দু লেখকের 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থে ১ম খণ্ডে ৫৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "অল্ল", অল্লা (আল্ল, আল্লা) অর্থাৎ মুসলমানদের উপাস্য পরম দেবতা। আমাদের অর্থ বর্ণ সূত্রে ঐ পরম পুরুষের উপাসনার কথা উল্লিখিত আছে।

এখন ইরান ও পারস্য হতে কেমনভাবে আর্যগণ ভারত তথা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ল সে সম্বন্ধে গবেষণান্তে যা পাওয়া গেছে তা মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ–

ইরান দেশে জরদশত নামে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকায় (Encyclopadia Britanica) 'Zoroaster' এবং বিশ্বকোষ এ "জরসুস্ত্রস্পিতম" নামে ডাকা হয়েছে। ইরানী ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Sir percy Sykes-এর বক্তব্যের ছায়াবলম্বনে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গাশতাশপ'নামক জনৈক রাজবংশীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন পুরুষ জরদাশতের শিষ্য হন। তখন সেখানে ভারতের মত পুরাতন ধর্ম অনুযায়ী পূজা পার্বণের খুব জোরালো নীতির প্রচলন ছিল। কতটা বাড়াবাড়ি ছিল তা বিখ্যাত এক পণ্ডিতের পুস্তকের একাংশ তুলে ধরলাম; এটুকুই বোঝার পক্ষে পর্যাপ্ত হবে বলে মনে করি।

"প্রকৃতির প্রত্যেক অবদান–এমনকি ভেক পর্যন্ত ছিল তাহাদের পূজার দেবতা। বিবাহ পদ্ধতিতেও নানা প্রকার অনাচারের প্রাদুর্ভাব ছিল। হিন্দুদের মতো তাহাদের মধ্যে নরমেধ যজ্ঞের প্রচলন ছিল। দাস প্রথা ইত্যাদির তো কথাই নেই।"

যাহোক, গাশতাশপের এবং তার সভাসদ তথা বেশির ভাগ লোকের নতুন ধর্ম গ্রহণের পর পুরাতন ও নতুন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে শেষ যুদ্ধটি সংঘটিত হয় সবজাওয়ার শহরের পশ্চিমাংশে। তুরানীদের আক্রমণে বৃদ্ধ গাশতাশপ নিহত হন; কিন্তু প্রচলিত মতানুসারে, তিনি উপাসনার মধ্যেই শিষ্য বৃন্দের সম্মুখে পরলোক গমন করেন। তিনি প্রচার করেছিলেন সৃষ্টিকর্তা এক; তিনি ছাড়া আর কারো উপাসনা নিষেধ। সোমলতার রস ও মদ্য পান নিষেধ। পরকাল ও ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে হবে।

মোটকথা উপর্যুক্ত যুদ্ধের স্বাভাবিক ফলাফল দাঁড়ালো এই যে, পরাজিত মূর্তিপূজক বা পুরাতন আইন পদ্ধতির অনুসরণকারী নানা দিকে দেশ ত্যাগ করে চলে এলেন। আমাদের ভারতে কাশ্মীরে ও এলাহাবাদে আর্য আগমন এইভাবেই হয়েছে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস

ভারতের প্রাচীন নিজস্ব ইতিহাস বলতে 'বেদ নামে পরিচিতি চারখানি ধর্ম পুস্তকের বিশেষত ঋগ্বেদ।' আবার রামায়ণ ও মহা-ভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থগুলো অনেকের মতে মূল ইতিহাস বলে গ্রহণীয়। কিন্তু বাইরের ইতিহাসগুলো বাদ দিলে এগুলোতে যে তথ্য বা তত্ত্ব আছে তা প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান হিসেবে নগণ্য। তবে মুসলিম ইতিহাস ও ইংরেজদের ইতিহাস পরিপক্ব জ্ঞান থাকলে ঐ সমস্ত গল্প কাহিনী হতে কিছু কিছু যোগ- বিয়োগের মাধ্যমে কোন কোন স্থানে খাপ খাওয়ানো যেতে পারে। জানা দরকার, পুরাতন পুস্তক মাত্রই ইতিহাস নয়। অনেক মুসলমান পুঁথি লেখকও লিখেছেন এই কায়দায়, যথা–

"লাখে লাখে মর্দ ছব ছহিদ হইল, লোহুতে লাল হয়ে দরিয়া বহিল" ইত্যাদি ইত্যাদি। এর নাম ইতিহাস নয়। তেমনি আবার অনেক বিজ্ঞজনের মতে রামায়ণ মহাভারতের মধ্যেও অনেক কিংবদন্তি ও অসার কল্প কাহিনী আছে, যা ইতিহাসরূপে মর্যাদার অধিকারী নয়। যেমন বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদারের মতে আর্য জাতির জন্ম সম্বন্ধে পুরাণ ও মহাভারতে আছে–

"দীর্ঘতমা নামে এক বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি যযাতির বংশজাত পূর্ব দেশের রাজা মহাধার্মিক পণ্ডিত প্রবর সংগ্রামে অজেয় বলিয়া আশ্রয় লাভ করে এবং তাহার অনুরোধে তাঁহার রানী সদেজ্ঞা গর্ভে পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেন। ইহাদের নাম অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র, সুক্ষ ও বঙ্গ। তাঁহাদের বংশধরেরা ও তাঁহাদের বাসস্থানও তাঁহাদেরই নামে পরিচিত। অঙ্গ বর্তমানে ভগলপুর এবং কলিঙ্গ, উড়িষ্যা ও তার দক্ষিণবর্তী ভূভাগ; পুণ্ড্র, সুক্ষ ও বঙ্গ যথাক্রমে বাংলার উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ও পূর্ব ভাগ। সুতরাং এই পৌরাণিক কাহিনী মতে উল্লিখিত প্রদেশগুলোর অধিবাসীরা এক জাতীয় এবং আর্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের মিশ্রণে সমুদ্ভুত। এই কাহিনী ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।"

ক্ষত্রিয় রমণীগণ স্বামীর আদেশক্রমে পরপুরুষ বা অপর ব্রাহ্মণের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করলে সেই সন্তানকে বলা হয় ক্ষেত্রজ সন্তান। কিন্তু বর্তমান যুগে কেউ-ই সেটাকে ধর্ম বলবে না বরং বলবে ব্যভিচার। ধর্মগ্রন্থের শাস্ত্রকারগণ বাংলাদেশের অধিবাসীদিগকে রাক্ষস, পিশাচ, অসুর প্রভৃতি বলে উল্লেখ করেছেন, এমনকি স্বয়ং "ভগবান মনু" ব্যবস্থা দিয়েছেন যে, "তীর্থ যাত্রা ব্যতীত গমন করিলে তাহাকে পুনরায় সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে।"

ঋগ্বেদের ওপর অনেকেরই বিশ্বাস যে, তার নাকি একটি অক্ষরেরও পরিবর্তন হয়নি, অবিকলরূপে পূর্বাবস্থায় বর্তমান আছে। কিন্তু এ কথা যে সর্ববাদী সম্মত সত্য নয় তা নিচের আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা মারাত্মকভাবে প্রচলিত, কিন্তু বর্তমান যুগে বহু শিক্ষিত মানুষ ধর্মের ঐ অংশের ভুল অর্থ করতে দ্বিধা করছেন না। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সুক্তটি "পুরুষ সুক্ত" বলে বিখ্যাত। এই সুক্তের শেষের দিকে জাতি বিচারের ব্যবস্থা দেওয়া আছে যথা- "সেই বিরাট পুরুষের মুখ হতে

>Goto List

ব্রাহ্মণ, তাঁর বাহুদ্বয় হতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হতে বৈশ্য” পরে আরও বলা হয়েছে পদভ্যাং শূদ্র অজায়ত' অর্থাৎ পা হতে শূদ্র সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু বর্তমানে ঐটুকু ঢাকতে গিয়ে ভুল অর্থ করতে কুণ্ঠাবোধ করা হচ্ছে না। অনেকে বলেছেন, এর অর্থ হবে “শূদ্রই উহার পদদ্বয়”। আবার স্বনামখ্যাত অনুবাদক ও টীকাকার রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঐ সুক্ত সম্বন্ধে বলেছেন, “ঋগ্বেদে অন্য কোন অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার জাতির উল্লেখ নেই। জাতি বিভাগ প্রথা ঋগ্বেদেব সময় প্রচলিত ছিল না। ঋগ্বেদে এই কু প্রথার একটি প্রমাণ সৃষ্টি করার জন্য এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।”

সুতরাং প্রমাণ হচ্ছে ‘ঋগ্বেদে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটেনি’ এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

বলাবাহুল্য, এমন নানা তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভারতে সঠিক ইতিহাসের কোন অস্তিত্ব ছিল না।

এতদ্ব্যতীত মুসলমান সভ্যতা বা হযরত মুহাম্মদের (সা.) প্রতিভাময় প্রভাব প্রকাশ ও প্রচারের আগে সারা বিশ্বে অকথ্য কুসংস্কারের বন্যা চলছিল। ভারতে ছিল নরবলী, সতীদাহ, সাগর-সলিলে সন্তান বিসর্জন, অগ্নিপরীক্ষা, জড় পূজার আধিক্য, জাতিভেদ প্রথা, মারামারি, ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ, শোষণ, পীড়ন প্রভৃতি আরও কতশত অন্যায়, অবিচার। উল্লেখ করা যেতে পারে-উপর্যুক্ত কুসংস্কারগুলোর প্রত্যেকটিই এত সত্য যে, কোন ঐতিহাসিকেরই এ বিষয়ে মতবিরোধ নেই।

এই বিষয়ে রুশ ঐতিহাসিক মিঃ A. Z Manfred যা লিখেছেন তা গভীর শ্রদ্ধার সাথে পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করা হল-

“The most privileged caste was that of the priests Brahmens who were freed from all types of taxation, conscription and carparal punishment. According to the laws of ancient India a nine years old member of the Brahmen cast was considered as father in relation to a ninty years old member of the Kshatriya. In peace time the Kshatriya cast led a relativity undisturbed existence and recived rich gifts and fevours from the kings, but in time of war the were the only section of the population required to fight. The vaisya cast had to pay taxes into the state treasury : commune peasants up to one sixth of there hervest and merchants up to fifth of their income. Most wretched of all was the position of the Sudra caste. Members of this caste had no rights whatever but merely obligations. Member of higher castes only had to pay a fine for the murder of a sudra, the same as for killing a dog.

(A short history of the world, V.I.P-42, 43)

অতএব রুশ ঐতিহাসিক পরিবেশিত তথ্যের দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে ব্রাহ্মণদের কোন কর দিতে হত না; ক্ষত্রিয়, শূদ্র প্রভৃতি জাতিকে ছোট লোক শ্রেণী ধরা হতো। নব্বই বছরের বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়কে নয় বছরের ব্রাহ্মণের পদসেবা করতে হতো; পিতৃজ্ঞান করার বাধ্যকতা ছিল। ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর জাতির প্রতি ছয় ভাগের একভাগ বা পাঁচ ভাগের এক ভাগ কর আদায় করা হত; নরহত্যা করলে শিরশ্ছেদ হতো বটে কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রকে হত্যা করত তবে শুধুমাত্র সামান্য জরিমানা দিলেই চলতো। যেমন পোষা কুকুর মেরে ফেলার শাস্তিস্বরূপ কিছু জরিমানা হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ঐতিহাসিক A.Z. Manfrad যা লিখেছেন এটাকে নিরপেক্ষ তথ্য বলা যায় এই জন্য যে, ভারতের হিন্দু বা মুসলমান লেখকদের মত এঁরা ইউরোপের প্রভাবে প্রভাবিত নন বলে অনেকের ধারণা।

এসব ছাড়াও ব্যভিচার এত প্রবল ধারায় প্রবাহিত ছিল, যা ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করতেও লজ্জা করেছেন। বিখ্যাত বাঙালি ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার "বাংলাদেশের ইতিহাস" গ্রন্থে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে পুরনো দিনের চরিত্র মনে পড়লে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হতে হয়। ব্রাহ্মণ জাতি শূদ্রাকে বিয়ে করতে পারতেন না, ধর্মে নিষেধ, কিন্তু অবৈধ সহবাস বা ব্যভিচার নিষিদ্ধ ছিল না। 'শূদ্রাকে বিবাহ করা অসঙ্গত, কিন্তু তার সহিত অবৈধ সহবাস তদৃশ নিন্দনীয় নয়।' সে যুগের অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ধর্মের নামে, দেবদেবীর নামে দেবালয়াভ্যন্তরে যে ধরনের চিত্র প্রদর্শিত হতো তারও কিছুটা নমুনা তিনি দেখিয়ে গেছেন, "রাজ প্রাসাদে প্রতি সন্ধ্যায় 'বেশ বিলাসিনীজনের মঞ্জীর ম স্বনে' আকাশ প্রতিধ্বনিত হয়; সে যুগের কবি মন্দিরের একশত দেবদাসীর রূপ যৌবন বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া লিখিয়াছেন যে, ইহারা কামিজনের কারাগার সঙ্গীত কেলীশ্রীর সঙ্গম-গৃহ এবং ইহাদের দৃষ্টি মাত্র ভস্মীভূত কাম পুনরুজ্জীবিত হয়। সে যুগে কবি বিষ্ণুমন্দিরে লীলাকমল হস্তে দেবদাসীগণকে লক্ষ্মীর সহিত তুলনা করতে দ্বিধা করেননি, সে যুগের নরনারীর যৌন সম্বন্ধে ধারণা ও আদর্শ বর্তমানকালের মাপকাঠিতে বিচার করলে খুব উচ্চ ও মহৎ ছিল, এরূপ বিশ্বাস করা কঠিন।"

মনীষী আলবিরুনী লিখেছেন, "কোন বৈশ্য এবং শূদ্রবেদ অধ্যয়ন করলে শাস্তি হিসেবে তাহার জিহ্বা কাটিয়া লওয়া হইত। আইনের ক্ষেত্রে সমজ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হইত। উচ্চ জাতির লোক অপেক্ষা নিম্ন জাতির লোকদিগকে

>Goto List

কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। হিন্দু সমাজে শূদ্রগণ ছিল ভারবাহী, পশুর ন্যায়; বিভিন্ন জাতির মধ্যে আন্তর্বিবাহ কিংবা পঙ্ক্তি ভোজন নিষিদ্ধ ছিল; এমনকি শূদ্রগণের স্পর্শও অপবিত্র বলিয়া গণ্য হইত। এইরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া দুর্ভাগ্য শূদ্র নরনারী নিম্নস্তরের জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইত। 'মনু'র 'অনুজ্ঞাতে তাদের জন্য নিতান্ত অপমানজনক কতকগুলো জীবনযাপন প্রণালীর শর্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। 'মনু' বলেন, ব্রাহ্মণদের ভোজনের সময়ে কোন চান্দেলা (অনুন্নত জাতি) গ্রাম্য শূকর অথবা কুকুর দৃষ্টি দিতে পারিবে না। চান্দেলাদিগের আবাসভূমি হইবে গ্রামের বহির্প্রান্তে, অন্যলোকের দ্বারা ভগ্ন পাত্রে তাহাদের আহার্য দান করিতে হইবে এবং রাত্রিতে তাহারা শহরে পরিভ্রমণ করিতে পারিবে না। দিনের বেলায় কার্যোদ্দেশ্যে বহির্গত হইলেও তাহাদিগকে রাজ আদেশের চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে।" (মনুস্মৃতি)

মনু ব্যক্তিটি কে? তাও জানা দরকার। মনু-ব্রহ্মার পুত্র, মনুষ্য জাতির আদি পুরুষ, ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতা গ্রন্থের প্রণেতা, মুনি বিশেষ। (বাংলা অভিঃ) ধর্মপ্রণেতা মনু বলেছেন, "পৃথিবীর যেখানে যা কিছু আছে তাহা ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।"

এবার আসুন প্রাচীন আরবের কথায়- হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মের পূর্বে আরব পৃথিবীর সবচেয়ে পাপ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। নর হত্যা চলত কথায় কথায়; সামান্য উটকে জল খাওয়ানো নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে যেত এবং যুগ যুগ ধরে চলতে চলতে ক্রমে তা রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে রূপ নিত। সুদ, মদ, জুয়াখেলা, ব্যভিচার ইত্যাদি খুব ব্যাপকভাবে চলত এবং বিয়ে বলে যা ছিল তা ব্যভিচারেরই নামান্তর মাত্র। এমনকি স্ত্রীর গর্ভধারিণী মাও বিবাহের ইন্ধন হতো। নারী-পুরুষের ব্যভিচার ছাড়াও সেখানে পুং ব্যভিচার প্রভৃতি গর্হিত কাজ হতো এবং জড় পূজার দিক দিয়েও মাত্রা চরমে পৌঁছেছিল। ঠাকুর দেবতা ছাড়া এক পাও যেন অগ্রসর হওয়া যায় না; যদি সঙ্গে কোন দেবদেবী ভুলক্রমে না আনা হত তখন পথিমধ্যে মূর্তি তৈরি করেও পথ চলতে হত। সংক্ষেপে নোংরামি, নিষ্ঠুরতা ও অহঙ্কারই ছিল তদানীন্তন আরবের পরিচয়।

এমনিভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পূর্বে ইরানেও সব রকম অসভ্যতাই বর্তমান ছিল। জড় পূজা ও পশু পূজা প্রভৃতি করতেও তারা অভ্যস্ত ছিল। ইরান সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে আলোচনা কিছু করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে জনৈক রাশিয়ান ঐতিহাসিক ঐ একই কথা বলেছেন–The ancient Iranian religion involved nature (For example the mountans? and animal worship-

Later worship of the Persion tribal god Ahura Mazda and the sun god Mithars became widespread.

তেমনি চীনও চরম সভ্যতায় অনুন্নতার অভিশপ্ত শিকারে পরিণত হয়েছিল।

মহামানবের পদার্পণ

এভাবে সারা পৃথিবীতে পাপের সমুদ্র যখন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল ঠিক ঐ সময় পৃথিবী এক পূর্ণাঙ্গ চরিত্র, আদর্শবান মহাপুরুষের আগমন প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছিল; এমন সময়ে ৫৭০ খৃষ্টাব্দে বিশ্বত্রাতা মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) 'একেশ্বরবাদের' মূলমন্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হলেন পৃথিবীর নাভিকুণ্ড আরব ভূমিতে। তিনিই ঐ সময়ে সারা বিশ্বে মানবতার অবলুপ্ত প্রায় যৌবনকে ফিরিয়ে আনলেন। বিশ্ব যেন দিন দিন তাঁর শিষ্যে পূর্ণ হয়ে উঠল। চারদিকে শত্রু-মিত্র বুঝতে পারলো সত্যিই এই মহান মানুষটি, জীবনে লেখা-পড়ার সুযোগ না পেলেও তাঁর শক্তিকেন্দ্র ও ভক্তিকেন্দ্র ছিল আল্লাহর অশেষ অলৌকিক শিক্ষা-দীক্ষায় সমাচ্ছন্ন। তাই তিনি অবিলম্বেই সকলের কাছে ভক্তির পাত্র, শিক্ষা গুরু, দীক্ষা গুরু ও আদর্শরূপে মানবজাতির মানবতার সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন। যাঁরা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন; ইহকালের ও পরকালের সুদীর্ঘ পথের পাথেয় মনে করে গ্রহণ করলেন, তাঁরা হলেন মুসলমান। তাঁদের বল, বিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, মানবতা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, প্রত্যেক সুনীতিই পৃথিবীর মানুষের বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। এক কথায় তাঁর আত্মপ্রকাশের পরে পৃথিবীর বুকে এমন একজনও নাম করা মানুষ জন্মাননি, যিনি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) অথবা তাঁর ভক্ত আরবদের প্রভাবে কিছুও প্রভাবিত নন। বরং প্রত্যেকেই পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে সেই অমর মহাপুরুষের মহান জীবনাদর্শের কাছে ঋণী। একথা অপরাপর ধর্মাবলম্বীরাও যুগ যুগ ধরে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে আসছেন। প্রমাণস্বরূপ কতকগুলো মনীষীর মন্তব্য উল্লেখ করা গেল।

মেজর আর্থার গ্লীন লিনওয়ার্ড লিখেছেন; "আরববাসীদের উচ্চ শিক্ষা, সভ্যতা ও মানসিক উৎকর্ষ এবং তাদের উচ্চ শিক্ষার প্রণালী প্রবর্তিত না হলে ইউরোপ অদ্যাপি অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন থাকত। বিজেতার ওপর সদ্ব্যবহার ও উদারতা তাঁরা যে প্রকার প্রদর্শন করেছিলেন তা প্রকৃতই চিত্তাকর্ষক।"

ঐতিহাসিকগণের বিশ্ব ইতিহাসে অষ্টম খণ্ডে লেখা আছে—"মধ্য যুগে আরব রাষ্ট্র একমাত্র প্রতীক ছিল; উত্তরে অসভ্য জাতিসমূহের আক্রমণে বিপর্যস্ত ইউরোপকে তাঁরাই বরবর্তার হস্ত হতে রক্ষা করেন।"

ঐতিহাসিক জি সি ওয়েলস বলেছেন, "আরবদের ভেতর দিয়েই বর্তমান জগৎ তার আলোক ও শক্তি সঞ্চয় করেছে।... ল্যাটিন জাতির ভেতর দিয়ে নহে।"

পাদরি আইজ্যাক টেলর বলেন, "জগতের বহু দেশব্যাপী ইসলাম ধর্ম খৃস্টান ধর্ম অপেক্ষা সাফল্য লাভ করেছে। সর্বক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের প্রচার ক্রমশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়েছে এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী জাতিকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এমনকি যে স্থানসমূহে পূর্বে খৃস্টধর্ম প্রচারিত ছিল তাহাও ক্রমশ খৃস্টধর্মের প্রচারকগণের প্রভাব হতে মুক্ত হতে আরম্ভ

হয়েছে। মরক্কো হতে জাভা এবং সম্প্রতি পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে ইসলাম ধর্ম সুদীর্ঘ পদবিক্ষেপে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশই অধিকার করতে অভিযান আরম্ভ করেছে।

ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মের মূল পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দিচ্ছে। কোটি কোটি ভারতবাসীর এক-চতুর্থাংশ এবং সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও অধিক মুসলমান।"

সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেন, "আমার আশা হয় অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত দেশের শিক্ষিত ও প্রাজ্ঞমণ্ডলীকে সম্মিলিত করে কোরআনের মতবাদের ওপর ভিত্তি স্থাপন করে জগতে একতামূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব। কারণ একমাত্র কোরআনই সত্য এবং মানবকে সুখ ও শান্তির পথে পরিচালিত করতে সক্ষম।"

স্যার উইলিয়াম ম্যুর বলেন, "সম্রাট হিরাক্লিয়াসের অধীনে সিরিয়াবাসী খ্রিস্টানগণ যেভাবে বাস করেছিলেন; আরব মুসলমানদের অধীনে তার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা উপভোগ করতেছিলেন। খ্রিস্টান নরপতি হিরাক্লিয়াসের অধীনে থাকা অপেক্ষা আরবদের অধীনে থাকা অধিকতর শ্যান্তপ্রদ হয়েছিল।"

ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বলেন, "ইসলামের বিশ্বজনীনত্বের অপার্থিব সৌন্দর্যে মুগ্ধ মানবগণ আজ ধরায় এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাহাদের ভাব ও ভাষায় আদান প্রদান করিতে এবং কর্মের যোগ সূত্র স্থাপন করতে প্রয়াসী। ... প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বক্ত ব্যাপিয়ে এই সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপন তাহাও ইসলামের উদার শিক্ষার প্রকৃষ্ট অবদান।

আজ যদি জগতের লোক সেই বিশ্ববন্ধু বিশ্বনবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংসার পথে বিচরণ করিতে পারে, সেই পূর্ণ কীর্তির চরিত্র কথা যদি সর্বত্র প্রচারিত হয় তাহা হইলে আইন কানুনের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য হাজার হাজার প্রহরী নিযুক্ত করিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না। তাহা হইলে হিংসা, দ্বেষ, কলঙ্ক, বিষাদ ধরা পৃষ্ট হইতে মুছিয়া যায়। যে ধর্ম যে উদাহরণ সেই মহামানব এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, আমাদের দেশবাসী যদি সেই ধর্মের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষকে ভালবাসিতে পারে, যদি তাঁহার উদাহরণে আপনার চরিত্রকে গঠিত করিতে পারে, যদি সে ভাবোচ্ছ্বাসে চালিত হয়, তাহারই সুশীতল ছায়ায় বসে শান্তির ধারা প্রবাহিত করিতে পারে, তাহা হইলে এই ভারতের স্বাধীনতার পথে কে অন্তরায় হতে পারে? তাহা হইলে কখনও অশান্তির উদয় হয় না।"

ভারতবর্ষের ব্রাহ্ম ধর্মের অন্যতম নেতা আচার্য কেশবচন্দ্র হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্বন্ধে বলেন, "তিনি তেজপূর্ণ সন্ধিবন্ধন বিমুখ একেশ্বর রাজের প্রতিপোষক এবং পৌত্তলিকতার স্থির প্রতিজ্ঞ চির শত্রু। তাঁহার মত পুত্তলিকাভঙ্গকারী আর কেউ-ই ছিলেন না। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তিনি ঈশ্বরের

সিংহাসন স্পর্শ করিতেও দেন নাই। তথাপিও তিনি প্রেরিত পুরুষদের সম্মান করিতেন। তিনি তাঁহাদর পূজা নিষেধ করিলেন। তাঁহাদের কোন মধ্যবর্তিতা বা অবতারত্ব সহ্য করিলেন না। কিন্তু অপর নবী ও প্রেরিত পুরুষকে বিশ্বাস করিতে তিনিই প্রবর্তিত করিলেন। তিনি ঈশ্বরের বিরোধীগণের বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিকূল ভাব প্রচলিত করে ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের প্রতি ঈদৃশ অনুগত এবং বিশ্বাসী ছিলেন যে, কোন প্রকারের অবিশ্বাস বা কোন শ্রেণীর অবিশ্বাসীকে উৎসাহদানের ভাবও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

তিনি আরও বলেন, “যখন কোন অবিশ্বাসী স্বর্গের ঈশ্বরের সহিত সংগ্রাম করে তাঁহার অবমাননা করে, তাঁহার সিংহাসন বিপর্যস্ত এবং তাঁহার পৃথিবীস্থ রাজ্য ধ্বংস করিতে যত্ন করে, ঈশ্বরের প্রত্যেক যথার্থ সৈনিক ঈশ্বরের পবিত্র জয় পতাকা হস্তে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে এবং দয়া না করিয়া অবিশ্বাস উপহাস বিমর্দিত হইবে– ।”

... “ভারতের ব্রহ্মবাদীগণ যেন নিরন্তর ঈশ্বরের এই প্রেরিত পুরুষের সম্মান করিতে পারেন এবং তিনি স্বর্গ হইতে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের সংবাদ আনয়ন করিয়াছেন যেন তা গ্রহণ করিতে সমর্থ হন।” (মহাজন সমাচার, পৃ: ১২৭-১২৯)

বিখ্যাত পরিব্রাজক **চন্দ্রশেখর সেন** (বার-এট-ল) লিখেছেন, “কেবলমাত্র ষোল বছরের বালক হযরত আলী (রা.)কে ও বিবি খাদিজা (রা.)কে সাথী করিয়া যিনি সংসারে সনাতন ধর্ম প্রচার করিতে সাহসী ও প্রবৃত্ত হন এবং সেই প্রচারের ফলে সহস্রাধিক বর্ষ পৃথিবীর অর্ধেক স্থানব্যাপী এই ধর্ম চলিতেছে। তিনি ও তাঁহার সেই ধর্ম যে বিধাতার প্রেরিত তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।” (ভূপ্রদক্ষিণ ৫২৫ পৃ:)

শ্রী মানবেন্দ্রনাথ রায় বলেন, Lerning From The Muslim, Europe became the leader of Modern civilization. (Historical Role of Islam.)

অর্থাৎ- মুসলিম শিক্ষার প্রভাবেই ইউরোপ জগৎ আধুনিক সভ্যতার নেতা হতে পেরেছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন, “জগতের বুকে ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট গণতন্ত্রমূলক ধর্ম। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত মানবমণ্ডলীকে উদারনীতির এক সূত্রে আবদ্ধ করিয়া ইসলাম পার্থিব উন্নতির চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।”

ডক্টর তেজ বাহাদুর সাপ্রু বলেন- “হিন্দুদিগকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় ইসলাম ধর্মের কতিপয় মূলনীতি- আল্লাহর একত্ববাদ ও মানবের বিশ্ব জনীনত্ব।”

শ্রী ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন- “হিন্দুর স্বধর্ম বিদ্বেষরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই বিধাতা মুসলমানকে শাস্তারূপে এদেশে পাঠাইয়া ছিলেন।”

>Goto List

গুরু নানক বলেন– "বেদ ও পুরাণের যুগ চলে গেছে; এখন দুনিয়াকে পরিচালিত করার জন্য কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ।... মানুষ যে অবিরত অস্থির এবং নরকে যায় তার একমাত্র কারণ এই যে, ইসলামের নবীর প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নেই।"

ভারতের পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহেরু বলেন- হযরত মুহাম্মদ-এর প্রচারিত ধর্ম, এর সততা, সরলতা, ন্যায়, নিষ্ঠা এবং এর বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সমতা ও ন্যায়নীতি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের লোকদের অনুপ্রাণিত করে। কারণ ঐ সমস্ত রাজ্যের জনসাধারণ দীর্ঘদিন যাবৎ এক দিকে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিপীড়িত, শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল; অপরদিকে ধর্মীয় ব্যাপারে নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হচ্ছিল পোপদের হাতে।"... তাদের কাছে এ (ইসলাম বা মুহাম্মদের নীতি) নতুন ব্যবস্থা ছিল মুক্তির দিশারী।"

শ্রী মহাত্মা গান্ধী বলেন– "প্রতীচ্য যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত, প্রাচ্যের আকাশে তখন উদিত হল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং আর্ত পৃথিবীকে তা দিল আরও স্বস্তি। ইসলাম একটি মিথ্যা ধর্ম নয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে হিন্দুরা তা অধ্যয়ন করুক তাহলে আমার মতই তারা একে ভাল বাসবে।"

হযরত মুহাম্মদ (সা.) দিনে এবং বিশেষ করে গভীর রাত্রে সালাত বা নামায, যেকের (আল্লাহর স্মরণ) প্রভৃতি গভীর উপাসনায় নিজের এবং তাঁর ভক্তদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত। রাত্রির সঞ্চিত এই শক্তি দিনের বেলায় প্রয়োগ করতেন আরবের হিংস্র একগুঁয়ে মানুষদের প্রতি। তার ফলে তীব্র বিরোধিতা ও লড়াই শুরু হতো। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাতে ভীত হতেন না; বরং কোরআনের আদর্শে ধৈর্যশীল হয়ে তাদের অত্যাচার সহ্য করতেন এবং সঙ্গীদের সহ্য করতে বাধ্য করতেন।

কিন্তু ফজর (প্রাভাতিক), জোহর (দ্বিপ্রাহরিক) এবং আসর (অপরাহ্নিক) এই ত্রিকালের উপাসনা জোটবদ্ধভাবে কোথাও প্রকাশ্যে কোথাও বা গোপনে চালিয়ে যেতে লাগলেন; তাছাড়া মাগরিব (সূর্যাস্তের পর) এবং এশা এই দ্বিকালের উপাসনাও জোট বেঁধে করতেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির এটাই ছিল তাঁদের প্রাথমিক কোর্স। তারপর রাত্রির অন্ধকারে প্রত্যেকে যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় করতেন 'তাহাজ্জুদ' (রাত্রি জাগরণ) সাধনা দ্বারা। তদুপরি তাঁরা প্রত্যেকেই এমন মূর্তিতে থাকতেন যদ্দারা এক পলকেই চেনা যেত এরা মুসলমান বা হযরত (সা.)-এর দলের লোক; তাঁদের পরিধানে থাকতো ঢিলা জামা, লুঙ্গি-পাজামা, মাথায় থাকত টুপি, তার উপরে অনেকের শিরোপরি শোভা পেত শিরস্ত্রাণ; প্রাপ্ত বয়স্কদের দাড়ি ছিল বড় কিন্তু প্রত্যেকের গোঁফ ছিল কাটা বা ছাঁটা। এই হল মোটামুটি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ভেতর ও বাহিরের চিত্র।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমাদের তথা সারা বিশ্বের মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) জানতেন যে, অন্তরের সাথে সাথে বাহিরের পরিবর্তন সম্ভব না হলে আরবগণ মানবতার মর্যাদাদানকারীরূপে বিশ্বের ইতিহাসে চিরজীবন্ত, চিরবরেণ্য

থাকতে পারে না। হযরতের (সা.) এই ধারণার বাস্তব প্রতিচ্ছবি দেখেছি তখনই, যখন আরবরা ছিল তাঁর মতাদর্শের অনুসারী ও অনুগামী। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ধর্মের ওপর অবহেলা, শৈথিল্য, ভণ্ডামি ও ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটল। হৃদয় বিকৃত হল, চেহারাও পরিবর্তিত হল; শুরু হল পুনরায় ধরনীয় রঙ্গমঞ্চে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পতনে জঘন্যতম দৃশ্যাবর্তন। তাই আজ আমরাও যদি এহেন সংকটময় মুহূর্তে সেই মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে পারি তবে অদূর ভবিষ্যতে হৃত মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করে বিশ্বের ইতিহাসে সম্মানের উচ্চাসনে উপবিষ্ট হতে আমাদের বেগ পেতে হবে না।

বিশ্ব মুসলিমের ভারত প্রেমের কারণ

ভারতবর্ষ ইসলামের ইতিহাসে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকারী দেশ। কারণ সারা বিশ্বের আদি মানব ও আদি নবী হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হয়েছিল যে মৃত্তিকা খণ্ডের দ্বারা তা ছিল 'উজ্জয়িনী' নামক স্থানের মৃত্তিকা। আর সেই উজ্জয়িনী পৃথিবীর অন্য কোথাও নয় তা আমাদের ভারতের সর্বজনবিদিত স্থান উজ্জয়িনী'। আবার আদি পিতা আদম (আ.) কৃত ভুলের শাস্তিস্বরূপ মহান স্রষ্টা কর্তৃক স্বরূপ মহান স্রষ্টা কর্তৃক স্বর্গধাম হতে মর্তধামে যেখানে নির্বাসিত হলেন তাও ছিল এশিয়া মহাদেশ সংলগ্ন এই ভারতেরই সরণদ্বীপ বা লঙ্কা, বর্তমানে সিংহল। (যেটা ছিল ঐ সময়ে ভারতেরই অংশ)

এ ছাড়া বিশ্বনিয়ন্তা স্রষ্টার সৃষ্টি আর এক শ্রেণীর উপাসক আছেন, যাদের আরবীতে মালায়েকা, ফারসিতে ফেরেশতা, বাংলায় দেবদূত, ইংরেজিতে Angel বলে। সমস্ত দেবদূতের সর্দার মহান নেতার নাম জিব্রাঈল (আ.)। তিনি বিশ্বনিয়ন্তা হতে বিশ্ববক্ষে তাঁর বাণী বাহক ছিলেন। প্রত্যেক নবী বা পথপ্রদর্শকের কাছেই তাঁকে আসতে হত প্রভুর অমৃত আদেশ আর উপদেশের বার্তা নিয়ে। বিশ্ব স্রষ্টার এই মহান দায়িত্ব পালনার্থে হযরত জিব্রাঈল (আ.) পৃথিবীর যে স্থানে প্রথম পদার্পণ করেন সেও এই আমাদের সাধের ভারতবর্ষে, যেহেতু প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) এই ভারতেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং 'তফসীরে জালালাইন' আরবী গ্রন্থে পাওয়া যায়; আদম (আ.) ভারত হতেই পৃথিবীর কেন্দ্রভূমি পবিত্র মক্কায় রওনা হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে হযরত মুহম্মদের (স.) বাণী ছিহাছিত্তা হাদীসে খুব একটা পরিলক্ষিত না হলেও একথা প্রমাণের অভাব নেই যে, বহু হাদীস ছিহাছিত্তা হাদীসের বাইরেও বিদ্যমান। তবে এ বিষয়ে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, হযরতের এমন কোন কথা বা কর্ম থাকতে পারে না, যা কুরআন বা ছিহাছিত্তা হাদীসের নীতি বহির্ভূত অথবা এই দুই প্রমাণিক মাধ্যমকে মিথ্যা বা ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন করতে পারে।

বহু পণ্ডিত তাঁদের গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের সাক্ষীস্বরূপ রেখে গেছেন পরিশ্রমলব্ধ অনেক জ্ঞানগর্ভ সংগ্রহলিপি। তাই ভারতের কলকাতা, দিল্লি, আলিগড় প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তৎসংলগ্ন বহু লাইব্রেরি মন্থন করে কিছু

নবোদ্ভূত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, যার দ্বারা প্রমাণ হয় ভারতে ইসলাম ধর্মের সম্পর্কশীলতা অবিচ্ছেদ্য। Dr. Syed Mhmud সাহেবের লেখনীতে প্রকাশ, হযরত আলী (রা.) তথা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জামাতা এবং মুসলিম বিশ্বের খলীফা (প্রতিনিধি) ও পৃথিবীর প্রথম পুরুষ ছিলেন যিনি মুহাম্মদ (সা.)কে সর্বশেষ এবং শ্রেষ্ঠতম নবী বলে স্বীকার করেছিলেন; তিনি বলেছেন ভারতের কথা। যার বঙ্গানুবাদ হল এই যে, "ভারতভূমি যেখানে হযরত আদম (আ.) স্বর্গ হতে নেমে এসেছিলেন এবং মক্কার ভূমি যা হযরত ইব্রাহীমের (আ.) দ্বারা সম্বন্ধ যুক্ত, বিশ্ব ভূমণ্ডলের এই দুই স্থানই উত্তম ভূখণ্ড।" (তবে মক্কা, মদীনা ও জেরুজালেমের পরেই ভারতের স্থান)

"ভারতে অযোধ্যায় এক বিরাট ও বিখ্যাত মন্দিরের পাশে এক দীর্ঘকায় কবর আছে, যার সম্বন্ধে অতীতকাল থেকে ঘোষিত জনশ্রুতি-ঐ সমাধি হযরত শীস আলাইহিস সালামের। হযরত শীস (আ.) হযরত আদমের (আ.) অন্যতম পুত্র, যিনি হযরত আদমের পর নবীত্ব গৌরবপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ হযরত আদমের পরে দ্বিতীয় পয়গম্বর হযরত শীসের বসতি স্থানও এই ভারতেই স্থাপিত হয়েছিল। এ কারণেই সারা দুনিয়ার মুসলমান ভারতকে পয়গম্বরের দেশ বলে।"

হযরত আলীকে (রা.) একবার সিরিয়ার একজন জ্ঞানানুসন্ধিৎসু প্রশ্ন করেছিলেন, "বিশ্বভূমণ্ডলে সব থেকে গুরুত্ব ব্যঞ্জক দেশ কোনটি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সেই দেশ যাকে 'সরন্দীপ' (স্বর্ণদ্বীপ, লঙ্কা বা সিংহল) বলা হয়। যেখানে আদম (আ.) স্বর্গচ্যুত হয়ে নেমে এসেছিলেন।"

একজন ডক্টরেটপ্রাপ্ত পণ্ডিত লিখেছেন, "বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজেও ভারতকে ভালবাসতেন। তিনি একবার বলেছিলেন, ভারত থেকে আমার প্রতি স্নিগ্ধ শীতল মৃদু হাওয়ার হিল্লোল ভেসে আসে।"১

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ব স্রষ্টা মহান আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে মানবজাতির সমগ্র আত্মাকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমি কী তোমাদের প্রভু নই?" তখন সকলে সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল, "নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রভু।" বলাবাহুল্য, আত্মা সমাজের এই একত্রিকরণ ও প্রশ্নোত্তর যে পবিত্র ভূমির ওপর হয়েছিল সেও আমাদের এই ভারতবর্ষ।

হযরত আদম (আ.) সুগন্ধময় স্বর্গধাম থেকে সর্বপ্রথম ভারতে অবতরণ করেছিলেন বলেই ভারতে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশি পরিমাণে সুগন্ধি দ্রব্য পাওয়া যায়। যথা- মৃগনাভী, কর্পূর, সুগন্ধি চন্দন কাঠ, জাফরান, কেওড়া, গোলাপ প্রভৃতি।

এছাড়া হযরত আদম (আ.) স্বর্গ থেকে আসার সময় এক হাতে এনেছিলেন 'হাজারোল আসোয়াদ' নামক প্রস্তর খণ্ডটি যা অদ্যাবধি কাবা গৃহে সুসংরক্ষিত রয়েছে। অপর হাতে এনেছিলেন নানা স্বর্গীয় বৃক্ষ, তরুলতার কিছু নিদর্শন যার প্রভাবে ভারতের মাটিতে আম-কাঁঠালের মত বৃহৎ ও সুস্বাদু ফলের দৃষ্টান্ত সারা বিশ্বকে চমক লাগিয়ে দেয়।

হযরত আবু হোরাইরা (রা.) হযরত (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত আদম (আ.)-এর অবস্থানের জন্য হযরত জিব্রাঈল (আ.)কে ধরায় পাঠানো হয়েছিল তখন হযরত জিব্রাঈল (আ.) পৃথিবীতে শুভাগমন করে আযানের ন্যায় চারবার আল্লাহু আকবার এবং দুবার করে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' ইত্যাদি বাক্যগুলো উচ্চারণ করেছিলেন। তখন হযরত আদম (আ.) মুহাম্মদের (সা.) নাম জিজ্ঞাস করেছিলেন যে, এই ব্যক্তিটি কে? উত্তর দেওয়া হয়েছিল, ইনি আপনার সন্তানদের মধ্যে সর্বশেষ নবী। (তবরানী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

এই বর্ণনা থেকে এ কথাই সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার প্রথম বাণী ও ইসলামের মূল মন্ত্রের প্রথম প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এই ভারতেরই হৃদয় মাঝে এবং পূর্বোক্ত আলোচনা হতে এ কথাও পাওয়া গেল যে, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সমগ্র আত্মাকে একত্রিত করেছিলেন সেহেতু তার মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আত্মাও বিদ্যমান ছিল। অতএব সারা বিশ্বের তথা মুসলমানদের চরম ও পরমতম নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আত্মিক অবতরণ এও সর্বপ্রথম এই ভারত বর্ষেই হয়েছিল।

এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত উত্থাপন করা যায় কিন্তু পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। অবশ্য উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তসমূহের দ্বারা এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, ভারতের সাথে মুসলিম বিশ্বের এক নিগূঢ় আত্মিক সম্পর্ক নিহিত ছিল। যার অনিবার্য কারণেই মুসলমানদের বারবার ভারতের বুকে আগমন করতে হয়েছে।

প্রকৃত ইতিহাস ও ঐতিহাসিকগণ

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, আর্যগণের মতই মুসলমানগণ এসেছিলেন বহির্ভারত হতে তৌহিদের (একেশ্বরবাদ) বাণী বহন করে।

আমরা আদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখব যে, ভারতের আদি ইতিহাস বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ এবং পুঁথিপত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেগুলোর অধিকাংশ সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত। অবশ্য বিরোধীপক্ষ বা শত্রুপক্ষ অনেক কিছু বলতে পারেন কিন্তু মিত্রপক্ষ যা বলেন তা অগ্রাহ্যের নয় অবশ্যই।

ইতিহাস আর ধর্মগ্রন্থ দুটিকে পৃথক বিষয় মনে করা উচিত। কারণ ধর্মের ছায়াবলম্বনে কোন এক ধর্মাবলম্বী জাতি পরিচালিত হয় আর ইতিহাস পরিচালিত হয় মানবজাতির বুদ্ধি বিদ্যাপ্রসূত অভিজ্ঞতার ছায়ায়। যদি বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতকে ধর্মগ্রন্থ বলে সম্মান প্রদর্শন করা হয় তবে সেগুলোকে ইতিহাস গ্রন্থ বলে ছোট করতে অবশ্যই আপত্তি আছে। যেমন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কুরআন শরীফ। এটা স্বয়ং আল্লাহ প্রেরিত সংবিধান, তাতে ইতিহাসের ইন্ধন মিললেও কোন ক্রমেই তা শুধুমাত্র ইতিহাস নয়।

বেদ, পুরাণ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কোরআন শরীফ প্রভৃতি যদি নির্ভুল ঐশীগ্রন্থ হয়, তাহলে ইতিহাস শ্রেণীতে অন্যান্য পুস্তক দাঁড় করাতে হয়। কিন্তু আমাদের প্রাচীন ভারতে সঠিক প্রাণবন্ত ইতিহাস বলতে তেমন কিছু ছিল না; বরং আমাদের তথা ভারতবাসীর চেয়ে আরববাসীগণ ইতিহাস সৃষ্টিতে শত গুণে শ্রেয় বলে বিবেচিত। কারণ তারিখ ধরে সবকিছু লেখা বা গদ্য, পদ্য অথবা কাব্যগ্রন্থ ইত্যাদি মুখস্থ করার কারবার আরবে অতি জোরদার ছিল, এমনকি বাড়ির সামান্য ঘোড়ার ইতিহাস পর্যন্ত তারা লিখে রাখত। তাই ইতিহাসকে তারা 'তারিখ' বলতো বা আজও বলে।

আমাদের ভারতে ইতিহাস শাস্ত্র আজ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট বিষয় সন্দেহ নেই; কিন্তু আমাদের দেশে ইতিহাস জানা পণ্ডিত বা ঐতিহাসিকগণ এবং ইতিহাস বইগুলো বেশির ভাগই ইংরেজ ঐতিহাসিক আর ইংরেজি ইতিহাসেরই প্রসবিত সন্তান। আবার ইংরেজরা কিন্তু ভারতেরও ইতিহাস জানার এবং ভারতে তা অপরিচ্ছন্ন হাতে পরিবেশনের পরিপ্রেক্ষিতে আরব ও পারস্যদের লেখা মূল ইতিহাসের পাঠোদ্ধার করে বহু কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করে আরবী, ফারসি ও উর্দু ভাষা শিখে অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছে।

আজ মনে রাখতে হবে যে, ভারতের মূল ইতিহাস যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা জানতে পেরেছি তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন মুসলমান। কিন্তু আফসোস আর দুঃখের বিষয়, আমরা অনেকেই তাঁদের নাম পর্যন্ত জানি না। সাধারণ মানুষের কথা যদি ছেড়েই দেওয়া যায় তবু বলব, আজ আমরা যারা কেবল ইতিহাসকেই মাধ্যম করে জীবনের উন্নতির পথ বেছে নিয়েছি তাঁরাই বা কয়জন তাঁদের অতুলনীয় অবদানের কথা জানি। তাই পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য কতিপয় মুসলিম বিশ্বের স্বনামধন্য ঐতিহাসিকের নাম উল্লেখ করা গেল। অসংখ্য ঐতিহাসিকের মধ্যে জনাব আল-বিরুনী, জনাব ইবনে খালদুন, জনাব ইবনে বতুতা, জনাব অলি বিন হামিদ, জনাব বাইহাকী, জনাব উৎবী, জনাব কাজী মিনহাজুদ্দিন সিরাজ, জনাব মুহীউদ্দীন, জনাব মুহাম্মদ ঘুরী, জনাব জিয়াউদ্দিন বারণী, জনাব আমীর খসরু, জনাব সামসী সিরাজ, জনাব বাবর, জনাব ইয়াহিয়া বিন আহমাদ, জনাব জওহর, জনাব আব্বাস শেরওয়ান, জনাব আবুল ফজল, জনাব বাদাউনি, জনাব ফেরিস্তা, জনাব কাফি খাঁ, জনাব মীর গোলাম হোসেন, জনাব গোলাম হোসেন সালেমী, জনাব সাঈয়েদ আলি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আজ যখন আমাদের ছেলেরা পাঠশালা, স্কুল বা কলেজে পড়ে তখন উপর্যুক্ত মহাপরিশ্রমী ঐতিহাসিকদের কত জনকেই বা তারা জানে অথবা জানতে পারে। তার ওপরে ইতিহাস নিয়ে রিসার্চ করলে বা ইতিহাস নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ ডিগ্রি নিতে হলে যে ইংরেজি ইতিহাস পড়তে হয় তাতে সামান্য সামান্য

অস্পষ্টভাবে অথবা টীকায় ঐসব ইতিহাস বা ঐতিহাসিকের নাম এমনভাবে জানানো হয়েছে, যা অন্তরে বিশেষভাবে দাগ কাটতে পারে না। অথচ মুসলমান ঐতিহাসিকদের ইতিহাস বিশ্বের প্রাজ্ঞমণ্ডলীকে বিস্ময়ে হতবাক করে দেয় এবং এ গ্রন্থগুলো পৃথিবীর যেকোন ইতিহাসের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে শুধুমাত্র শীর্ষস্থানীয় নয় বরং পিতৃস্থানীয়। এক কথায়, এই সমস্ত ইতিহাস বা ঐতিহাসিকরাই জগতের ইতিহাসের জন্মদাতা। উদাহরণস্বরূপ মুসলিম জ্ঞান ভাণ্ডার হতে সামান্য কয়টি মহা মনীষীর রচিত ইতিহাসের নাম উল্লেখ করা হল।

তারিখি সিন্ধু (তারিখি মাসুমি) নামে বিখ্যাত ইতিহাসটি ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক জনাব মীর মুহাম্মদ মাসুম কর্তৃক লিখিত। ভারতে আরবীয় অভিযান হতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যু পর্যন্ত সঠিক তথ্য সম্ভার সম্বলিত এটি এক মহামূল্যবান গ্রন্থ।

চাচানামা - চাচানামা এক অত্যন্ত অভিজাত শ্রেণীর ইতিহাস। এটি লিখেছেন জনাব মুহাম্মদ আলি বিন বকর। সিন্দু দেশে আরব জাতির বিজয় কাহিনীই হল-এর বিষয়বস্তু, গ্রন্থখানিকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নাম ও ঘটনাবলি বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তাছাড়া এটি সেই সময়কার সিন্দু দেশ তথা ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐতিহাসিক তথ্যের ও নির্ভরযোগ্য সংবাদদাতা। বইটি ফারসি ভাষায় লিখিত।

কিতাবুল ইয়ামিনি- গ্রন্থটি ঐতিহাসিক জনাব উৎবীর রচনা। বইটির মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে সাথে সাহিত্য সৃজনতারও বন্যা বয়ে গেছে পর্যাপ্ত পরিমাণে।

তারিখি মাসুদী- ইতিহাসটি লিখেছেন জনাব আবুল ফজল মুহাম্মদ বিন হাসেন আল বাইহাকী। উচ্চমানের এই ইতিহাসটি নানা ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

বিশেষ করে সুলতান মামুদ সমন্ধে সঠিক আলোচনায় আর প্রকাশনায় ইতিহাসটি প্রশংসার দাবিদার।

তারিখি ফিরোজ শাহী—এর লেখক ঐতিহাসিক জনাব জিয়াউদ্দিন বারণী। বইটিতে বলবনের রাজত্বকাল হতে ফিরোজ তুঘলকের সময় পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। খিলজী ও তুঘলক বংশের ওপর সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য উপাদান এই পুস্তকখানি। ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দে এটি রচিত। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক গ্রন্থখানি পুনরায় ছাপা হয়েছে।

তৈন-উল-আখতার- ইতিহাস গ্রন্থটি লিখেছেন ঐতিহাসিক জনাব আবু সঈদ। নিখুঁত তারিখ উল্লেখে এবং সঠিক সংবাদ পরিবেশনে প্রামাণ্য হিসেবে পুস্তকটি সুপ্রশংসিত।

তারিখুল হিন্দ (তাহ্‌কিকে হিন্দ)-সুবিখ্যাত ইতিহাসটি প্রখ্যাত পর্যটক ও ঐতিহাসিক জনাব আবু রাইহান আলবিরুনীর লেখা। গ্রন্থটির মূল ভাষা আরবী।

>Goto List

পরে এর ফারসিতে অনুবাদ করা হয়। গ্রন্থখানির ইংরেজি অনুবাদও করা হয় ডক্টর সাচ্চু মহাশয়ের তৎপরতায়। ভারতে হিন্দু জাতি, হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি জানবার এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম মূল গ্রন্থ। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক ডক্টর সুনীতি কুমার মুখার্জি তাই মনীষী আলবিরুনীকে 'সভ্যতার আলোকবাহী' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

তা-জুমাসির- বিখ্যাত ইতিহাসটির রচয়িতা। ঐতিহাসিক জনাব হাসান নিজামী। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ হতে ১২৯৮ সাল পর্যন্ত সময়ের এটি তথ্যবহুল এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। কুতুবুদ্দিন আইবক, মুহাম্মদ ঘোরী প্রমুখ বাদশাহদের বিশদ বিবরণ আছে এই গ্রন্থে, যা সমীক্ষিত, সঠিক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

তবকাৎ-ই নাসিরী- ইতিহাসটি লিখেছেন ঐতিহাসিক জনাব মিনহাজুদ্দিন আবু ওমর বিন সিরাজ। ১২৬০ সালে এটি রচিত। ইতিহাস মঞ্চে সর্বস্বীকৃত মূল্যবান এই গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেন মিঃ রেভারটি। মুসলমান রাজা বাদশাহদের জানতে এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

খাজেনুল ফতোয়া- ইতিহাসটি 'ভারতের তোতা পাখি' উপাধিপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক জনাব আমীর খসরুর লেখা। নিঃসন্দেহে এটি একটি সত্য তথ্যযুক্ত সুন্দর পুস্তক। আমাদের পরবর্তী দেশীয় ঐতিহাসিক এ.এল.শ্রী বাস্তব মহাশয় লেখকের খুব প্রশংসা করেছেন। মিথ্যার মিশ্রণ নেই বলেই ভাল ইতিহাসের কোঠায়এর' এত বড় মর্যাদা। অধ্যাপক হাবিব সাহেব ইংরেজিতে এর অনুবাদ করেছেন।

ফতোয়া উস সালাতিন- ইতিহাসটির লেখক জনাব খাজা আবু মালিক ইমামী। বইটি শিক্ষিত সমাজে খুবই সমাদৃত।

কিতাবুর রাহলাব- এই বিখ্যাত ইতিহাসটি ভ্রমণ কাহিনী সংবলিত সুন্দর সৃষ্টি। এটি রচনা করেছেন জনাব ইবনে বতুতা।

তারিখে মুবারক শাহী- এর লেখক ছিলেন জনাব ইয়াহিয়া বিন আহমেদ।

তারিখে সালাতিনে আফগান, গ্রন্থের লেখক আহমদ ইয়াদ গা। **'তারিখে শেরশাহী তোহফা এ আকবার শাহী'র-** লেখক হচ্ছেন আব্বাস শেরওয়ানী। **মাখজান এ আফগান**-এর লেখক হলেন নিয়ামতুল্লাহ।

এছাড়া আরও বহু মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস গ্রন্থ আজ ইতিহাস জগতে জন্মদাতা ও জন্মদাত্রীর ভূমিকায় চির ভাস্বর হয়ে আছে। যথা- 'তারিখে দাউদী'র লেখক হলেন জনাব আবদুল্লাহ। জনাব আবুল ফজলের লেখা 'আকবরনামা; 'আইনি আকবরী; জনাব বাদায়ুনির 'মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ' জনাব নিজামুদ্দীনের লেখা' 'তাবাকাত-ই আকবার;' জনাব হিন্দুবেগ (ছদ্মনাম) সাহেবের লেখা 'ফেরিস্তা', জনাব ফেরিস্তা লিখিত 'তারিখে হিন্দুস্থান', জনাব কাফি খাঁ লিখিত 'মুনতাখাবুল লুবাব', জনাব ফৈজি সাহেব লিখিত 'আকবর নামা' ও 'মসনভী', জনাব আবদুল বাকী সাহেব লিখিত 'মাসির-ই রহিমী; জনাব

এনায়েত খাঁ লিখিত 'শাহজাহান নামা' জনাব দারাশেকো লিখিত 'সফিনাৎ আল আউলিয়া' ও ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গিরী' প্রমুখ জাগদ্বিখ্যাত ইতিহাস ও ঐতিহাসিকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য, মুসলমান জাতির রক্তে রক্তে ইতিহাস লেখা, পড়া তথা ইতিহাসে সর্বপ্রকার আকর্ষণ যেন স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। অবশ্য বর্তমানে ইংরেজদের বিষ খাওয়া হিন্দু ও মুসলমান জাতির কথা স্বতন্ত্র।

আজ ভারতীয় হিন্দু ঐতিহাসিকদের নাম লিখলেও অনেকগুলো নামই সগর্বে লেখা যায়, যেমন ঐতিহাসিক শ্রী রমেশ মজুমদার, শ্রী যদুনাথ সরকার, শ্রী ঈশ্বরী প্রসাদ, শ্রীপ্রভাত বাবু, শ্রী কিরণ বাবু, শ্রী হিরেন বাবু, শ্রী চন্দ্রশেখর বাবু, শ্রী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অক্ষয় কুমার বাবু, শ্রী নৃপেন্দ্রচন্দ্র বাবু, শ্রী অশোক মেহতা বাবু, শ্রী সখারাম বাবু, শ্রী গনেশ বাবু, শ্রী ডাঃ কালিদাসনাথ বাবু, শ্রী হেমেন্দ্র কুমার বাবু, শ্রী কিরণ চৌধুরী, শ্রী বিনয় ঘোষ প্রমুখ ঐতিহাসিকদের নাম বিশেষ প্রশংসার দাবিদার।

কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ঐ সমস্ত অমুসলমান ঐতিহাসিকের নামই আজ ইতিহাসের পাতায় যথেষ্ট নয় বরং এমন অসংখ্য মুসলমান ঐতিহাসিকের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে, যা আজকের আধুনিক শিক্ষিত-শিক্ষিতাদের বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না।

মোটকথা আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যেও মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সংখ্যায় নগণ্য নন মোটেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ জনাব খোদাবখ্‌শ সাহেব এম এ বি সি আই, বিএল; ব্যারিস্টার সালাহ উদ্দিন সাহেব, জনাব মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেব প্রমুখ পণ্ডিত প্রবরের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা বহু পুস্তক-পুস্তিকা ও গ্রন্থ লিখে গেছেন। তাছাড়া 'মুসলিম বিক্রম' 'বাংলায় মুসলিম রাজত্ব' ইতিহাস বই দুটি লিখেছেন হুগলি জেলার শ্রী রামপুরের জনাবা নূরুন্নেসা খাতুন। 'পারস্য প্রতিভা' লিখেছেন জনাব বরকত উল্লাহ সাহেব এম এ বি এল, বি সি এস, 'Musalmon Culture' লিখেছেন জনাব শহীদ সোহাওয়ার্দী সাহেব এমএ। Islam and the modern world' এবং Short cultural History of the Arabs' ইতিহাস দুটি লিখেছেন জনাব কে আলি এম এ সাহেব। জনাব সৈয়দ আলি হাসান সাহেব লিখেছেন 'Our Heritage', এম এন রায়ের 'Historical Rule of Islam'-এর বঙ্গানুবাদ ইসলামে ঐতিহাসিক অবদান আর বৈশিষ্ট্য লিখেছেন জনাব মোহাঃ আবদুল হাই এম এ। H.A.R Gilb ইংরেজ লেখকের 'Mohammedanism-and Historica surlvey' গ্রন্থের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা বাংলায় লিখেছেন জনাব মতিউর রহমান সাহেব, জনাব মোঃ ইসহাক এম এ লিখেছেন ইসলামের অভিনব ইতিহাস ও পাক ভারতের ইতিহাস। জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব এম এ লিখেছেন 'ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' এবং 'পাক ভারতের মুসলিম শাসনের ইতিহাস'। খ্রিস্টান ফিলিপ, কে, হিট্টি সাহেবের

>Goto List

'The Arabs, A short History'r বঙ্গানুবাদ 'আরব জাতির ইতিহাস' লিখেছেন প্রিন্সিপাল জনাব ইব্রাহিম সাহেব এম এ বি,এল। এছাড়া আরও অনেক ইতিহাস বই তিনি লিখেছেন, যেমন A needets from Islam; 'আনোয়ার পাশা 'কামাল পাশা' প্রমুখ। 'A brief survey of Muslim rule in India' পুস্তকখানি লিখেছেন জনাব মোহাঃ মোহর আলি এম এ। 'ইসলাম ও আধুনিক জগত' এবং 'An Introduction to the History of Muslim culture' পুস্তক দুটি লিখেছেন জনাব মোহাঃ মিজানুর রহমান সাহেব এমএ। জনাব মোঃ ওলিউল্লাহ্ সাহেব লিখেছেন, 'সেকাল ও একাল'। জনাব কাজী ইমদাদুল হক বি এ বি টি লিখেছেন 'ঐতিহাসিক গ্রন্থমালা'। জি এইচ রহমান এম এ লিখেছেন তিন খানি অতি মূল্যবান ইতিহাস বই 'Out lines of History of Islam', History of Indo Pakistan' FmÄ ÈOut lines of Modern Europe'। জনাব মুহঃ আবদুর রহিম সাহেব এম এ লিখেছেন 'আরব জাতির ইতিহাস'। জনাব সিরাজ সাহেব লিখেছেন 'মুসলিম সভ্যতা; 'তুরস্ক ভ্রমণ', 'মহানগরী কর্ডোভা প্রভৃতি ইতিহাস। মজিবুর খাঁ এবং আহ্সানুল্লাহ খান বাহাদুর লিখেছেন 'আমাদের ইতিহাস'। জাস্টিস জনাব সৈয়দ আমীর আলি লিখেছেন 'History of the Saracenes', আবার এটাকে 'আরব জাতির ইতিহাস নাম দিয়ে বাংলায় প্রকাশ করেন জনাব রিয়াজুদ্দিন সাহেব। তদানীন্তন স্কুল ইনস্পেক্টর জনাব আবদুল করিম সাহের লিখেছেন "ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত'। নোয়াখালীর জনাব ডক্টর আবদুল কাদের সাহেব লিখেছেন 'সুলতান মাহমুদ', তারপর লিখেছেন 'বাবর', 'হায়দার আলি' ও টিপু সুলতান'। তাছাড়া আরও কয়টি ইতিহাস তিনি লিখেছিলেন, যা মুসলিম প্রতিভার জীবন্ত সাক্ষীস্বরূপ চির উজ্জ্বল হয়ে আছে। যেমন 'তুরস্কের ইতিহাস' 'স্পেনের ইতিহাস', ক্রুসেডের ইতিহাস', 'সালাহউদ্দিন; 'মুর সভ্যতা', 'কামাল পাশা' ও 'মুসলিম কীর্তি' ইত্যাদি। এছাড়া আরও অনেক ইতিহাস ডক্টর সাহেবের অক্ষয় কীর্তির পরিচায়করূপে বেঁচে থাকলেও প্রকৃষ্ট প্রমাণের অভাবে তা এখানে উল্লেখ করা গেল না। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার কালিগঞ্জ থানার নলতা গ্রামের খান বাহাদুর জনাব আহসান উল্লাহ্ এম এ অবিভক্ত বঙ্গে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন। তিনি লিখে গেছেন 'মুসলিম জগতের ইতিহাস' এবং 'ইসলামের ইতিবৃত্ত'।

এছাড়া আরও বহু মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস আজও বেঁচে আছে, যা মুসলিম বিশ্বের অবিস্মরণীয় কীর্তির বাহক। যেমন হুগলী জেলার বাগনানের ডাঃ সৈয়দ আবুল হোসেন সাহেব, খুলনার কাজী আকরাম হোসেন ইত্যাদি বহু ইতিহাস রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। বর্ধমান জেলার জনাব আবুল হায়াত সাহেবের ইংরেজি ইতিহাসটিও চিত্তাকর্ষক বই সন্দেহ নেই। তাছাড়া বর্ধমান জেলার জনাব গোলাম রব্বানী সাহেব, কাটোয়ার জনাব এম, আঃ রহমান সাহেব, বর্ধমানের ওয়ারী গ্রামের আবদুল মওদুদ সাহেব এম এ প্রভৃতি ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ইতিহাসে কম বেশি ছাপ রেখে গেছেন। কিন্তু মাঝখানে কিসের যেন হতাশা; কিসের যেন অমনোযোগ অবহেলা, কিসের যেন অবশ অলস নিদ্রা। লেখদের লেখনীসমুদ্রে পড়ল ভাঁটা। প্রবাহিত হল অমনোযোগিতার স্রোতধারা। আবার এক সময় আচম্বিতে প্রবল জোয়ারের ন্যায় দুকূল প্লাবিত করে অলস ঘুমে অচেতন লেখকদের চেতনার সঞ্চার করতে অমনোযোগিতার যবনিকা টানতে তথা ইনকেলাব আনতে ধূমকেতুর মত আত্মপ্রকাশ করল ‘পুস্তক সম্রাটের মত আরও কিছু জাতীয় ইতিহাস। তবে উপরের পুস্তক-পুস্তিকা ও গ্রন্থাদির দ্বারা একথা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, প্রতিটি শিক্ষিত মানুষেরই অধিকাংশ লেখা আরব, ইসলাম ও মুসলমান কীর্তি কলাপকে কেন্দ্র করে। কিন্তু কেন? এর অন্যতম প্রধান কারণ, শিক্ষিত মুসলমানগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজের বিষবৃক্ষ ফলে-ফুলে মজবুত হয়ে ভারতের মাটিতে শিকড় গেড়েছে। হিন্দু ভ্রাতা মহোদয়গণ দিন দিন যেন বুঝতে শিখছেন যে, মুসলমান বিদেশী আর তারা হিন্দুদের শত্রু। অতএব শত্রুর বীরত্ব, বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্বকে বিকৃত বা চাপা দেওয়া স্বাভাবিক অথচ এই বিষাক্ত প্রতিকূল আবহাওয়াকে অনুকূলে পরিণত করাও প্রতিবেশী মুসলমানদের শক্তির বাইরে। সুতরাং দ্বিতীয় পথই তাঁরা বেছে নিলেন; নিজেদের ঐতিহ্য ইতিহাসকে সঠিকভাবে বাঁচাতে নিজেরাই কলম ধরেছিলেন শক্ত আঙুলে। এক্ষণে ধর্মগ্রন্থগুলোতে কতটুকু ইতিহাসের ইন্ধন মিলতে পারে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

বেদ সম্বন্ধে হিন্দু ভাই-বোনদের বিশ্বাস যে, “ইহা আদিগ্রন্থ, ইহার কোন পরিবর্তন বা বিকার আজ পর্যন্ত সংঘটিত হয় নাই। বেদ মন্ত্রগুলো দীর্ঘকাল ধরিয়া আর্য মুনিঋষিগণের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে এবং শিক্ষার্থী গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া, তাহার বর্ণিত ঐ মন্ত্রগুলো কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়াছে।” কিন্তু বেশির ভাগ পণ্ডিত গবেষণান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, আসল বেদের অস্তিত্ব আমাদের দেশে নেই বরং যেটুকু যেখানে আছে তা বাড়তে বাড়তে মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে বড় রকমের ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে।

এক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষ কোন ব্যক্তির বক্তব্যের অবতারণা না করে স্বয়ং ঋগ্বেদের ভাষ্যকার পণ্ডিত শ্রী মহেন্দ্র চন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ভাষ্য হতে কিছু অংশ তুলে ধরা হল– "এতদৃশ মূল্যবান বেদের আজ কেন এত অল্প প্রচার একটু প্রণিধান করিলেই বোধগম্য হইবে। কুরুক্ষেত্রের মহা সমরে ভারত মহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। মহা যুদ্ধের সহিত আর্য গৌরব রবি (বেদ বা ধর্ম গ্রন্থগুলো) যে চিরতরে অস্তাচলে গমন করিয়াছিল সে বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই।" তিনি আরও বলেন, "দুঃখের সহিত বলতে হইতেছে, প্রবল পরাক্রান্ত মগধের রাজ বংশীয় মহানন্দীসুত, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক হইতেই আর্য রাজ্য বিলোপ হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম ভারত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।" রায় মহাশয় আরও লিখেছেন, 'পরবর্তীকালে বঙ্গে তান্ত্রিক ধর্ম প্রচারের পৃষ্টপোষক মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেনের নিয়োজিত আগমোক্ত শাস্ত্র বাণী কলিতে বৈদিক মন্ত্রশক্তি লোপ পাইয়াছে, বেদ মন্ত্র কার্যকরী নহে; 'যাগযজ্ঞ নিষ্ফল' ইত্যাদি প্রবচনে বেদের আলোচনা একেবারে রহিত হইয়া গেল। স্বধর্ম নিরত নিষ্ঠাবান বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মের আবরণে প্রাণপণে যে গ্রন্থগুলো অতি সংগোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন তাও গ্রীক, রোমান, পারসিক, তুরান, আফগান প্রভৃতি বৈদেশিকগণের বারংবার আক্রমণে বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়া বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এর আসল রচয়িতা কে বা কারা তা মানুষের কাছে নানা পরস্পরবিরোধী মন্তব্যের ঘুরপাক আজও অবধি অজ্ঞাত থেকে গেছে। যেমন–

ক। "হে হরি! আমরা তোমার উদ্দেশে নতুন স্তোত্র রচনা করিয়াছি।" (১০ম–১৬/২১)

খ। "হে ইন্দ্র! তোমার স্তুতির জন্য গৌতম বংশীয় কবিগণ মন্ত্র রচনা করিয়াছিল। (১/৯/৬৩)

গ। "গৌতম এই নতুন বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন।" (১ম, ৩৩/৬২)

ঘ। "হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের রচিত নতুন উবাথে (মন্ত্রে) সন্তুষ্ট হয়ে, আমাদিগকে ক্ষমা করো।" (১ম–১০/১৩০)

ঙ। "এই স্তুতি বিষয়ক বেদমন্ত্র আমি মান্দার্য ঋষির রচিত।" (১ম–৩৩/৬২)

চ। "পুরুভুজ ঋষি এই বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন।" (৮ম–১০/৮)

ছ। "হে ইন্দ্র! বিমদ বংশীয় ঋষিগণ তোমার উদ্দেশে এই বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন।" (৭/৯/২২)

জ। "হে ইন্দ্র! কি পূর্বাকালীন প্রাচীন ঋষিগণ কি একালের ঋষিগণ সেই সকল, "বিপ্ররাই" হইতেছে বেদমন্ত্রের রচয়িতা।" (৭/৯/২২)

উপর্যুক্ত 'ক' হতে 'জ' পর্যন্ত উক্তিগুলো একটু মনযোগ সহকারে পড়লেই মন হতাশায় বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে এবং ঋগ্বেদের স্বরূপ ও প্রকৃতি আমাদের সামনে পরিষ্কার ও পরিস্ফুট হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, A Spirations from a fresh world, by Shakuntala Rao Shastri (P. P. 1-2) হতে পাওয়া যায়–"ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বেদের মন্ত্রগুলো বহুদিন যাবৎ ভারতে বসতি স্থাপনকারী আর্যদের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক এই মন্ত্রগুলো রচনা করেছেন এবং তাঁদের বংশধর ও শিষ্যগণ উহা সংরক্ষণ করিয়াছেন। যখন মন্ত্রগুলোর সঙ্গে সঠিক পরিচয় করে আসিয়াছে, এমনই এক অন্ধভক্তির যুগে উহাকে ঐশী বাণী বলে গ্রহণের প্রবণতার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

এইসব যুক্তিতর্ক ছাড়াও স্বয়ং বেদের মন্ত্রগুলিই মানুষের দ্বারা রচিত হওয়ার প্রমাণ বহন করতেছে। বহু মন্ত্র রচনাকারী তাঁর নাম মন্ত্রের সহিত যোগ করে দিয়েছেন। মন্ত্র রচনাকারী ঋষিগণের স্বগতোক্তি হইতেছে–আমরা বহু পরিশ্রমে এবং নিজেদের জ্ঞান ও সাধ্যানুসারে এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছি।"

সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য 'ঋগ্বেদেব প্রথম মণ্ডলে (১ম–৩৪/১১) দেবতাগণের স্তুতিতে দেবগণের সংখ্যা মাত্র তেত্রিশটি দেখা যায়, কিন্তু দশম মণ্ডলে (১০–৫/৬) সেই সংখ্যা বর্ধিত হয়ে ৩ হাজার ৩০৯ জনে পরিণত হয়েছে।'

অতএব নীতি অনুসারে মানুষের রচিত একটিই ইতিহাসে একাংশের একই বক্তব্য অন্যাংশে বিপরীতে রূপধারণ করলে তাকে যদি ইতিহাস বলে গ্রহণ না করা যায়, তবে নিঃসন্দেহে এই প্রকার গ্রন্থের বিচার ধর্মগ্রন্থরূপে অনাবশ্যক হলেও বিজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে অন্তত ইতিহাস হিসেবে এগুলো গ্রহণ করানো যায় না মোটেই।

অনুরূপ রামায়ণ ও মহাভারতকেও হিন্দু ধর্মের পবিত্র পুস্তক বা ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলা হয়। কিন্তু নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম সমালোচক এবং প্রতিভাদীপ্ত ঐতিহাসিকগণ ঐ দুটি গ্রন্থকে ইতিহাস বলে স্বীকার করেননি। উদাহরণস্বরূপ বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এমএ পিএইচডি আরএস ডিলিট মহোদয় বলেন, "রামায়ণ ও মহাভারত কিন্তু কাব্যের বই ইতিবৃত্ত নহে। সত্য সত্যই রাম ও যুধিষ্ঠির নামে কোন রাজা ছিল কি না তা বলা যায় না।"

এমনিভাবে ধর্মীয় পবিত্র পুরাণ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। পুরাণ যে একটা ইতিহাস এবং তা যে নির্ভুল একথা ঐতিহাসিকগণ এবং বিশ্ববরেণ্য হিন্দু পণ্ডিতগণ অনেকেই স্বীকার করেন না। ভারতের বিখ্যাত মনীষী এবং আন্তর্জাতিক পরিচিতি পণ্ডিত স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "স্মৃতি পুরাণাদি সামান্য বুদ্ধি মানুষের রচনা; ভ্রম, প্রমাদ, ভেদবুদ্ধি ও দ্বেষবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তার যেটুকু উদার ও প্রীতিপূর্ণ তাই গ্রাহ্য, অপরাংশ ত্যাজ্য"– (স্বামী বিবেকানন্দ 'পত্রাবলী' ৩য় ভাগ ৭৪ পৃষ্ঠা।)

স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন এরূপ ধর্মগ্রন্থকে সম্বল করে বা তাকে সঠিক ইতিহাস বলে ভারত তথা হিন্দু জাতিকে রক্ষা করা যাবে না। বরং রক্ষা করা যেতে পারে যদি ইসলাম ধর্মকে বৈদিক ধর্মের সাথে মেশানো হয় তবেই। প্রমাণস্বরূপ বিবেকানন্দ বলেছেন, “আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামী দেহ একমাত্র আশা। আমার মাতৃভূমি যেন ইসলামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক হৃদয়রূপ এই দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে আশ্রয় হয়েন।” (দ্রষ্টব্য, বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড)

এবার আসুন প্রকৃত ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের সম্বন্ধে বিশ্ব মনীষীদের অমূল্য বক্তব্যকে নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করা যাক।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ ব্রাউন বলেছেন, “আরবীয়ানরা বিশ্বকে সর্বপ্রথম ইতিহাস লিখন শিক্ষা দেয়। তাহাদের ইতিহাস লেখার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, প্রকৃত ঘটনার সাথে কাল ও অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞাত হওয়া যেত। যেহেতু তাহাদের ইতিহাসের মত উপযুক্ত ইতিহাস কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপেও পরিদৃষ্ট হয় নাই।”

আর একটি মূল্যবান উদ্ধৃতি খুবই উল্লেখযোগ্য বলা যেতে পারে—“অতি বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা এই যে, মুসলমানরাই বিশ্বের সর্বপ্রথম ইতিহাস লেখার সূত্রপাত করে। ইহার পর এরূপ ত্বরিত গতিতে উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে যে, ইউরোপ অদ্যাবধি উহার সমপর্যায়ে আসতে সক্ষম হয় নাই। কারণ মুসলমানেরা ইতিহাস লিখনে অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করতঃ প্রকৃত ও সত্য বিষয়বস্তু বিনা স্বার্থে, সত্যের অপলাপ না করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের ইতিহাস উল্লিখিত দোষসমূহ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।” (কোঃ প্রঃ পঃ)

R. A. Nicholson বলেন-

The sacred book offered many difficulties both to the Arabs and especially to persians and other Muslims of foreign extraction. For their right understanding of the Holy Quran, a knowledge of Arabic grammer and philosophy was assential and this involved the study of ancient pre-Islamic poems. The study of those poems entaild researches into genealogy and history, which in course of time become independent branches of learning.

অর্থাৎ- পবিত্র গ্রন্থ (কুরআন) আরববাসীগণ এবং বিশেষ করে পারস্যবাসীগণ ও বিদেশী বংশের অন্য মুসলমানদের বহু অসুবিধার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। পবিত্র কুরআনের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝবার জন্য আরবী ব্যাকরণ ও দর্শনে জ্ঞান লাভ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছিল এবং তজ্জন্য প্রাচীন প্রাগৈসলামিক কবিতা সকল পাঠ করতে হত। ঐ কবিতাবলি পাঠের নিমিত্ত বংশ বিবরণ ও ইতিবৃত্ত পাঠ করার প্রয়োজন হত, যার ফলে কালক্রমে ইতিহাস বিদ্যা এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র শাখাতে পরিণত হয়েছিল।

Mr. Draper বলেন - In Whatever direction we look, we meet in vaious parsuil of peace and war, of letters and science, saracenic vestiges.

অর্থাৎ- আমরা যেদিকে দৃষ্টিপাত করি না কেন যুদ্ধ ও শান্তির বিভিন্ন কার্যকলাপে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সাধনায় আরবীয় পদচিহ্ন বা নিদর্শনসমূহ দেখতে পাই।

আমরা নানা মনীষীর মতবাদকে নিয়ে গবেষণা শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হব যে, মুসলমান তথা আরববাসীরাই বিশ্বে ইতিহাসের সূত্রপাত করেছে। এদের পূর্বে জগতে ইতিহাস লেখার কোন সুনিয়মিত ব্যবস্থা ছিল না। বলা বাহুল্য, ইসলাম গগনে এমন অসংখ্য মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা দেদীপ্যমান নক্ষত্ররাজির ন্যায় জগতের বিভিন্ন মণ্ডলকেই প্রভা বিকিরণ করেছেন। মুসলিম জগতে বহু স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের জন্ম হয়েছে যাঁদের নাম আমরা পূর্বেই কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। এবং এখানেও কিছু খ্যাতিসম্পন্ন ইতিহাসের নাম লিপিবদ্ধ করছি।

বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক বেলাজুরী দুখানি বৃহৎ ইতিহাস লিখে গেছেন; একটি **'ফাতহুল বুলদান'** এবং দ্বিতীয়টি **'আনসাবুল আশরাফ ওয়া আখবারোহ'** নামে বিখ্যাত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে কাতীবাহ একখানি বিখ্যাত ইতিহাস লিখে গেছেন যার নাম **'ওয়ুনুল আখইয়ার'**। আহম্মদ বিন আবু ইয়াকুব বিন জাফর **'তা-রিখি ইয়াকুবী'** নামক এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস লিখে গেছেন যার মধ্যে ৯৬৯ সালের পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত আছে। ইতিহাসটি কতটুকু প্রশংসার দাবি রাখে তা প্রমাণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, লন্ডনে বিভিন্ন প্রকাশক দ্বারা বার বার এটি ছাপা হয়েছে। সর্বশেষ ছাপা হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনেই। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই-এর আংশিক অনুবাদ করা হয়েছে, কিন্তু পূর্ণভাবে অনুবাদ করা হয়েছে নিশ্চিত সূত্রে পঁচিশটি ভাষায়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবু হানিফা আহমদ দিনাওয়ারী তাঁর রচিত **"কিতাবুল আখবারিত্তি ওয়াল'** নামক গ্রন্থে পারস্য দেশের সুবিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হযরতের জীবনী রচনা করে সর্বপ্রথম ইতিহাস লেখার দ্বারোদঘাটন করে

বিশ্বকে ইতিহাস রচনার প্রতি অনুপ্রাণিত করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইমাম তাবারী বিশ্ব শ্রেষ্ঠ ইতিহাস লেখক। তিনি ৯৩০ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর লেখা **“তারিখে তাবারী’** মোট বার খণ্ডে ছাপা হয়েছিল। বইটির পাতা ছিল বার খণ্ডে আট হাজারেরও বেশি। তিনি **আখবারুর রসূল ওয়াল মুলুক’** নামক বিখ্যাত ও সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থখানিতে বিশ্বের সৃষ্টি হতে ৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস লিখে গেছেন। এই বার খণ্ড বইও ইংল্যাণ্ডে ছাপা হয়েছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাসয়ুদী একজন বড় ভূগোলজ্ঞ ছিলেন এবং ভূ-পর্যটকও ছিলেন। তিনটি বৃহদাকার ইতিহাস তাঁকে অমর করে রেখেছে। ১। **‘আখবারুজ্জামান’**, (২) **‘মারওয়াজুজ জাহাব’** ও (৩) **‘তানবিহুল আশরাফ’** তিনটি বই-ই খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছে তন্মধ্যে ২নং বইটি পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। **‘কামিল’** নামক সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস (১২৩১ খৃ: পর্যন্ত) রচয়িতা ইবনুল আসীর ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত ঐতিহাসিকরূপে খ্যাতি লাভ করেন।

প্রায় ৭৫০০ জন সাহাবার (হযরতের অনুচরবর্গ) জীবন চরিত অবলম্বনে তিনি **‘উসদুল গাবাহ’** নামে এক অভিনব ইতিহাস প্রণয়ন করেন। আসসওলী লিখিত বিখ্যাত **আখবারুল আব্বাস’** এক অতি বিশেষ বিশ্বাস্য ইতিহাস। তাঁর দ্বিতীয় সৃষ্টি **‘কিতাবুল ফিদ-আ’** যা একটি প্রামাণ্য এবং প্রাণবন্ত ইতিহাস। ইবনে তাইমিয়া নামক স্বনামধন্য ও সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ১২৬২ খ্রিস্টাব্দে জন্মে ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর সমগ্র জীবনে সর্বমোট ৫৯১ খানা গ্রন্থের প্রণেতা হিসেবে তিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তথা জগতের আসরে এক অক্ষয় কীর্তি ও এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখে গেছেন। ইবনে খালদুন নামক বিখ্যাত স্পেনীয় ঐতিহাসিক জগতের ইতিহাসে ইতিহাস রচনায় এক নতুন প্রণালী প্রবর্তন করেন। তাঁর মত রহস্য উদঘাটনকারী ও গভীর অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ঐতিহাসিক দার্শনিক পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। Prof. Hitti তাঁর সম্বন্ধে বলেন ঃ Ibn Khaldun was the greatest historical philosopher Islam producted and one of the greatest of all times. প্রাচ্যের একজন প্রখ্যাত ভূগোলজ্ঞ **‘মুয়াজ্জামুল বুলদান’** নামে যে ভৌগোলিক বিশ্বকোষ রচনা করেন তাতে ইতিহাস পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিবৃত্ত এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আলোচিত হয়েছে।

এমনিভাবে আন্‌নাদিম আলরাজি, আবুল ফারজ, ইবনে মাসবুক, ইবনে হেজাম, ইবনে আসাকীর, আলজাওজির প্রমুখ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বিশ্বের বই পুস্তকে বেঁচে থাকলেও আমাদের হৃদয়দুর্গে প্রবেশ করতে পারেন নাই। কেন, সে কারণ অদূরেই অনুমেয়।

এই অবসরে আমাদের সাধের ভারতের ইতিহাসের অবস্থাটা একটু পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাক।

ভারতবর্ষ প্রাচীন যুগ হতেই ইতিহাসের ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। অবশ্য পুঁথি, উপন্যাস ও কাব্যের কথা বলছি না। কিন্তু এই যুগে ইতিহাস লেখার লেখক ডজন ডজন শহরে, পল্লীতে পাওয়া যাচ্ছে, যাঁরা কাগজে কালি দিয়ে অবিরত লিখে যাচ্ছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে। কিন্তু আগেই বলেছি, আবার বলছি, কাগজের উপর লেখা সুন্দর হবে শুধু কাগজ পরিষ্কার থাকলেই নয় বরং মগজ পরিষ্কার থাকলে তবেই। অথচ মগজে এখনও বেশির ভাগ ইংরেজের পঙ্কিল প্রভাব পরিছন্ন। তদুপরি অনেকেরই যোগ্যতার অভাবও অস্বীকার করা যায় না।

এবারে আসুন উপর্যুক্ত মন্তব্যের সাক্ষীস্বরূপ সুবিখ্যাত লেখক, সাহিত্যিক, সমালোচক এবং ইতিহাসবিদ শ্রী হেমেন্দ্র কুমার রায় মহাশয়ের লেখা হতে কিছু অংশ তুলে দেওয়া হোক—"ভারতবাসীরা ইতিহাস রচনার জন্য খ্যাতি লাভ করেনি। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস দুর্লভ। মুসলমানরা এদেশে এসে ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করেন বটে এবং তাঁদের দেখাদেখি অল্প কয়েকজন হিন্দুও কিছুকিছু ঐতিহাসিক রচনা রেখে গেছেন। কিন্তু সে রচনাগুলি প্রায়ই নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। এদেশে নিয়মিতভাবে ইতিহাস রচনার সূত্রপাত করেন পাশ্চাত্য লেখকরাই। যদিও সেসব হচ্ছে বিজেতার লিখিত বিজিত দেশের ইতিহাস। তবু তাঁদের মধ্যে অল্পবিস্তর পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং প্রচুর মূল্যবান তথ্য এবং একথা বললেও ভুল বলা হবে না, বাঙালিরা ইতিহাস রচনা করতে শিখেছে ইংরেজদের কাছ থেকেই।" আমরা কিন্তু ইতিহাসের বাজারে খুবই নতুন লোক। তাই হেমেন্দ্র বাবু পরেই বলেছেন—"বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম গুরু বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের দিকে বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর যুগেই বাঙালিরা বিশেষভাবে ইতিহাস রচনায় নিযুক্ত হন। কিন্তু আমাদের ইতিহাস রচনায় প্রাথমিক প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল বলে মনে হয় না। অনেকেরই সম্বল ছিল কেবল ইংরেজদের লিখিত ইতিহাস। অনেকের রচনা হচ্ছে অনুবাদ। অনেকে স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। অনেকের ভেতর ছিল না সত্যিকার ঐতিহাসিক সুলভ মনোবৃত্তি। অনেকেই নন নিরপেক্ষ সমালোচক। অনেকে অল্প বা বিনা পরিশ্রমে হতে চাইতেন ঐতিহাসিক।"

তারপর শ্রী হেমেন্দ্র বাবু আরও বলেছেন—"বঙ্কিমোত্তর যুগে বাংলার ঐতিহাসিক সাহিত্য ধীরে ধীরে উন্নত হতে লাগলো। কিন্তু সে উন্নতিকে সর্বোতভাবে আশাপ্রদ বলা যায় না। সে সময়ে এমন ঐতিহাসিক ছিলেন, যিনি মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত এবং গুপ্ত বংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করেছেন। ঐতিহাসিক নিখিল চন্দ্র রায়ের নাম সুপরিচিত। কিন্তু তিনি ইতিহাস রচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেননি এবং তার রচনাও ভুরিভুরি ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ।" তিনি

আরও অগ্রসর হয়ে বলেছেন–"সত্য কথা বলতে কি, আমাদের মাতৃভাষায় আজ পর্যন্ত নিখুঁত ইতিহাস রচিত হয়নি। মাতৃভাষায় যা হয়নি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে একজন বাঙালি ঐতিহাসিকের দ্বারা সেই দুরূহ কাজটি সম্পাদিত হয়েছে। স্যার যদুনাথ সরকার হচ্ছেন বাংলাদেশের প্রথম ঐতিহাসিক।" ('যদুনাথ সরকার' দ্রষ্টব্য)

অতএব এত আলোচনার পর একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আজ জগতের ইতিহাসে যত বড় বড় ইতিহাস আর ঐতিহাসিকের নামই থাকুক না কেন, মুসলমান ঐতিহাসিকরাই প্রকৃত ইতিহাসের জন্মদাতা বা দাত্রীর ভূমিকায় চির ভাস্বর হয়ে আছেন ও থাকবেন। শুধু তাই নয়, মুসলমানেরাই ইতিহাসের আবিষ্কারক, নিয়ামক ও স্রষ্টারূপে বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় বরণীয়, স্মরণীয় ও গ্রহণীয় হয়ে থাকবেন চিরকাল একথা আজ একটু তমসাচ্ছন্ন বোধ হলেও অদূর ভবিষ্যতে তা প্রকাশ্য দিবালোকের মত পরিস্ফুট হয়ে যাবে অবশ্যই।

হিন্দু ও মুসলমান দুটি জাতির মধ্যে ভেদবুদ্ধি ও শত্রুতার প্রচার ও প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ এক নতুন চাল চেলেছিল। সেটি হচ্ছে এই যে, 'আদালতে পার্সি ভাষার চালচলন এবং চিঠিপত্র, বই পুস্তক ও কাব্য কবিতায় হিন্দুদের মুসলমানদের মত আরবী ও ফারসি ব্যবহার করার পদ্ধতিটা সহ্য করা ঠিক নয়। তোমরা উর্দু ভাষা অঞ্চলে উর্দুর যত প্রভাবই থাক মৃতপ্রায় হিন্দি ভাষার ওপর জোর দাও, আমরা পেছনে তোমাদের সাহায্যকারী।' এইভাবে ভারতের বুক থেকে নিরপরাধ উর্দু ভাষাটার গলাটিপে তার স্থলে সংস্কৃত ভাষার প্রবর্তনের জন্য আমাদের হিন্দু ভাইদের নানা প্রলোভনে এবং যুক্তিতর্কে উত্তেজিত করা হতে লাগল। অবশ্য পরিপূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করলেও পরিশেষে ভাষার রূপ যা দাঁড়ালো তা একটু পরেই অনুধাবন করা যাবে। প্রসঙ্গত একটি কথা অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, উর্দু ভাষা কোন বিদেশী ভাষা নয়। অবশ্য আরবী, ফারসি ভাষা ভারতের বাইরে হতে এসেছে কিন্তু উর্দু ভাষা মুসলমান রাজারা ভারতের হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের সাথে পরামর্শক্রমে নিজেদের আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য নানা ভাষার সংমিশ্রণে সৃষ্টি করেছিলেন। ইংরেজরা ভারতের হিন্দু ভ্রাতাদের শুধু একথাই মনে করিয়ে দেয়নি যে, আর্য জাতি ও আর্য ভাষা সবই ভারতের বাইরে হতে আমদানি।

যাহোক, খ্রিস্টান সাহেবরা অবিভক্ত বাংলাদেশের বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর মত করে চালু করার ব্যবস্থা পুরাপুরি গ্রহণ করলো। এক কথায় ভারতের হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে যুগ যুগ ধরে যে শব্দগুলি ব্যবহার করছিল তাতে 'তৎসম' আর 'তদ্ভব' শব্দ দিয়ে আরবী বা ফারসি শব্দের চিরতরে মৃত্যু ঘটানোর চক্রান্ত চললো। হিন্দি ভাষাটিতে মোটামুটি 'তদ্ভব' আর 'তৎসম' সংস্কৃত শব্দ মিলিয়ে দিলেই প্রায় বাংলা-হিন্দি সমান হয়ে যাবে। অবশ্য উর্দুতে

ক্যারতা হ্যায়, ক্যারেগা শব্দগুলোর 'হ্যায়', 'গা' প্রভৃতি লেজগুলো থাকবে আর দেহটি থাকবে শুদ্ধ বাংলার মানেই "তৎসম" ও "তদ্ভব" ছাপ মারা সংস্কৃত শব্দ। আজ ইংরেজদের সেই স্বপ্নসাধ ফলপ্রসূ হয়েছে।

বাংলাদেশের দিকে ইংরেজরা এত খেয়াল দিয়েছিল কেন? পাঠক মনের এই স্বাভাবিক প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যেতে পারে যে, বিশ্বনিয়ন্তা এদেশের অধিকাংশ লোককে এত স্বাধীনচেতা, স্বতন্ত্র বিশ্বাসী, বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন বীর এবং কূটনীতিপরায়ণ এক কথায় এত বিভিন্নমুখী প্রতিভাধারীরূপে সৃষ্টি করেছেন যে, এদের চলন্ত, দূরন্ত ও ছুটন্ত গতিকে যেদিকেই মুখ ঘুরিয়ে দেয়া হবে সেই দিকেই দুর্বার গতি নিয়ে ছুটবে। হারবে, জিতবে, মরবে, বাঁচবে পরোয়া নাই তবু ছোটা চাই। তাই দেখা গিয়েছিল ইংরেজদের অনুশাসনকালেও এই বঙ্গ দেশই ছিল ভারতের প্রাণকেন্দ্র অর্থাৎ কলকাতাই ছিল ভারতের রাজধানী। অতএব এই অবিভক্ত বাংলার বিরাটসংখ্যক মুসলমান জাতিকে দুর্বল করার চক্রান্ত শুরু হয়ে গেল। সৃষ্টি হলো ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ আর তার কেন্দ্র হল শ্রীরামপুরের মিশন। ১৮০০ সালে মে মাসে শ্রীরামপুরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্ম হলো। ফোর্ট মানে দুর্গ। সত্যিই মুসলমান শক্তিকে দুর্বল করার জন্য ঐ ফোর্টে বহু সৈন্য তৈরি হতে লাগল, যাদের হাতিয়ার হবে কামান, গোলা নয়; বিষাক্ত কাল কালি আর সরকাঠি অথবা পালকের কলম।

ইংরেজ চক্রান্তকারীদের সর্দার মিঃ কেরী হলেন বাংলা আর সংস্কৃত বিষয়ের প্রধান অর্থাৎ যাকে বলে Head of the department. বাকি প্রফেসার সাহেবদের মধ্যে ছিলেন মিঃ ওয়ার্ড, মিঃ মার্শম্যান, মিঃ বার্নস্ ডন প্রমুখ এবং ঐ সঙ্গে টাকায় কেনা কিছু আমাদের দেশীয় বাঙালি ভ্রাতা। মিঃ কেরী সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ বই তৈরি করলেন যেটা দেখলেই বোঝা যায় যে কড়া পাকের সন্দেশ।

মিঃ কেরী সাহেবের চক্রান্ত প্রমাণের জন্য তাঁর এই বাংলা ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকে কিছু অংশ আমার বিচক্ষণ ও জ্ঞানসম্পন্ন সূক্ষ্মদর্শী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের উদার দৃষ্টির সামনে তুলে ধরা হলো, যা থেকেই তাঁদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় মিলবে।

"The language in which the classical books of the Hindoos are written is principally derived from Sanskrit. This is called pure Bengali, but multitudes of words, originally Persian or Arabic, are not constantly empoyed in common converstaion, which perhaps ought to be considered as enriching rather than corruption the language."

>Goto List

অর্থাৎ – হিন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেণীর পুস্তকাদি যে ভাষায় লেখা হত তা প্রধানত সংস্কৃত ভাষা হতেই উৎপত্তি সিদ্ধ এবং এটাকেই বিশুদ্ধ বাংলা বলে অভিহিত করা হত। কিন্তু ফারসি অথবা আরবীয় কোন শব্দ সমষ্টিকে সাধারণ কথোপকথনে অবিরতভাবে ব্যবহার করা হত না, হয়তো এগুলো ভাষাকে উর্বর করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক বলে বিবেচিত হত। বরং সত্য বলতে কি এগুলো ছিল ভাষাকে দূষিত কারক।

এদিকে আরবী ও ফারসি বিভাগও খোলা হলো, উদ্দেশ্য শুধু সর্বনাশ সাধন, কারণ সেখানে কোন মুসলমান পণ্ডিতরা মাথা গলিয়ে সুবিধা করতে পারেনি। তবে ইংরেজ সত্যিই বাহাদুর। তারা এই ভূমিকা নেবার আগেই বহু বিখ্যাত লোক বহু বছর ধরে বহু শ্রম সাধনা করে আরবী, ফারসি ও উর্দু শিখেছিল, সেই সঙ্গে বাংলা ও সংস্কৃত। তবে খুব ভালভাবে শেখা যে তাদের হয় নাই প্রমাণ একটু পরেই আসছে। তাতেই তাদের বাংলা ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। তবে তারা ছিল শাসক সম্প্রদায়। প্রচুর টাকা-পয়সার বিনিময়ে ভাড়াটে লোক এনে যে পুস্তক যে ভাষার প্রয়োজন হয়েছে অনুবাদ করে কাজ সমাধা করে নিয়েছে। আসলে তো আর তাদের বাংলাপ্রীতি ছিল না অথবা বাংলা ভাষায় পুত্র, কন্যা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের সাথে প্রাণের কথা, প্রণয়ের কথা, গোপন কথাও তারা বলত না, শুধুমাত্র শাসন আর শোষণের জন্য এবং খ্রিস্টধর্ম প্রচার প্রসারের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু মাত্র।

যাহোক, তের-চৌদ্দ বছরের মধ্যেই ইংরেজরা এ ব্যাপারে কৃতকার্যতা লাভ করলো। প্রমাণস্বরূপ, প্রফেসর শ্রী বিনয় সরকারের লেখার আংশিক তুলে ধরছি– “পাদ্রি কেরী, মার্শম্যান প্রমুখের সহায়তায় হিন্দু পণ্ডিতবর্গ সংস্কৃত মেশানো বাংলা গদ্য ভাষা সৃষ্টি করিয়া গদ্য গ্রন্থ প্রণয়নে যত্নবান হইলেন। নব আবিষ্কৃত এই গদ্য ভাষায় মুসলমানগণ সহসা প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ফলে প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল তাঁদের লেখনী অচল হইয়া রহিল। সুদীর্ঘ ছয়-সাত বৎসরকাল যে মুসলমান বাংলা তথা ভারতবর্ষ শাসন করিয়া আসিয়াছে তাহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রাজ্যচ্যুত হইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে নানা দিক হইতে আক্রমণাত্মক আঘাত-সংঘাতে মুসলিম সমাজ জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে সমাজের ভিত্তি মূল অনেকখানি শিথিল হইয়া পড়িল।”

আজ যে হিন্দি রাষ্ট্র ভাষা তাও ইংরেজদের কারখানার কল্যাণে। বিহারে ইংরেজ সরকারের মোটা মাইনের চাকরিপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় ওপর মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। প্রমাণস্বরূপ একজন হিন্দি সমর্থক ভ্রাতা ভূদেব বাবুর জন্য যা লিখেছেন তাই তুলে দিচ্ছি এখানে–

>Goto List

"একদা তিনি বিহার প্রদেশে শিক্ষা বিভাগে কর্ম করিতেন। সেখানে তিনি দেখিলেন, হিন্দি অঞ্চলে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের উর্দু ভাষা চলিতেছে–তাঁহার নিপুণ হস্তক্ষেপের ফলে তাহা উঠিয়া গেল। বিহারে হিন্দি ভাষা চালু হইল। এজন্য বিহারের গ্রাম্য কবিগণ তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া কত গান লিখিয়াছিলেন। আজ হইতে বহু দিন পূর্বে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন হিন্দি ভাষাই ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হইবার উপযুক্ত।

অথচ আগেই বলেছি যে হিন্দি ভাষার অর্ধেকটা সংস্কৃত মার্কা বাংলা আর অর্ধেকটা উর্দুর 'হ্যায়', 'গা', 'গি' প্রভৃতি। তবে বিরুদ্ধবাদীদের আনন্দ শুধু এতটুকুই যে, হিন্দির অক্ষরগুলো আর সংস্কৃতের অক্ষরগুলো প্রায় একই। অন্তত আরবী, ফারসি ও উর্দুর অক্ষর 'আলিফ', 'বে' হতে পরিত্রাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু আর একটু ভুল থেকে গেছে। বোধ হয় চোখে পড়েনি অনেকের। ভাষার নামটি 'হিন্দি' না দিয়ে 'ভারতী' দিলেই ভাল হত। কেননা ঐ 'হিন্দি' শব্দটিও মুসলমানদের সৃষ্টি, তাঁদেরই দেওয়া নাম। 'সিন্ধু', 'হিন্দু' প্রভৃতি তাঁদেরই রাখা স্নেহের নাম। আজকের বাংলা অভিধান খুললেই পাওয়া যাবে 'হিন্দি' মানে 'জাতি বিশেষ, হিঁদু, বৈদিক ধর্মাচারী ভারতবর্ষবাসী। ফার্সী (<সিন্ধু)। বি।'

এমনিভাবে শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত মৃতঞ্জয় বাবু প্রমুখ লেখক ঐ রাস্তাতেই চলতে লাগলেন। কিন্তু শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র প্রথমে বিরোধিতা করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার বিরুদ্ধে, মতের বিরুদ্ধে এবং তাঁর সুখ্যাতির বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিম বাবু যা বলেছেন হুবহু তাই উদ্ধৃতি দিচ্ছি। বঙ্কিম চন্দ্র বলেছেন, "বিদ্যাসাগর কঠিন সব সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করে বাংলা ভাষার ধাপটা খারাপ করে গেছেন।"

তাছাড়া শ্রী সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের লেখার দিকে তাকালেই আরও প্রমাণ হবে প্রবহমান পর্যালোচনা। দাস বাবু লিখেছেন, "১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্তীকালে হেনরি পিট ফরস্টার ও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী-ফারসির অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃতি হইয়া উঠিয়াছে।"

১৭৭৩ সালে ইংরেজদের নিয়ামক আইন (Regulating act) সৃষ্টি ও কার্যকরী হবার পরেই আরবী ফারসি হত্যার খড়গ তথা হিন্দু মুসলমানদের মৈত্রী ছেদনে অস্ত্র তৈরির কারখানা ঐ দুই প্রতিষ্ঠান ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুরের মিশন ও তার সঙ্গে বিলেতী প্রেসটির চাকা ঘুরিয়ে আমাদের মগজ গুঁড়িয়ে পরিবেশ যখন অনুকূল হয়ে উঠল তখনই ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে আইনের সাহায্যে দেশময় ঘোষণা করা হল যে, সরকারি আদালত শহর বা গ্রামে কোন স্থানেই পারসি ভাষার ব্যবহার চলবে না। ব্যবহার চলবে ইংরেজি আর বাংলার, কিন্তু

মাতৃহারা সন্তানেরা যে অবস্থা হয় পারসিকে হারিয়ে নবোদ্ভূত বাংলার অবস্থাও হল তদ্রূপ শ্রীহীন। অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে যে, ইংরেজরা শত চেষ্টা করেও পারসিকে বাংলার হৃদয় থেকে সম্পূর্ণ মুছে দিতে পারেনি। আর বাস্তাবিক তা পারা সম্ভবও নয়। আজ আমাদের সাধের বাংলায় অসংখ্য পারসি শব্দ এখানে ওখানে লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু ইংরেজ বাহাদুররা তা বোঝেনি তাই পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করতে গিয়ে যে ধরনের বাংলার সৃষ্টি করেছিল তাতেও অনিচ্ছা সত্ত্বেই বহু আরবী, পারসি, উর্দু শব্দ থেকে গিয়েছিল। ফলে ইংরেজি ডিজাইন আর আরবী, পারসির সংমিশ্রণে নতুন বাংলা ভাষা যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা সত্যই অনুধাবনযোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিচে সাহেবদের হাতের নতুন বাংলার কিছু নকল দেওয়া হলো–

“আমি এই অবধি বুঝিয়াছি বিশয়ের সহিত। যেকোন কেতাব অদ্যাবদি প্রকাশ না পাইয়াছে সিখাইতে তোমাদিগকে ইঙ্গরাজি কথা আর অনায়াসে তাহাতে লউয়েছে আমারে সংগ্রহ করিয়া তরজমা করিতে এই কেতাব।”

শুধু লেখনীর জগতেই নয় অনুবাদের জগতেও আমাদের ইংরেজ বাহাদুরের কতদূর অবদান ছিল তারও কিছু নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো–

"Now the wages of sin is death-but the gift of God is eternal life. Throuth Jesus christ our lord."

বঙ্গার্থ ঃ “গোনার মাহিনা মিত্তু কিন্তু খোদার দেওয়া চির প্রমাই জিজছ ক্রাইস্ট হইতে।”

এগুলো সব ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের আইন প্রণয়নের পূর্বের নমুনা। ১৭৮৩ খ্রিঃ পর্যন্ত এনবি এডমন সাহেব যখন ইংরেজ সরকারের ফারসি অনুবাদকের পদে ভূষিত হলেন তখন তাঁর নিজের হাতের তর্জমা বা অনুবাদের নমুনা দেখুন তাতে কত ফারসি ও আরবীর সংমিশ্রণ! পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার্থে আরবী ও ফারসি শব্দগুলোর নিচে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হল।

সেওয়ায় মহালাত মুতালুকে সহর মুরসিদাবাদ ও আজিমাবাদ ও জাহাগির নগর জে এই তিন মকামে আদালতের সিরিস্তা আলাহিদা মোকারর হইল আর এই তিন এলাকার সরঙ্গ সাহেব জেলাদিগের তজবিদ মতে হইবে মঞ্জুর হইল। এবং সেওয়ার সহর কলিকাতা জে বড় আদালতের তাবে আছে জারি থাকিবেক।”

আসুন আরও একটা দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি– “আমার সন্তান রহিত– অন্তেষ্টিক্রিয়া তগদি করাইয়া সাকীম তফশীল জমি আবাদ তবদুদ করিয়া ও শিষ্য সেবক বহাল রাখিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করিয়া ইহার দান বিক্রয়ের সত্তাধিকার তোমার। আমি কিংবা আর কেহ দাওয়া করে সে ঝুটা ও বাতিল।” ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক দৃষ্টান্তের অবতারণা করা যায় কিন্তু বাহুল্য জ্ঞানে তা পরিত্যাগ করলাম।

যাহোক, আগেই বলেছি হিন্দু, মুসলমান একে অপরের ভাব ভাষায় মিলন-মৈত্রীর পরিপ্রেক্ষিতে সংকীর্ণতার দৃষ্টি না দিয়ে নিজেদের ভাষাকে পরস্পরের মধ্যে খাপ খাইয়ে নিয়ে এক অপরূপ নতুন ভাষার আবিষ্কার করেছিল। যার জোয়ারে ভারতীয় জনজীবন নতুন আস্বাদে প্লাবিত হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ মনিবদের কল্যাণে বঙ্গ ভাষায় সংস্কৃত মিশে প্রথমে যা সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল তা সংস্কৃতের মত সমাজে ব্যবহার অনুপযুক্ত। শ্রী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা লঙ্কার মহাশয়ের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র একটু অংশ তুলে ধরলেই এ সত্য প্রমাণিত হবে।

"কোকিল কলালাপ বাচলে যে মলয় নিল সে উচ্ছলচ্ছী কয়াত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কনাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।"

একটি পত্র পাওয়ার পর প্রত্যুত্তর লিখবার বহরখানা কেমন ছিল তাও এক উৎকট উদাহরণ লিপিবদ্ধ করা হল–

"পরম প্রণয়ার্ণব গভীর নীর তীর নিবসিত কলেবরাঙ্গ সম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়শ্রিত শ্রী অঙ্গমোহন দেব শর্ম্মনঃ ঝটিত ঘটিত বাঞ্ছিতান্ত বরণের বিজ্ঞপণাঞ্চাদৌ শ্রী মতীর শ্রী করকমলাঞ্চিত কমল পত্রী পঠিত মাত্র শুভম্ভিশেষ।" (প্রাচীন শিশু বোধকের ভাষা)

আমাদের শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও ঐ সংস্কৃতি রঙে রঞ্জিত করেছেন তার গদ্যকে। কিন্তু গড়ার পরে তা হয়ে গেছে সংস্কৃতমাখা পদ্য। নমুনাস্বরূপঃ

"রে পাষাণ্ড ষণ্ড এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াও কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া বকাণ্ড প্রতাশ্যার ন্যায় লণ্ড ভণ্ড হইয়া ভণ্ড সন্ন্যাসীর ন্যায় ভক্তি ভাণ্ড ভঞ্জন করিতেছে এবং গবা পণ্ডের ন্যায় গণ্ডে জমিয়া গণ্ডকীস্থ গণ্ডশীলার গণ্ড না বুঝিয়া গণ্ডগোল করিতেছে।"

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "সংস্কৃত প্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন দুর্বল এবং বাঙালি সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল।"

কিন্তু লজ্জা ও দুঃখের কথা, সাহিত্য সম্রাটের ব্যবসাদারী মনোভাব নিজের নীতি হতে তাঁকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছিল। তিনি বুঝিয়েছিলেন সংস্কৃত ভাষা মিশিয়ে কঠিন শব্দ সৃষ্টি করলে সকলে বুঝুক বা না বুঝুক প্রশংসা পাওয়া যাবে যথেষ্ট। কারণ মূর্খ অর্ধমূর্খের সংখ্যাই সমাজে অধিক। তারা যা জানে না বা বোঝে না তারই ওপর তাদের দাবি– তারা সব জানে সব বোঝে। ভাল না লাগলেও তারাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। পক্ষান্তরে শিক্ষিতগণ মনে করবেন, এঁরা আমাদের চেয়েও শিক্ষিত বেশি। কারণ এই কঠিন দুর্বোধ্য বিষয়ের রহস্য আর আনন্দের পরিচয়ে তাঁরা আমাদের অপেক্ষা বিপুলভাবে অগ্রণী ও জয়যুক্ত। তাই শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথেই পাড়ি দিলেন অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ দিয়ে বাংলা ভাষাকে তিনি কঠিন করে তুললেন।

প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর লেখার পাতায় পাতায় বিদ্যমান। এখানে শুধুমাত্র নমুনাস্বরূপ সামান্য একটু অংশ তুলে ধরছি।

"প্রাবিট-সম্ভূত-নবদুর্বাদল তুল্য, অথবা ততোধিক মনোজ্ঞকান্তি বসন্ত প্রসূত নব পত্রাবলীতুল্য বর্ণোপরি কবচাদি রাজপুত জান্তির পরিচ্ছদ শোভা করতেছিল।"

"সোম প্রকাশ" পত্রিকার সম্পাদক শ্রী দারকানাথ বিদ্যাভূষণ বঙ্কিম বাবু ও তার অনুসরণকারীদের উপহাস করে সমালোচনা করতেন "শব পোড়া-মরাদাহের দল" বলে। আর বঙ্কিম বাবু প্রতিপক্ষ দলকে গালি দেবার সাথে বলতেন 'ভট্টাচার্যের চানা।'

তাই সর্বশেষে বলব, আমরা প্রত্যেকটি মানুষ সারা দিনে আমাদের ভাষার মধ্যে যেমন ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করি তাতে আভিজাত্য ও শিক্ষাসুলভ পরিচয় বহন করে, তেমনি আরবী, ফারসি ও উর্দুর বেলাতেও তাই-ই হওয়া উচিত ছিল। তাই কবি ভারতচন্দ্র মুসলমানদের ভাল চক্ষে না দেখলেও মুসলমান সাহিত্যের ধারাকে বর্জন করতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন–

"না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যবনি মিশাল॥"

সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধনে

কুকুর বিড়াল দেখলে তাড়া করে, বিড়াল ইঁদুর দেখলে তাড়া করে আর সাপ ব্যাঙ দেখলেই তাড়া করে কেননা, একটি অপরটির খাদ্যবস্তু। প্রয়োজনের পরিপেক্ষিতেই একটির আরেকটির ওপর ইদৃশ আক্রমণ। কিন্তু দুঃখ বা আশ্চর্যবোধ তখনই যখন দেখা যায় মানুষ মানুষকে আক্রমণ করার জন্য অস্ত্র শাণ দিতে দ্বিধাবোধ করে না। আমাদের মতে প্রধানত দোষী সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় বা শাসক সম্প্রদায়। কেননা, লঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে দাঙ্গা বাধাতে চায় না, তাতে মারার পরিবর্তে মরতেই হয়। পাকিস্তানে যদি উর্দু ও বাংলা ভাষী লোকদের ভেতর দাঙ্গা হয় তবে দোষ অবশ্যই উর্দুওয়ালাদের দেওয়া যায়। কারণ তারা সংখ্যাগুরু এবং শাসক দলের ভূমিকায় আছে। ঠিক তেমনি আরবে যদি ইহুদীদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক কলহ হয় দোষ হবে আরবের মুলমানদের। আবার ইসরাঈলে যদি মুসলমানদের সাথে লড়াই হয় ইহুদীর মুখ্যত দোষ হবে ইসরাঈলের। ঐ রকম বাংলাদেশে যদি হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হয় তাহলে প্রধানত দোষ মুসলমানদের বলা চলে কারণ তারা সংখ্যা বা শক্তিতে অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি। তদ্রূপ ভারতে যদি হিন্দু মুসলমানদের দাঙ্গা হয় মূলত বা মুখ্যত দোষ আসবে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর স্বাভাবিকভাবেই, তার কারণও ঐ একই।

ভারতে কতবার যে হিন্দু-মুসলমানদের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়েছে, কতবার যে হিন্দু-মুসলমানদের তাজা রক্তে ভারতের বুক রক্তাক্ত হয়েছে, কত মা সন্তান হারা হয়ে চোখের জলে পৃথিবী ঝাপসা দেখেছে, কত স্ত্রী স্বামী হারা, কত শিশু পিতা-মাতা হারা হয়ে অসহায় এতিম হয়েছে সে ইতিহাস পরে আসছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইন্ধনে ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের যে অশোভনীয় আচরণ তা সত্যিই বিস্ময়কর। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে শোষক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে স্বাধীনতালব্ধ ভারতেও যে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি জাতির মধ্যে লড়াই ঝগড়া হবে একথা ভাবা যায় না; কিন্তু তবুও তা সত্য, ইতিহাস তার সাক্ষী। সাম্প্রতিকতার পশ্চাতে যা কিছু কারণ থাকে তার মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষসুলভ মনোভাবই বোধ হয় অন্যতম প্রধান। আমাদের ভারতের হিন্দু- মুসলমানদের মধ্যে এই ব্যাধি অত্যন্ত ব্যাপক ছিল বা আজও আছে। ফলে আজও আশঙ্কা হয় আবার হয়ত কখন ভারতের হিন্দু-মুসলমান অবতীর্ণ হবে এই নিষ্ঠুর পৈশাচিক ভূমিকায়।

আমাদের দেশে মুসলিম হিন্দুকে, হিন্দু মুসলিমকে যথাক্রমে 'কাফের' ও 'যবন' বলেন। 'কাফের' আরবী শব্দ, অর্থ হচ্ছে অবিশ্বাসী। যে বা যারা ইসলাম ধর্মের অনুগামী, অনুসারী অথবা বিশ্বাসী নয় তাদের কাফের বলা হয়। যথা খ্রিস্টান, হিন্দু, ইহুদী, জৈন প্রভৃতি প্রত্যেক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। কিন্তু অনেক মুসলমানের ধারণা কাফের মানেই হিন্দু। আবার অনেক হিন্দুরও ধারণা কাফের মানে হিন্দু অথবা গালিবাচক ঘৃণ্য কোন চক্রান্তপূর্ণ শব্দ। আসল কথা হচ্ছে এই, যদি কোন মুসলমান এমনকি ডিগ্রিধারী কোন মাওলানাও বলেন, 'আমি কুরআনের সব বাক্য স্বীকার করি, শুধু একটি বাক্য মিথ্যা মনে করি তবে ইসলামের আইনে ডিগ্রিধারী ঐ মাওলানা সাহেবকেও ঐ আখ্যায় অতি সহজে আখ্যায়িত করা হয়। এমনকি কুরআনের কোন বাণীকে সন্দেহযুক্ত মনে করলেও তারও ঐ একই অবস্থা। অনৈসলামিক কোন নীতিকে কাজে পরিণত না করলে পাপী বা অপরাধী হয়। কিন্তু অস্বীকার করলে তাকে কাফের বা অবিশ্বাসী বলে চিহ্নিত করতে হবে তাতে অবাক বা আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অপরদিকে হিন্দু ভাইয়েরা মুসলমানদের বলেন, 'যবন'। 'যবন' শব্দের অর্থ গ্রীক জাতি। অনেকের মতে, ভারতের মুলমান আগমনের পূর্বেও 'যবন' কথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ভাগ্যের কি ফের, এখন 'যবন' মুসলমানদের বোঝায়। ভাষা শিখতে হলে অভিধানের আবশ্যকতা অবশ্যই আছে। কিন্তু আমাদের দেশের পণ্ডিতদের কল্যাণে অভিধানে 'যবন' শব্দের অর্থ যা পাওয়া যায়, অনেকের বিচারে তাও বিষাক্ত এবং দুর্গন্ধময়– দেশের ভবিষ্যৎ গঠনের বাধাস্বরূপ। 'নতুন বাঙালা অভিধানে'– আছে 'যবন' মানে "অহিন্দু জাতি বিশেষ; ম্লেচ্ছজাতি! বিধর্মী, অসদাচারী, গ্রীস, আফগানিস্তান আরব পারস্য প্রভৃতি দেশের অধিবাসী।" তারপর

>Goto List

'কথিত আছে' বলে যে তথ্যটি ঢুকানো হয়েছে তা যেমন সারকুড়ের আবর্জনা ছাত্রছাত্রীদের পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। যেমন– 'বশিষ্ঠের আশ্রমদ্রোহী বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য পরাভূত করিবার নিমিত্ত তাঁহার কামধেনু শবলার যোনিদ্বার হইতে ঐ জাতি উৎপন্ন হয়।' তাতেও আশা মেটেনি লেখক তখন ধর্মের বুলি শুনিয়েছন। "বিষ্ণু পুরাণে যবন জাতির অন্যবিধ উক্তি আছে–

সগর রাজা কতগুলো লোককে গুরু অপরাধের জন্য মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিয়া দেন; তাহারাই পরে যবন নামপ্রাপ্ত হইয়াছে।" কিন্তু উইলসন সাহেবের মতে, 'ব্যাকট্রিয়া হইতে আয়োনা বা গ্রীস পর্যন্ত সমগ্র গ্রীক উপনিবেশে অধিবাসী গ্রীকদিগকে হিন্দুরা যবন বলিতেন এবং Jonia শব্দটি হইতে যবন শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।"

অভিধানে তার পরের শব্দটি আছে 'যবনারি'। মানে– শ্রীকৃষ্ণ। যবন + অরি। অরি মানে শত্রু; অতএব কৃষ্ণও মুসলমানদের শত্রু। সুতরাং হিন্দু জাতিকে মুসলমানদের শত্রু না সাজালে কৃষ্ণ ভক্ত হওয়া যায় কী করে।

দেশকে বাঁচাতে হলে কলম আর কালিকে সংযতভাবে খরচ করতেই হবে, নইলে এক কলম কালি যা ক্ষতি করবে একটা পারমাণবিক বোমা ক্ষতি করবে তার চেয়ে অনেক কম।

আমাদের স্বদেশের লেখক ও কবিগণ এই অমৃতপ্রায় 'যবন' শব্দটিকে কেমনভাবে ব্যবহার করেছেন তার কিছুটা নমুনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেনের লেখা হতে প্রমাণস্বরূপ তুলে দেওয়া হচ্ছে–

"ব্রাহ্মণের জাতি ধ্বংস হেতু নিরঞ্জন।
সাম্বাইল জাজপুর হইয়া যবন।" ইত্যাদি।

ভারতের বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক নদীয়ার শ্রী শ্রী চৈতন্য দেব ধর্মগুরু পণ্ডিত সভাসদ মুসলমান জাতিকে যবন বলতে ভোলেননি।

"শ্রীবাসে বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন,
প্রভু তারে নিজ রূপ করাইল দরশন।"

সাম্যের স্বয়ং মূর্তি শ্রী চৈতন্য দেব নিজেও মুক্ত মনের পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি তাঁর মুসলমাম ভক্তের নাম দিয়েছিলেন 'যবন হরিদাস।'

'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে' লেখা আছে–

"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার,
ভালমত তারে আনি করহ বিচার।" ইত্যাদি।

এ ছাড়াও আরও অনেক দৃষ্টান্ত এ ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন উক্তির প্রমাণ করে। 'মধ্য যুগের বাঙালা ও বাঙালি' পুস্তকে লিখিত আছে–

"যবনেহ যার কীর্তি শ্রদ্ধা করি শুনে,
ভজ হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে।'

‘প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য’ পুস্তকে ২৮ পৃষ্ঠায় আলিবর্দী খাঁয়ের উড়িষ্যা আক্রমণে ভুবনেশ্বরের রক্ষীর বর্ণনায় আছে–

“মারিতে লইয়া হাতে প্রলয়ের শূল।
করিব যবন যত সমূল নির্মূল॥”

আলিবর্দী খাঁয়ের আক্রমণের নিন্দা করে কবি ভরতচন্দ্র লিখেছেন–

“পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাংলার কি দশা হইল॥
লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী।
সেই পাবে তিন সূবা হইল নারকী॥”

মহাভারতে আছে– “হিন্দুরাজ যযাতি একবার গোমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তাঁর অসংযমী পুত্র লোভ বশত এক টুকরো গোমাংস খেয়ে ফেলে। তখন থেকেই পিতার অভিশাপ ক্রমে এই আগের ভ্রষ্ট পুত্র হতেই গো–খাদক ম্লেচ্ছ বংশ আরম্ভ হয়। সাধারণের ধারণা ঐ গো-খাদক মুসলমানরাই ঐ ম্লেচ্ছ বংশীয় যবন।”

কিন্তু আসল কথা তা নয়। মুসলমান জাতি বিশ্বাস করে তাদের আদি পিতা ও ধর্ম প্রবর্তক হচ্ছেন হযরত আদম (আ.)। তাই আদম সন্তান আদমী বলে গণ্য হয়। হযরত মোহাম্মদ (সা.) ইসলাম ধর্মের প্রথম প্রবর্তক নন বরং তিনি ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণকারী শেষ পয়গাম্বর।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও গবেষক শ্রী ডাঃ কালিদাস নাগ এবং ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়ের মতে, ব্যাকট্রিয়ান গ্রীকদেরই উপাধি হচ্ছে যবন। কেবল তাদের ক্ষেত্রেই যবন শব্দের প্রয়োগ সম্ভব। কিন্তু উপর্যুক্ত অসভ্য উক্তির উদাহরণ নিরপরাধ মুলমানদের ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ করলে তা হবে নিতান্ত অপরাধজনক ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

যাহোক, সপক্ষে ও বিপক্ষে যে দলিলই থাক “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” পুস্তকের ২৯/৩০ পৃষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “যবন হচ্ছে গ্রীকদের নাম; এই নামটার ওপর অনেক বিবাদ হয়ে গেছে; অনেকের মতে ‘যবন’ এই নামটা ‘য়োনিয়া’ (Ionia) নামক স্থানবাসী গ্রীকদের ওপর প্রথম ব্যবহার হয়। এজন্য মহারাজা অশোকের লেখনামায় ‘যোন’ নামে গ্রীক জাতি অভিহিত। পরে যোন হতে সংস্কৃত যবন শব্দের উৎপত্তি। আমাদের দেশীয় কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে ‘যবন’ গ্রীক শব্দ বাচনীয় নয়। কিন্তু এ সমস্তই ভুল যখন শব্দটাই আদি শব্দ, কারণ শুধু যে গ্রীকদের যবন বলতো তা নয়; বরং প্রাচীন মিসরীয় ও ব্যাবিলীয়ানরাও গ্রীকদের যবন নামে আখ্যায়িত করতো।”

মোটামুটি উপরের আলোচনা হতে একথাই আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, আমাদের দেশের বেশির ভাগ অমুসলমান লেখক তাঁদের লেখায় মুলমানদের

সমাজের ওপর অনেক ক্ষেত্রে নানা কুৎসিত শব্দ প্রয়োগ করে বিরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

যবন ম্লেচ্ছ পাতকী ছাড়াও পাষণ্ড, পাপিষ্ঠ, পাপাত্মা, দুরাত্মা, দুরাশয়, নরাধম, নরপিশাচ, বানর, নেড়ে, দেড়ে, ধেড়ে, এঁড়ে, অজ্ঞান, অকৃতজ্ঞ প্রভৃতি শব্দ তাঁরা স্থান কাল ক্ষেত্রে ব্যবহর করেছেন।

বঙ্কিম বাবু' রাজ সিংহে" হিন্দু প্রজাবৃন্দ কর্তৃক জগদীশ্বর উপাধিপ্রাপ্ত সম্রাট আকবর বাদশাহের দাড়িতে একটি যুবতী নারী দিয়ে ঝাড় মারিয়েছেন এবং মুলসমান ধর্মনেতা ঔরঙ্গজেব বাদশাহের মুখে কল্পিতা সাখী ও স্ত্রীলোকদের দ্বারা লাথি মারারও ব্যবস্থা করেছেন। বঙ্কিম বাবু তাঁর "মৃণালিনী" বইয়ে বখতিয়ার খলজীকে 'অরণ্যর' বানর বলতেও দ্বিধা করেননি। এছাড়া তিনি তাঁর কবিতা পুস্তকে মুসলমান জাতিকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, "আসে আসুক না আরবী বানর, আসে আসুক না পারসী পামর।"

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন প্রতিবেশী মুসলমান পাঠকদের জন্য–

"বড় বড় ধেড়ে দেড়ে, ছাগল দেড়ে নেড়ে পানে রূকে,
চোড়ে ঘাড়ে, কোলে দেয় হাড়ে হাড়ে ঠুকে।
পশ্চিমে নিয়া মোল্লা, কাচা খোল্লা তোবা তাল্লা বোলে,
কোলে পোড়ে তোপে উড়ে যাবে সব জ্বেলে।
কেবল মরজী তেড়া তেড়া, কাজে ভেড়া নেড়া মাথা যত
নরাধম নীচ তাই নেরাদের মত।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রখ্যাত কবি দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় লিখেছেন–

"আল্লা বল রে ভাই নবী কর সার,
মাজা দুলায়ে চলে যাবা ভব নদী পার।
মুখ ঘামছে, বুক ঘামছে বিবির ভেসে যাচ্ছে হিয়ে,
খসম যদি থাকত কাছে পুঁচতো নুমাল দিয়ে।
পিড়েই বসে কাঁদছে বিবি ডুবি আখির জলে,
মোল্লারে ধরেছে ঠেসে খসম খসম বলে।"

আরও এগিয়ে আসুন। "....উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা সব সময়েই মুসলমানদের নিম্ন বর্ণের হিন্দুর সমান জ্ঞান করতেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও সম্মানিত মুসলমানেরা হিন্দুদের ঘরে প্রবেশের অনুমতি পেতেন না।" (দ্রঃ R.C. Majumder, History of Freedom Movement in India.)

"এমনকি স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনার যুগেও মুলমান যুবকদের হিন্দু যুবকের দাওয়া হতে নেমে যেতে হত বন্ধুর জলপানের সুযোগ করে দেবার জন্য– এমন ঘটনা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন" (দ্রষ্টব, রবীন্দ্রনাথ, "লোকহিত, "লোকান্তর", রবীন্দ্র রচনাবলী ২৪ খণ্ড, পৃঃ ২৬২)

এমনিভাবে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সুলভ লেখক শ্রেণীর বিষাক্ত লেখনীরূপ বীজের প্রভাব সামান্য চারারূপে বিকশিত হলেও এক সময় তা বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়ে শিকড় গেড়েছিল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষ ভারতবাসীর হৃদয় ভূমিতে। আর তারই অনিবার্য ফলস্বরূপ শুরু হল রক্তের হোলিখেলা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

১৯৬৪তে কি ভয়ানক রক্তাক্ত দাঙ্গা কলকাতায় হয়েছিল তার সাক্ষী ইতিহাস ও এরই জীবন্ত অধিবাসী। ৯ জানুয়ারি কলকাতার যাদবপুর, টালীগঞ্জ, বাশদ্রোষী, জমিদারপাড়া, মোল্লাপাড়া প্রভৃতি স্থানে হত্যা, লুণ্ঠন আর অগ্নি সংযোগের ফলে নিদারুণ বিভীষিকার স্রোত বয়ে গিয়েছিল। এছাড়া বেলেঘাটা, এন্টালি, করেয়া, বেনেপুকুর, তালতলা, ওয়াটগঞ্জ, একবালপুর, এলাকায় হত্যা, লুট, আর আগুনে জ্বালানো হয়েছে মুসলমানদের যথা সর্বস্ব। পুলিশের সহযোগিতায় এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে। কিন্তু দায়ী কে? গুণ্ডাহ? না– তা নয়। প্রকৃতপক্ষে দায়ী ইতিহাস আর বিষাক্ত ইতিহাস শ্রেণী।

ঠিক তেমনি পূর্ব বাংলায় ও পাকিস্তানে হিন্দু নির্যাতনের প্রমাণের প্রাচুর্যের অভাব নেই। পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) যেভাবে হিন্দু হত্যা করা হয়েছিল তা বাঘ-সিংহের হিংস্রতাকেও অতিক্রম করেছিল। যার জন্য সেখানকার মুসলমান বংশধরকে বহু যুগ পর্যন্ত নির্লজ্জজনক ও ঘৃণিত অপরাধের ধিক্কার বহন করতে হচ্ছে এবং হবেও।

১৭ ফেব্রুয়ারি একজন ভারতীয় এমপি দাঙ্গার বিরুদ্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। "..... মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর বিমান ৮টা ৪০ মিনিটে বিমান ঘাঁটি স্পর্শ করেছে। তিনি তার নিজের চোখে দেখেছেন অধিকাংশ মুসলিম বসতি এলাকা, যেমন– মতিঝিল, কলাবাগান, জালিয়া টোলা, চিংড়ী হাটা, ট্যাংরা, বিবি বাগান ও অন্যান্য মুসলমান এলাকা জ্বলছে। যদিও আর তিনি মাত্র ১২ ঘণ্টা পরে পৌঁছাতেন, তাহলে এমনকি জ্যাকেরিয়া স্টীট, বলুটোলা যেখানে হাজার হাজার মুসলমান আশ্রয়ের জন্য উঠেছিলেন, মাটিতে মিশে যেত। এমনকি আমাদের তালতলা অবস্থিত বেকার হোস্টেল, এলিয়ট হোস্টেল, কলিকাতা মাদরাসা, বিপিনস্ট্রীট যেখানে মুসলমানরা জমায়েত হয়েছিল, সেসব হয়তো কসাইখানায় পরিণত হতো।"

এমনিভাবে ১৯৬১ সালে জবলপুরে, ১৯৬২ সালে মালদহ, মুর্শিদাবাদে প্রভৃতি স্থানেও ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। তাছাড়া জামসেদপুরে সীমাতিরিক্ত খুনখারাবি করা হয়েছিল। রাওরকেল্লা, গুজরাট প্রভৃতির হত্যাকাণ্ড তো কল্পনাই করা যায় না। অথচ এ সমস্তই স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর। স্বাধীনতার আগে যে হিন্দু-মুসলমানে কত রক্তারক্তি হয়েছে তার কোন সঠিক হিসাব নেই। তবে নিঃসন্দেহে তা ভয়াবহ এবং উভয় জাতির জন্য লজ্জাকর। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর

পাকিস্তানে সাম্প্রতিক দাঙ্গার জন্য দায়ী মুসলমানগণ এবং ভারতে দায়ী হবেন হিন্দু ভ্রাতাগণ। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও শান্তিপ্রিয় নিরপেক্ষ মানুষ আজও আছেন, পূর্বেও ছিলেন এবং আগামীতেও থাকবেন। যে খ্রিস্টান জাতি আমাদের ভেদবুদ্ধির শিক্ষাগুরু তাদের মধ্যেও সাধু সজ্জন নিরপেক্ষ মহামানুষ নেই বললে শুধু অপরাধই হয় না বরং সত্যের অপলাপ করা হয়।

শুধু সংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধি আমাদিগে ধ্বংসের পথে ঠেলে নাই বরং আমাদের পরস্পরের ধর্মের ভেতরেও তার মহাপ্রবেশ ঘটেছে, ফলে ধর্ম কেন্দ্রীয় ভারতবাসী পরস্পরের প্রতি বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়েছে। "নৃসিংহ পুরাণে'র শ্লোক উদ্ধৃতি করে লেখক যা বলেছেন, তাতে দেশবাসীর মুসলমান ও হিন্দুর কি উপকার হবে তা চিন্তার বিষয়।" "দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহত ম্লেচ্ছো হারামো পতি পুনঃ পুনঃ। উক্তাপি মুক্তিমাপ্নেতি, কিং পুনঃ শ্রদ্ধায় গৃগন" অর্থাৎ– "দাতাল শূকরের হস্তাহত হইয়া ম্লেচ্ছ যবন বারংবার হারাম হারাম শব্দ উচ্চারণ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, তখন শ্রদ্ধাপূর্বক রাম শব্দ উচ্চারণ করিলে যে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে ইহাতে অসম্ভব কি আছে।" টীকাকার বলেছেন– "যবনেরা প্রচলিত বাক্যে অপবিত্র শব্দের পরিবর্তে যে হারাম শব্দ বলে তাহা হারাম এই উচ্চারণ হওয়াতে ঐ নাম নামাভাস হইল এই নামাভাসেই যবনগণ অনায়াসেই মুক্ত হইবে।" (চৈতন্য চরিতামৃত হতে ৫৭৩, ৭৪ পাতায় দ্রষ্টব্য)

এই অলীক, অসত্য, অযৌক্তিক কল্পনাকে প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষই ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করবে। যেহেতু মূর্খের মূর্খামী মুখ খুললেই প্রকাশ পায়। হারাম আরবী শব্দ যা অবৈধ বস্তুকে নির্দেশ করে। আর লেখকের ভাষা হচ্ছে বাংলা বা সংস্কৃত। একেই বলে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে'। যেমন বাংলায় 'বাগ' মানে সুযোগ কিন্তু উর্দুতে 'বাগ' মানে বাগান আর ইংরেজিতে 'বাগ' মানে পোকা। এই সবকে একাকার করে ফল যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু আগামীতে সাবধান না হলে আমাদের স্বাতন্ত্র্য শেষ হয়ে যেতে পারে না কি?

যাহোক, এত আলোচনার পর একথা ভুললে চলবে না যে, ভারতের মাটিতে হিন্দু-মুসলমান এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে তথা সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে গ্রোথিত। মুসলমান হিন্দুর চরিত্রে সমাজে ইতিহাসে এমনকি ভাষার ক্ষেত্রেও উন্নতির জোয়ার এনে দিয়েছে। বঙ্গের বাংলা ভাষা আজ যত উন্নতই হোক না কেন এখনো তাতে সহস্র সহস্র আরবী, পারসী ও উর্দু শব্দ যুক্ত হয়ে সমৃদ্ধশালী হয়ে রয়েছে। বিখ্যাত গবেষক পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন রায় বাহাদুর এমএ পিএইচডি মহাশয় লিখেছেন– "বঙ্গ সাহিত্যকে একরূপ মুসলমানদের সৃষ্টি বললেও অত্যুক্তি হবে না।

>Goto List

..... মুসলমান সম্রাটগণ সাহিত্যের একরূপ জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা বহু ব্যয় করিয়া শাস্ত্রগুলিকে অনুবাদ করাইয়াছিলেন।” দীনেশ বাবুর কথায় অনেক কিছু প্রমাণিত হলেও দরিদ্র ভবঘুরে শ্রেণীর পুঁথি লেখক সাহিত্যিক মুসলমানদের পরিশ্রমেও বাংলা সাহিত্য গৌরবান্বিত হয়েছে। যেমন মুসলমান আলওয়াল, মুসলমান মাগন ঠাকুর প্রভৃতি নামের সাথে ঠাকুর শব্দের যোগ আছে বলে অনেকের ধারণা, হয়তো এরা মুসলমান নন। কিন্তু আমাদের কাছে তার তথ্য মজুদ আছে যে, এঁরাও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত।

মুসলমান রাজা-বাদশাহগণ এদেশে এসে তাঁরা প্রতিবেশী সুলভ মনোভাব পোষণ করতেন এবং হিন্দুদের সাথে যথেষ্ট পরিমাণে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। হিন্দুদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবকে তাঁরা যে সমর্থন করতেন তা বড় বড় উদারচিত্ত ঐতিহাসিকদের লেখায় প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন—“মুসলমানগণ ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান হতেই আসুন না কেন এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণ বাঙালি হইয়া পড়িলেন, তাঁহারা হিন্দু প্রজামণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পাশে দেব মন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, মহরম, ঈদ, শবেবরাত প্রভৃতির পাশে দুর্গোৎসব, রাস, দোল উৎসব চলিতে লাগিল।”

আজ আশ্চর্য লাগলেও প্রমাণিত ঐতিহাসিক সংবাদ এই যে, হিন্দু ধর্মের পবিত্র পুস্তকসমূহ যেমন রামায়ণ মহাভারত, গীতা, পুরাণ প্রভৃতি আকাশের ছায়াপথের মত দূর হতেই পরিদৃষ্ট হত। ব্রাহ্মণ ছাড়া এ সমস্ত গ্রন্থ অপর কেউ পড়তেই পেতেন না। অর্থাৎ পড়ার অধিকারই ছিল না। আর সাধারণ মানুষ পড়তে পারা তো দূরের কথা এর অর্থই বুঝতো না। এমনকি যাঁরা পুরোহিত তাঁরাও অধিকাংশ জন অর্থ বুঝতেন না। কারণ ঐসব বেদ বা ধর্মগ্রন্থগুলো অনুবাদ করা শাস্ত্রে নিষেধ ছিল। (শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদারের ইতিহাস দ্রষ্টব্য)

কিন্তু ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের উক্তিতে পরিষ্কার উল্লিখিত আছে যে মুসলমান রাজা হুসেন শাহের সময় তাঁর সেনাপতি পরগাল খাঁ ও পরগালের পুত্র ছুটি খাঁ রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করেন। সেটি শুধু মাত্র প্রাথমিক অনুবাদ হিসেবেই উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সংবাদ নয়; বরং আজ বহু ভাষায় বহুরূপে ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করবার ও সর্বশ্রেণীর পড়বার অধিকারের ওটাই হচ্ছে গোড়াপত্তন, ওটাই হচ্ছে হিন্দু ধর্মকে প্রকাশ ও প্রচারের ভিত্তিস্থাপনা। তেমনি বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'কুরআন তর্জমা'ও আমাদের কাছে প্রশংসনীয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টাতেই ভারতের সমাজ সংস্কৃতি ও সভ্যতা এতখানি উন্নত কারোর কোন অবদানের কথা ভুলে গেলে চলবে না। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের অবদান যদি আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকে তাহলে নজরুলের বিদ্রোহিতার সুরও ঝংকৃত হবে ভারতবাসীর হৃদয়তন্ত্রীতে।

স্বাধীনতা সংগ্রামীরূপে বিনয়, বাদল, দীনেশ প্রমুখের নাম যদি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে তবে হযরত মাওলানা ওলিউল্লাহ, মুহাম্মদ শহীদ ইসমাইল, মাওঃ আবদুল আজিজ, ওবাইদুল্লা সিন্ধী, হুসাইন আহম্মদ মাদানী (র.), আহম্মদ ব্রেলবী প্রমুখ স্বাধীনতাকামী বীরদের নামও লেখা থাকবে রক্তাক্ত ইতিহাসের পাতায় রক্তের তুলি দিয়ে। সে ইতিহাস পরে আসছে। মীরজাফর সিরাজ হত্যার পেছনে দায়ী বলে সারা মুসলমান সমাজ যদি হয় বিশ্বাসঘাতক তবে হিন্দু সমাজও বিশ্বাসঘাতক, নরহন্তারূপে চিহ্নিত হবে। কেননা তারই সন্তান নাথুরাম গড সে স্বাধীনতা সংগ্রামী অন্যতম নেতা গান্ধীজীর বুকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেছিল। কারবালার রক্তাক্ত ইতিহাস যদি হয় দুঃখের তবে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর প্রাণহানিও অনুরূপ বেদনাদায়ক। অতএব দোষ-গুণ আমাদের সকলেরই আছে একথা ভুলে গেলে চলবে না।

পরিশেষে বলব, আজ ভারতের হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতায় মেতে থাকার দিন নয়। আজ উভয় সম্প্রদায়ের কোটি কোটি হস্তকে এক করে এগিয়ে যেতে হবে উন্নতির পথে; সংগ্রাম করতে হবে যাবতীয় অন্যায় অত্যাচার আর কলুষতার বিরুদ্ধে। তবেই হবে ভারতের কল্যাণ–তবেই প্রতিষ্ঠিত হবে অনাবিল সুখ আর শান্তি। অতএব হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীকে যাবতীয় অসভ্যতা আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে মিশে যেতে হবে। তাহলেই আমরা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারব বিপুল সংবর্ধনা আর সাফল্যতার সাথে এবং অচিরেই ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হবে নিষ্কলুষ সৌভ্রাতৃত্ব রবি, যা দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে দিতে অপরিহার্য পাথেয়।

>Goto List

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলমান আগমনের পূর্বে ভারতের সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক অবস্থা

আমরা পূর্বেই ভারতের প্রাচীন যুগের ধর্ম, ইতিহাস ও বিবর্তনের বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি, এখন ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করব। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতির জন্য আমরা 'ভারত জনের ইতিহাস' টিকে বেছে নিলাম। তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে এই যে, এটি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের মস্তিষ্কস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর অর্থাৎ স্কুল ও কলেজের উপযুক্ত ইতিহাস। যেহেতু একাদশ শ্রেণী পূর্বে কলেজেই পড়তে হত। মাঝে স্কুলেই একাদশ শ্রেণী চালু হয়েছিল, পুনরায় তা কলেজেই চালু হয়েছে। ইতিহাসটি বেছে নেওয়ার আরও একটি কারণ হচ্ছে এই যে, ইতিহাসটির লেখক যে একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তি তা তার বইয়ে প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেমন–

'বিনয় ঘোষ'

'এমএ, রকফেলার রিসার্চ ফেলো ও বিদ্যাসাগর লেকচারার (১৯৫৬-৫৭), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; মেম্বার, হিস্টোরিকাল রেকর্ডস, কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ', 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র' প্রভৃতি প্রধান ইতিহাস গ্রন্থের লেখক; সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার জন্য রাজ্য সরকারের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার" প্রাপ্ত।'

বর্তমানে যাঁদের কালি-কলমের উপর ভারতনির্ভর করছে সেই শিক্ষিত পুরুষ ও নারীর বর্তমান স্বরূপও উপলব্ধি করতে পারা যাবে এই ইতিহাসটির দ্বারা। কারণ, হাঁড়ির ভাত একটা টিপলেই বোঝা যায় শক্ত না নরম। এবার আসুন আলোচনা শুরু করা যাক।

"বেদের বিরুদ্ধে বিরাট আক্রমণ শুরু হয়েছিল একদল লোকের দ্বারা, তাঁদের বলা হতো 'লোকায়ত বা চার্বাক'। বৌদ্ধ গ্রন্থে এদের নাম আছে, মহাভারতে এদের নাম ' হেতুবাদী'। তাঁরা আসলে নাস্তিক। তাঁরা বলতেন পরকাল, আত্মা ইত্যাদি বড় বড় কথা বেদে আছে। কারণ ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর এই তিন

শ্রেণীর লোকই বেদ সৃষ্টি করেছে, ভগবান নয়। বেদের সার কথা হলো পশুবলি। যজ্ঞের নিহত জীব নাকি স্বর্গে যায়। চার্বাকরা বলেন, যদি তাই হয় তাহলে যজ্ঞকর্তা বা যযমান নিজের পিতাকে হত্যা করে সোজা স্বর্গে পাঠান না কেন? ইত্যাদি। (ভাঃ জঃ ইঃ দ্রষ্টব্য)

ঐ ঝগড়া বাড়তে বাড়তে বেদ ভক্তদেব সঙ্গে বৌদ্ধদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঝাঁপ দিতে হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যে নাস্তিক তা চার্বাকদের উক্তিতেই প্রমাণ হয়েছে। অতএব বৌদ্ধরা মূর্তিপূজা যজ্ঞ বলি বা ধর্মাচার নিষিদ্ধ করে প্রচার করেছিল পরকাল নেই, জীব হত্যা পাপ প্রভৃতি। মোটকথা হিন্দুধর্ম বা বৈদিকধর্মের বিপরীত ধর্ম বৌদ্ধধর্মে জাতি ভেদ ছিল না। (ভাঃ জঃ ইঃ)

বৌদ্ধধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধর্ম সংগঠন ও সন্ন্যাস সংঘ। হিন্দুধর্মের বিধান হচ্ছে জীবনে প্রথম দিকে ব্রহ্মচারী, তারপর গৃহী বা সংসারী, তারপর বানপ্রস্থ আর বার্ধক্যে বা বয়সের শেষাংশে সন্ন্যাস। আর হিন্দু সন্ন্যাস সংবিধানে সংঘ সৃষ্টির কোন নিয়ম নেই। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সংঘ সৃষ্টি একটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক মূল্যবান ব্যবস্থা। কিন্তু পরে দেখা যায় শঙ্কর হতে শ্রী চৈতন্য, শ্রী রামকৃষ্ণ পর্যন্ত প্রত্যেকেই বৌদ্ধের ঐ নীতি গ্রহণ করেছেন। যদি আজও ভারতে হিন্দু জাতির মধ্য হতে সংঘগুলো বাতিল করা হয় তাহলে জাতি সামাজিক শৃঙ্খলা ও উন্নতি হতে বহু দূরে ছিটকে পড়বে। (ভাঃ জঃ ইঃ) ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ বলেছেন, "The Sanga of monks developed in to a hightly organized, wealthy and powerful fraternity...

যাহোক, হিন্দুধর্মের সাথে বৌদ্ধধর্মের লড়াই চলতে লাগল, পরস্পর পরস্পরকে গ্রাস করার চেষ্টা করতে লাগলো। ছল, বল, কলা, কৌশল প্রভৃতি অস্ত্রেরই প্রয়োগ হতে লাগল। একে অপরের প্রতি ঐ লড়াইটিও ছিল নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক লড়াই। অনেক উত্থান-পতনের পর অনুন্নত হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম হতে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করে উন্নত হয়েছিল আর বৌদ্ধরা নানা চক্রান্তের শিকার হয়ে বৌদ্ধদলকে দুই ভাগে ভাগ করেছিল। প্রাচীনপন্থীরা হীনযান আর আধুনিকরা হলো 'মহাযান'। মহাযান নতুন দল হিন্দু বা বৈদিক সম্প্রদায়ের সমর্থন বা প্রয়োজনীয় প্রশংসা পেয়ে মূর্তিপূজা শুরু করে। ফলে বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি ওখানেই নড়ে যায়, পরে হিন্দুদের অত্যাচার ও অনাচারে ভারতে সৃষ্ট বিশাল বৌদ্ধ সমাজ হিন্দু শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করে ভারত হতে বিতাড়িত ও বিদূরিত হয়েছে, শুধু পড়ে আছে বুদ্ধদেবের ছোট-বড় গোটা কতক বুদ্ধমূর্তি। ব্রহ্মদেশ, জাপান ও সিংহল প্রভৃতি বহির্ভারত বা অপর রাষ্ট্রে বৌদ্ধধর্ম বেঁচে থাকলেও ভারতবর্ষ হতে বৌদ্ধদলকে নিষ্ঠুরভাবে বিদায় হতে হয়েছে। ভারতজনের ইতিহাস-এ ১০০ পৃষ্ঠায় আছে-"হিন্দুধর্মের কাছে নতি স্বীকার করিয়া তাকে নিজের শ্রেষ্ঠ নীতি ও গুণগুলি দান করিয়া বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইয়াছে।"

এখানে মনে রাখার কথা, কোন জাতি তার মৌলনীতির পরিবর্তন সাধন করে অপর জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার কাছে নতি স্বীকার করে তাহলে তাকে স্বাতন্ত্র্যবিহীন হয়ে ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে যেতে হয়। এ কথা অব্যর্থ সত্য।

যাহোক, শিব ঠাকুরের শৈব ভক্ত শ্রেণী বা প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায় যে বৌদ্ধদের ওপর বেপরোয়া অত্যাচার করেছিল তা বহু ইতিহাসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে। শ্রী রমেশ মজমুদারের ইতিহাস গ্রন্থেও পাওয়া যায় হিন্দু রাজা শশাঙ্ক বিদ্বেষবশে বুদ্ধদেবের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র "বোধিদ্রুম বৃক্ষ" যা গয়াতে ছিল তা সমূলে উৎপাটন করেন এবং পাটলিপুত্রে বৌদ্ধদের ভক্তির বস্তু বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন সম্বলিক পবিত্র পাথরটিকে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন। তাছাড়া কুশীনগরের একটি বৌদ্ধ বিহার হতে বৌদ্ধদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং গয়ার বৌদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধদেবের মূর্তিটি অসম্মানের সঙ্গে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং সেই স্থানে স্থাপন করেন শিবমূর্তি। 'আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, শুধু বৌদ্ধধর্মে নয়, জৈনধর্মের ওপরও উৎপীড়ন এবং অত্যাচার তিনি প্রায় সমানভাবেই করে গেছেন।

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে অনেক মিল আছে। উভয় ধর্মেই জীব হত্যা নিষেধ এবং পরকাল ও ঈশ্বর স্রষ্টা সম্বন্ধে তাদের ধারণা নেতিবাচক। এবার প্রশ্ন হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম ধ্বংস হল, আর মহাবীরের জৈনধর্ম টিম টিম করে বেঁচে রইল কেন? তার কারণ হচ্ছে এই যে, জৈন বেচারারা হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে চুপচাপ তাদের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে ফেলেছে, ফলে তাদের জৈনতা মৌনতায় পরিণত হয়ে আসল সত্তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুছে গেছে। তারা ব্যবসায়ে নতুন খাতা, গণেশ ঠাকুরকে সম্মান প্রদর্শন, দুর্গা, কালী, সরস্বতী প্রভৃতি প্রত্যেক পূজা পার্বণে খুশি হয়ে অংশগ্রহণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা মূর্তি পূজারীর ন্যায় যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল তা তাদের মুছে যাওয়ারই পূর্বাভাষ। প্রমাণস্বরূপ 'ভারতজনের ইতিহাসে' পাওয়া যায় যে, "হিন্দু মতে যদিও জৈন ও বুদ্ধ উভয়ে নাস্তিক তাহলেও হিন্দুধর্মের সহিত উভয়ের সংগ্রাম তীব্র ও ব্যাপক হয় নাই।... হিন্দুদের বর্ণাশ্রম হিন্দু দেবদেবী এবং হিন্দু আচার নিয়ম তারা অনেকটা মেনে নিয়েছে ও রক্ষা করেছেন।"

তারপর মৌর্য সাম্রাজ্য, শিশু নাগবংশ এবং নন্দবংশের উল্লেখ ইতিহাসে আছে। কিন্তু সাল তারিখ ও ঐতিহাসিক তথ্যের অস্পষ্টতা হেতু মূল উপাদানের অভাবে বহু মতভেদে পরিপূর্ণ হয়ে আছে ঐ অধ্যায়। এরপর খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ বছর আগে পারস্য সম্রাট তাঁর সৈন্য ভারতের দিকে চালনা করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৬ সালে গ্রীসদেশের ম্যাসিডন রাজ্যের রাজা হন আলেকজাণ্ডার। তিনি পারস্য আক্রমণ করে সেখানকার রাজাকে পরাস্ত করেন। রাজার মৃত্যুর পর সমগ্র পারস্য দেশ আলেকজাণ্ডারের কবলিত হয়। এরপর খ্রিস্টপূর্ব ২৭ সালে

বীরবিক্রমে আক্রমণ করে সিন্ধু নদীর পার্বত্য এলাকার লোকদের হাজার হাজার আহত-নিহত করে আলেকজাণ্ডার ভারতে প্রবেশ করলেন। ভারতের পুরু নামীয় রাজার সাহসের পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই উভয়ের সৎসাহস ও উদারতা প্রশংসার দাবি রাখে। ঐ সময়ে গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ হয় এবং সেখানকার ঠাকুর-দেবতার মূর্তির নমুনাগুলোও ক্রমে ভারতে আমদানি করা হয়। শ্রী বিনয় ঘোষের ইতিহাসে ১২৩ পৃষ্ঠায় আমাদের এই মতের সমর্থন আছে। যথা "ভারতের গন্ধার শিল্প ও ভাস্কর্য শিল্প গ্রীক শিল্পের কাছে অত্যধিক ঋণী। গ্রীক দেবতাদের মডেলে ভারতের দেবদেবীর মূর্তি গঠিত হয়েছে।"

তাহলে এটা লক্ষণীয় বিষয় যে, আর্য, মুসলমান, গ্রীক, ইরানি, তুরানি সবই বিদেশী। এমনকি ঠাকুর দেবতার মূর্তিগুলো পর্যন্ত বাইরের প্রভাব বহন করে।

তারপর এল মৌর্য সাম্রাজ্য বা চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকা। চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করে প্রজাদের শেয়াল-কুকুরের মত অর্থাৎ পশুর মত মনে করে দুর্ব্যবহার করেন এবং হত্যাকাণ্ড করে প্রজাদের রক্তে হাত রাঙা করেন। প্রজাদের তিনি ক্রীতদাস শ্রেণীতে পরিণত করেছিলেন। (রোমান ঐতিহাসিকদের লেখা দ্রষ্টব্য)। তিনি নাকি জৈন ধর্মে দীক্ষা নিয়ে শেষে সিংহাসন ছেড়ে উপবাস ব্রত পালন করতে করতে মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র বিন্দুসার পিতার রাজ্যের সংরক্ষণ ও আরও পরিবর্ধন করেন।

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তার পুত্র অশোক মগধের সিংহাসনে বসলেন। ইংরেজ মহাশয়ের কৃপায় 'The great' শব্দের অনুবাদে আমরা তাঁকে মহামতি বলে ডেকে থাকি। তিনি যৌবনে বল্গাহীন ও অনুন্নত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। নিষ্ঠুরতার পরিচয়ে তিনি অনেককে টপকে গেছিলেন। সিংহাসন দখল নিয়ে প্রত্যেক ভাইকে তিনি নৃশংসভাবে হত্যা করে রক্তস্নাত সিংহাসনে সমাসীন হলেন। তিনি জীবনে প্রথম যুদ্ধ করলেন কলিঙ্গকে কেন্দ্র করে। অবশ্য তিনি জয়ীও হয়েছিলেন। সেই প্রথম যুদ্ধই তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ। কারণ সহস্র সহস্র নয়, লক্ষ লক্ষ প্রজার মুণ্ডহীন দেহ চারদিকে ছড়িয়ে থাকা, কাটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রাণহীন অজস্র দেহের পাশে কুকুরের মাংস নিয়ে মারামারি, শকুনের কর্কশ স্বর তাঁকে দিয়েছিল চমকে। আর তিনি যুদ্ধের পথে চলতে চাইলেন না। থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। সকলকে অভয় দিয়ে পালিয়ে যাওয়া প্রজাদের ফিরিয়ে আনলেন। প্রজাদের জন্য রাজকোষের দ্বার খুলে দিলেন। নিজে বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। শুধু অনুশোচনা আর পূর্ব কর্ম তাঁকে বারবার আঘাত করতে লাগলো। এবার দয়ার প্রতীক বৌদ্ধধর্মকে রাজধর্ম করে ভারতকে বৌদ্ধ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলেন। প্রচুর শিলালিপিতে সারা রাজ্যে বুদ্ধদেবের বাণী খোদাই করলেন। সেই সঙ্গে নিজের জীবনের অপরাধ অনুশোচনার চিহ্নস্বরূপ

পূর্বকাহিনীগুলোও লিপিবদ্ধ করতে তাঁর নির্ভেজাল সারল্যে ও সাধুতায় বাধেনি। অশোকের আদর্শ নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য সারা বিশ্বের লোকের জন্য। তবুও বলব, এইসব সিংহাসনকেন্দ্রিক রক্তাক্ত ইতিহাস প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকাকে মুসলমান রাজাদের বিশেষত ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস পড়ার সময় অবশ্য মনে রাখা উচিত।

প্রায় খ্রিঃ পূঃ ২৩২ সালে আশোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর সন্তান ও উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন অযোগ্য, ফলে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে বিবাদ শুরু হয়। মৌর্য বংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে ব্রাহ্মণ সেনাপতি হত্যা করে নিজে সিংহাসনে বসলেন এবং অশোকের স্মৃতি লোপ করে নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণ মতে, ভারতের অনেক প্রশংসার উল্লেখ আছে, আবার দুর্নামও আছে তেমনি। যেমন-হিন্দু জাতির মধ্যে কোন দল বা শাসক ছিল না। আর রাজাগণ যে নারী নিয়েই অধিকাংশ সময় অপব্যয় করতেন তারও উল্লেখ আছে। রাজা লোক লস্কর নিয়ে শিকারে যাওয়ার সময় সুন্দরী নারী বেষ্টিত হয়ে যেতেন এবং উচ্চ মঞ্চ তৈরি করে রাজা সেখান হতে তীর নিক্ষেপ করতেন। সেখানে শুধু কয়েকজন সুন্দরীই রাজার সহযাত্রী হতেন।

ভারতের শাসকগণ কর আদায় করতেন যথাযথভাবে। ব্যবসাদারেরা বিক্রয়লব্ধ অর্থের দশ ভাগের এক ভাগ কর হিসেবে দিতে বাধ্য থাকতেন। অনাদায়ে শাস্তি হতো। এমনকি প্রাণদণ্ডও পর্যন্ত দেওয়া হতো। এখানে ঔরঙ্গজেবের জিয্ইয়া কর প্রসঙ্গ পড়ার সময় পাঠকবৃন্দকে এগুলো না ভুলতে অনুরোধ করি।

পূর্বেই বলেছি, অশোকের পর তাঁর সন্তানরা ছিল অযোগ্য। তাই তাদের অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে নতুন শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বহু দিন হতে মৌর্য শক্তির সঙ্গে হিন্দু শক্তির ছোট-বড় লড়াই চলে আসছিল। অবশেষে শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্র খ্রিঃ পূঃ ১৮৭ সালে সুঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধররা সিংহাসন আর ক্ষমতার লড়াই করে অবশেষে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তারপর রাজা দেবভূতির মন্ত্রী বসুদেব রাজাকে হত্যা করে কান্ববংশের প্রতিষ্ঠা করলেন। আবার তেলেগু ভাষী সাতবাহন বংশ প্রবল শক্তি দিয়ে কান্ববংশকে অস্ত্র বলেই একেবারে ধ্বংস করেন।

তারপরই শকদের আক্রমণ। আক্রমণের ফলে সাতবাহন বংশ কাহিল হয়ে পড়ে। কিন্তু শ্রীযজ্ঞ সাত কর্নির আমলে আবার সাতবাহন শক্তিশালী হয়ে উঠে।

আমাদের অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, বুদ্ধদেব, মহাবীর প্রমুখ ধর্ম প্রচারকগণের দলবল মৌর্য বংশ তথা উপরের আলোচিত রাজাগণ হিন্দু বা ব্রাহ্মণ বংশের লোক। শুধু ভারতে ইংরেজ আর মুসলমানরাই হচ্ছে অহিন্দু বা বিদেশী। এটা এক বিরাট ত্রুটি বা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিনয় ঘোষ

মহাশয়ের ইতিহাসে ১৬৮, ১৬৯ পাতায় আছে–"পূর্ব ভারতে মগধে শৈশু নাগ, নন্দ, মৌর্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠা লাভের ফলে এসব বেদবিরোধী ধর্মমত যে রাজ পোষকতা লাভ করে তাতে বেশ কয়েক শতাব্দীর জন্য হিন্দুধর্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার পথ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। প্রকাশ্যে অবশ্য মৌর্য রাজারা হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করেননি, চন্দ্রগুপ্ত হইতে অশোক কেই ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের মত সম্রাট যে বেদবিরোধী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ইহাই যথেষ্ট।" শক বংশে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনই হচ্ছেন শেষ রাজা। ১৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

তারপর ভারতের বাহির হতে কুশান নামে আর এক শক্তিশালী জাতির আবির্ভাব ঘটল। ইউচি নাম তাদেরই। কুশন বংশের শেষ রাজার নাম কনিষ্ক। আমরা কিন্তু একটা মজার জিনিস দেখতে পাই কনিষ্ক কুশান বংশীয় রাজা, মোটেই 'শক' বংশীয় নন অথচ ৭৮ খ্রিঃ হতে তিনি নতুন অব্দ শুরু করেছিলেন। কনিষ্কের এই অব্দ কনিষ্কাব্দ বা কুশানাব্দ নাম না দিয়ে নাম হয়েছে শকাব্দ। যদিও তিনি শক নন তবু আমাদের সাধের শখে তিনিও শকের মত চিহ্নিত।

এ ক্ষেত্রেও আমাদের অনেকেই মনে করে থাকেন তিনিও হিন্দু। অতএব দেখা যাচ্ছে মুসলমান প্রতিষ্ঠিত হিজরি সন গণনা করলে সম্মান যেতে পারে অথচ বিদেশী কুশান বংশকে মনে মনে হিন্দু ও স্বদেশী কল্পনা করে শকাব্দকে গ্রহণ করে ধন্য হলে ক্ষতি নেই। কনিষ্কও বৌদ্ধধর্মে শুধু বিশ্বাসী ছিলেন বললেই হবে না বরং অশোকের মত তিনিও তাঁর রাষ্ট্রে বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রের তরফ হতে বহু অর্থ ব্যয় করে যে বৌদ্ধধর্ম দু-নান্দু হয়ে পড়েছিল তাকে সবল করে তুলেছিলেন। এমনকি বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জন্য কনিষ্ক যা করেছিলেন মহামতি সম্রাট অশোকও অতটা করতে পারেননি। বিনয় ঘোষের লেখায় আছে–"অশোক বৌদ্ধধর্মের উন্নতি ও বিস্তারের জন্য যে কাজ করিয়াছিলেন কণিষ্ক তা আরও সুবিন্যস্তরূপে সম্পাদন করার চেষ্টা করেন।" কনিষ্কের সময়ে চীনে সেই দেশীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতায় বৌদ্ধধর্মের অনুবাদ করে অনেক লোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনিভাবে জাপানেও বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে।

অতঃপর আসে গুপ্ত যুগ। প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্ত। ইনি মৌর্য বংশীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় প্রতাপশালী ছিলেন না। ৩৭৮ খ্রিঃ ইনি মারা যান। ইনিও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং চারদিকের রাজা-প্রজার মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন। তার উপাধি হয়েছিল 'সর্বোরাজোচ্ছেতা' অর্থাৎ সকল রাজ্যের উচ্ছেদ সাধনকারী। তারপর আসেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। তারপর এলেন একে একে কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রমুখ। সর্বশেষে এলেন রাজবুধগুপ্ত।

>Goto List

এরপর ভারতের বাহির হতে শুরু হল হুন জাতির আক্রমণ। সারা দেশে মারধর, লুট, অগ্নিসংযোগ, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতিতে এক বিভীষিকাময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর ঐ জাতি ভারতে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে ভারতীয়-অভারতীয় দুই জাতির সংমিশ্রণে রাজপুত বংশের সাথে মিশে যায়।

গুপ্ত যুগেই শিব পূজার প্রবর্তন হয়। "গুপ্ত যুগে শৈব ধর্মেরও বিকাশ হইয়াছিল।" (ভাঃ জঃ ইঃ ২০৭ পৃঃ) গুপ্ত যুগে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। হিন্দুধর্মের চিরদিনের বিষ্ণু হঠাৎ কৃষ্ণতে পরিণত হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন ভগবানের মধ্যে বিষ্ণু কৃষ্ণ হয়ে সমাজে প্রচারিত হতে থাকেন। (ভারতজনের ইতিহাস দ্রঃ ২০৮ পৃঃ)

এদিকে হুন জাতির প্রবল আক্রমণে হিন্দুগুপ্ত বংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। ঐ সময় রাজা শশাঙ্ক প্রবল প্রতিভাশালী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন এবং বৌদ্ধধর্মের ওপর নির্মম ব্যবহার করেন। তারপর দিল্লির নিকটে ধানেশ্বরে পুষ্যভূতি রাজার আর্বিভাব হয়।

তারপর রাজনীতির মঞ্চে আসেন রাজা হর্ষবর্ধন। তাঁর ভাই রাজা গ্রহবর্ধন নিহত হয়েছিলেন। হত্যাকারী শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনেরও শত্রু হয়ে উঠলেন। তাঁর ভাইকে হত্যার অপরাধে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যত দিন ভ্রাতৃ হত্যার প্রতিশোধ না নিতে পারবেন ততদিন তিনি ডান হাতে খাবেন না। অবশ্য তিনি বাম হাতেই খেতেন। শশাঙ্ক কিন্তু প্রবল শক্তি ও প্রভাবমণ্ডিত অবস্থাতেই স্বাভাবিকভাবে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মা সব অঞ্চল দখলে আনেন।

এত আলোচনায় দেখা গেল শুধু আক্রমণ, হত্যা, মারামারি আর জয়-পরাজয়ের ইতিহাস, শুধু রক্ত আর রক্ত। আমাদের মতে ওগুলো তত দোষণীয় নয়, কারণ সিংহাসনের জন্য, রাজ্যের জন্য লড়াই তখন বীরত্ব বলে ধরা হতো। আজকের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তখনকার দিনের কীর্তিকলাপকে বিচার করা উচিত নয়। বর্তমানে মুষ্টিযুদ্ধে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর মোহাম্মদ আলী ক্লে। তিনি কোটি কোটি টাকা পুরস্কার পাচ্ছেন আর তাঁর খেলা দেখার জন্য পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ টেলিভিশন সামনে করে বসে থাকেন। খেলা শেষে দেখা যায় প্রবল ঘুষির আঘাতে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়তোবা নাকভাঙা, চোখ উৎপাটিত কিংবা হাড়ভাঙা হয়ে হাসপাতালে যাচ্ছেন। কিন্তু সেদিন অদূরে না হলেও সুদূরে যে এই বীভৎস খেলা অসভ্যতায় পরিগণিত হতে পারে। তখনকার সমালোচকগণ যদি বিশ্ববিজয়ী মোহাম্মদ আলী ক্লে আর ভারতের বিশ্ববিজয়ী কুস্তিগীর গামা এবং রামমূর্তিকে বলেন অসভ্য তাহলে তা বিরাট ভুল করা হবে। বরং সে যুগে বীরত্ব ও বুদ্ধির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বললে বেশি কিছু আসে যায় না।

যাহোক, হর্ষবর্ধনের পর ভারতের বুকে 'চেত বংশের' আর্বিভাব হয়। ঐ বংশের শেষ রাজা খরবেল এবং রাজ্যের নাম ছিল কলিঙ্গ। খৃঃ পূঃ ১৬৫ সালে তিনি তামিল দেশের রাজ্যগুলো আক্রমণ করেন। শেষে 'পাণ্ড দেশ' থেকে মণি-মুক্তা, সোনা-রুপা, হাতি-ঘোড়া বহু কিছু নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মোটকথা, হর্ষবর্ধনের রাজত্ব তাঁর মৃত্যুর পরে আস্তে আস্তে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

তারপর এল চালুক্য বংশ ও পল্লব বংশ। যথাক্রমে প্রথম পুলকেশী, দ্বিতীয় পুলকেশীসহ ছোট-বড় অনেক রাজার আর্বিভাব ঘটে ক্রমে পাল বংশের সূচনা হয়। পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল।

তারপর ৮৫০ হতে ১২০০ সাল পর্যন্ত 'চোল বংশ' আত্মপ্রকাশ করে টিকে থাকে। রাজবাজ, রাজেন্দ্র প্রমুখ চোল রাজার ভূমিকাও শক্তিদীপ্ত ছিল। ঐ চোল রাজাদের সময়ে ভারতের শিল্পনৈতিক বেশ উন্নতি হয়েছিল। বড় বড় মন্দির এবং স্থাপত্য শিল্পে নৈপুণ্য সগর্বে প্রমাণিত হয়েছে।

তারপরই পাল বংশ ও সেন বংশের আর্বিভাব। গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল, প্রথম নহাপাল ও দ্বিতীয় মহীপাল প্রমুখ রাজা ছিলেন পাল বংশের মধ্যে। দ্বিতীয় মহীপাল তার ভাই সুরপাল ও রামপালকে জেলের মধ্যে বন্দি অবস্থায় রেখেছিলেন। কারণ আতঙ্ক ছিল ভবিষ্যতে যদি সিংহাসন নিয়ে লড়াই হয়। তাই পূর্বাহ্নেই পাকাপাকি ব্যবস্থা। যাহোক, পাল বংশে আরও অনেক নরপতির আগমন ঘটেছিল। যেমন নারায়ণপাল ৫৪ বছর রাজত্ব করেছিলেন, রাজ্যপাল ৩২ বছর রাজত্ব করেছিলেন। দ্বিতীয় গোপাল ১৭ বছর, দ্বিতীয় সুরপাল ২৬ বছর, রামপাল ৪২ বছর, গোপাল (তৃতীয়) ১৪ বছর, মদনপাল ১৮ বছর ও গোবিন্দপাল ৪ বছর রাজত্ব করেছিলেন। এমনিভাবে সেনবংশের মধ্যেও বিজয় সেন ৬২ বছর মতান্তরে ৩২ বছর, বল্লাল সেন ১১ বছর, লক্ষ্মণ সেন ২৭ বছর, বিশ্বরূপ সেন ১৪ বছর, কেশব সেন ৩ বছরকাল প্রভৃতি।

এর মধ্যে কৈবর্ত বংশ একবার শক্তিশালীরূপে আত্মপ্রকাশ করে মেরুদণ্ড সোজা করতে চেয়েছিল। কৈবর্ত রাজার নাম ছিল ভীম। সম্ভ্রান্ত রাজাগণ ঐ সময় একতাবদ্ধ হয়ে জোট বাঁধলেন যে, কৈবর্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া হতেই পারে না। কৈবর্ত রাজা ভীমের সেনাবাহিনীও ছিল দুরন্ত এবং রণনিপুণ। কিন্তু যুদ্ধে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মিলিত শক্তির কাছে তাকে পরাজিত হতে হল। ভীমরাজা বন্দি হলেন এবং জীবিত অবস্থায় তাকে ধরে আনা হল। তাঁর মন্ত্রী হরিকে এবং যুদ্ধের পর অনেককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে কৈবর্ত শক্তিকে দমন করা হয়েছিল। ভীমরাজার আত্মসমর্পিত সৈন্যদের রামপাল নিজের সৈন্যদলে সংযুক্ত করেন। তারপর রামপালের পুত্র রাজ্যপালও সবশেষে গোন্দিপাল রাজা হন, কিন্তু রামপালের মত এদের উপযুক্ততা ছিল না।

এবার সেন বংশের রাজারা এগিয়ে এলেন শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। পাল রাজাদের বিদায় পর্ব এবং সেন রাজাদের উদয় পর্ব শুরু হয়ে গেল।

বল্লাল সেন খুব উচ্চ হৃদয়সম্পন্ন মানুষ ছিলেন না। যুগের তালে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি পাশাপাশি বসবাস করার ফলে ক্রমে ছুতমার্গিদা হিন্দু সমাজে কমে আসছিল। কিন্তু বল্লাল সেন শক্ত হাতে তা দমন করলেন। ব্রাহ্মণদের ভদ্র ও কুলীন শ্রেণীতে এবং অব্রাহ্মণ ও অনুন্নত শ্রেণীকে নীচ বা ছোটলোক ও অস্পৃশ্য শ্রেণীতে পরিণত করেন। "রাজা বল্লাল সেন বলেন যে, কুলীনদের নয়টি গুণ থাকা উচিত। যাদের এসব গুণ আছে তাদের শ্রেষ্ঠ, যাদের আটটি গুণ আছে তাদের 'সিদ্ধ শ্রোত্রীয়' ও যাদের সাতটি গুণ তাদের আছে 'সাধ্য শ্রোত্রীয়' বলে অভিহিত করেন। বাকি কুলীনদের তিনি নাম দেন 'কাষ্ঠ শ্রোত্রীয়'।... বল্লাল সেন সব কুলীনকেই সমান স্থান দিয়েছিলেন। তিনি তাদের অকুলীন কন্যা বিবাহেও কোন বাধাআরোপ করেননি।" (বিনয় ঘোষের লেখা 'ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর' পুস্তকের ১০৯ পৃঃ হতে)

ঐ পুস্তকে ১১০ পৃষ্ঠায় আরও লেখা আছে "...ব্রাহ্মণরা এই কৌলিন্য প্রথার দোহাই দিয়ে সামাজিক সুবিধা আদায় করতে লাগলেন। ক্রমে এই কৌলিন্য প্রথা থেকে সৃষ্টি হল কন্যাকে উচ্চ বর্ণে বিবাহ দেওয়ার রীতি-যার অবশ্যম্ভাবী ফল হল বহু বিবাহ। এক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বহু কন্যার পানি গ্রহণ করতে লাগলেন।... ঋতুমতী হওয়ার আগে কন্যার বিবাহ দেওয়ার বাধ্য-বাধকতা ও বিবাহ দিতে না পারলে পিতা-মাতার যে সামাজিক অমর্যাদা হতো তা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্যই কুলীন ব্রাহ্মণরা এই কন্যাদের বিবাহ করতেন। অতএব বিবাহ বেশ লাভজনক পেশা হয়ে উঠল। কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাদের অসহায় পিতা-মাতারা দু'তিন ডজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ৭০/৮০ বছরের বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণদের উপযুক্ত পাত্র বলে বিবেচনা করতেন।... মৃতপ্রায় আশি বছরেরও অধিক বয়স্ক বৃদ্ধের সঙ্গে নিতান্ত নাবালিকা কন্যাদের বিবাহ হতো। মৃত্যুর আগে সেই বৃদ্ধের লাভ হতো সামান্য কয়েকটি টাকা।"

কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা অনেকে এই প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) রাশবিহারী মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর জীবন চরিতে যা লিখেছেন সামান্য একটু তুলে ধরা হল। তিনি লিখেছেন,"...পিতাঠাকুর মহাশয় আমাকে অতি শৈশবাবস্থায় রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তখন পিতৃব্য শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার অবিভাবক ছিলেন। দারিদ্র্যতাবশত আমাকে অল্পকালের মধ্যেই তিনি আটটি বিবাহ করান।... বহুবিবাহে সম্মতি থাকলে বোধহয় আমাকে শতাধিক রমণীর পানিগ্রহণ করিতে হইত। অনন্যোপায় হয়ে আরও ছয়টি পরিণয় স্বীকার করিতে হইল, তাতে আমার ঋণ পরিশোধ ও পরিবার বর্গের কিঞ্চিৎকালের

>Goto List

ভরণ-পোষণের সংস্থান হইলে আমি... হুসেন শাহীর জমিদারদের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক তহশীলদারী কর্মে নিযুক্ত হইলাম। (রাশবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত)। এছাড়া আরও অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে যে, কৌলীন্য প্রথা সমাজে কত ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। যেমন (ক) "একটি ব্রাহ্মণের যদি ত্রিশটি স্ত্রী থাকে তবে প্রতি মাসে কয়েক দিনের জন্য শ্বশুরালয়ে গিয়ে থাকলেই ভাল খেয়ে ও উপহার পেয়ে এবং জীবিকা অর্জনের কোনও চেষ্টা না করে তাঁর সারা বছর কেটে যেতে পারে। বহু বিবাহ প্রথার ফলে কুলীন ব্রাহ্মণরা এক নিষ্কর্মা, পরভুকশ্রেণী হয়ে উঠেছে এবং বিবাহের মত একটি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে নীতিহীনতার উৎস করে তুলেছে।"

(খ) "অতএব অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন বহু বিবাহ করা।"

(গ) "কুলীনরা বৃদ্ধ বয়সেও বিবাহ করে। অনেক সময় স্ত্রীদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎই হয় না অথবা বড়জোর তিন-চার বছর পরে একবারের জন্য দেখা হয়।"

(ঘ) "এমন কথা শোনা যায় যে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ এক দিনেই তিন-চারটি বিবাহ করেছেন।"

(ঙ) "কোনও কোনও সময় একজনের সব কয়টি কন্যার ও অবিবাহিত ভগিনীদের একই ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়।"

(চ) "কুলীনের ঘরের বিবাহিত বা কুমারী কন্যাদের খুব দুঃখের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। কুলীনদের এই ধরনের বহু বিবাহের ফলে ব্যভিচার, গর্ভপাত, শিশুহত্যা ও বেশ্যাবৃত্তির মত জঘন্য সব অপরাধ সংঘটিত হয়।" (উপরের 'ক' হতে 'চ' পর্যন্ত উদ্ধৃতিগুলো শ্রী বিনয় ঘোষের লেখা ঐ 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামক পুস্তক হতে নেওয়া হয়েছে।)

এ ছাড়া এমন ব্যক্তিদের কথা জানা গেছে, যারা ৮২, ৭২, ৬৫, ৬০ ও ৪২টি কন্যার স্বামী। এবং ঐ স্ত্রীদের যথাক্রমে ১৮, ৩২, ৪১, ২৫ ও ৩২টি করে পুত্র সন্তান এবং ২৬, ২৭, ২৫, ১৫ ও ১৬টি করে কন্যা সন্তান ছিল। মোটকথা কৌলিন্য প্রথা একশ্রেণীকে একশত খণ্ডে বিভক্ত করে বিভেদের প্রাচীর রচনার ফলে মানুষের মানবিকতাকে দারুণভাবে অপমানিত করা হয়েছিল এবং মানুষের স্বাধীন অধিকারের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছিল।

তারপরেই রাষ্ট্রমঞ্চে লক্ষ্মণসেনের পদার্পণ। তাঁর সময় দেশের একতা আরও নষ্ট হয়ে যায়। ছোট-বড় প্রত্যেক রাজাই যেমন নিজের সিংহাসন, রাজ্য ও স্বার্থকেই বড় করে দেখেছেন, দেশ, সমাজ ও জাতির কল্যাণ কামনায় উদারতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তেমন কাউকে অগ্রবর্তী হতে দেখা যায়নি। তার ওপর তিনি বৃদ্ধ হয়ে শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতাবোধ করছিলেন। এমন সময় নিত্যনতুন

সংবাদ মুসলমান জাতি সম্বন্ধে শুনতে লাগলেন। তাঁরা নাকি তিন ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন। এমনকি তাঁদের ধর্মে মূর্তিপূজা মোটেই নেই। তাঁরা নাকি মূর্তিপূজার খুব বিরোধী, তাঁদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা এত বেশি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিষ্যরা আল্লাহর শক্তিতে প্রথমেই কোন দেশ আক্রমণ করার আগেই জানতে পারেন সেই রাজ্যের সমস্ত অবস্থা। তার পরেই হয় আক্রমণ। তাঁরা নাকি অল্প সৈন্য নিয়ে বিশাল বিশাল সৈন্য বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে জয়লাভ করেন ইত্যাদি। তবে একথা ঠিক যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" পতাকা তলে একত্রিত হয়ে তথা কুরআন ও হাদীসের মর্মকেন্দ্রে সমবেত হয়ে আধ্যাত্মিক বা ঐশী ক্ষমতায় ক্ষতাবান মুসলমানরা যে দিকেই পদার্পণ করেছে জগতের সেই অংশই হয়েছে জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-সভ্যতা, তাহজিব ও তামাদ্দুন অতুলনীয়।

আমাদের দেশের প্রচলিত ইতিহাসের মধ্যে রমেশ মজুমদারের ইতিহাস ও ঐতিহাসিকতায় অনেকেই আস্থাশীল। সেই ইতিহাস অবলম্বনে লক্ষ্মণ সেনের হাত হতে রাজশক্তি কেমনভাবে মুসলমানের হাতে এল এখন সেই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা যাক।

তিনি তাঁর ইতিহাসে অবশ্য ঐতিহাসিক মিনহাজুদ্দিন সিরাজ সাহেবের লেখার অনুবাদ হতে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। উদ্ধৃতিটি নিম্নরূপ-

"এই সময় লখমনিয়া রাজধানী 'নুদীয়তে অবস্থান করিতে ছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর সময়ে তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন। তাঁহার জন্মকালে দৈবজ্ঞগণ গণনা করিয়া বলেন যে, যদি এই শিশুর এখনই জন্ম হয় তবে সে কখনই রাজা হইবে না কিন্তু আর দুই ঘণ্টা পরে জন্মিলে সে ৮০ বছর রাজত্ব করিবে। এই কথা শুনিয়া রাজমাতার দুই পা বাঁধিয়া মাথা নিচের দিকে করিয়া তাঁহাকে ঝুলাইয়া রাখা হইল। শুভ মুহূর্তে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নামান হয়, কিন্তু পুত্র প্রসবের পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি হিন্দুস্তানের একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। বখতিয়ার কর্তৃক বিহার জয়ের পরে তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি নুদীয়ায় পৌঁছিল।

তাহলে উপরোক্ত উদ্ধৃতি হতে এও জানা গেল, ভাগ্য ভবিষ্যতের যে ফল ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্ঞগণ বলতেন সামান্য হতে স্বয়ং রাজা পর্যন্ত তা বিশ্বাস করতেন। নচেৎ ঐ প্রসবকালের যন্ত্রণাদায়ক সময়ে এ রকম নিষ্ঠুর ভূমিকা প্রতিপালিত হতে পারত না।

পূর্বেই বলা হয়েছে মুসলমান সৈন্য, সেনাপতি ও রাজাগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাতে কঠোর সাধনা এবং দিনে সৈন্য চালনা করতেন। তাঁরা ঘুমানোর পূর্বে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের সময় নিয়ে একটি নামায পড়তেন তার নাম ছিল 'ইস্‌তিখারা' নামায। তারপর দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন; হে আল্লাহ! আমরা আমাদের জন্য নয়, তোমার জন্য যুদ্ধ করে যাচ্ছি এবং তোমার জন্য মরতেও আমরা প্রস্তুত। এখন আমাদের আগামী অভিযান কেমনভাবে

কোনদিকে করা হবে তুমিই জানিয়ে দাও, সাহায্য কর; তারপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। স্বপ্নযোগে প্রার্থনার ফলাফল জানতে পারতেন এবং সেই মত যুদ্ধের ময়দানে ও জীবনের সর্বত্র দুর্বার গতি নিয়ে ছুটে যেতেন; সাফল্য তাদের সাদর অভিবাদন জানাত। এখনো খুব সাধু শ্রেণীর মুসলমানরা নিজেদের ব্যক্তিগত কাজেও ঐ নামাযের মাধ্যমে নির্দেশ লাভ করে থাকেন। খুব পরীক্ষিত এমনি বহু তথ্যপূর্ণ ঘটনা আমাদের হাতে আছে, কিন্তু বর্তমান বিশ্বের নিচ হতে ওপর পর্যন্ত বেশির ভাগ মুসলমানই মুখে ধর্মের মত বাণীই বলেন না কেন, অনেক মানুষেরই অবস্থায় ঘুণ ধরেছে। এর কারণ পরিবেশ ও উৎকট শিক্ষার চাপ।

যাহোক, নুদীয়ার বৃদ্ধ রাজা কতগুলো সৈন্যকে স্বপ্নে দেখলেন তাঁরা নুদীয়া আক্রমণ করেছেন, ঘুম ভাঙার পর যারপরনাই বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর ওপর মুহাম্মদ বখতিয়ার তুর্কী মুসলমান বীরের খ্যাতি নানাভাবে শুনে আসছেন। তখন ঐ বড় বড় দৈবজ্ঞ, যাঁরা তাঁকে বিধান দেন তাঁদের ডাকলেন। তাঁরা গণনা করে বললেন আক্রমণের সম্ভাবনা। দৈবজ্ঞগণ এবং রাজা অনেক চিন্তা-ভাবনার পর অবশেষে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, গুপ্তচরগণ ভিক্ষুক বেশে গিয়ে দেখে আসুক তুর্কী সৈন্যদের চেহারা পোশাক-পরিচ্ছদ কেমন। তারপর যদি স্বপ্নে দেখা রূপ চেহারার সাথে মিলে যায় তাহলে স্বপ্ন সত্যিই বলতে হবে। তাই-ই করা হল। কিছুদিন পরে সংবাদ এল-তাঁদের দাড়ি আছে, গোঁফ কামানো, মাথায় উন্নত শিরস্ত্রাণ, সৈন্যরা লৌহবর্ম পরে থাকে। কথায় কথায় 'আল্লাহ' আর 'ইনশাআল্লাহ' শব্দ উচ্চারণ করে। একতাবদ্ধ হয়ে উপাসনা করে তারপর সমবেত হয়ে হাত তুলে নিজের ভাষায় কী যেন প্রার্থনা করে এবং উপাসনা শেষে শিশুর মত সকলে কান্নাকাটি করে। এই সংবাদ শুনেই দৈবজ্ঞ বললেন, "হ্যাঁ, শাস্ত্রেও ঐ রকম লেখা আছে।" তারপরই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রাজা লক্ষ্মণ সেন জানালেন, আমার স্বপ্নে দেখা তুর্কীবীরদের চেহারা আর গুপ্তচরদের আনা সংবাদ একেবারে মিলে গেছে। তখন দৈবজ্ঞগণ পরামর্শ দিলেন, আপনাদের চুপিচুপি সম্মান নিয়ে নুদীয়া হতে সরে পড়াই ভাল, আমরাও আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত।

এ সম্বন্ধে শ্রী রমেশ মজুমদারের ইতিহাসে শুধু ইঙ্গিত আছে মাত্র। যেমন—"গুপ্তচর পাঠাইয়া বখতিয়ারের আকৃতিতে বিবরণ আনান হইলে দেখা গেল যে, শাস্ত্রের বর্ণনার সহিত এর সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। তখন বহু ব্রাহ্মণ ও বণিক নদীয়া হইতে পলায়ন করিল।"

যাহোক, লক্ষ্মণসেনের মত রাজার 'ওঠ বললেই কাঁধে ঝুলি'র মত পলায়ন সম্ভব নয়। বছর খানেক পরেই মুহাম্মদ বখতিয়ার ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্যসহ বিপুল বেগে নদীয়ার রাজদরবারে এসে উপস্থিত হলেন। তার পূর্বেই নগরে ও রাজধানীতে রাজার সৈন্যদের বাধা দেওয়া কর্তব্য ছিল;' কিন্তু প্রত্যেকের আতঙ্ক ছিল 'জুজুর ভয়' যেখানে স্বয়ং রাজাই আতঙ্কিত; ফলে বখতিয়ার সহজেই

রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করলেন। লক্ষ্মণ সেনের পুত্র এবং খুব অল্পসংখ্যক দেহরক্ষী এতক্ষণে বুঝতে পারল এঁরা বণিক নন; সেই স্বপ্নে দেখা তুর্কী সৈন্য। বীর বিক্রমে একবার বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু বৃথা হল শেষ চেষ্টা। এইবার বাধ্য হয়ে রাজা লক্ষ্মণ সেন পেছনের দরজা দিয়ে আত্মগোপন করে পূর্ব বঙ্গে পলায়ন করলেন।

রমেশ মজুমদার 'বাংলা দেশের ইতিহাস'-এ ২৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "যে সময়ে তুরস্ক সেনাকর্তৃক দেশ আক্রান্ত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান সেই সময়ে রাজধানীর দ্বাররক্ষীরা আঠারজন অশ্বারোহী তুর্কীকে বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ করিতে দিল এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বর্মাবৃত সৈন্যকে অশ্বব্যবসায়ী বলিয়া ভুল করিল।"

ঐতিহাসিকগণের নিজের জ্ঞান দিয়ে সমালোচনা করা একটা চিরন্তন স্বভাব ধর্ম। যেমন অমুক রাজা অমুক বাদশার পতনের কারণ এই ইত্যাদি। যদি তিনি এই ভুল না করতেন তবে পরাজয়বরণ করতে হতো না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখার প্রয়োজন যে, যদিও প্রচলিত আছে 'সাবধানের বিনাশ নাই'। কিন্তু তবুও এর চেয়েও শক্তিশালী পরীক্ষিত সত্য কথা হচ্ছে এই যে বিনাশের সাবধান নাই'। অতএব যখন স্রষ্টার সদিচ্ছা অনুকূলে থাকবে তখন সব ভুলই ঠিকে পরিণত হবে আর যখন বিশ্ববিধাতা পক্ষে না থেকে বিপক্ষে প্রতিকূলে ভাব পোষণ করবেন তখন সব ঠিকই ভুলে রূপ নেবে-যদিও এই বিশ্বাস শুধুমাত্র আস্তিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দলভুক্ত মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর দলকে ঘোড়া ব্যবসায়ী নামে আখ্যায়িত করার বা মনে করার পেছনে ঐ একই সত্যের ইঙ্গিত রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলমানদের ভারত আগমনের পূর্ণ তথ্য

মুসলমানদের ভারতে প্রথম পদার্পণ সম্বন্ধে দেশের প্রচলিত আটপৌরে ইতিহাসে পাওয়া যায়, ভারতে সর্বপ্রথম মুসলমান জাতির আগমনকাল মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময় হতে। আসল ইতিহাস কিন্তু তা নয়; বরং আরও বহু তথ্যপূর্ণ ইতিহাস লুকিয়ে আছে ইতিহাসের ইতিহাসে।

আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রী বিনয় ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী 'ইতিহাসের সিনিয়র শিক্ষয়ত্রী শ্রী বীনা ঘোষ এম এ বি-টি'র সহযোগিতায় লেখা 'ভারত জনের ইতিহাস' হতে উদ্ধৃতি দিয়েছি। তাতে তাঁদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, নিরপেক্ষতা ও দুরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গেছে যথেষ্ট। কারণ বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতির ইতিহাসে বিদ্বেষতার চিহ্ন পাওয়া যায়নি যদিও তাঁরা হিন্দু ছিলেন না, বরং অহিন্দু বা তাঁর ভাষায় নাস্তিক প্রভৃতি। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে শ্রী ঘোষ মহাশয় নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেননি বলে অনেকের বিশ্বাস। তার প্রমাণ একটু পরেই আসবে।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি, ইংরেজগণ তাঁদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে ইতিহাসে মুসলমান চরিত্রকে বিকৃত করেছিলেন এবং করিয়েছিলেন। আর হিন্দু-মুসলমান বিরাট দুটি জাতির মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষবৃক্ষ রোপণ করতে পারলেই তাঁদের কৃতকার্যতা। তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি। তাই মুসলমানদের ইতিহাস লেখার সময় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনেকে তাঁদের লেখায় প্রমাণ দিয়েছেন তাঁরা মুসলমান জাতিকে কে কোন চোখে দেখেন! পুরস্কারপ্রাপ্ত বিনয় ঘোষও তার ব্যতিক্রম নন বলেই অনেকে মনে করেন। তিনি একজন ইতিহাস লেখক ও সরকারের দায়িত্ববহনকারী এবং শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের বা স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত। তাঁর স্ত্রীও একজন উচ্চ শিক্ষিতা এবং তিনিও দেশের ভাবী নাগরিক গড়ে তোলার জন্য নির্বাচিত নাম করা শিক্ষানিকেতনের শিক্ষয়িত্রী। এখন তাঁদের লেখাও যদি নির্ভেজাল দোষমুক্ত না হয় তবে সাধারণ লেখক-লেখিকা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর অবস্থা যে আরও ভয়াবহ হবে তাতে আশ্চর্য বা অবাক হওয়ার কী আছে? তাই এই আবশ্যকীয় অবতারণার প্রয়াস।

শ্রী ঘোষ তাঁর 'ভারত জনের ইতিহাসে' একাদশ অধ্যায়ে ২৭৭ পাতায় শুরু করেছেন 'ইসলামের অভিযান'। সেখানে মোটা অক্ষরে যা লেখা আছে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই তা গভীর সাম্প্রদায়িকতা যুক্ত না মুক্ত তার বিচারের দায়িত্ব আমার সূক্ষ্মদর্শী পাঠক-পাঠিকার ওপরেই অর্পণ করলাম।

ঐ ইতিহাসে লিখিত আছে–"হযরত মুহাম্মদের মৃত্যুর পর যাহারা ইসলাম ধর্মের ধারক হইলেন তাঁহাদের বলা হয় খলীফা। এই খলীফাদের শাসনকাল ক্রমে একটা সুসংহত মুসলমান রাজশক্তির বিকাশ হইলে এবং তাহা আরবের বাহিরে পরিব্যাপ্ত হইল। **বিধর্মীদের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' (ধর্মযুদ্ধ) ঘোষণা করা এবং তাদের ছলে বলে কৌশলে ধর্মান্তরিত করা ইসলামের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার যুগে অন্যায় বলিয়া গণ্য হইত না।**

তার পূর্বেই ইতিহাসের ঐ পাতাতেই ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে লেখক বলেছেন,...৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ আরবের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া প্রচণ্ড বেগে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুধর্ম বহু প্রাচীন, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাচীনতাও কম নয়। খৃিস্টধর্মের ৬০০ বছরের বেশি হইয়াছে। কাজেই নবজাত ইসলাম ধর্মের দুর্বার প্রাণশক্তি অন্তত সাময়িকভাবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মানুরাগীদের বেশ বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল।"

যাহোক বাচ্চাদের বই হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বই পর্যন্ত পড়ে এটুকুই সাধারণত বলা হয়ে থাকে, ভারতে মুসলমানদের প্রথম অভিযান মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময়। ভারতের ওপর লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে হিন্দু রাজা দাহিরের সময়ে মুসলমানগণ যেন বিনা কারণেই আকস্মিক আক্রমণ করেছিলেন, ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমান সূক্ষ্মদর্শী গবেষক পণ্ডিতদের মতে, সিন্ধুস্তান হিন্দুস্তান বা ভারতবর্ষ মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্বতন্ত্রস্থান। সিন্ধু বা হিন্দু নামটি মুসলমানদেরই দেওয়া। হযরত মুহাম্মদের (সা.) সময়েই ভারত সম্বন্ধে একদিন তার বিখ্যাত শিষ্য হযরত আবু হোরাইরা (রা.) জানিয়েছিলেন, "হিন্দ বিজয়ের সুসংবাদ"। তাই সাহাবী বা শিষ্য হযরত আবু হোরাইরা (রা.) বর্ণিত হাদীস গ্রন্থে আছে, "রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের হিন্দ অভিযানে নিশ্চিত ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) দিয়েছেন।" তিনি আরও বলেছেন, "যদি আমি সেই সময় জীবিত থাকি তবে আমি আমার প্রাণ ও সম্পদ-সম্পত্তি বা অর্থাদি ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করব না। আর যদি নিহতই হই তো সম্মানীয় স্বর্গীয় শহীদের সম্মান পাব, আর যদি নির্বিঘ্নে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসি তাহলে আমি হতে পারব নরকমুক্ত আবু হোরাইরা (রা.)।" নাসায়ী হাদীস গ্রন্থ হতে (২ : ৬২ পৃঃ)

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবদ্দশায় খালেদ ইবনে ওলিদ (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনিই ইসরাইল-আফগান ও নিজের গোত্রের লোকদের পত্র দিয়ে জানান যে, "সমস্ত ধর্মের প্রতিশ্রুত প্রতিক্ষীত পয়গম্বর 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' সারা বিশ্বের পাপীদের পরিত্রাণের পাথেয় নিয়ে শেষ নবী হয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার করছেন। আমি নিজে সেই শান্তি সাম্যের স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি এবং আপনারাও সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন আশা

করি। আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টির কাছে নতিস্বীকার করাকে ইসলাম চিরতরে বন্ধ করেছে। সংশোধিত চরিত্রবান এবং সভ্য ও উন্নত হয়ে স্বর্গের অধিকারী হওয়ার পূর্ণ পদ্ধতি আমরা উপলব্ধি করে উপকৃত হচ্ছি। তাই আপনাদেরও মঙ্গল কামনায় এই পত্র প্রেরণ...।" (তারিখে জাঁহাকুশ,' মজমাউল আনসা' এবং আছনাফুল মখলুকাত' ইতিহাস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

অনুরূপ একটি পত্র পেয়ে 'কয়স' নামে একটি প্রভাবশালী নেতার নেতৃত্বে আফগানিস্তান হতে একটি দল মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং অনেক আলোচনার পর স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে 'কয়স'ও হযরতের হাতে হাত দিয়ে ইসলামের ওপর আত্মসমর্পণ করলেন। হযরত তখন কয়সের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখলেন আবদুর রশিদ। কারণ প্রত্যেক মুসলমানের নাম মুসলমানের মত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এবার আবদুর রশিদ (রা.) সঙ্গে আর একজন সাহাবা বা সঙ্গী দিয়ে আদেশ দিলেন ইসলামের বাণী প্রচার করতে। তিনি নিজের দেশ অর্থাৎ আফগানিস্তানে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে বহু গোত্রীয় অগোত্রীয় লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে ৭৮ বছর বয়সে পরবর্তীকালের কাজের দায়িত্ব জীবিত মুসলমানদের ওপর ন্যস্ত করে পরলোক গমন করলেন।

মুসলমানরা একহাতে তলোয়ার আর অপর হাতে কুরআন নিয়েই নাকি ইসলাম প্রচার করেছে বলে যা মিথ্যা অপপ্রচার আমাদের মধ্যে প্রচারিত তা কত অসার, অবাস্তব এবং পরিকল্পনাপ্রসূত ভারতে ইসলাম আগমনের প্রথম অভিযাত্রার ইতিহাস পাঠ করলেই প্রমাণিত হবে।

ভারত রাষ্ট্রের মাদ্রাজ তামিলনাড় প্রদেশের একটি জেলার নাম 'মলাবার' বা 'মালাবার'। এই 'মালাবার' ঘাঁটিটি আরবদের জন্য এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। কারণ, মাদ্রাজের এই বন্দরের উপর দিয়েই আরবরা চীনে যাতায়াত করতেন। যেমন করেই হোক সারা বিশ্বের প্রত্যেক স্থানে ইসলামের বাণীকে পৌছে দেওয়া তাঁরা 'ফরয' বা অবশ্য কর্তব্য বলে জানতেন। অবশ্য প্রত্যেক দেশ বা জাতিকে মুসলমান করা 'ফরয' নয়, তবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী শুনিয়ে দেওয়া ফরয। তাই আরবরা রাতে নামায সাধনায় রত থাকতেন আর দিনে সিদ্ধান্ত শেষে বিশাল কর্ম-সমুদ্রে চালাতেন তাঁদের অব্যর্থ অভিযান। যাহোক, আরবরা এই জায়গাটিকে বলতেন 'মাবার', আরবীতে এর অর্থ অতিক্রম করে যাওয়ার স্থল-পারঘাট। আরব বণিক ও নাবিকেরা এই ঘাট পার হয়েই মাদ্রাজ ও মক্কার কাছে হেজাজ প্রদেশে যাতায়াত করতেন এবং মিসর হতে চীনে এবং যাত্রাপথের নগর ও বন্দরগুলোতে যাতায়াত করতেন। এ জন্যই 'মাবার' নাম রেখেছিলেন তাঁরাই। ঐ যাতায়াতের পথে মূল্যবান কর্তব্য ইসলামের বাণী পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁরা যথাযথভাবে পালন করতেন। ফলে তাঁদের হাতেই বহু মানুষ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল!

বিশ্বকোষের শ্রী সম্পাদক মশাই তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "পরাবৃত্ত পাঠ জানা যায় যে চেরব রাজ্যের (ভারতের) শেষ রাজা চেরুমাল পেরুমাল ইচ্ছা করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্মগ্রহণ অভিলাষে মক্কানগরীতে গমন করেন। (দ্রঃ বিশ্বকোষ ১৪ : ২৩৪ পৃঃ)

তাছাড়া একজন মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিত 'তোহফাতুল মুজাহেদীন' গ্রন্থেও পাওয়া যায়, "একজন রাজার মক্কা গমন, তাঁর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হওয়া এবং স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। রাজা কিছুকাল হযরতের কাছে থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় 'শহর' নামক স্থানে পরলোক গমন করেন।" (তোহফাতুল মুজাহেদীন দ্রষ্টব্য)

এখানে দেখা যাচ্ছে, উভয় লেখকের বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সামস্য রয়েছে। অতএব অব্যর্থভাবে প্রমাণিত হচ্ছে মাদ্রাজেই প্রথমে ভারতের রাজা স্বেচ্ছায় মুসলমান হওয়ার জন্য মক্কায় গিয়েছিলেন। আরও প্রমাণ হয়, তরবারি দিয়ে ইসলাম প্রচারের মিথ্যা ঘৃণ্য অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তদুপরি আরও প্রমাণ হয়, রাজার মুসলমান হওয়ার আগেই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহত্ত্ব মহানুভবতা ও মর্যাদার কথা মুসলমান নাবিক বা তবলীগ জামাতের (ধর্ম প্রচারক দল) নিকট জ্ঞাত হয়ে, সাধারণ মুসলমানের মত তিনি তাঁদের হাতে দীক্ষা না নিয়ে মূল কেন্দ্রে গিয়ে মুখ্য আলোক উৎসে পৌঁছিলেন। অর্থাৎ সাধারণ নাগরিকরা অনেকেই মুসলমান হয়েছিলেন অনেক পূর্বে।

একজন প্রাচীন ঐতিহাসিক ভারতীয়দের মুসলমান হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন—"তাহার মধ্যে প্রধান হইতে বৌদ্ধ ও জৈনদের মতবাদ, তাহাদের ওপর হিন্দু পণ্ডিতগণের নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং পক্ষান্তরে কয়েকজন মুসলমান সাধু পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ ও তাহাদের মুখে হযরতের ও ইসলামের ধর্মের পরিচয় লাভ।"

'সাধু পুরুষদের সাক্ষাৎ লাভ' কথাটি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। মুসলমান 'ফকির' ও আওলিয়াগণের চরিত্র তাঁদের আধ্যাত্মিক অলৌকিক প্রভাবেও অনেকে মুসলমান হয়েছিলেন। সে সম্পর্কে পূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করতে হলে গ্রন্থ আরও বেড়ে যাওয়ার ভয়ে এখানেই সংযত হতে হচ্ছে।

মাদ্রাজের মালাবারের অধিবাসীদের 'মোপলা' বলা হয়। তাঁদের প্রধান কাছ ছিল তাবলিগী বা ধর্ম প্রচার। মোপলাদের সম্বন্ধে বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয়ের লেখা হতে কিঞ্চিৎ তুলে ধরা হচ্ছে "ইহারা অধ্যবসায়শীল, কর্মক্ষম এবং বর্ধিষ্ণু... ইহাদের অবয়ব সুগঠিত ও বলিষ্ঠ... ইহারা দেখতে সুশ্রী... ইহাদের ন্যায় পরিশ্রমী দ্বিতীয় জাতি ভারতবর্ষে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না... সাহসিকতায় ইহারা চির প্রসিদ্ধ... আরবীয় ধর্ম মতে দীক্ষাদানই ইহাদের প্রধান কর্ম। ইহারা শ্মশ্রু (গোঁফ দাড়ি) ধারণ করে, কেশকর্তন করে। সকলেই মস্তকে টুপি দেয়... ইহারা স্বভাবত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।" (বিশ্বকোষ ১৪ : ৬১৭ পৃঃ দ্রঃ)

>Goto List

তাহলে আমরা বেশ বুঝতে পারছি ভারতে মুসলমান অভিযাত্রীদের আক্রমণের সময়, পদ্ধতি, কারণ ও রহস্য যেন হজম করে একটা গোলকধাঁধা সৃষ্টি হয়েছে। তবে এর পশ্চাতে কি কোন পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল না? অবশ্যই ছিল। যার ইঙ্গিত পূর্বেই করা হয়েছে এবং পরে আলোচনায় আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে বোধকরি।

মালবারেরই প্রাচীন নাম চেরর বা কেরল। ওখানে সেই যুগেই দশটি মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল যথাক্রমে কোবঙ্গ নূরে, কুইলনে, হিলি ধারায়া পর্বতে, পাকদূরে, মঙ্গলর নগরে, দরফতন নগরে, শালিয়াত নগরে, কুণ্ড পুরমে, যান্দারিনায়, কজর কোট প্রভৃতি স্থানে। বিশ্বকোষ প্রণেতা বলেন, "মসজিদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এতদ্দেশে মুসলমান প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নেই। (দ্রঃ ১৪ : ৬১৮ পৃঃ)

হযরত মুহাম্মদের (সা.) পরলোক গমনের মাত্র কয়েক বছর পর হতেই আবরদের ভারত যাতায়াত শুরু হয়। অবশ্য প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। মহারাজা মনীন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রী অনিলচন্দ্র লিখিত ইতিহাসে পাওয়া যায়–"ভারত বর্ষে মুসলমান আক্রমণ বহুদিন পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। মুহাম্মদের মৃত্যুর আশি বছর যাইতে না যাইতেই আরবরা ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সিন্ধুদেশ অধিকার করে।... সিন্ধু দেশ আরবদের অধিকারে আসার ৩০০ বছর পরে গজনীর সুলতান মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং পাঞ্জাব অধিকার করেন। তখনও সিন্ধুদেশ আরবদের অধীন ছিল, কিন্তু উত্তরভারতে অন্যান্য প্রদেশ সমগ্র দক্ষিণ ভারতে হিন্দু রাজা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন।" (ভারত ও পৃথিবী, ৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

সিন্ধু বিজয়ের আলোচনা করলেই মনে আসে হিন্দু রাজা শ্রী দাহির আর মুসলমান সুলতান মুহাম্মদ বিন কাসিমের কথা। কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিমের অনেক পূর্বেই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ে হিজরি সনের ১৫ সালেই সিন্ধু অঞ্চল অভিযানের প্রয়োজন হয়েছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিমের পূর্বে সিন্ধু অঞ্চলে অনেক আরবীয় তবলীগ জামাত বা অভিযাত্রী দল আগমন করেছিলেন। বিখ্যাত ইতিহাস 'ফাতহুল বুলদান'-এর মূল্যবান তথ্যে জানা যায় যে, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.)-এর সময়ে ওসমান নামের এক বিজ্ঞ বীরকে 'বাহরায়েন' ও 'আম্মানের' গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। ওসমান নিজের ভাইকে 'বাহারায়েন নিজের পদে বহাল রেখে আম্মান হইতে একটি সৈন্যবাহিনী ভারত সীমান্তে পাঠান। ওখান হইতে অভিযান সমাপ্তির পর তাঁহার ভাই মুগীরাকে দেবল বা করাচিতে পাঠান। মুগীরা সাফল্য লাভ করেন যদিও করাচি অঞ্চলে তাঁকে বিপুল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

এইবার তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রা.) (যিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জামাতা) আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে ইরাকের শাসনকর্তা করে পাঠান এবং তদানীন্তন ভারতের পূর্ণ সংবাদ সংগ্রহের আদেশ দেন। হাকেম নামক জনৈক ব্যক্তিকে ভারতের সংবাদ প্রেরকের দায়িত্বপ্রাপ্ত পদে নিয়োগ করা হয়। তিনি যে রিপোর্ট দেন তার ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, ভারতে আরব সৈন্য না যাওয়া উত্তম কারণ সেখানে তখন খাদ্য ও পানীয়ের অভাব ছিল। তাই হিজরি সনের ৩৮ সাল পর্যন্ত ভারতে অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এরপর চতুর্থ খলীফা হযরত আলীর (রা.) অনুমতিতে হারিস সিন্ধু সীমান্তে অভিযান করেন। ভারতে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের বিরুদ্ধে ভারতের নেতাগণ প্রবল বাধা দান করেন কিন্তু সেই বাধা দুর্দমনীয় আরব সেনাদের কাছে টেকেনি। তুমুল যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষের হতাহতও হয়েছিল অনেক। অবশেষে মুসলমানদেরই জয় হল। বহু মাল সম্পদ আরবদের হস্তগত হয় এবং বহু ভারতীয় সৈন্য আরব সেনাদের হাতে বন্দি হয়। বন্দিদের হত্যা না করে তাদের খাওয়া পরার এবং আরও অন্য দায়িত্বসহ এক হাজার বন্দিকে আরব সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। অপর দিকে 'কায়য়ান' নামক স্থানে মুসলমান বাহিনী যখন আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়, সেই সময়ে যুদ্ধের কোনও সম্ভাবনা নেই দেখে মুসলমান সৈন্যরা গর্ব ভরে কাল ক্ষয় করছিল। তাই আক্রমণ ও আঘাতের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করার মত কোন প্রস্তুতিই আরবদের ছিল না। তাই পরাজিত হতে হয়েছিল ভীষণভাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যুদ্ধ শেষে মুসলমান বন্দিদের নিষ্ঠুরভাবে নিহত হতে হয়েছিল।

তারপর ৪৪ হিজরি সনে আমীর মোয়াবিয়ার (রা.) শাসনকালে মোহাল্লাব ভারত সীমান্তে অভিযান করেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয় কিন্তু তাঁর অগ্রসর-অনগ্রসরের সঠিক সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া যায়নি বলে এখানে আন্দাজ-অনুমানে গ্রন্থকে কলঙ্কিত করা অপ্রয়োজন মনে করি।

যাহোক, মোহাল্লাবের মৃত্যুর পর মোয়াবিয়া (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে সওয়ারকে ভারতের দিকে পাঠালেন। তিনি কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করে বেশকিছু মালপত্র উপঢৌকন নিয়ে আমীরের নিকট ফিরে গেলেন। পরে ডাকাতকর্তৃক তিনি শহীদ হয়েছিলেন।

তারপর রাশেদ একবার ভারতের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। অবশেষে 'ময়দ দেবল' নামক স্থানের যুদ্ধে তিনি নিহত হন, কিন্তু তাঁর স্থানে সেনান এসে পুনরায় ঐ অঞ্চলে যুদ্ধের ডাক দেন। যুদ্ধে জয়ী হয়ে তিনি ওখানেই দুই বছরকাল অবস্থান করেন।

তারপর জিয়াদের পুত্র আব্বাসও ভারত আক্রমণ করে বীরত্বের পরিচয় দেন। এরপর মুনজীর ইবনে জরুদ আব্দদীও ভারত সীমান্তে যুদ্ধ পরিচালনা

করেন এবং বিজয় মাল্যে ভূষিত হন। বিজয়ী ও বীরত্ব এই জন্যই বলছি যে, তখনও এক রাজ্য হতে অপর রাজ্য আক্রমণ করা বীরত্ব বলেই বিবেচিত হতো। শুধু তাই নয়; বরং কোন রাজা কোন রাজাকে আক্রমণ না করলে অথবা কারোর আক্রমণ প্রতিহত করতে না পারলে তাঁকে কাপুরুষতার কলঙ্ক বইতেই হতো। তাই সেকালের নীতির ওপর এই যুগের নীতিকে কেন্দ্র করে মন্তব্য করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক বালাজুরীর বর্ণনায় জানা যায় যে, ইউসুফ ছকফীর পুত্র হাজ্জাজ এরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। হাজ্জাজ সিন্ধু অভিযানের জন্য হারুনের পুত্র মুহাম্মদ, উবাদুল্লাহ ও বোদাযালাক পরপর সিন্ধু অভিযাত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। প্রত্যেকেই বিক্ষিপ্তভাবে ও অপূর্ণভাবে বিজয়ী হলেও সমগ্র বা ব্যাপক বিজয়ের দিকে তাঁরা মনোনিবেশ করেননি।

আরবের উমাইয়া বংশের খলীফা আল-ওয়ালিদের সিংহাসনে উপবেশন করার পরেই তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি মুসার বীরত্ব ও সাধনার ফলস্বরূপ উপাস্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করে আফ্রিকা মহাদেশের দিকে ধাবিত হলেন। রাতে সাধনায় সঞ্চিত শক্তি নিয়ে দিনেরবেলায় বীরবিক্রমে আক্রমণের ফলে সমগ্র আফ্রিকা দখল করে নিলেন, অর্থাৎ ইসলামের মানবতা, উদারতা ও শক্তি সাহসের সাথে আফ্রিকাবাসী পরিচিত হয়ে ধন্য হলো।

এইবার বীর মুসা হঠাৎ দিনেরবেলায় 'সালাতুল হাজাত' নামে একপ্রকার নামায সাধনা সম্পন্ন করে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে কেঁদে বললেন, 'ওগো প্রতিপালক! ওগো পরিচালক! তুমি আমার ওপর যেমন অনুগ্রহ করেছ তার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। তুমি আমার সঙ্গীদেরও সাহসী ও বলশালী কর। এবং তাঁদের দ্বারা ইসলামকে সারা বিশ্বে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা কর।" তারপর তাঁর সৈন্যদের মধ্যে সেরা সৈনিক 'তারিক'কে আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করলেন এবং স্পেনের দিকে পাঠালেন। জাদু খেলার মত স্পেন দেশ তারিকের অধীনে এসে গেল। শত্রু-মিত্র সকলেরই মুখে একই কথা– 'মুহাম্মদ (সা.)-এর দাবি সত্যই সঠিক'।

তারপরেই 'কুতাইবা' রাতের অন্ধকারে আরাধনান্তে আর দিনে 'সিয়াম' সাধনা অর্থাৎ উপাস্যের উদ্দেশ্যে উপবাসব্রত অবস্থায় অভিযান শুরু করলেন প্রাচ্য ভূমির উপর। কুতাইবা দিনের বেলায় উপবাস থেকেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন কিন্তু সৈন্যদের বলতেন, "আল্লাহর নামের কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর আর খুব খাও ও পান কর। ইসলাম ধর্মে যদিও বেশি খাওয়া, বেশি শোওয়া, বেশি কথা বলা ভাল নয়, কিন্তু প্রিয়নবীর আইনের অনুকূলেই আমি তোমাদের বেশি বেশি করে খেতে বলছি। কারণ যোদ্ধাদের জন্য ঐ আইনটি ছাড় আছে।"

যাহোক, অল্প কিছু দিনের মধ্যে বিশাল মহাদেশের মধ্য পর্যন্ত এসে ইসলামের আলো জ্বলে উঠল। নতুন সভ্যতা, শিক্ষা ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হল এশিয়া মহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সেই বিখ্যাত কুতাইবার কত কামনা ও গবেষণার শেষে–

ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন–"The earliest Muslim invaders of Hindustan were not the Turks but the Arabs, who issued out from their desert homes after the death of the great Prophet to spread their doctrine through out the world, which was, accordinngto Them "The key of heaven and hell" Whenever they went, there intrepidity and vigour roused to the highest pitch by their proud feeling of a common nationality and their zeal for the faith enabled the Arabs to make themselves msters of syria, palestine, Egypt, persia within the short space of twenty years. The conquest of persia made them think of their cxpansion eastword and when they learnt of the fabulous wealth and idolatry of India from the merchants who Sailed from Shraz and Hurmuz and landed on the Indian coast, They discounted the difficulties and obstacles which nature placed in their way, and determined to lead and expedition to India which at once received the sanction of religious enthusiasm and political ambition. The first recorded expedition was sent From Uman to pillage the cost of India in the year 636-37 A. D. during the Khilafat of Umar.

অর্থাৎ-হিন্দুস্তানের প্রথম মুসলমান বিজয়ীগণ তুর্কী ছিলেন না; বরং তাঁরা ছিলেন আরব জাতি। মহান নবীর পরলোক গমনের ঠিক পরেই এই আরব জাতি ইসলামের মতবাদের প্রচার ও প্রসারকল্পে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েন। তবলীগ বা ধর্ম প্রচারের মধ্যেই আছে পরকালের ভালমন্দ, এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। এই আরবগণ যেখানেই গেছেন বিক্রমপূর্ণ দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিয়েছেন সেখানে এবং জাতীয়তাবাদের গৌরবোজ্জ্বল প্রেরণাকে কেন্দ্র করে এইভাবে সত্যের অনুসন্ধানপ্রাপ্ত আরবগণ মাত্র বিশ বছরের মধ্যে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিসর ও ইরানের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। পারস্য বা ইরান বিজয়ের পর আরবগণ তাঁদের এই বিজয়কে পূর্ব দিকে আরও সম্প্রসারিত করতে প্রয়াস পান। সিরাজ ও হরমুজের ব্যবসাদারগণ তখন ব্যবসায়ী কার্যোপলক্ষে ভারতের উপকূলবর্তী

অঞ্চলে গমনাগমন করতেন। আরবগণ তাঁদের মুখ হতেই ভারতের ধর্মনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংবাদ পেয়েই ভারত অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং প্রথমে ৬৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে উমারের (রা.) খেলাফতকালে 'ওমান' হতে ভারতে প্রথম অভিযান হয়েছিল।

আরবী ৪০ হিজরিতে মুসলিম ধর্ম প্রচারকগণ (তবলীগ জামাত) ভারতবর্ষ পৌঁছেন। তাছাড়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে বনি উমাইয়াদের আমলে খলীফা ওলিদের সময় ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয় হয় এবং সেটা খোরাসান প্রদেশের অংশরূপে একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় পরিণত হয়।

যাঁরা ভারতে এসেছিলেন তাঁরা বেশির ভাগ 'তাবেয়ীন' বা 'তাবেতাবেয়ীন'। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিষ্য বা প্রশিষ্যের সঙ্গ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। হযরতের বাণী শুধু প্রচারে নয় তার প্রসারে এবং নিজেদের ভারতের অধিবাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁরা এখানে স্থায়ী বসবাস করেছিলেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী খুব ভালভাবেই কেটেছিল, তৃতীয় শতাব্দীতে মুসলমান নামধারী 'বাতেনী' দলের প্রভাবে মুসলিম জাতি মুসলিম জগতের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

পঞ্চম শতাব্দীতে সুলতান মাহমুদ গজনবী খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধু দখল করেন। ফলে ভারতের সঙ্গে পুনর্বার মুসলিম জাতির যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

তারপর সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের প্রায় সকল অংশই মুসলমানদের দখলে আসে। তাঁরাই সর্বপ্রথম দিল্লিকে ভারতের রাজধানী নির্বাচিত করেন। এই সময় এশিয়ার অন্তর্গত খোরাসান, তুরস্ক প্রভৃতি স্থান হতে বহু সৈনিক ব্যবসায়ী, আলেম ও বুযুর্গ স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। আলেমদের সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ বাদশাহদের রাজনীতি, সৈন্যদের বিক্রম, পীর বুযুর্গদের ইবাদত, সাধনা, চরিত্রবল ও আদর্শ স্থাপনা সব একত্রিত হয়ে ইসলাম ধর্ম সারা ভারত তথা এশিয়া তথা বিশ্বে ক্ষিপ্রগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। দেহের এক অঙ্গের সাথে অন্য অঙ্গের যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক, ঠিক তেমনি উপরোক্ত আগতদের বেলাতেও অনুরূপ এক নিগূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

সত্যের অপ-প্রচার

আমরা শুধুমাত্র সমালোচক পুস্তক প্রণয়নেই এই গ্রন্থ সংকলনে অগ্রসর হয়নি, বরং চাপাপড়া সব ইতিহাসকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। তবুও সত্য রক্ষার খাতিরে কিছু কিছু সমালোচনা না করলে ছাত্র-ছাত্রীদের সমালোচনা যোগ্য শক্তি সৃষ্টিতে উৎসাহ আসবে না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই প্রয়াস।

শ্রী বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "খলীফাধীন পারস্য সাম্রাজ্যের শাসক হাজ্জাজ মনেপ্রাণে সাম্রাজ্যলোভী ছিলেন এবং কাশগড়ে চীনাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। অতঃপর কাবুল ও সিন্ধুদেশ অভিযান আরম্ভ হয়।

সিংহলের রাজা কিছু মূল্যবান উপঢৌকন নাকি খলীফা ও হাজ্জাজের সন্তুষ্টির জন্য পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তাহা পথে সিন্ধুর দেবল অঞ্চলের জলদস্যুরা লুট করেছিল, অতএব দেবলের দস্যুদের শায়েস্তা করা দরকার এই ছিল হাজ্জাজের সিন্ধু অভিযানের অযুহাত।" (দ্রষ্টব্য ভারত জনের ইতিহাস)

বলাবাহুল্য, শ্রী ঘোষের লেখায় আর শ্রী বজায় থাকছে না; বরং বিশ্রী বস্তুর দুর্গন্ধে নিরপেক্ষ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সাম্প্রদায়িকতার নিদর্শনরূপে গণ্য হবে না, একথা শপথ করে সকলে বলবে বলে মনে হয় না। অবশ্য অনেকের মতে, শ্রী ঘোষকে আসলে দোষ দেয়া যায় না। কারণ স্বামী স্ত্রীর যুগ্ম প্রতিভাতে যে ইতিহাস তাঁরা লিখেছেন তা ইংরেজি ইতিহাস আর আমাদের দেশের হাটে পাওয়া সহজ ইতিহাসকেই অবলম্বন করে। কিন্তু আগেই বলেছি প্রকৃত ঐতিহাসিক হতে হলে আরবী, ফারসী প্রভৃতি বিদেশী ভাষা না জানলে মূল ইতিহাস বোঝা বা বুঝে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। হয়তো শ্রী এবং শ্রীমতী ঘোষের পক্ষে ওকালতি করে কেউ বলতে পারেন-তাঁরা যে আরবী-ফারসি জানতেন না তারই বা প্রমাণ কী? প্রমাণ তাঁদের লেখা ঐ ইতিহাসের ২৭৯ পৃষ্ঠায় মওজুদ আছে। তাঁরা 'মুহাম্মদ বিন কাসেম'-এর নামের পরিবর্তে বারবার ব্যবহার করেছেন শুধু 'কাসিম'। আমার সরল চিত্ত কোন পাঠক হয়তো বলবেন যে, এতবড় নামের পরিবর্তে শুধু মাত্র 'কাসিম' ব্যবহার করে একটু সংক্ষেপ করা হয়েছে তাতে ক্ষতি কী? ক্ষতি হচ্ছে এই যে, অযোধ্যার ইতিহাস লিখতে গিয়ে রামচন্দ্রের স্থানে দশরথচন্দ্র লিখলে যা হয় তাই। শ্রী ঘোষকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেশের ছাত্র সমাজ যদি প্রশ্ন করেন-সিন্ধু বিজয়ে ভারতে প্রথমে কোন মুসলমান এসেছিলেন? উত্তরে প্রথম ভুল হয়তো হবে এই যে, যাঁরা আগেই ইতিহাসের পাতায় সিন্ধু অভিযানের জন্য অমর হয়ে আছেন তাঁদের নামোল্লেখ না করেই বলবেন—'কাসিম'। কিন্তু প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা নির্বিশেষে প্রত্যেক ইতিহাস অনুরাগীকেই জেনে রাখা ভালো যে, সিন্ধু বিজয়ী মুসলমান ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরের প্রতিদ্বন্দ্বীর বাবার নাম 'কাসিম'। তাঁর নিজের নাম 'মুহাম্মদ'। মুহাম্ম বিন কাসিমের অর্থ হল—মুহাম্মদ কাসিমের পুত্র। অর্থাৎ কাসিমের পুত্র মুহাম্মদ। এখন যদি নামের সংক্ষেপ করতে হয় তাহলে 'মুহাম্মদ লেখা উচিত ছিল। 'বিন' বা 'ইবন' মানে ছেলে। আরবদের নিয়ম যোগ্য পিতার নামে নিজের নাম যুক্ত করা।

বিখ্যাত ইতিহাস 'আববোঁ কী জাহারাণী', "ফাতহুল বুলদান" প্রভৃতি আরও বহু আরবী, ফারসি ও উর্দু এবং ইংরেজি ও বাংলা ইতিহাস সামনে রেখে আসল তথ্য আমরা তুলে ধরছি নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসুদের জন্য। হাজ্জাজের সিন্ধু অভিযানের অনেক কারণ ছিল।

প্রথমত, হাজ্জাজ ইরান বা পারস্যের যুদ্ধে প্রাণপণে যখন সৈন্যদের নিয়ে লড়ছিলেন তখন ভারত হতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে সাহায্য করা হয় ফলে মুসলমানদের মনে একটা গভীর চাপা দুঃখ বা জ্বালা এবং প্রতিশোধপ্রবণতা জাগ্রত ছিল। আজ বিংশ শতাব্দীতেও কোন যুদ্ধের সময় অপর রাষ্ট্র শত্রুকে সাহায্য করলে সেই রাষ্ট্রের সাথে সঙ্গে সঙ্গেই কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করা হয়।

দ্বিতীয়ত, হাজ্জাজের শাসনকালে পারস্য হতে একটি বিদ্রোহী দল ভারতে আসে এবং তদানীন্তন ব্রাহ্মণ রাজা দাহির তাঁদের সাহায্য ও আশ্রয় দিয়েছিলেন। অবশ্য পেছনে রাজনৈতিক কারণও ছিল।

তৃতীয়ত, আরবের কিছু সাধক পুরুষ ও মহিলা এবং অনেক সাধারণ নরনারী সমেত কয়েকটি আরবীয় জাহাজ সিন্ধু অঞ্চলে লুট হয়ে যায় এবং পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সকলকে পাইকারিভাবে হত্যা করা হয়। তখন হাজ্জাজ সিন্ধুরাজ দাহিরের নিকট দস্যুদের শাস্তি দিতে এবং ক্ষতিপূরণ করার জন্য দাবি করলেন। দাহির জানিয়ে দিলেন, ক্ষতিপূরণ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় আর দস্যুদের শায়েস্তা করার দায়িত্বও তিনি নিতে বাধ্য নন।

এইবার ক্রোধের বশবর্তী হয়ে হাজ্জাজ একদল সৈন্যসহ একজন বিচক্ষণ সেনাপতিকে পাঠালেন সিন্ধু অঞ্চলে। এ যুদ্ধ আরব সভ্যতা, শিক্ষা ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী প্রচারের জন্য করা হয়েছিল বলা যাবে না, বরং ক্রোধের ওপর নির্ভর করেই ছিল এই অভিযান। যুদ্ধ হল সিন্ধুবাসীদের সাথে মুসলমানদের। প্রাথমিক অবস্থায় সিন্ধীরা পরাজয়ের দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ তাদের ধর্মের বিধানদাতাদের পরামর্শে দেবমূর্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে যাওয়া হলে যুদ্ধে কিন্তু মুসলমানদের ভাগ্যে দারুণ পরাজয় নেমে এল। যুদ্ধ শেষে বিরাট সৈন্যবাহিনীর এমনকি সেনাপতিকে পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানকে ঠাকুরের সম্মুখে নির্মমভাবে টুকরো টুকরো করে হত্যা করা হয়েছিল। জীবন্ত বন্দি জীবনযাপন করার সৌভাগ্য কোন মুসলমান সেনার হয়ে ওঠেনি।

শ্রী বিনয় ঘোষও তাঁর ইতিহাসের ২৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “কিন্তু এই অভিযান ব্যর্থ হয়। দেবলের তথাকথিত দস্যুদের শায়েস্তা করা সম্ভব হয় না। সিন্ধীদের প্রবল প্রতিরোধে আরব সেনাপতি পর্যন্ত নিহত হন।”

অতঃপর হাজ্জাজ তাঁর আর এক অল্প বয়স্ক সুদর্শন বীরকে সেনাপতি নির্বাচিত করে পুনরায় সিন্ধু অভিমুখে মুসলমান বাহিনী পাঠালেন। ইনিই ইতিহাসে মুহাম্মদ বিন কাসিম নামে পরিচিত। ঐ তরুণ সেনাপতি হাজ্জাজের আপনজন, পিতৃব্য পুত্র। শুধু তাই নয়, আরও গভীর সম্পর্কে ঐ যুবক তাঁরই জামাতা।

'সালাতুল হাজাত' (প্রয়োজনের নামায) নামক উপাসনা অন্তে উলামা ও আওলিয়াদের পরামর্শ ও শুভাশিস নিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিম এবার ধর্মনৈতিক কারণেই অভিযান চালালেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম জলপথে এবং স্থলপথে উভয় দিক হতে সেই সময়ের বিখ্যাত কেন্দ্র দেবল মন্দির আক্রমণ করলেন। সিন্ধীরা ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরের আদেশে প্রবল বাধা দেয়ার জন্য বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আবার পূর্ব সমরের ন্যায় জনসাধারণ ঠাকুরদের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। কিন্তু এবার নিমেষে দাহিরের সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ফেললেন। মুসলমান সৈন্যরা 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহই মহানতম) বলে চিৎকার করতে লাগলেন। যুদ্ধ পুরোদমে চলতে লাগল। রাজা দাহির হাতির উপর উপবিষ্ট হয়ে যুদ্ধ করছিলেন, এমন সময় বিপক্ষ বাহিনীর একটা তীর রাজার হাতির পিঠে হাওদায় পড়ে হু হু করে আগুন জ্বলে উঠে। হাতি প্রাণের ভয় ও আতঙ্কে জলাশয়ে নেমে পড়ে। দাহির মাটিতে দাঁড়িয়েই যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যদল আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। একটা কথা রটে গেল, মুসলমানরা অগ্নিতীর ব্যবহার করে, যা লেলীহান শিখা নিয়ে জ্বলে উঠে। শ্রী বিনয় ঘোষও তাঁর ইতিহাসে এ বিষয়ে একটু আলোকপাত করেছেন। যেমন তিনি লিখেছেন, "দাহিরের হাতির হাওদায় আরবদের একটি অগ্নিতীর বিঁধিয়া আগুন জ্বালিয়া উঠে, হাতি দৌড়াইয়া জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে।" (ভাঃ জঃ ইঃ)

অনেকের মত, অলৌকিক ঘটনা বা দৈব ঘটনা ওটা যাই হোক দাহির যুদ্ধে বাধা দিতে গিয়ে নিহত হলেন। দাহিরের স্ত্রী সৈন্যদের সাহস যোগাতে এবং পুনঃ একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু রানীর কথায় কোন কাজ হয়নি। অবশেষে রানী ও তাঁর সঙ্গিনীগণ বিপদগ্রস্ত হওয়ার পূর্বেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

৭১২ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে ব্রাহ্মণ রাজা দাহির সাহসের সাথে যুদ্ধ করেও নিহত হলেন। তারপর এক বছরের মধ্যেই দাহিরের গোটা সাম্রাজ্য মুহাম্মদ বিন কাসিমের দ্বারা মুসলমানদের অধিকারে আসে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৬৩২ সালে পরলোকগমন করেন আর কাসিমের পুত্র মুহাম্মদ ৭১২ খ্রিস্টাব্দে এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে ইসলামের বিজয় কেতন ভারত ভূমিতে উড্ডীন করেন। তাঁরা ইচ্ছা করলে হয়তো ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল করতলগত করতে পারতেন। কিন্তু অনেকের কাছে এ যুদ্ধ খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও আরবদের কাছে সেটা সাধারণ একটা যুদ্ধ ছিল মাত্র। কারণ পৃথিবীর প্রত্যেক দিকেই তাঁদের অভিযান আরও নাটকীয় ও আশ্চর্যজনক ঘটনা, যা মারাত্মক প্রতিকূল অবস্থাতেও নিশ্চিত পরাজয় হতে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তা জয়ে পরিণত হয়েছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় সংকীর্ণতা তথা পক্ষপাতিত্ব ও অবিচারের ফলে ভারতের 'জাঠ' সম্প্রদায় এবং 'মেড' সম্প্রদায় রাজার ওপর অসন্তুষ্টই ছিল; তদুপরি তথাকথিত নীচ জাতি বা শোষিত অবহেলিত, অনুন্নত সম্প্রদায় এমনকি হিন্দু ছাড়া ভারতীয় প্রায় প্রত্যেক সম্প্রদায় রাজাদের ওপর ভাল ধারণাপোষণ করত না। যুদ্ধের সময় তাদের সহযোগিতা স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায়নি। তবে 'জাঠ' ও 'মেড' সম্প্রদায় অত্যন্ত সাহসী ও বলিষ্ঠ জাতি। তারা মুসলমানদের পক্ষ প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করে দাহিরের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। দাহিরের শোচনীয় পরাজয়ের এটি একটি কারণ।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের মন্দির আক্রমণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন যে, মুহাম্মাদ বিন কাসিম মন্দির আক্রমণ করতে গেলেন কেন? কারণ মুহাম্মদ বিন কাসিমের পূর্বে ভারত অভিযানকারী পরাজিত মুসলমানগণ নির্মূল হয়েছিলেন। তাতে জনসাধারণের তো ধারণা হয়েছিল যে, দেবল মন্দিরের ঠাকুরের দ্বারাই এই জয় সম্ভব হয়েছে। তার ওপর নতুন মুসলমান যাঁরা হয়েছিলেন তাঁদেরও ধর্ম বিশ্বাস শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তাই মানবজাতিকে সৃষ্টির কাছে মাথানত না করে বা ঠাকুর-দেবতার কাছে যথাসর্বস্ব বিলিয়ে না দিয়ে স্রষ্টার কাছে মাথানত হবার প্রেরণা যোগানোর জন্যই এ মন্দিরের সম্মুখে যুদ্ধ আয়োজনের প্রয়োজন হয়েছিল।

ব্রাহ্মণদের দেবতা ঠাকুরের ওপর আনুগত্য স্বাভাবিকভাবেই ছিল। তার ওপর গত যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই ঐ মন্দিরের ঠাকুর দেবতার ওপর আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। তাই রাজার মূল্যবান ধনাগার স্থানান্তরিত করা হয়েছিল ঐ মন্দিরে। ফলে যুদ্ধ শেষে বহু মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী মুসলমানদের হাতে অতি সহজেই এসে গিয়েছিল।

মুসলমান ধর্মে বহু হিন্দু আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন দেবতার পূজা নিষ্ফল মনে করার কারণে। অতএব মুহাম্মদ বিন কাসিম যদি ঐ মন্দিরের প্রাঙ্গণে তথা পক্ষান্তরে দেব শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বিজয়ী না হতেন তাহলে এইসব নব মুসলিমদের ধর্মান্তরিত হওয়া ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হতো।

আগেই বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ রাজা দাহিরের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ও অন্য মহিলারা মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনাও সত্য। তাই বলে বিকৃত ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের চারিত্রিক দুর্বলতার কারণ বলে বর্ণনা করা নিঃসন্দেহে তা পক্ষাপাতিত্ব দোষে দুষ্টামি ও নষ্টামি। আসল কারণ হচ্ছে; হিন্দুধর্মের বিধান মতে, সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলাদের আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করাটা খুবই মহৎ কাজ বলে বিবেচিত হতো। যেমন সতীদাহ প্রথার প্রাবল্যে স্বামীর মৃত্যুর পর জলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেওয়া। এক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান, শ্বশুর, দেবর ও ভাসুরদের চারিত্রিক দুর্বলতার

কারণে তাদের পুড়ে মরতে হতো না। আসলে দুর্বলা নারীদের চারিত্রিক দুর্বলতা ও দুশ্চিন্তার ওপর ধর্মীয় সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে স্বর্গের কথা মনে করেই নিজেদের আত্মহত্যা করা ছিল বীরাঙ্গনার পরিচয়। আর তাই দেখে দুর্বল মুহূর্তে মৃত্যুবরণের হিড়িক পড়ে যেত। অবশ্য এ প্রথা যে একটা অসভ্যতা, বর্বরতা ও কাপুরুষতা ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যাহোক, মুহাম্মদ বিন কাসিম যুদ্ধান্তে কিছুদিন নিজের মুখ্য পদগুলোতে নিজেদের নিয়োজিত লোককে বহাল করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর দাহিরের সময়ে যে হিন্দু কর্মচারী যে পদ নিয়ে থাকত তাকে সেই পদে পুনর্বহাল করে চরম উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, "ব্রাহ্মণদের ওপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল।"

খুব মনে রাখার কথা হচ্ছে এই যে, ঐ সময় ভারতে কুরআন শরীফ ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী বা হাদীস হিন্দুদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত, পঠিত ও সমাদৃত হয়। সেই সময় মুসলমান রাজার প্রবল আগ্রহে ভারতের পুরাতন পুঁথিপত্র এবং ধর্ম গ্রন্থাদি অনুবাদের দ্বারোদঘাটনও সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, হিন্দুধর্মের পুস্তকপত্র আরবেও নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের ধারণা ছিল, যে দেশে থাকতে হবে সেই দেশের পরিবেশ, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে না জানতে পারলে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। তাই অত্যন্ত অধ্যবসায়ী আরবরা ভারতীয় প্রাচীন ভাষা শিক্ষা লাভের জন্য বেনারসে এসেছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আমীর খসরু লিখিত ইতিহাসে আছে- আবু মুসা দশ বছর ধরে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র পড়ার জন্য পরিশ্রম করেছিলেন।

আরও আসুন, শ্রী ঘোষ তাঁর ইতিহাসের ২৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "দাহিরের দুই কন্যাকে বন্দি করিয়া কাসিম খলীফার হারেমের জন্য পাঠাইয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা খলীফার কাছে অভিযোগ করিলেন যে, কাসিম তাহাদের ইজ্জত নষ্ট করিয়া খলীফার কাছে পাঠাইয়াছেন। ইহাতে খলীফা ক্রুদ্ধ হয়ে হুকুম দেন যেন কাঁচা গোচর্মে আপাদমস্তক মুড়িয়া সেলাই করিয়া কাসিমকে তাঁহার কাছে অবিলম্বে পাঠানো হয়। খলীফার আদেশ আল্লাহর আদেশের মতো, কাজেই কাসিম নিজেই ঐভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এই কাহিনীর সবটুকু হয়তো ঐতিহাসিক সত্য নয়। কিন্তু কাসিমের জীবনের করুণ পরিণতির কথা অনেকেই স্বীকার করেন।"

শ্রী ঘোষ ভারতের সুশীল ছাত্রছাত্রীদের মাথায় একটা কিংবদন্তীর ছাপ কেমনভাবে এঁকে দেয়ার চেষ্টা করেছেন তা লক্ষ করার বিষয়। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, কাহিনীটির সবটুকু ঐতিহাসিক সত্য নয়, অথচ সন্দেহজনক ও সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিকর এই মারাত্মক কথা ইতিহাস বলে চালিয়ে যাওয়ার পেছনে লাভ কতটুকু তা দেখা দরকার।

এর উত্তরে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যায়, অনেক জাতির মধ্যে রাজা-রানীদের বিপদের সময় আত্মহত্যা করার ঘটনা আছে। কিন্তু একমাত্র মুসলমান রাজত্বে আত্মহত্যার ইতিহাস দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা তার পক্ষে পরকালে স্বর্গে যাওয়া সহজে সম্ভব নয়। তাই মুসলমান জাতি ঐ কাপুরুষতা হতে মুক্ত। অবশ্য ইদানীং ভারতে সাধারণ মুসলমান দু-একজন আত্মহত্যা করলেও প্রথমত, তারা ধর্মের তত ধার ধারে না। দ্বিতীয়ত, তারা প্রতিবেশীর প্রভাবেই প্রভাবিত। কিন্তু ঐ সময় মুহাম্মদ বিন কাসিমের পক্ষে আত্মহত্যা করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না।

এ ছাড়া আরও এক কারণে এরূপ ঘটনা মিথ্যা বলে বিবেচিত হচ্ছে। সেটা হচ্ছে এই যে, ইসলাম ধর্মের সংবিধানে আসামি বাদী ও সাক্ষী ছাড়া অপর কারোর মুখ হতে কিছু শুনে (সত্য মিথ্যা যা হোক) আসামির বক্তব্যকে ব্যক্ত করতে না দিয়ে দূর হতে আদেশ বা নির্দেশ পাঠিয়ে কোন কিছু নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ নীতিবহির্ভূত। অতএব যদি ঐ ঘটনা সত্যই হতো তাহলে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে জানানো হতো এবং তার কী অভিযোগ তা জানিয়ে সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বক্তব্য শোনার পর সুবিচার-অবিচার যাই হোক হতে পারত। কিন্তু তাঁকে জীবন্ত আসতেই দেওয়া হল না; বরং কাটা গোচর্মে মুড়িয়ে তাঁর মৃতদেহ আনানো হল—এটা সবই অবিশ্বাস্য ও ভ্রান্ত। আবার যদি শূকরের চামড়া মুড়িয়ে আনার নির্দেশ থাকত তবে খলীফার ক্রুদ্ধ হওয়ার প্রমাণ হতো। কিন্তু মিথ্যা ইতিহাসে অর্থাৎ ইংরেজ ও তাদের দালাল দ্বারা লিখিত ইতিহাসে গরুর চামড়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ গরুর চামড়া মুসলমানদের নিকট অপবিত্র নয়, যেমন অপবিত্র নয় খাসি বা হরিণের চামড়া ঠিক তেমনিই।

>Goto List

আসল কথা মুহাম্মদ বিন কাসিম স্বাভাবিকভাবে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর ন্যায় বিখ্যাত বীরের মৃতদেহ রাজকীয় মর্যাদার সাথে উপযুক্ত স্থানে কবর দেবার জন্যই ম্যমি করার মত চামড়া সদৃশ মূল্যবান সাদা মখমল কাপড়ে মুড়া অবস্থায় কাঠের বাক্সে করে পৌঁছেছিল।

শ্রী ঘোষ আরও লিখেছেন, "নারীর মর্যাদা কলঙ্কিত হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি (রানী) এবং দুর্গের ভিতরে অন্য মহিলারা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জীবন বিসর্জন দেন।" এখন আলোচনায় আসা যাক। যদি এটা সত্য হয় তাহলে দাহিরের সুন্দরী কন্যাদ্বয় মৃত্যুর পরে কী আবার বেঁচে উঠেছিল? নতুবা তাঁরা তো অগ্নিতে ঝাঁপ দেন নাই। তাহলে ইজ্জত নষ্ট হতে পারে, এই আশঙ্কাই যদি সত্য হয় তবে তাঁদের বোঝা উচিত ছিল আমাদের যেখানে পাঠানো হবে সেখানেও এই কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। অতএব বিধবা মা অপেক্ষা কুমারী কন্যাদের আগেই মৃত্যুবরণ করা উচিত ছিল। কিন্তু তা যখন হয়নি তখন নিঃসন্দেহে এহেন এক ঘৃণ্য ধারণার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়।

লেখক আরও লিখেছেন, "খলীফার আদেশ আল্লাহর আদেশের মতো"। এটি মুসলমানদের মনে গভীর দুঃখ দিতে বাধ্য। কারণ আল্লাহর মত কোন কাউকে মনে করা বা বিশ্বাস করাকেই ইসলাম 'শির্‌ক' অংশীদারত্ব বলে। আর এই "শির্‌ক" সমস্ত অপরাধের চেয়ে মারাত্মক আর তা মার্জনার অযোগ্য প্রায়। অতএব "খলীফার আদেশ আল্লাহর আদেশের মতো" এই উক্তির মধ্য দিয়ে বিশ্ব মুসলিমকে অমুসলিম সাব্যস্ত করার পশ্চাতে কোন মনোভাবের পরিচয় নিহিত আছে পাঠকবর্গই তা চিন্তা করবেন।

(শ্রী ঘোষ আরও জানিয়েছেন, "হিন্দুদের নিকট হইতে তাঁহারা রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা শিক্ষা করিলেন।")

যদি উপর্যুক্ত মত সত্য হত তবে ভারতবাসী অর্থাৎ আমরাই আরব জয় করতাম, জয় করতাম আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা সম্ভব হয়নি, বরং আমাদরে ভারতের সাথে আরবের তুলনা করলে দেখা যাবে আরব সভ্যতাই সারা বিশ্বে প্রভাব সৃষ্টি করেছে ও ধর্মমত প্রচার করেছে। কী ইতিহাসে, কী বিজ্ঞানে, কী ভূগোলে, কী গণিতে, কী সংস্কৃতে, কী দর্শনে, কী চিকিৎসা বিজ্ঞানে, কী মানচিত্র অঙ্কনে, কী জ্যোতির্বিজ্ঞানে, কী রাষ্ট্র বিজ্ঞানে, কী সমাজ বিজ্ঞানে মুসলমানরাই ছিল সারা বিশ্বের গুরু। আরব ভূমিই ছিল বিশ্বের জ্ঞান সাগরের উৎসকেন্দ্র। অতএব মুসলমানরা হিন্দুদের কাছে জ্ঞান শিক্ষা করেছে এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাছাড়া নিজের ধর্ম ও সমাজ মানুষ তখনই ত্যাগ করে যখন সে বোঝে আমাকে আমার চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যা পাওয়া দরকার তা এর দেবার ক্ষমতা নাই। আর নতুন ধর্ম যখন গ্রহণ করে তখন এই কথাই বোঝে, আমি যা পাই না তা পাব এই পন্থায়। কিন্তু হিন্দুধর্ম অপরকে নিজের

মধ্যে টেনে নিতে পারেনি বরং অপর ধর্মকে ভারত হতে তাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন বৌদ্ধধর্ম অথবা নিজেরা মুসলমান ও খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্ম ও সমাজে প্রবেশ করে তাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছে। অতএব বলা যায়, "তাহারা রাষ্ট্রশাসন শিক্ষা করিলেন" কথাটি কল্পনাপ্রসূত।

ইংরেজি ইতিহাসের সবকিছু বর্জন করার বস্তু তাও যেমন আমাদের মত নয়, তেমনি এ কথাও বিশ্বাস্য যে সুযোগ বুঝে ইংরেজি ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে মিথ্যা ইতিহাসের প্রচারের অপচেষ্টাও অনুচিত।

মুহাম্মাদ বিন কাসিমের বিজয় কীর্তি যখন পৃথিবীর বুকের ওপর সূর্যালোকের মত ছড়িয়ে গেল তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৭ বছর। এতবড় বৃহৎ বৈশিষ্ট্যময় বীরের বীরত্বকে ম্লান আর মিথ্যায় পরিণত করতে তাঁর মৃত্যু নিয়ে মিথ্যা কল্পনাকের গল্প আর কিংবদন্তীকে ইতিহাস বলে খাপ খাইয়ে দেশের উন্নতি নয় বরং অবনতির ইন্ধনের যোগান দেবার উৎকট প্রচেষ্টাকে আজকাল সুধী সমাজ বরদাশ্‌ত করতে পারেন না কোনক্রমেই। ইতিহাসকে যাঁরা তাঁদের উপন্যাস আর ছায়াছবি, নাট্যমঞ্চের ভেতর দিয়ে পাল্টাতে চান তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, ইতিহাস নিয়ে কলম ধরার অধিকার তাঁদের নেই। কারণ এই উল্টানো বা পরিবর্তন ইতিহাসের ক্ষেত্রে দুর্গন্ধময় গলিত কুষ্ঠ। দস্তুর মত ঐতিহাসিক দলিল নিয়ে প্রমাণ করা যায় যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যু হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে নয় বরং আকস্মিকভাবে।

অবশ্য তাঁর যখন মৃত্যু সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ আজও এক মত নন। কেউ কেউ মনে করেন মুহাম্মদ বিন কাসিম আততায়ী কর্তৃক নিহত হয়েছেন আবার কেউ খলীফার চক্রান্ত হত্যা বলে মনে করেন। মোটকথা অল্প বয়সে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয় তাতে কারো সন্দেহ নেই। সন্দেহ শুধু ঐ পদ্মা দেবী আর সূর্য দেবীর কেচ্ছা-কাহিনীতে। ঐ মিথ্যা ঘটনায় এও উল্লেখ আছে, মুহাম্মাদ বিন কাসিমের প্রাণদণ্ডের পর সুন্দরীদ্বয় খলীফার কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, "মুহাম্মদ সাধু চরিত্রের লোক, আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য আমরা তাঁর ওপর মিথ্যা অভিযোগ করেছি।" তখন খলীফা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে দুই বোনকেই হত্যার আদেশ দিলেন। ফলে তাঁদের উভয়কেই প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

শ্রী ঘোষ তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন, "দাহিরের দুই কন্যাকে বন্দি করিয়া কাসিম খলীফার হারেমের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।" অর্থাৎ আপনা আপনিই অক্ষরে অক্ষরে ফুটে উঠছে, খলীফা ব্যভিচারী বা নারীভোগী ছিলেন, তাই কুমারী নারী পেলেই সেনাপতিরা খলীফার ভোগের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ আজ চিন্তা করতে শিখেছে; তাই তারা বেশ বুঝতে পারছেন, নারীভোগী মুসলমান অবিবাহিতা রাজকুমারীর মত দুইজন সুন্দরী শিকার হাতে পেয়ে

তাদের মায়াকান্না আর অভিমানের বায়না মিটাতে গিয়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন– এটা যদি সত্য হয় তাহলে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর যখনই ঐ সুন্দরীদ্বয়ের স্বীকারোক্তিতে বুঝতে পারলেন যে, তারা মুহাম্মদ বিন কাসিমের ওপর মিথ্যা অভিযোগ করেছিল সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। লম্পট চরিত্রের স্বাভাবিক নিয়মে তা হয় না। লম্পট ব্যাভিচারীদের বিজাতি, কুমারী-অকুমারী ভেদাভেদ থাকে না। আর যেখানে ঐ রাজকন্যাদের রূপের মোহে পাগল হয়ে বাদীপক্ষের কোন মন্তব্য, কোন কৈফিয়ত না শুনেই খলীফা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে প্রাণদণ্ড দিতে পারলেন তখন ঐ রূপলাবণ্য, সৌন্দর্যে আভিজাত্যের অভিনব জীবন্ত প্রতীক সুন্দরীদের হত্যা করা লম্পট চরিত্রের পক্ষে অবশ্যই অস্বাভাবিক। সুতরাং খলীফার চরিত্রের ওপর অভিযোগ এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রতি নারী সরবরাহের অভিযোগ কল্পনার ইতিহাস মাত্র।

অতএব এই প্রকার ঐতিহাসিকতা অনেকের মতে ভারতের উন্নতির পরিপন্থী এবং অবনতি আর অঘটনের কারণ।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ইংরেজ বা তাঁদের পোষা বান্ধব বা দালাল দ্বারা লিখিত ঐতিহাসিক তথ্য যেমন পরিহার যোগ্য তেমনি এও মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক জাতি বা গোত্রের প্রত্যেক ঐতিহাসিক একই ছাঁচে ঢালা নন। তাছাড়া একজন দুষ্ট ঐতিহাসিকের সমস্ত তথ্য বা বাক্যই পঙ্কিল পরিকল্পনাপ্রসূত নয়। তবে ঐতিহাসিকতা পরিবেশনের সময় অবশ্যই মনে রাখা দরকার আমি যা লিখছি তা পড়ে দেশ জাতি তথা সারা ভারতের মানুষ উপকৃত হবে না অপকৃত হবে? যদি হিন্দু মুসলমান বা এক জাতি অপর জাতির মাঝখানে সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর খাড়া করা যায় তাহলে প্রাচীরের সংখ্যা যত বেশি হবে ভারত তত টুকরো টুকরো বা খণ্ডিত হবে। গতকালের বিরাট ভারত আজ ত্রিভাগে বিভক্ত। তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী সমাজের সেইসব লোক, যারা নেতা বলে পরিচিত হয়ে সরল, সবল, স্বচ্ছ ও সুন্দর নেতৃত্বের পরিবর্তে দেশকে দিয়েছেন নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, ছুতমার্গতা আর দালালীপূর্ণ নকল নেতৃত্ব। অনেকের মতে তাঁদের অপরাধ অমার্জনীয় আর অনেকের মতে, যা হবার হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটতে দিয়ে অশুদ্ধ ও বিষাক্ত ঐতিহাসকে বিশুদ্ধ ও উপযোগী করে সত্যের সঠিকতা বজায় রেখেই ভারতের উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে এমন তথ্য ছাত্রছাত্রী বা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা, যা এক জাতি অপর জাতিকে তথা এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে বন্ধু বলে মনে করতে পারে। যিনি বা যাঁরা এই অসাধ্য সাধন করতে পারবেন তাঁরাই হবে প্রকৃত ইতিহাস বিজ্ঞানী।

>Goto List

চতুর্থ অধ্যায়

সম্রাট আকবর ও ঔরঙ্গজেব সম্পর্কিত বিকৃত ইতিহাসের পর্যালোচনা

অনেক অখ্যাত বা কুখ্যাত ঐতিহাসিকরা ভারতে মহান দুই জাতি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদের বা বিবাদের দেওয়াল রচনার চেষ্টা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা জানতো, হিন্দুধর্মে বহু মত, বহু পথ, বহু দেবদেবী ও বহু কুসংস্কার আছে তাই তাদের ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান করে নেওয়া অত্যন্ত সহজসাধ্য। যেহেতু অনেককে তারা পূর্ণভাবে অথবা অর্ধভাবে খ্রিস্টান করতে সক্ষম হয়েছিল। এছাড়া তারা আরও লক্ষ করেছিল, সহস্র সহস্র নয়; বরং অজস্র হিন্দু-মুসলমান রাজার সময় স্বধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছে। কিন্তু মুসলমান দলে দলে খ্রিস্টান হয়েছে কিংবা হিন্দু কিংবা জৈন ও বৌদ্ধ হয়েছে এ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। অতএব মুসলমান জাতিকে খ্রিস্টান করতে হলে এমন এক জায়গায় ছুরিকাঘাত করতে হবে, যাতে গোটা শরীরটা অচল অবশ হয়ে মৃত্যুর দ্বারদেশে পৌঁছে যায়। সেটা হচ্ছে এই যে, মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা ধার্মিক, বিজ্ঞ পণ্ডিত, মাওলানা, হাফিজ প্রমুখ নেতৃস্থানীয় নরপতি তাঁদের চরিত্রে কলঙ্ক সৃষ্টি করে ইতিহাসের পাতায় তাদের চরিত্রহীন, লোভী, হিন্দু বিদ্বেষী, লুণ্ঠনকারী অথবা পাগল ইত্যাদি বলে প্রতিপন্ন করা আর যাঁরা চরম মাত্রায় চরিত্রহীন, ইসলাম ধর্মে উদাসীন মধ্যপায়ী, অদূরদর্শী চক্রান্তকারী ও স্বেচ্ছাচারীরূপে খ্যাত, তাঁদের চরিত্রে প্রশংসার ডাক পিটিয়ে এত বড় ও মহান করে তুলে ধরা, যার ফলে ভবিষ্যতে শিক্ষিত মুসলিম সমাজ যেন সুনাম ও প্রশংসা পাওয়ার জন্য স্বধর্মে অবিশ্বাসী আর স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে। তারই জন্য উদার ও মহানুভব আওরঙ্গজেবের চরিত্রকে করা হয়েছে দুর্বিষহ অভিযোগের প্রভাবে কলঙ্কিত আর চরিত্রহীন আকবরকে দেওয়া হয়েছে "The great" উপাধি অর্থাৎ "মহামতি"।

আসল ইতিহাস সমাজের সামনে তুলে ধরতে গেলে আমাদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা আছে বলে মনে হবে। কারণ প্রচলিত ইতিহাসের বিরুদ্ধে কিছু বলা বড়ই সুকঠিন। শুধু বিপরীত মতামত পেশ করলেই চলবে না; বরং প্রমাণাদি দিতে হবে প্রামাণ্য ইতিহাস বা দলিল থেকে, তাও আবার সব জাগায় শুধু। নামী-দামী মুসলমান ঐতিহাসিকদের ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতি দিলেই চলবে না, কারণ অনেকে মনে করতে পারেন যে, মুসলমান ঐতিহাসিকরা মুসলমান

সম্প্রদায়ের পক্ষ টেনে বলতে বা তাঁদের গোত্রের দুর্নাম ছড়িয়ে যাওয়ার ভয়ে কিছু তথ্য গোপন করতে পারেন। অতএব সেজন্য অনেক মুসলিম ঐতিহাসিক পরিবেশিত তথ্যের পাশে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের দলিল এবং ভারতীয় নামকরা শিক্ষিত হিন্দু লেখকদের উদ্ধৃতি দেবার আবশ্যকতা স্বীকার করছি অনেক ক্ষেত্রে।

সুতরাং মুসলমানদের জন্য অনেক কথা লিখতে হচ্ছে ওকালতির জন্য নয়– প্রয়োজনেরই প্রয়োজনে। যেমন অনেক দিন থেকে শুনে আসছি ও পড়ে আসছি চাঁদ সুন্দর। চাঁদের এই সৌন্দর্য প্রমাণের জন্য লম্বা কোন দলিলের প্রয়োজন নেই, কিন্তু 'চাঁদ অসুন্দর' বললেই প্রমাণ করতে হবে চাঁদের নৈপুণ্য চাঁদের বৈশিষ্ট্য ও তার আকার উপাদান, পরিবেশ ও বর্তমান পরিস্থিতি– পৃথিবী হতে চাঁদের দূরত্ব– বর্তমানের চন্দ্রাভিযাত্রীদের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি অনেক আলোচ্য বিষয়বস্তুকে। পরে প্রমাণ হবে, চাঁদের কোন জ্যোতি নেই বা তার কোন আলো নেই– সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়। আসলে চন্দ্র একটা অন্ধকারময় অসমান্তরাল, অস্বাস্থ্যকর, অসুন্দর স্থান ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক তেমনি আকবরকে আমরা ভারতের স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির আটপৌরে আধুনিক ইতিহাস পড়ে জানতে পেরেছি, তিনি নাকি মুসলমান রাজা-বাদশাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহান হতে মহানতম সম্রাট। অপর দিকে আওরঙ্গজেবের ইতিহাস পড়লে মনে হয় এত বড় হিন্দু বিদ্বেষী গোঁড়া ভ্রাতৃহন্তা দুষ্টমতি সংকীর্ণমনা বাদশাহ মুসলমান যুগের কলঙ্ক ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ প্রকৃত ইতিহাস এই সবের বিপরীত।

এখন যদি আকবর আর আওরঙ্গজেবের ইতিহাস সঠিকভাবে আলোচনা করা হয় তাহলে আমরা সাধের ভারতবর্ষের ভাবী বা বর্তমান বংশধর কল্যাণকামী পদক্ষেপে আসল ইতিহাসের পেছনে অনুসন্ধিৎসু হয়ে মৃত ইতিহাসের দেহের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে দিতে পারব বলে বিশ্বাস।

মুঘল সম্রাট আকবর

পিতার মৃত্যুর সময় আকবরের বয়স ছিল মাত্র তের বছর। ঐ বয়সেই ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে ১৪ জানুয়ারি তাঁর প্রধান সহায়ক বৈরাম খাঁ তাঁকে সিংহাসনে বসালেন। আসলে আকবরের নামে শাসনকার্য পরিচালিত হলেও সমস্ত কাজকর্ম ও দায় দায়িত্ব বৈরাম খাঁকেই পালন করতে হত। পাঁচ বছর পরে আকবর বৈরামের একাধিপত্য অসহ্যবোধ করলেন এবং তাঁর হাত হতে সমস্ত দায়িত্ব নিজেই ছিনিয়ে নিলেন এবং জানিয়ে দিলেন, 'আমি এখন উপযুক্ত, আপনি বরং হজ করতে যান।' এই আদেশ জারি হওয়াতে বৈরাম খাঁ নিজেকে অপমানিতবোধ করলেন এবং শেষে বিদ্রোহীরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। আকবর তাঁকে পরাজিত করলেন কিন্তু কারারুদ্ধ বা প্রাণদণ্ড না দিয়ে তাঁর হজ্জে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন যেহেতু বহু দিক দিয়ে তাঁর থেকে তিনি উপকৃত ছিলেন। কিন্তু হজ্জ থেকে ফিরে এসে বৈরাম খাঁর ভূমিকা কী হত বলা যায় না। হজ্জে

যাওয়ার পথে গুজরাটে তিনি আততায়ী কর্তৃক নিহত হন। কারো ধারণা এটা গুণ্ডা কর্তৃক, আবার কারো ধারণা আকবরের অঙ্গুলী হেলনের নিষ্ঠুর পরিণাম।

আকবর বুঝে দেখলেন, এতবড় ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করতে হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতিকে হাতে রাখলেই কাজের সুবিধা হবে। তাই রাজপুত ও হিন্দু জাতিকে নিজের দিকে আকর্ষিত করতে বদ্ধপরিকর হলেন। অবশ্য তা আন্তরিকতার আলোকে না রাজ্য বিস্তারের আশায় সুমিষ্ট টোপ নিক্ষেপ, তা বিচার করবেন সুধী সমাজ।

তিনি হিন্দুদের ওপর হতে জিজিয়া কর তুলে দিলেন এবং হিন্দুদের বড় বড় পদে ভূষিত করলেন। রাজপুত বীর মানসিংহকে অন্যতম সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। রাজস্ব বিভাগ ছেড়ে দিলেন। বহুদিনের যবন অস্পৃশ্য মুসলমান আকবর এত সহজে হিন্দুদের প্রিয়পাত্র হলেন যে, কেউ আপন বোন কেউ ভগ্নি, কেউ বা নিজের কন্যাকে রাজার হেরেমে প্রবেশ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। অম্বর এবং জয়সালমীরের হিন্দু রাজকুমারীদ্বয়কে আকবর বিয়ে করলেন এবং অম্বরের পরবর্তী রাজা ভগবান দাসের কন্যা এবং মাড়োয়ার রাজা উদয় সিংহের কন্যার সঙ্গে পুত্র সেলিমের বিবাহ দিলেন। প্রায় সকলেই আসল শুধু ব্যতিক্রম মেবারের রানী। বাধ্য হয়ে আকবর মেবার আক্রমণ করলেন। তখন মেবারের রাণা ছিলেন সংগ্রাম সিংহের পুত্র উদয় সিংহ। তিনি সেনাপতি জয়মল্লের হাতে রাজ্য রক্ষার ভার দিয়ে আরাবল্লী পর্বতে আশ্রয় নিলেন। জয়মল্ল নিষ্ঠুর অকারণ আক্রমণের শিকার হয়ে আট হাজার সৈন্য নিয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেও পরাজয়বরণ করলেন। অধঃপতিত চিতোর দখলে এল বটে, কিন্তু সমগ্র মেবার হাতে এল না। উদয় সিংহ উদয়পুরে রাজধানী স্থাপন করে রাজত্ব করতে লাগলেন। উদয় সিংহের মৃত্যুর পর প্রতাপ সিংহ আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, যতদিন না চিতোর পুনরুদ্ধার হয় ততদিন তিনি রণক্ষেত্র ছাড়া আহার করবেন না এবং শয়ন করবেন শুধু তৃণ শয্যায়। হলদিঘাট নামক গিরি সঙ্কটে তুমুল যুদ্ধ হয় ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে। প্রতাপ পরাজিত হলেন আর মেবারের হল অনিবার্য পতন। প্রতিজ্ঞা পালনের পরিপেক্ষিতে প্রতাপ বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন কিন্তু প্রিয় রাজধানী চিতোরকে আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি তাঁর জীবদ্দশায়।

পূর্বে যে সমস্ত দেশ স্বাধীন হয়েছিল আকরব সেই সকল রাজ্য একে একে জয় করে চললেন। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে গুজরাট দখল করলেন তখন সুলাইমান কাররানী ছিলেন বাংলার সুলতান। তিনি যুদ্ধের পথে পা না বাড়িয়ে সন্ধি করতে আগ্রহী হলেন কিন্তু তাঁর স্বাধীনচেতা সন্তান দাউদ বিদ্রোহী হয়ে বিহার আক্রমণ করলেন। আকবর অনেক সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে দাউদের স্বাধীনতার সাধ মিটিয়ে তাঁকে হত্যা করে নিশ্চিন্ত হলেন। আর বাংলা ও উড়িষ্যা নিজের দখলে আনলেন। তারপর ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীর ও ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুদেশ জয় করে সমগ্র আর্যাবর্তের দণ্ডমুণ্ড কর্তা হয়ে দাঁড়ালেন।

উত্তর ভারতের সাথে সাথে দক্ষিণ ভারতের দিকেও দৃষ্টি দিলেন। ঐ সময় বাহমনী রাজ্য ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। আহমাদনগরের রাজার মৃত্যুর পর রাজ্যে অশান্তি ও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বিদ্রোহীরা আকবরের সাহায্য প্রার্থনা করলে ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে আকবর তাঁর পুত্র মুরাদকে এক দল সৈন্য দিয়ে আহমদনগরে পাঠালেন। আহমদনগরের নাবালক বাচ্চা রাজার অভিভাবিকা বিদূষী নারী বীরাঙ্গনা চাঁদ সুলতানা বিপুল বিক্রমে বাধা দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন। মুঘল সৈন্যরা আহমাদনগর করায়ত্ত করতে পারলেন না। পরের বছর আকবর স্বয়ং নারী এবং শিশুর বিরুদ্ধে বিপুল সৈন্য ও শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চাঁদ বিবি এবারেও প্রাণপণে যুদ্ধ চালনা করলেন। রসদ ও গুলি বারুদের স্বল্পতা হেতু শুধু বন্দুক এবং মল্লযোদ্ধাদের মামুলী অস্ত্র নিয়েই রুখে দাঁড়ালেন, কিন্তু আকবরের বীর গুপ্তচর পেছন হতে সুলতানাকে হত্যা করার ফলে আহমদনগরে পরাজয়ের অন্ধকার নেমে এল। আহমদনগরের একাংশ বাদশার হাতে এল। তারপর বাদশাহ খন্দেশত আসিরগড় দুর্গে আক্রমণ চালিয়ে বাকি অংশগুলোকে দখল করলেন। এমনিভাবে আকবর এক বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা রাজাধিরাজ বাদশাহ বলে বিবেচিত হলেন।

আকবর সম্বন্ধে প্রশংসা ও উদারতার উদাহরণ ইতিহাসে এত বেশি স্থান পেয়েছে যা মুসলমান বাদশাহ কারো ভাগ্যে সম্ভব হয়নি। ইতিহাসের শুষ্ক পাতা সরল ও জীবন্ত হয়ে যেন চিৎকার করে বলে ওঠে– 'মহামতি আকবর! মহামতি আকবর'!! পাঠশালা হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ঐ একই শব্দ 'ধন্য আকবর! ধন্য আকবর'!!

আকবরের জন্মদাতা পিতা হুমায়ুনের ওপর যখন বিপদের বিরাট বন্যা এসে পড়েছিল, সেই সময় হুমায়ুনের এতবড় বন্ধু আর সুহৃদ কেউ ছিলেন না যিনি নিজের প্রাণ, সম্পদ-সম্পত্তি ও সম্মান সবই দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি হুমায়ুনের জন্য– তিনিই হচ্ছেন বৈরাম খাঁ। হুমায়ুন তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত হারিয়ে যাওয়া জায়গাগুলো পুনরুদ্ধার করতে পারেননি– সামান্য কিছু ভূখণ্ড ছাড়া ঐ সময় সিকিন্দারশূর এবং এব্রাহিমশূরের মধ্যে খুব শক্তির প্রতিযোগিতা চলছিল। কিন্তু আদিলশাহের এক হিন্দু মন্ত্রী হিমু তদানীন্তন সময়ে শক্তি সামর্থ্য ও জ্ঞান বুদ্ধিতে প্রধান ছিলেন। তিনি এত শক্তিশালী হয়ে পড়লেন যে, দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে বিক্রমাদিত্য নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করলেন। আবার আকবরের ভাই আবদুল হাকিমের অধীনে কাবুল, বাংলাদেশ, মালব, গুজরাট, গণ্ডোয়ানা, উড়িষ্যা, কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও দাক্ষিণাত্য তখন স্বাধীন হয়ে পড়েছিল। রাজপুত্রগণও প্রথম মুঘল আক্রমণের আঘাতে সামলে নিয়ে শক্তিশালী হয়ে পশ্চিম উপকূলে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারে মেতে উঠল। এমনকি পারস্য সাগরে ও আরব সাগরে তাদের প্রভুত্বের মক্কা শরীফে হজ্জ যাত্রীদের ভীষণ বিপদ ও বাধার সম্মুখীন হতে হত।

>Goto List

একে তো এতগুলো বিপদ তার ওপর আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেছেন বালক বয়সে। অতএব বৈরাম খাঁই এরূপ বিপদে আকবর নওজোয়ান বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত আকবরকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। আকবরের পিতা হুমায়ুন তাই অকৃত্রিম বন্ধু বৈরাম খাঁর দুটি হাত ধরে অশ্রু সজল নয়নে বলেছিলেন– "আমাদের পরিবারের দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে আপনার ন্যায় সাহায্যকারী আর কেউ নেই।" তাই হুমায়ুন যখন কান্দাহার দখল করলেন তখন কৃতজ্ঞতার সাক্ষীস্বরূপ বৈরাম খাঁকে সেখানকার শাসনকর্তা করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁকে সিংহিন্দের জাইগীর প্রদান করেছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি আকবরের অভিভাবক নির্ধারিত করেন ঐ বৈরাম খাঁকেই (খান-ই-খানান)। আকবর পিতার কাছে শিখেছিলেন তিনি বাবার মত। তাই তাঁকে ডাকতেন খান-ই বাবা সম্বোধন করে।

ঐ বৈরাম খাঁকে অসম্মানিত আর পরাজিত হয়ে যে বহিষ্কৃত হতে হবে গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধবদের সভা হতে, রাজ্য হতে এবং পৃথিবী হতে এ কথা ভাগ্যহারা বৈরাম খাঁ কোন দিন কল্পনাও করেননি, কল্পনা করেনি অতীত ইতিহাসের পাঠক। আকবরের জীবনের শুরুই কী তবে চক্রান্তের বেড়াজাল গোলকধাঁধার চোখ ধাঁধানো পথে?

সহজলভ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়, আকবর হিন্দু বা রাজপুতদের বিশেষত বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতিয়ে নিয়েছিলেন বা আয়ত্তে এনে বন্ধু জাতি ও বন্ধু জাতিতে পরিণত করেছিলেন। অপরদিকে হিন্দু প্রজাবর্গও তাঁকে খুব আপনজন বলে মনে করতেন। ইতিহাসে হিন্দু প্রজাবৃন্দ তাঁকে 'দিল্লীশ্বর' উপাধিতে ভূষিত করেই ক্ষান্ত হননি অনেকে আবার তাঁকে 'জগদীশ্বর' উপাধি দিতেও বিচলিত হননি। দালাল মার্কা ইংরেজ ঐতিহাসিকরা প্রশংসা করতে গিয়ে অনেকে চরম মাত্রায় পৌঁছে গেছেন। যথা ইংরেজ ঐতিহাসিকরা আকবরের জন্য লিখেছেন, "বৃটিশ যুগের ডালহৌসির সাম্রাজ্য প্রসারনীতির সাথে আকবরের তুলনা করলে মনে হয় যেন মোগল বাদশাহ ভারতের আকাশে প্রখর সূর্যের মত দিপ্তমান আর ডালহৌসির ক্ষুদ্র তারকাটি তার পাশে মিটিমিট করে জ্বলছে। "Astrong and stout annexasionist before whose sun the modest star of Lord Dalhousie place." আকবর আসলে দেখতে সুন্দর ছিলেন না, তাঁর রঙ ছিল কালো তদুপরি আকবর ছিলেন খর্বাকৃতি। কিন্তু ইংরেজ প্রভুর(?) দেওয়া সনদ হচ্ছে– "He looked every inch a king." অর্থাৎ– পা হতে মাথা পর্যন্ত প্রতি ইঞ্চিই আকবরের রাজার মত। আবার কোন কোন প্রভু(?) বলেছেন– "He was great with the great lowly with the lowly." শক্তের সাথে শক্তি প্রয়োগ আর নরমের সাথে নম্রতা ব্যবহার ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। আবার কোন ঐতিহাসিক বলেছেন– তার চক্ষুর চাহনী ছিল সূর্য করোজ্জ্বল সমুদ্রের মত। Vibrant like the sea in sun shine." ইত্যাদি।

তিনি হিন্দু নারীদের বিয়ে করেছিলেন। শুধু তিনি কেন, পৃথিবীর বহু মুসলমান-অমুসলমানদের মেয়ে বিয়ে করেছেন বা করলেও সেখানে নিশ্চয়ই ইসলাম ধর্মে কোন বাধা নেই। তবে শর্ত হচ্ছে, সেই নারীকে প্রথমে মুসলমান হতে হবে, তারপর ইসলাম অনুযায়ী বিয়ে হতে পারে। বিয়ে আর ব্যভিচারের পার্থক্য এই টুকুই। কিন্তু আকবর তার হিন্দু পত্নীদের রাজ অন্তঃপুরে হোমাগ্নি জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং যিনি যে ঠাকুরের পূজারিণী ছিলেন তাঁর তেমনি ব্যবস্থা করা হয়েছিল রাজ অন্তঃপুরের অন্তঃস্থলে। তার ফলে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদের তথা রাজবাড়িতে অনৈসলামিক কুপ্রথার প্রচলন হয়। যথা– মদ্যমান, ব্যভিচার, গীতবাদ্য প্রভৃতি এবং তাঁর সন্তানগণ এত বেশি ব্যভিচারপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে, আকবরের জীবদ্দশাতেই তাঁর পুত্র মুরাদ ও দানিয়াল অত্যন্ত মদ্যপানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম বা জাহাঙ্গীরও চরম মাতাল ছিলেন বলা যেতে পারে। মহামতি আকবরের পুত্রদের মধ্যে মদ্যপান এত চরমে উঠে যে, মদে আর নেশা হত না তখন মদের সঙ্গে ভাং নামক মাদক দ্রব্য মিশ্রিত করে পান করতেন।

যাইহোক, ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের হিন্দ রাজা হিমুকে বৈরাম খাঁর কৌশল কীর্তির কারণে পরাজিত করা সম্ভব হয়। হিমু বন্দি হন কিন্তু আকবরের শাসনের প্রারম্ভে আকবরের সামনেই তাঁর মুণ্ডটি দেহচ্যুত করা হয়। আকবরকে মহামতি অভিনয় করতে হলে এই অশোভনীয় কাজটুকু ধামাচাপা দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আবার অন্য দিকে এত বড় এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে বাদ দেওয়া যায় না, তাই ঐ ভারতজনের ইতিহাসে লেখা হয়েছে– "বন্দি হিমুকে আকবরের কাছে ধরিয়া আনিয়া বৈরাম হত্যা করিতে বলিলে তিনি তাহা করেন নাই। শেষে বৈরাম নিজেই তরবারী দিয়া হিমুর মুণ্ডটি কাটিয়া ফেলেন।" লেখক এই ঘটনাটি প্রমাণ দেবার জন্যে কিছু ইতিহাস ও ঐতিহাসিকের নাম দিয়েছেন যাঁরা এই ঘটনা সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন আবুল ফজল, জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী ইত্যাদি। তবুও বাজারের ঐতিহাসিকদের প্রমাণ প্রয়োগে শান্তি না পেয়ে পরক্ষণেই লিখেছেন, "ভিসেন্ট স্মিথ কেন যে আকবরকে কিশোর বয়সেই এই নিষ্ঠুর হত্যার দায়ে দোষী করিয়াছিলেন তাহা রহস্যজনক মনে হয়। হিমুর পরাজয়ে মোঘল রাজ শক্তির প্রতিষ্ঠা এবং আফগান শক্তির অবসান হয়।"

এক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের উপর্যুক্ত প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় দোষ যেন আকবরের নয়– বৈরাম খাঁর। দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য হচ্ছে– আকবরই হত্যাকারী, কারণ কাউকে হত্যা করতে হলে সিংহাসন বা শয়ন পালঙ্কে সম্ভব নয়। হত্যা করার নির্দিষ্ট স্থান প্রত্যেক রাজার থাকে এখানেও তাই ছিল। আকবর তাঁকে (হিমু) হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং হত্যাকাণ্ড চোখের সামনে দেখতে ইচ্ছুক

>Goto List

ছিলেন। শুধু হত্যা করার উদ্দেশ্য থাকলে বৈরাম খাঁ তার আগেই কাজ সমাধা করতে পারতেন। হিমুকে বদ্ধভূমিতে আনার পর আকবরকে মনে করিয়ে দিলেন তাঁর বাচ্চা মনের আচ্ছা খেয়ালের কথা। তারপর আকবরের অনুমতি ও আদেশেই তাঁকে হত্যা করা হয়। রাজ সিংহাসনে আরোহিত আকবর, তাঁকে আদেশ করার অধিকার বৈরাম খাঁর থাকতে পারে না। যিনি যখন নেতৃত্ব দেন সাধারণ নিয়ম হত্যাকাণ্ড তাঁর দ্বারা, তাঁর সঙ্গী বা কর্মী দ্বারা, তাঁর আদেশ, সমর্থন বা মৌনতা প্রভৃতি নেতারই ইঙ্গিত বলে বিবেচিত হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এবার যাঁরা আকবরের দোষ গৌণ এবং বৈরাম খাঁর দোষ মুখ্য বলেছেন তাঁরা হলেন আবুল ফজল, জাহাঙ্গীর আর আবদুর রহিম প্রভৃতি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যাঁরা ঐতিহাসিক তারা নবী ও অবতার নন যে, তাঁদের সাধারণ মানবিকতা প্রত্যেক মুহূর্তে সতেজ থাকবে। কোন কোন ক্ষেত্রে লোভ লালসা, ক্রোধ, অভিমানের কবলেও পড়তে হয়। এ ক্ষেত্রে এটাই কারণ। যেহেতু আবদুর রহিম হচ্ছেন পিতার অবাধ্য সন্তান, পিতা-পুত্রের কলহের প্রমাণ আছে। আর জাহাঙ্গীর হচ্ছেন আকবরের ঔরসজাত সন্তান, সেখানে যা স্বাভাবিক তাই হয়েছে। এমনিভাবে আবুল ফজল ও আকবরের মধ্যেও এক গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ ছিল– গুরুর পুত্র। অতএব এ ক্ষেত্রে তাঁদের কিছু দুর্বলতা বোধহয় আশ্চর্যের নয়।

শেষের কথা আকবরের মা ও বাবার স্বপ্ন 'আমার ছেলের নাম ও রাজ্য বিস্তার যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।' যেমন মৃগনাভীর গন্ধ ছড়িয়ে যায় অনুরূপ। আকবর তাই বলেছিলেন, ছলে-বলে, কলে-কৌশলে, হত্যা, মিথ্যা, শঠতা যেমন করেই হোক তাঁকে রাজ্য বিস্তার করতেই হবে। অতএব আপনি আমার ধর্ম বাবা, খান-ই-বাবা, সুতরাং যতক্ষণ না আমি মজবুত হই আপনি যা ভাল হয় করুন। হত্যার জন্য দায়ী বন্দুক না বন্দুকধারী সেটাই আজ সিদ্ধান্তের বস্তু। অতএব আফগান শক্তি নির্মূল করতে হলে হিমুর ধ্বংসের প্রয়োজন ছিল। তাই হিমুর মৃত্যুর সঙ্গেই দিল্লি ও আগ্রা আকবরের হাতে এসে গেল।

অপরদিকে আদিল শাহও অন্যত্র নিহত হন। সেকেন্দার শূর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। এব্রাহিম শূরও বহু দিন যাবৎ ঘুরে ঘুরে শেষে উড়িষ্যায় হলেন নিহত। ১৫৫৮ হতে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গোয়ালিয়র, আজমীর ও জৈনপুর আকবরের অধীনে এসে যায়। এসবই বৈরামর বীরত্বের ফল আর আকবরের ভাগ্যের জোর বলতে হবে। অবশেষে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে বৈরাম খাঁকে পদচ্যুত করে তাঁর অপেক্ষা বহু গুণে সর্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ পীর মুহম্মদ এবং আদম খাঁকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। এটা বৈরাম খাঁর ব্যক্তিত্বে যে কত চরম আঘাত ও পরম বেইজ্জতিতা তা আজ চিন্তার বিষয়। তবুও তো এক পক্ষের কাছে আকবর মহামতি।

বৈরাম খার মৃত্যুর পর এক সময় আকবরের মা হামিদা ও ধাত্রী মাতা মহিমঅনাগা আকবরকে অশ্রুপ্লুত নয়নে বলেছিলেন, "আকবর, বৈরাম খাঁ আর নেই। তোমাকে সৎ পরামর্শ দিয়ে সঠিক পথ দেখাবে তেমন কেউ নেই। তাছাড়া তুমি নিজেও লেখাপড়া জান না। সুতরাং যখন ভালমন্দ বুঝতে পারবে না আমাদের মতামত নেবার চেষ্টা করবে।" কিন্তু আকবর নিজেকে খুব বেশি পণ্ডিত বলে মনে করতেন। পরে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তবে ছোট ছোট ব্যাপারে মাকে খুশি করার জন্য মহামতি মাতার মতামত নিতেন। তাও আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল তা অরাজকীয় বিষয়।

১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে নতুন সেনাপতি আদম খাঁ ও পীর মহম্মদ মালব জয় করেন। পরের বছর ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে আকবর সেনাপতি আদম খাঁকে হত্যা করেন। অপরাধ ছিল মন্ত্রী শামসুদ্দিনকে তিনি হত্যা করেছিলেন। মহামতি যে আদম খাঁকে হত্যা করেছিলেন সেই আদম খাঁ ছিলেন ধাত্রী মাতা মহিমঅনাগার পুত্র। তাই পুত্রের শোকে বৃদ্ধা মাতা বাঁচতে পারলেন না, বুক ফাটা শোকে দেহ ত্যাগ করলেন। এ যেন এক নিষ্ঠুর তথা পৈশাচিক ইতিহাস।

তারপর পীর মহম্মদকেও পুরস্কার দিলেন মৃত্যুদণ্ড। এরপর আকবর তাঁর একজন অন্যতম রাজা মোয়াজ্জমকে মিথ্যা হত্যার অভিযোগে প্রাণদণ্ড দিলেন। নানা কারণে সারা মুসলমান সমাজ আত্মীয়-অনাত্মীয় প্রত্যেকেই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। আকবর বুঝতে পারলেন এক দল ভেঙে গেছে। অতএব অন্য কূল আর ভাঙতে দেয়া হবে না। যেমন করেই হোক হিন্দু রাজপুত্রদের হাতে রাখতেই হবে। তাঁর এই প্রস্তাবে রাজপুত্ররা সাড়া দিলেন। সাড়া দেবার কারণ ঐতিহাসিকদের মতে প্রধাণত দুটি। প্রথমত পূর্ব হতেই রাজপুত্ররা মুসলমানদের শক্তি ও প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁরা এর মাধ্যমে নিজেদের শক্তি সঞ্চয়, আধিপত্য লাভ ও ভবিষ্যতে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের আশার আলোক প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। যাইহোক, ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে অম্বর (জয়পুর) রাজ্যের রাজা বিহারী মল্ল আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং তাঁর সুন্দরী কুমারী এক কন্যা আকবরকে দান করেন। সেলিম বা জাহাঙ্গীরের জন্ম ঐ কন্যার গর্ভেই হয়েছিল। "সেলিম চিস্তি" নামে এক মুসলমান সাধক দোয়া করেছিলেন তাঁই তাঁরই নাম অনুসারে নাম রাখা হয়েছিল 'সেলিম'।

তারপর মানসিংহ আকবরকে তাঁর আপন সহোদরা বোনকে দান করেন। আকবর নিজে বিয়ে না করে সেলিমের সঙ্গে তার বিয়ে দেন। মানসিংহের বোন ছিলেন বিহারী ভগবান দাসের কন্যা। এই কন্যারই গর্ভজাত সন্তান জনাব খসরু। যোধপুরের রাজা উদয়ের কন্যাকেও বিয়ে করেন আকবর পুত্র জাহাঙ্গীর। রানী যোধভাইয়ের গর্ভেই জন্ম নিয়েছিলেন সম্রাট শাহজাহান। বিকামীরের রাজা রায় সিংহও তাঁর সুন্দরী কন্যা দান করেন মহামতির হেরেমে। তাঁকেও বিয়ে

করলেন জাহাঙ্গীর। যশলমীরের রাজা আকবরের বশ্যতাস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু শুধু বশ্যতাই নয় সেই সঙ্গে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তমা কন্যাকেও।

মোটকথা মহামতির আসল ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় তাঁর অসংখ্য স্ত্রী-অস্ত্রী আর পত্নী-উপপত্নীর কথা। যাঁদের দ্বারা মহামতির মহল সব সময়ই জমজমাট থাকত। কিন্তু এসব কীর্তি ইতিহাসে প্রকাশ করলে মহামতি নামের সার্থকতা থাকে না। তাই অপ্রকাশ্য ছিল এতদিন।

আকবরের বহুসংখ্যক উপপত্নী ছিল... ইত্যাদি এইসব নতুন তথ্যের সন্ধান মুসলমান লিখিত ইতিহাসে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিখ্যাত হিন্দু ঐতিহাসিক শ্রী রামপ্রসাদ গুপ্তের লেখা 'মোগল বংশ' পুস্তকের ১৭৮ পাতার মন্তব্য বিশেস স্মরণযোগ্য। উপপতির সংখ্যা ছিল পাঁচ শতের বেশি। যিনি পাঁচশ নারীর ধর্ষক রাজা বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। যদি এটা সত্য হয় তাহলে তাঁকে মহামতি আমরা বললেও আগামীকালের ইতিহাস বলবে কী করে সেটাই চিন্তার কথা। আমাদের ভারতের বিখ্যাত Vindication of Aurangz গ্রন্থের ১৪৩ পাতায়-এর পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যাবে, যথা Akber had over five thousand wives আকবরের পাঁচ শতেরও বেশি স্ত্রী ছিল ..... ইত্যাদি। আর যাঁরা কন্যা দিয়েছিলেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই দিয়েছিলেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। ফলে তাঁরা বাদশার অনুগ্রহে ধন্য হয়েই অর্থ, সম্পদ, সম্পত্তি ও সম্মান পেয়েছেন এবং সার্বিক উপকারের মধ্যে রাজপুতদের হাতে রাজকীয় শক্তির মোটামুটি একটি অংশ এসে পড়েছিল। আর স্বাভাবিকও তাই।

এক পক্ষ বলেন, আকবর ও রাজপুত্রদের উদারতা সাক্ষ্য বহন করেছে কন্যা প্রদানের ক্ষেত্রে। অপর পক্ষ বলেন, নারী লোলুপতা আর চরিত্রহীনতার প্রকাশ পেয়েছে মহামতির দিক থেকে আর পার্থিব উন্নতির জন্য যাঁরা নিজেদের কন্যা ও বোনকে চরিত্রহীনের হাতে স্বেচ্ছায় অর্পণ করতে পারেন তাঁরা নিঃসন্দেহে জঘন্য, ঘৃণ্য ও নগণ্য।

তবে একথা সত্যিই যে, প্রত্যেক রাজপুত্রই পাইকারিহারে ঐ পাপ পঙ্কিলে নিমজ্জিত হয়েছিলেন তা নয়। বরং বহু রাজপুত্র বীর তাঁদের বীরত্বের মহিমাকে অক্ষুণ্ন রাখতে উল্টো নজির সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে আকবর যখন মধ্য প্রদেশের গণ্ডোয়ানা দখল করেন এবং সেখানকার বিধবা রানী দুর্গাবতী যুদ্ধে পরাস্ত হন, কিন্তু তিনি আত্মহত্যা করেন তবুও আকবরের হাতে পড়েননি। মেবারের রানী সংগ্রাম সিংহের পুত্র উদয় সিংহ আকবরের প্রস্তাব সত্ত্বেও তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করেননি। যার ফলে আকবর কর্তৃক চিতোর আক্রান্ত হয় ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে। উদয় পলায়ন করেন কিন্তু রাজপুত্র সৈন্যগণ জয়মল্ল ও পুত্রের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন। অবশেষে পুত্র ও জয়মল্লকে আকবরের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হতে হয়। ফলে চিতোর আকবরের হাতে এসে যায়।

যুদ্ধে পরাজিত রাজপুত্রদের প্রাণ দিতে হল মহামতি আকবরের হাতের ঈশারায়। আর নারীরা হাল চাল বুঝতে পেরে 'জহর ব্রত' অর্থাৎ আগুনের চিতার মত করে তৈরি করে তাতেই ঝাঁপ দিয়ে প্রাণবিসর্জন করলেন। তার প্রমাণ আজ ভূরি ভূরি বিদ্যমান। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে উদয়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রতাপ সিংহ পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন। তিনি পিতার চেয়েও সাহসী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে হলদীঘাটের যুদ্ধে আকবরের হাতে তিনি পরাজিত হলেন। তারপর বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে অর্ধাহারে অনাহারে কাটিয়ে বহু যুদ্ধ করে অনেক কিছু পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন কিন্তু তাঁর সাধের চিতোর অধিকার করা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। প্রতাপের এই পরাজয় বিজয়েরই নামান্তর। তিনি বশ্যতা স্বীকার ও কন্যাদানের চিন্তা মুহূর্তের মধ্যেও তাঁর মস্তিষ্কে আসতে দেননি।

প্রতাপের জন্য অনেকে গোঁড়া সংকীর্ণমনা হিন্দু বলে অভিযোগ করেন। কারণ, একবার আকবরের শ্যালক, আকবরের আত্মীয় আবার সেনাপতি মানসিংহ প্রতাপের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন। প্রতাপ মোটেই অতিথির আপ্যায়ন বা সম্মানপ্রদর্শন কিছুই করেননি বরং অপমানের সুরে বলেছিলেন, যারা মুসলমানকে পিসি, বোন বা কন্যা দিয়েছে তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" মান সিংহের নাম নষ্ট হওয়ায় তিনি বলেছিলেন, "এর কেমন করে প্রতিশোধ নিতে হয় আপনাকে দেখাতে পারি জানেন? তদুত্তরে প্রতাপ বলেছিলেন, "যাও যাও, তোমাদের পিসে মশাই, ভগ্নিপতি, জামাইদা আকবরকে গিয়ে বলো এবং তাকেও সঙ্গে করে এন।"

প্রতাপের এহেন বীরত্ব আমাদের মতে নিরেট গোঁড়ামি নয় বরং একনিষ্ঠ বীরের বীরত্ব। ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁকে গোঁড়া হিন্দু না বলে 'নিষ্ঠাবান বীর প্রতাপ সিংহ' বলা উচিত।

তারপর বনে-জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে প্রতাপ সিংহকে এক হৃদয়বিদারক ঘটনার সম্মুখীন হতে হল। তিনি দেখলেন তাঁর আদরের কন্যা ক্ষুধায় কাঁদতে কাঁদতে ছটফট করতে লাগল। তখন আর ধৈর্যধারণ করতে না পেরে আকবরকে এক লিখিতপত্রে জানালেন আপনার কাছে আমি আত্মসর্পণ করতে সম্মত। পত্র পেয়ে খুশি হয়ে আকবর সভাসদকে ডেকে বললেন, প্রতাপের ওপর অত্যাচার করতে নিষেধ করে দিন। ঠিক ঐ সময় সভাসদগণের মধ্য হতে জাহাঙ্গীরের শ্বশুর বিকানিরের রাজা রায় সিংহের কনিষ্ঠ সহোদর পৃথ্বীরাজ মর্মাহত হয়ে প্রতাপকে এক পত্রে বললেন—"আমরা রাজপুত্ররা আকবরের অধীনতা স্বীকার করেও এবং তাঁকে কন্যা দিয়ে অধঃপতিত হলেও আপনার জন্য আমরা গর্ব করি। সম্রাট আকবরকে একদিন মারতেই হবে তখন আমাদের দেশে খাঁটি রাজপুত্র বীজ বপনের জন্য আমরা আপনার নিকটেই উপস্থিত হব। রাজপুত জাত আপনার মুখের দিকে চেয়ে আছে।" পত্রটি যে একটি ঐতিহাসিক গবেষণামূলক

চিন্তাভিত্তিক দ্বিধাবিদূরক দলিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাছাড়া পত্রটির দ্বারা তদানীন্তন রাজপুত্র জাতির বিশ্বাসঘাতকতার এক জঘন্য চরিত্রের পরিচয় প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু মহামতি ছিলেন তখন গভীর মোহ নিদ্রায় অচেতন। পিতা-মাতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করাই ছিল তার জীবনের লক্ষ্য তাতে দেশ রসাতলে যাক আর থাক তাতে কিছু এসে যায় না।

যাহোক, এই পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপ নতুন করে কর ধারণ করলেন। রাজপুত্রগণ আকবর দ্বারা ভারত ভূমি কর্ষিত করে রাজপুত্র জাতির প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষা করছিলেন বীজ বপনের। কিন্তু কালের চক্র পরিচালিত হয় বিশ্বনিয়ন্তার ইঙ্গিতেই।

মহামতির স্বধর্মে বিরোধিতা

বড় বড় আলেম, উলামা, মোল্লা, মুফতি বাদ দিয়ে মহামতি একজন কপট, বিভ্রান্ত মুসলমান মোবারক নাগুবীকে তাঁর উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করেছিলেন। আর তাঁরই সন্তানদ্বয় আবুল ফজল ও ফৈজীকেও করেছিলেন উপদেষ্টা। আকবরের ভুলভ্রান্তি চারিত্রিক দুর্বলতা ছেলেদের কাছে ধরাপড়া যে সম্ভব নয় অথবা প্রকাশিত হওয়ার পথেও যে অনেক বাধা তা আকবরের জ্ঞাননুবিক্ষণে ধরা পড়েনি। তাই তিনি এক নতুন ধর্ম সৃষ্টি করলেন, যার নাম 'দীন-ই-ইলাহী'। একপক্ষের কাছে দারুণভাবে প্রশংসিত আর অপর পক্ষের কাছে তা নিরেট ভণ্ডামি ও আবর্জনার ন্যায় পরিত্যাজ্য বস্তু। মোটকথা নিরপেক্ষ ভূমিকায় 'দীন-ই-ইলাহী' ছিল মহামতি আকবরের স্বধর্মের নিপাত সাধনের এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত।

ইসলাম ধর্মে আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টির উপাসনা করা শুধু নিষেধই নয় বরং সৃষ্টির কোন উপাসক মুসলমান নয়। তাই হযরত মুহাম্মদ (সা.) সারা জীবনব্যাপী পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করে গেছেন এবং বিশ্বকে জানিয়ে গেছেন উপাসনা একমাত্র স্রষ্টারই জন্য। কিন্তু (ক) মহামতি তাঁর 'দীন-ই-ইলাহী' ধর্মে সূর্য উপাসনার উৎসাহ ও আদেশ দিয়েছেন। তিনি নিজেও সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর ও মধ্য রাত্রিতে সূর্যের উপাসনা করতেন।

(খ) সারা বিশ্বের মুসলমানদের মূলমন্ত্র "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহরই প্রেরীত পয়গম্বর। কিন্তু আকবর তাঁর নতুন 'কালেমাহ' চালু করলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আকবর খলীফাতুল্লাহ।" এত বড় আঘাত দান যা মুসলমানদের ওপর কোন বিরুদ্ধবাদী অন্য ধর্মাবলম্বীর পক্ষেও সম্ভব হয়নি তাই হয়েছিলো 'মহামতির' সময়ে।

(গ) কুরআন শরীফে মদ ও সুদকে অবৈধ বা হারাম বলা হয়েছে। কিন্তু মহামতির নতুন ধর্মে মদ ও সুদকে বৈধ বলে নির্দেশ এবং উৎসাহ দান করা হয়েছে।

(ঘ) কুরআন শরীফে জুয়া খেলাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু মহামতি তাঁর ধর্মে জুয়া খেলা জায়েয বা বৈধ করেছেন। শুধু তাই নয়, রাজ খরচে বিরাট একটা পৃথক অট্টালিকা তৈরি করে সেখানে জুয়া খেলার সুবন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও জুয়া খেলায় যাদের পুঁজি বা মূলধন থাকত না রাজকোষ হতে তাদের কর্জ বা দেনা দেয়ারও সুব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

(ঙ) 'দাড়ি রাখা' ইসলাম ধর্মে, 'সুন্নাত' বা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশ। না রাখলে পাপ হয়। কিন্তু দাড়ি রাখাকে বা বিশেষ কোন সুন্নাতকে উপেক্ষা কিংবা অস্বীকার করলে সে ইসলাম বিদ্রোহী বলে বিবেচিত। মহামতি দাড়ি মুণ্ডন বৈধ বলে আইন করলেন এবং তাঁর মাতার মৃত্যুর পরেই মাতার শোকে দাড়ি মুণ্ডন করে আদর্শ স্থাপন করলেন। তার পরদিন থেকে রাজদরবারে যত উচ্চশ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন তারা অনেকে নিজের নিজের দাড়ি মুণ্ডন করে বাদশাহের পদপ্রান্তে উৎসর্গ করলেন। ফলে মহামতি আকবর নিজের ধর্মের ও বুদ্ধির সাফল্যে বেশ আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন।

(চ) প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কোরআন ও হাদীসের আইন অনুযায়ী স্ত্রী সংসর্গান্তে 'ফরয গোসল' (এক বিশেষ নিয়মে স্নান করা) অবশ্য প্রতিপাল্য। কিন্তু নতুন ধর্মে তা রহিত করা হয় এবং নতুন এক প্রথার প্রচলন করা হয়। গোসল করা ভাল কিন্তু পরে নয় পূর্বে।

(ছ) মহামতি দেশের কল্যাণের জন্য না হলেও নিজের বা রাজপুত্রগণের এবং সভাসদবর্গের সুবিধার্থে এক অভিনব বিবাহ প্রথার প্রচলন করলেন যার নাম 'মুৎআ' বা অস্থায়ী বিবাহ। যেমন দুচার দিন বা দু-এক মাসের জন্য একটা বিয়ে করে আবার তাকে তালাক বা বর্জন করা যাবে। বিবাহের নাম দিয়ে এরূপ এক বীভৎস ব্যভিচার প্রথার প্রচলন করে নারীর নারীত্বকে কলঙ্কিত করতে মহামতির মতি কোন সময় কেঁপে উঠেনি।

(জ) ব্যভিচারের সুবিধার্থে, ইসলামের সুচিন্তিত 'পর্দা প্রথা'কে একেবারে রহিত করেন এবং সারা ভারতের মুসলমান হিন্দু ভদ্র রমণীগণের মধ্যে অবগুণ্ঠন যথা ঢিলে পোশাক পরা, মাথার কাপড় উড়না ব্যবহার করা ইত্যাদি যে সভ্য নীতিগুলোর প্রচলন ছিল, মহামতি কঠোর হস্তে নির্দেশ দিয়ে তা নিষিদ্ধ করলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা লজ্জাশীলতা বা শালীনতা বোধ ছিল। কিন্তু মহামতি নির্দেশ দিলেন—বাজারে বা বাইরে চলাফেরার সময় মাথায় কাপড়, পর্দা অথবা অবগুণ্ঠিতা হওয়া চলবে না।

(ঝ) বার বছরের কম বয়স্ক বালকদের 'খতনা' দেওয়া নিষিদ্ধ। সে বড় হয়ে নিজের ইচ্ছায় দিতেও পারে আবার না দিতেও পারে।

(ঞ) মৃত মুসলমানকে কবর দেওয়া সারা পৃথিবীর মুসলমানের একটা সার্বজনীন প্রথা ও ইসলাম ধর্মের নির্দেশ। আর কবর দেবার নিয়ম মৃত দেহটিকে

কবরে এমনভাবে শায়িত করা (ভারতে উত্তর-দক্ষিণে) যেন মক্কার কা'বা ঘরের দিকে পা-মাথা না থাকে। মহামতি নির্দেশ দিলেন মৃত ব্যক্তির দেহের স্কন্ধে একটা গমের প্যাকেট বা ইট বেঁধে পানিতে ফেলে দাও। আর যদি একান্তই কবর দিতেই হয় তাহলে ভারতের পশ্চিম দিকে কা'বা শরীফ, অতএব সেই পশ্চিম দিকে পা করে মৃত দেহটিকে শায়িত রাখতে হবে।

(ট) ইসলামের আইনে পুরুষদের জন্য প্রকৃত রেশম বা সিল্ক বস্ত্র ও সোনাপরা অবৈধ। নারীর জন্য অবশ্য বৈধ। মহামতি আইন করলেন–পুরুষের জন্য সোনা এবং সিল্ক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ নয়।

(ঠ) মহামতির নতুন ধর্মে গরু, মহিষ, মেষ, উট খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বন্য জন্তু যথা বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ ইত্যাদি খাওয়া চলবে। গোমাংস খাওয়া শুধু নিষেধই ছিল না এমনকি বিশ্ব মুসলিমের অতীব গুরুত্বপূর্ণ উৎসব 'ঈদুল আযহা'তেও গরু ব্যবহার পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল।

(ড) মসজিদে আজান ও এক সাথে (জামাতে) নামায পড়ার ব্যবস্থা বন্ধ করা হয়েছিল।

(ঢ) পবিত্র মক্কা শরীফে হজব্রত পালন যুগে যুগে সর্বদেশের সচ্ছল মুসলমানের জন্য একবার জরুরি, যাকে বলে 'ফরয'। হঠাৎ আইন প্রণয়ন করে হজের রাস্তাও বন্ধ করা হল।

(ণ) কুকুর ও শূকর ইসলাম ধর্মে ঘৃণ্য পশু বলে চিহ্নিত। কিন্তু মহামতি তাঁর সময়ে কুকুর ও শূকরকে আল্লাহর 'কুদরত' (মহিমা) প্রকাশক পবিত্র বলে ঘোষণা করেন।

(ত) মহামতি আকবর কোরআন বিশ্বাস করতে নিষেধ করতেন। অর্থাৎ মহামতির দুর্গতিপূর্ণ দৃষ্টিতে সারা পৃথিবী নাস্তিকতার শিকার হয়ে ধ্বংসলীলার কারণ হোক।

(থ) প্রত্যেক মুসলমানকে তাঁর মুসলমানত্ব বজায় রাখার জন্য মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং বিচার দিবসের ওপর বিশ্বাস করা একান্ত জরুরি। কিন্তু মহামতি পুনরুত্থান ও বিচারের ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতেন।

(দ) মুসলমান ধর্মে আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টির সম্মানের জন্য 'সিজদা' বা প্রণিপাত করা অবৈধ ও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু আকবর তাঁর দরবারে প্রজাদিগকে 'সিজদা' করার জন্য আইন প্রণয়নও বলবৎ করেন।

(ধ) মুসলমানদের একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হলে 'আসসালামু আলাইকুম' (আল্লাহ আপনার ওপর শান্তি বর্ষণ করুন) বলার নিয়ম আছে। প্রত্যুত্তরে 'ওয়া আলাই কুমুস্ সালাম' (আপনারও ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলা হয়ে থাকে। যুগ যুগ ধরে সারা বিশ্বের মুসলমানদের এই একই পদ্ধতি ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নেই।

>Goto List

মহামতি সালাম দেয়ার প্রথার বিলোপ সাধন করে তার পরিবর্তে 'আল্লাহু আকবর' বলার নিয়ম চালু করেছিলেন। তার উত্তরে 'জাল্লা জালালাহু' বলা হতো। তখন হিন্দু প্রজাগণ তাঁর কাছে নিবেদন করলেন, সম্রাট! আপনার কাজকর্ম দেখে সমস্ত হিন্দুই আপনার ওপর সন্তুষ্ট। তাই হিন্দুরা আপনাকে দিল্লিশ্বর ও জগদীশ্বর বলে। কিন্তু আপনি সালাম তুলে দিয়ে আবার আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করলেন কেন? অতএব ওটাও তুলে দিন। তখন আকবর হিন্দু প্রজাবর্গের নিশ্চিন্ত করতে বললেন– মুসলমানদের জন্য আমিই স্বয়ং আল্লাহ হয়ে প্রকাশিত হয়েছি। 'অর্থাৎ আল্লাহু আকবর' মানে আকবরই আল্লাহ। অতঃপর তাঁর অনুগত হিন্দু প্রজাগণ আবার অভিযোগ করলেন– আল্লাহ শব্দটা হিন্দুবিরোধী। অতএব ওটাকেও তুলে দিন। আকবর তাই করলেন। সারা দেশে ঘোষণা করে দিলেন আজ থেকে 'সালাম' বা 'আল্লাহুর' পরিবর্তে 'আদাব' শব্দ ব্যবহার করতে হবে। এটাই হল মহামতির মহাসিদ্ধান্ত।

(ন) যীশুখৃস্টের সঙ্গে যেমন 'খৃস্টাব্দ' বিজরিত তেমনি 'হিজরি' সাল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু প্রজাবৃন্দ 'দিল্লিশ্বরের' নিকট আবেদন করলেন– আমরা আপনার উদারতায় মুগ্ধ। আপনাকে হিন্দুর মত মনে করে আমরা আপনার সঙ্গে সর্ববিষয়ে মিল ও মিলনের পথে একমত। কিন্তু গণ্ডগোল ভারতের চিরদিনের প্রথা ঐ 'হিজরি' সন। যতদিন ভারতে 'হিজরি' সন থাকবে ততদিন মুহাম্মদেরই নাম হতে থাকবে অথচ আমরা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব আমাদের জন্য এক পৃথক সালের ব্যবস্থা করা হোক। তাই করা হল। পৃথক সালের নাম রাখা হল 'ইলাহি' বছর। আমাদের বাংলা সন অনেকের মতে আকবরেরই ঐ সন। হিজরি সনের সঙ্গে প্রায় এক যুগের পার্থক্য অর্থাৎ ১৪ বছর। তাতে অনেক হিন্দু প্রজাবর্গ তাদের কৃতকার্যতার দরুন মহামতির মহত্ত্বের প্রতি খুবই আস্থাবান হলেন। যদি রাজপুত্র বা হিন্দুদেরই কেউ দিল্লির রাজা হয়ে ঐ রকম ইসলাম ধর্মের উৎপাটন করতে সাহসী হতেন তাহলেও এতটা মারাত্মক ফল দেখা দিত না। কারণ মুসলমান সম্প্রদায় তাতে বিদ্রোহী হয়ে উঠত। কিন্তু কোন মুসলমান অথবা মুসলমান নামধারী ব্যক্তির দ্বারা এ কীর্তি করাতে পারলে দোষ যা হবার মুসলমানেরই হবে।

এখানে বেশ প্রমাণ হচ্ছে আকবর আসলে ইসলাম ধর্ম বিধ্বংসী কতগুলো চরমপন্থী মানুষের হাতের পুতুল ছিলেন।

(প) মুসলমানদের মসজিদ উপাসনালয়গুলোকে অনেক গুদামঘর ও হিন্দু প্রজাদের ক্লাবঘরে রূপান্তরিত করেছিলেন।

(ফ) ইসলাম ধর্ম নিঃশেষিত হতে পারে কিনা তা পরীক্ষার জন্য কিছু মসজিদ হিন্দু প্রজারা ভেঙে ফেলে সেই স্থানে মন্দির নির্মাণ করেন। আকবরের নিকট প্রতিবাদ করলে তিনি যুক্তি দেখালেন, "মুসলমানদের এ মসজিদগুলো

সত্যিকারের প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিল না। যদি থাকতো তাহলে ভাঙা সম্ভব হতো না। মন্দিরের প্রয়োজন ছিল তাই মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদও ধর্মস্থান আর মন্দিরও ধর্মস্থান। একটি ধর্মস্থান ভেঙে অধর্মের কিছু গড়ে উঠলে প্রতিকার করা যায় কি না বিবেচনা করা হতো। কিন্তু ধর্মস্থানের পরিবর্তে ধর্মস্থান গড়ে উঠেছে।" তার পরেই মসজিদ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে নতুন মসজিদ নির্মাণ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

(ব) মুসলমান ধর্মের হৃৎপিণ্ডপ্রায় পবিত্র কুরআন ও হাদীস শিক্ষা, শিক্ষালয় বা শিক্ষাদাতাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে আকবর সবচেয়ে মারাত্মক ও কুৎসিত কর্মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অর্থাৎ ইসলাম সংক্রান্ত শিক্ষার চির অবসানই ছিল আকবরের উদ্দেশ্য। এক কথায় হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যা নির্দেশ বা নিষেধ করেছেন, তিনি যেন তার সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী তায় নেমেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন মুসলিম বিদ্বেষী অমুসলমান শাসকও যা কল্পনা করেননি, মহামতি তা বাস্তবে পরিণত করার কত পাকাপাকি ব্যবস্থা করেছেন এত আলোচনার পর সে কথা সহজেই অনুমেয়।

অতএব উপর্যুক্ত ২৩টি উদাহরণে বোঝার কোন অসুবিধা নেই যে, আকবর 'ঘর শত্রু বিভীষণ' ছিলেন অথবা নামধারী ছদ্মবেশী মুসলমান ছিলেন। মনে করা যাক 'ক' একজন হিন্দু কিন্তু তিনি নিজধর্মে উদাসীন এবং পর ধর্মের শত্রুতা করেন না। অতএব তিনি একজন উৎকৃষ্ট হিন্দু নন। 'খ' একজন হিন্দু। তিনি নিজ ধর্মের ধার্মিক কিন্তু অপর ধর্মের শত্রু। অতএব তিনিও একজন নিকৃষ্ট। 'গ' একজন হিন্দু। তিনি নিজ ধর্মে আস্থাবান, কিন্তু অপর ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ধ্বংসকামী নন। অতএব তিনি একজন উৎকৃষ্ট হিন্দু ভদ্রলোক। 'ঘ' একজন হিন্দু। তিনি নিজ ধর্ম পালনকারী এবং অপর ধর্ম বা সম্প্রদায়েরও উন্নতি কামনা করেন। অতএব তিনি আরও উৎকৃষ্ট বা উচ্চতর। 'ঙ' একজন হিন্দু। তিনি নিজ ধর্মে নিষ্ঠাবান। অনিষ্ঠাবান হিন্দুদের তিনি ভাল করে গড়ে তুলতে চান এবং অপর ধর্ম বা সম্প্রদায়েরও উন্নতি কামনা করেন। তিনি নিঃসন্দেহে আরো উচ্চস্থানীয় অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট। 'চ' একজন হিন্দু। পরে তিনি অপর ধর্মে ধর্মানতরিত হন। তিনি হিন্দু জাতির শত্রু। অতএব তিনি নিকৃষ্ট। 'ছ' একজন হিন্দু। তিনি হিন্দু বলে পরিচয় দেন কিন্তু বেদ, পুরাণ বা গীতায় অবিশ্বাসী এবং পৃথিবী হতে ওগুলো মুছে ফেলার জন্য সমস্ত শক্তি অধীনস্থদের ওপর প্রয়োগ করেন। তিনিই হচ্ছেন নিকৃষ্টতম এবং বিশ্বাসঘাতকের দলে শীর্ষস্থানীয়। এক্ষণে আকবরের অবস্থাও ঠিক তাই কি না নিরপেক্ষ চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীরা চিন্তা করবেন।

কিন্তু একটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, উপর্যুক্ত তথ্যগুলো যদি সত্য হয় তবেই আকবর ঐ অভিযোগে অভিযুক্ত কিন্তু যদি কোন ইতিহাসে তার প্রমাণ না থাকে তাহলে অভিযোগের অধিকার আধুনিক ঐতিহাসিকদেরই বা

থাকবে কী করে। কিন্তু উল্লেখ করা যেতে পারে 'এছাবাতুন নবুয়ত', 'রিসালায়ে তাহলীলিয়া', 'মুনতাখাবুত্ত ওয়ারিখ', 'Mujaddis conception of Towhid', 'Awn-ul-Mabud' এবং 'Kalematul Hoque', প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ আকবরের কীর্তিকলাপের সাক্ষী স্বরূপ আজও বেঁচে রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন লাইব্রেরিতে। যেগুলো পড়ে অব্যর্থ সত্য ইতিহাসের উৎস সন্ধানে উৎসাহের খোরাক পাওয়া যায়। এছাড়া আরও বহু পত্র-পত্রিকা আমাদের দেশে ছোট-বড় লাইব্রেরিতেও মজুদ রয়েছে, যেগুলো হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান প্রমুখ ঐতিহাসিকদের তথ্য, তিরস্কার ও অনেক তত্ত্বের মিশ্রণে মূল্যবান মূলধন।

এত কাণ্ড করেও আকবরের সমস্ত দোষ কাটাকাটি করে বিরাট ভগ্নাংশের শেষে উত্তর মাত্র '১' অর্থাৎ একটিই কথা মহামতি আকবর! মুসলমান বাদশাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আকবর! কিন্তু ঐ কণ্ঠস্বর কাদের? আধুনিক নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের মতে, যাঁরা জ্ঞাতাবস্থায় সারা বিশ্বের তথা ভারতের মুসলমানদের চরিত্রহীন ধর্মহীন, ব্যভিচারী এবং ধর্মান্তরিত অবস্থায় দেখার প্রতীক্ষায় আছেন এ আওয়াজ তাঁদেরই।

আরও প্রমাণ হবে, সবচেয়ে অপরাধ, অপমান, বদনাম আর দুর্নামের এভারেস্ট যাঁর মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই আহত ভাগ্য আওরঙ্গজেব ওরফে আলমগীরের ইতিহাস যদি আকবরের পাশাপাশি আলোচনা করা হয়।

মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব

একপক্ষ বলেন, আওরঙ্গজেব গোঁড়া, হিন্দু বিদ্বেষী এবং অত্যাচারী। অত্যাচারের প্রমাণস্বরূপ ভ্রাতাদের হত্যা করা, বৃদ্ধ জন্মদাতাকে বন্দি করা এবং হিন্দু প্রজাদের ধর্মের নামে অত্যাচার করা যথা জিজিয়া কর গ্রহণ, হিন্দুদের মন্দির অপবিত্র করা বা ভেঙে ফেলা ইত্যাদি অনেক কিছুর উদাহরণ পেশ করেন।

আর অপরপক্ষ বলেন, আওরঙ্গজেব বা আলমগীর সমস্ত মুসলমান নৃপতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক, সমগ্র কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থকারী (হাফিজ) আলেম (বিজ্ঞ), সাধক, নিরপেক্ষ, উদার, দূরদর্শী এবং উপযুক্ত আদর্শ বাদশাহ ছিলেন। তিনি 'জিন্দাপীর' বলেও গণ্য হতেন।

প্রথম পক্ষের বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির সাধারণ ইতিহাস যথেষ্ট। আমাদের অনেকের মগজে এবং কাগজে তার প্রমাণের প্রাচুর্য অব্যর্থভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু দ্বিতীয়পক্ষের উক্তি প্রমাণে বহু দলিল ও ঐতিহাসিক সমর্থন এবং বিজ্ঞানপূর্ণ যুক্তি তর্ক ছাড়া মেনে নেয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া উচিতও নয়।

স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি এ তিনটিই আমাদের শিক্ষা ঘর। তন্মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন হিসেবে কলেজের ইতিহাস ঐ 'ভারতজনের ইতিহাস' হতেই উদ্ধৃতি রাখছি। ভারতের হাজার হাজার পাঠ্য পুস্তক ইতিহাসের উদ্ধৃতি দেওয়াও

>Goto List

যেমন সম্ভব নয় তেমনি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য ইতিহাসের সমস্ত কথা বাদ দেওয়াও যায় না।

এখানে প্রসঙ্গত হৃদয় ফলকে গেঁথে নেয়ার মত একটা কথা হচ্ছে এই যে, শিশু অবস্থায় শিশুর কচি মনের কোমল স্মৃতিপটে যে ছবি আঁকা যায় তা বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টতর ও আরও গভীর হয়ে মস্তিষ্ক পর্যন্ত আলোকিত অথবা সংক্রমিত করে তোলে। শিশুর মা যেমন শিশুকে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, ঠাকুর-দেবতা, মন্দির মসজিদ অথবা ভূত-প্রেতের প্রতি যে ধারণা জন্মিয়ে দেন শিশু সাধারণত বয়োপ্রাপ্ত হয়েও সেই প্রভাবে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। তেমনি স্কুলের ইতিহাসগুলো যদিও সংক্ষেপ তবুও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব শিক্ষাদাতা ও শিক্ষাদাত্রী এবং শিক্ষাগ্রহীতা ও গ্রহীত্রীকে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। স্কুলে যদি মাথায় এ কথাটুকু প্রবিষ্ট হয় যে, "আকবরকে মহামতি বলা হয়। তিনি হিন্দু মুসলমানকে সমান চোখে দেখতেন। আর আওরঙ্গজেব ছিলেন খুব ধর্মভীরু পণ্ডিত। কিন্তু তিনি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন, হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বৃদ্ধ পিতাকে বন্দি ও ভাইদের হত্যা করে সিংহাসনে বসেছিলেন" ইত্যাদি। তাহলে সাধারণ ক্ষেত্রে তারপর আরও বহু ইতিহাস পড়লেও বাল্যকালের ঐ প্রভাবটুকু কাটিয়ে ওটা কত কঠিন তা আজ নিরপেক্ষ চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকাদের চিন্তা করে দেখার দিন এসেছে এবং দেখতে হবে।

বর্তমানে ঐ ভারতজনের ইতিহাসে শ্রী ঘোষ বলেছেন, "শাহজাহানের মৃত্যুর আগেই আওরঙ্গজেবের রাজ্যাভিষেক হয় (জুলাই ১৬৫৮ ও জুন ১৬৫৯)। তাঁর মৃত্যুর পর তৃতীয়বার আওরঙ্গজেব মহাসমারোহে আগ্রার দুর্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন (মার্চ ১৬৬৬)। তিনবার অভিষেক কোন মুঘল সম্রাটের হয়নি। কিন্তু আওরঙ্গজেব যে মুঘল সম্রাটের মধ্যে বহুদিক দিয়ে অদ্বিতীয় হবেন, একাধিক অভিষেক হতে তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল।"

'রাজপুত্রদের প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়, আওরঙ্গজেব মারওয়াড় দখল করেন এবং নানা স্থানে মুঘল ফৌজ নিযুক্ত করেন। তাঁর আদেশে হিন্দু দেবালয় ধ্বংস করে বহু মসজিদও প্রতিষ্ঠিত হয়।" (ভাঃ জঃ ইঃ)

"১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব জিজিয়া কর পুনঃ প্রবর্তন করেন।" (ভাঃ জঃ ইঃ)

"ইসলাম ধর্মের আদেশ অনুসারে মুসলমান রাষ্ট্র ভিন্ন ধর্মের কোন স্থান হতে পারে না। পাঠান ও মুঘল সম্রাটদের মধ্যে যারা ভিন্ন ধর্মীদের প্রতি বিশেষ করিয়া হিন্দুদের প্রতি উদার ব্যবহার করেছেন তাঁরা ব্যক্তিগত মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন সত্য, কিন্তু ইসলামের আদর্শ সেবক বলে গোঁড়া মুসলমানদের কাছে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভ করতে পারেননি। আওরঙ্গজেব নিজেকে ইসলাম ধর্মের আদর্শ সেবক বলে মনে করতেন এবং রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে তিনি ইসলামের অনুশাসন বর্ণে বর্ণে পালন করার চেষ্টা করতেন। সেই

জন্য তাঁর রাষ্ট্রনীতিতে মুসলমান ছাড়া কোন ধর্মাবলম্বীর দাবি বা অধিকার স্বীকৃত হত না। বিধর্মীর অধিকার স্বীকার করা ইসলাম ধর্ম বিরুদ্ধ।" (ভাঃ জঃ ইঃ)

এ সমস্ত সাংঘাতিক কথায় এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আওরঙ্গজেব পূর্ণভাবে ইসলাম মেনে চলতেন। আর ইসলাম মেনে চললেই ঠিক তাকে পশু প্রকৃতির বর্বর, অনুদার এবং হিন্দু বিদ্বেষী হতেই হবে। তারপর আরও যা লেখা হয়েছে তা খুব গভীর চিন্তার বিষয়। ঐ ইতিহাসে আরও আছে–"চিন্তামন মন্দিরে গোহত্যা করে তিনি সাড়ম্বদের তা মসজিদে পরিণত করেছিলেন। সেই সময় গুজরাটে আরও বহু হিন্দু দেবালয় তিনি ধ্বংস করেছিলেন।" আরও লেখা আছে, "তিনি বিধর্মী হিন্দুদের সমস্ত টোল, চতুষ্পঠ’ দেব দেউল ধ্বংস করতে বলেন। সেই আদেশ অনুসারে হিন্দুদের বড় বড় তীর্থস্থানে বিখ্যাত দেব মন্দির ধ্বংস করেছেন–"

আরও লেখা হয়েছে–"গুজরাটে হিন্দুদের সমস্ত সম্পত্তি তাঁর আদেশে বাজেয়াপ্ত করা হয়" এ বিখ্যাত ইতিহাসে লেখক আরও লিখেছেন–"আগেই বলেছি যে, ইসলাম ধর্ম অনুসারে মুসলমান রাষ্ট্রে বিধর্মীর বসবাসের কোন অধিকার নেই।" ঐ ইতিহাসে আরও লেখা হয়েছে–"অর্থাৎ বিধর্মী বলে মুসলমানী ভারত রাষ্ট্রে তাদের বাস করার অধিকার নেই তা সত্ত্বেও হিন্দুদের বাস করতে দেওয়া হচ্ছে বলে মুসলমান সম্রাটরা হিন্দুদের মাথাপিছু জিজিয়া কর দিতে বাধ্য করতেন।" তার পরই ঐ ইতিহাসে হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের উত্তেজিত করার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে বলে অনেকের অনুমান। যেমন লেখক বলেছেন, "ভারতবর্ষ যাদের চিরকালের মাতৃভূমি সেই হিন্দুদের পরদেশবাসীর মতো অপমান ও অত্যাচার সহ্য করে লক্ষ লক্ষ টাকা জিজিয়া কর দিতে হত এ দেশে বাস করার জন্য। ইতিহাস এত বড় নিষ্ঠুর পরিহাস সহ্য করে না।" এছাড়া ঐ ইতিহাসে আরও বলা হয়েছে–"নতুন করে জিজিয়া প্রবর্তনের পর দিল্লির বিক্ষুব্ধ জনতা সম্রাটের কাছে এটা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাতে বিচলিত হননি উপরন্তু তিনি জনতার উপর দিয়ে হাতি চালিয়ে তাদের পদদলিত করে মারার আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অসহায় হিন্দুদের জোর করে মুসলমান করা।"

"হিন্দুরা মুসলমান হলে তাদের হাতির পিঠে বসায়ে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হত।" এতদ্ব্যতীত আরও লেখা হয়েছে–"আওরঙ্গজেবের ধর্মান্ধনীতির ফলে রাজপুত্র শক্তি ও মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল।" "দাক্ষিণাত্যের বিরাট হিন্দু পুনরভ্যুত্থান হয়েছিল মারাঠা বীর শাহজী শিবাজী শম্ভুজীর নেতৃত্বে।"

লেখক উপর্যুক্ত বাক্যগুলো স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যাই লিখেছেন লেখার আসল নায়ক যিনি বা যাঁরা তাঁদের আজ সমাজের কাছে ভুল প্রচারের অপরাধজনিত কলঙ্কের বোঝা বহন করতে হচ্ছে এবং হবেও। কারণ ইসলাম ধর্মে কোথাও

বলা হয়নি যে, "বিধর্মীদের অধিকার স্বীকার করা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ" বরং হযরত মুহাম্মদের (সা.) ইতিহাস এ কথাই স্মরণ করে দেয় যে, তিনি অমুসলমানদের পাশাপাশি বাস করছেন এবং মিলেমিশে থাকার জন্য ঐতিহাসিক সন্ধিস্থাপন করেন। আজও আরবে বহু ধর্মের মানুষ বাস করছেন। সারা পৃথিবীতে কোন মুসলমান রাষ্ট্রে ঐ অলীক আজগুবি অবান্তর আলেখ্য দৃষ্টিগোচর হয়নি।

এমনিভাবে চিন্তামন মন্দিরে গোহত্যা করাও কুচিন্তা বা কুকল্পনার নামান্তর। 'হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস, 'সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত,' জোর করে মুসলমান করা' ইত্যাদি কতটুকু সত্য আর কতটুকু মিথ্যা তা একজন অমুসলিম ঐতিহাসিকের বর্ণনায় পরিষ্কার হয়ে উঠবে। বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পুস্তকে লিখেছেন, ভোগ ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করে কেবলমাত্র পার্থিব জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করতে মুসলমান নরপতিগণ অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁরা সহস্র কাজে লিপ্ত হয়েও কখনো বিস্মৃত হননি যে, তাঁদেরকে একদিন আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে কার্যাকার্যের কৈফিয়ত দিতে হবে। ইসলামের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাদশাহগণ ন্যায়ের সীমার মধ্যে অবস্থিতি করে তাঁদের অধীন সমস্ত প্রজাবৃন্দকে সমচক্ষে দেখতেন। নরপতির ন্যায় বিচারে প্রজার সন্তোষ এবং সন্তোষের ওপর রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের অন্তঃকরণে এ সত্য যেন সুবর্ণ অক্ষরে খচিত ছিল।" ধর্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে কেউ কখনও বলপ্রয়োগ করেছেন–এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। মুসলমান বাদশাহদের যদি সে উদ্দেশ্য থাকত–তা হলে এতদিন রাজত্ব করার পর হিন্দুস্থানে হিন্দুর সংখ্যা কখনও মুসলমানের চতুর্গুণ হত না। হিন্দু ও মুসলমান একই দেশে একই পল্লীর ভেতর এ সুদীর্ঘকালব্যাপী মুসলমান রাজত্বের মধ্যে পরম সুখে পরম শান্তিতে বসবাস করছিল। বিদেশী স্বার্থান্ধ ঐতিহাসিকগণের কাল্পনিক চিত্রে অঙ্কিত মুসলিম নরপতিগণের স্বেচ্ছাচারিতা, নৃশংসতা ও ধর্মান্তরতার বিষয় পাঠ করে এবং কতিপয় স্বার্থপর বিদ্বেষপরায়ণ লোকের প্রচারিত জনরবের ওপর আস্থা স্থাপন করে এখনও সেসব মহানুভব নরপতিগণের নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করে থাকেন। রাজকার্যে যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করে মুসলেন শাসনকর্তাগণ ন্যায়পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেন। এমনকি হিন্দু বিদ্বেষী বলে অভিহিত সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দুকেই প্রধান সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রাজকার্যে যোগ্য ব্যক্তি তাঁর নিকট বিশেষ রূপে সমাদৃত হত। সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের কলঙ্ক কেউ তাঁর ওপর আরোপ করতে পারেনি। রাজ্যে শুভাশুভের দায়িত্ব হিন্দুগণের ওপর ন্যস্ত ছিল। তাঁর রাজত্বকালে দুজন অমুসলমান কর্মচারি রাজস্ব বিভাগে অতি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

কয়েকজন ধর্মান্ধ তাঁর নিকট অভিযোগ করেছিল রাজস্ব বিভাগে হিন্দুকে এরূপ বিশ্বাস করা অনুচিত। সম্রাট তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন তিনি

>Goto List

শরীয়তের (ধর্মনীতির) বিধি প্রতিপালন করে যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য পদে নিযুক্ত করেছেন। পবিত্র কোরআনে উক্ত হয়েছে যারা বিশ্বাসের উপযুক্ত তাদের ওপরেই বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং ন্যায়ের ওপর ভিত্তিস্থাপন করে বিচারকার্য সম্পাদন করবে।

এক একজন বাদশাহের ত্যাগের দৃষ্টান্ত পাঠ করলে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তাঁরা অনেক সময় রাজভাণ্ডার মুক্ত করে দান করতেন। কি দীন-দুঃখী কী অভাবগ্রস্ত কখনো বিফল মনোরথ হত না। কোন কোন বাদশাহ প্রাচীন যুগের খলীফাগণের অনুকরণে বিলাসবর্জিত অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন এবং কায়িক পরিশ্রম দ্বারা তাদের পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করতেন।

বাদশাহ ফিরোজশাহ তোঘলক বহু জনহিতকর কার্যে রাজকোষ হতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন, কৃষি কার্যে সুবিধার্থে তিনি পঞ্চাশটি জাঙ্গান (বাঁধ), চল্লিশটি মসজিদ, ত্রিশটি শিক্ষালয়, শতাধিক পান্থশালা, ত্রিশটি তড়াগ, শতাধিক দাতব্য চিকিৎসালয়, একশত স্নানাগার এবং শতাধিক সেতু ও বহু জনহিতকর কার্য করে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর কায়িক পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দ্বারা তাঁর সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করতেন। তিনি টুপি সেলাই ও পবিত্র কোরআন শরীফ লিখে তাঁর শেষ জীবনে আটশত পাঁচ টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। তার মধ্যে মাত্র চার টাকা আট আনা তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য রেখে অবশিষ্ট অর্থ দীন-দুঃখীকে দান করার জন্য উইল করে গিয়েছিলেন। .... সম্রাট বাবর তাঁর উপাসনা বলে বিশ্ব নিয়ন্তাকে হৃদগত করে তাঁর নিজের জীবনের পরিবর্তে জীবনাধিক পুত্র হুমায়ুনের জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। যে সমস্ত ঐতিহাসিক কী ঔপন্যাসিক মুসলিম বাদশাহদের অন্তঃপুরে সুরার তরঙ্গ প্রবাহিত করছিলেন তাঁদের মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমরা ঐতিহাসিক লেনপুল প্রণীত "আওরঙ্গজেব" পাঠ করতে পাঠকবর্গকে অনুরোধ করছি। সম্রাট নিজে কখনও মদ্য স্পর্শ করেননি এবং আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণ সুরা পান করতে কখনও প্রশ্রয় দেননি। ধর্মপরায়ণ আওরঙ্গজেব তাঁর প্রজাবর্গের উক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন।"

অতএব নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের সচ্চরিত্রের ওপর যারা কলঙ্কের কালিমা লেপন করে ইতিহাসের পাতাকে দূষিত করেছে প্রকৃত ইতিহাস তাঁদের ক্ষমা করবে না।

যাঁরা আজ আকবরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁদের চমক ভাঙার সময় হয়েছে। ইংরেজদের শত শত বছর ভারত শাসন অথবা শোষণের ইতিহাস, হিন্দু-মুসলিম প্রভৃতি জাতীয় ভারতীয়দের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা তথা স্বাধীনতার গ্লানির বীজ আকবরের সময়েই অঙ্কুরিত হয়েছিল। তিনিই প্রথমে ইংরেজ পাদ্রিদের রাজদরবারে স্থান দেন এবং ইংরেজ মহিলা হেরেমে স্থান দেন। তারপর

উদারতার নামে রাজনীতির খেলা শুরু করেন। কিন্তু ব্যভিচার প্রবণতার জন্যই আকবর ইংরেজদের মতলব বুঝেও না বোঝা হয়ে কাটিয়ে দিলেন। তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর যখন বাবার প্রতিনিধি হয়ে দিল্লির সিংহাসনে আসীন হলেন তখনই ইংরেজ জাতি ব্যবসার তুলাদণ্ড হাতে নিয়ে জাহাঙ্গীরের হাতের সহি রাজকীয় মোহরযুক্ত পত্রে অনুমতিপ্রাপ্ত হন। আর এই অনুমতিই ভারতের শোষণ-শাসনের অনুপ্রবেশদ্বার- ঐ অনুমতিই পরমাণু হয়ে শেষে ইংরেজদের পরমায়ু এবং পারমাণবিক বিস্ফোরণে বিবর্তিত হয়েছে। মধ্যপায়ী বিলাসী জাহাঙ্গীর বোঝেননি একটা সই বা টিপের মধ্যে কত হত্যা, মিথ্যা আর ষড়যন্ত্রের ইতিহাসি লুকিয়ে থাকতে পারে।

যাইহোক, শ্রী ঘোষের লেখা ঐ পাঠ্য পুস্তক ইতিহাসে আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে যত বিষাক্ত কথাই থাক তবুও এটুকু দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীকার করা হয়েছে যে, “ভারতবর্ষ যদি ইসলাম ধর্মের দেশ হতো তাহলে সম্রাট আওরঙ্গজেব হয়ত ধর্মপ্রবর্তক মুহাম্মদের বর পুত্ররূপে পূজিত হতেন। বাস্তবিক তাঁর মত সচ্চরিত্র, নিষ্ঠাবান মুসলমান ইসলামের জন্মভূমিতে দুর্লভ।” এতে আরো লিখা হয়েছে- “সম্রাট বলতেন বিশ্রাম ও বিলাসিতা রাজার জন্য নহে।” আরো লেখা হয়েছে- “বাস্তবিক বিলাসিতার অভ্যাস আওরঙ্গজেবের একেবারে ছিল না। বাদশাহদের বিলাসিতা তো দূরের কথা, সাধারণ ধনীর বিলাস ও স্বচ্ছন্দও তিনি ব্যক্তিগত জীবনে এড়িয়ে চলতেন। লোকে তাঁকে রাজবেশী ‘ফকির’ ও ‘দরবেশ’ বলত। তা স্তুতি নহে, সত্য,। পোশাক-পরিচ্ছদে ও আহারে-বিহারে তিনি সংযমী ছিলেন, সুরা-নারী-বিলাস তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।”

শ্রী ঘোষ আরও লিখেছেন- “কিন্তু আওরঙ্গজেব বিদ্যানুরাগী তো ছিলেনই, নিজেও বিদ্বান ও পণ্ডিত ছিলেন।”

“তিনি আরবী-ফারসি ছাড়া তুর্কী ও হিন্দি ভাষাতেও বেশ সহজে কথা বলতে পারতেন। ভারতবর্ষে মুসলমান আইনগ্রন্থ প্রণয়নে ফতোয়া-ই-আলমগীরীর রচয়িতা হিসেবে তাঁর কীর্তি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়।” এমনিভাবে সম্রাটের নিজের উদর পূরণ ও উদারতার উদাহরণ স্থাপনে নিজ হাতে টুপি সেলাই আর নিজ হাতে লেখা কুরআন শরীফ পরিবেশন রাজা-বাদশাহের ইতিহাসে আশ্চর্যতম ঘটনা। শ্রী ঘোষের ইতিহাসে আরও আভাস আছে- “নিজের হাতে তিনি কোরআন কপি করেছেন।”

আলমগীরের জন্য লেখা হয়েছে তাঁর ভাইদের মধ্যে তিনিই ছিলেন যোগ্যতম। অথচ ঐ ইতিহাসেই আছে- বড় ভাই দারাশিকোর জন্য বলা হয়েছে- “কিন্তু পিতার অত্যধিক স্নেহের ছায়ায় মানুষ হয়ে তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে প্রায় অনভিজ্ঞ ছিলেন বলা চলে।” দ্বিতীয় পুত্র সুজার জন্য বলা হয়েছে- “কর্মবিমুখ (অকেজো) ও অলস। তাঁর চরিত্রের প্রধান দোষ

ছিল– স্থিরভাবে কোন কাজ করার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেবের চরিত্র ছিল ঠিক এর বিপরীত। যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, স্থিরবীর ও হিসেবী। কর্মক্ষম ও তৎপরও ছিলেন তিনি যথেষ্ট। রাজনীতির জটিলতা সম্বন্ধে তাঁর যে অভিজ্ঞতা ছিল তা আর কারো ছিল না। শাহজাহানের পারিষদরা জানতেন যে, এ তৃতীয় পুত্রই সিংহাসনের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে হয়ত শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়ী হবেন। চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন গুজরাটের শাসক, কোন দিক দিয়া তিনি ঔরঙ্গবীরের সমকক্ষ ছিলেন না।”

আশ্চর্যের কথা, যে মুখে বলা হয়েছে ‘ক’ সারা জীবন চির কুমার ছিলেন আবার সেই মুখেই বলা হচ্ছে ‘ক’ দুই সন্তানের পিতা ছিলেন। এর নাম কী ইতিহাস না পরিহাস? এর নাম ইতিহাস না উপন্যাস? এর দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা না হিংস্রতার তালিম দেয়া? সেসব সঠিক সমীক্ষা সমাজেরই দায়িত্ব।

মুসলমানদের নিকট বড় অপরাধ হলেও যাকে হযরত মুহাম্মদের (দঃ) বরপুত্ররূপে পূজিত হইতেন’ বলে লিখতে দ্বিধা করা হয়নি, আবার সেই কলমেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ‘হিন্দুদের জোর করে মুসলমান করে হাতির পিঠে চাপিয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে শোভাযাত্রা বের করতেন। অথচ সকলেই স্বীকার করেন যে, মুহাম্মাদ (সা.) বিলাস ভোগের জন্য বাজনা একেবারে নিষিদ্ধ করেছেন। আলমগীরও মুসলমানদের মধ্যে বাজনাগীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। অতএব ব্যান্ড বাজিয়ে কী করে বরপুত্রের দ্বারা নবদীক্ষিত মুসলমানদের নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় মিছিল বের হতে পারে?

বিশ্ব ইতিহাসকে স্বীকার করতেই হবে। ইসলাম ধর্মে শাস্তি বিধান আছে নর হত্যার বদলে প্রাণদণ্ড। প্রাণদণ্ড বলতে শিরোচ্ছেদ। আর ব্যভিচারের প্রমাণে প্রাণদণ্ড এবং চোরের জন্য হস্তকর্তন ও চাবুক প্রয়োগ প্রভৃতি। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর আইনে বা তার সমাগ্রিক জীবনে কাউকে শূলে চড়িয়ে, না খেতে দিয়ে, বিষ প্রয়োগ করে অথবা কোন ভারী বস্তুর চাপ দিয়ে শাস্তি দেওয়ার নিয়ম ছিল না বা আজও নেই। অতএব জিজিয়া করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে হিন্দু জনতার উপর হাতি চালিয়ে দেবার হুকুম দিতে পারেন কি মুহাম্মদের (সা.) ভক্ত ও বরপুত্র (ঘোষ মহাশয়ের কথায়) আলমগীর তথা আওরঙ্গজেব?

অনেকের ধারণা এই প্রকার ঐতিহাসিকতা শুধুমাত্র আওরঙ্গজেবের চরিত্রকে কলঙ্কিত করার অপকৌশলই নয় বরং হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) সম্বন্ধেও কুৎসিত ধারণা জন্মিয়ে দিয়ে শিক্ষিত সমাজকে ইসলামবিমুখ করে দেবার এক উৎকট প্রচেষ্টা এবং জঘন্য ষড়যন্ত্র। অতএব হযরত মুহাম্মদের ভক্ত সারা বিশ্ব মুসলিম এরূপ চক্রান্তপূর্ণ ইতিহাস ও ঐতিহাসিকতাকে শ্রদ্ধার চক্ষে ক্ষমা করতে পারে না, পারা উচিতও না।

অবশ্য আকবরের জিজিয়া প্রথার বিলোপ সাধন আর আওরঙ্গজেবের জিজিয়া করের পুনঃ প্রচলন কথাটুকু সত্য হলেও জিজিয়া কাদের জন্য, কতটুকু পরিমাণে কেন নেওয়া হতো তার আলোচনা কিছু পরেই করা হবে। ঐতিহাসিক শ্রী ঘোষ ঐ বিখ্যাত ইতিহাসের পাতায় লিখেছেন, 'আওরঙ্গজেব কেবল আলমগীর নহেন, জিন্দাপীরও।' আবার সেখানেই লিখেছেন, "সৎনামী জাদুমন্ত্র জানে মনে করিয়া তিনি নিজের হাতে বাণী লিখিয়া জাদুমূর্তি আঁকিয়া দিলেন মুঘল সৈন্যদের পতাকাতে আঁটিয়া দিবার জন্য।"

আলমগীর যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একনিষ্ঠ ভক্তই হলেন অর্থাৎ শ্রী ঘোষের উক্তিতে তিনি যদি মুহাম্মদের 'বরপুত্রই হলেন এবং ইসলাম ধর্মের অনুসরণকারীই হলেন, তাহলে ইসলাম ধর্মে জাদু করা একেবারে হারাম বা অবৈধ। অতএব 'জাদুমূর্তি আঁকা কথাটা গভীর চিন্তার বিষয়। জাদুরূপী কোন নর বা নারী মূর্তি অথবা কোন জীবজন্তুর ছবি অঙ্কন ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ। সুতরাং জাদুর প্রয়োগ এবং মূর্তি অঙ্কন এ অপবাদ দুটি যৌক্তিক না অযৌক্তিক, মিথ্যা না সত্য তার ওপর দেবে নতুন সমাজ নতুন শতাব্দী।

এমনিভাবে 'আওরঙ্গজেব'কে বাংলায় লেখা হয়েছে ঔরঙ্গজীব'। 'জীব' মানে 'জন্তু'। হয়তো ঔরঙ্গজীব বলেই অনেকে শান্তি পেয়েছেন বা পান। তাই শান্তির ধারা সারা ভারতে ছড়াবার জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু আরবী, ফারসি, উর্দু ও ইংরেজি ইতিহাস হতে বাংলায় অনুবাদ করতে হলে 'ঔরঙ্গজীব' হতে পারে না বরং 'আওরঙ্গজেব' হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু মুসলমানদের নামগুলো উল্টে-পাল্টে পড়তে একটু মজাই লাগে বোধ হয়। কিছু দিন পূর্বেও শত-সহস্র বাংলা বই পুস্তকে আওরঙ্গজেবই লেখা হত কিন্তু কালের চক্রে চারিত্রিক উন্নতি বিকাশের সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলমান অনেক লেখকই 'ঔরঙ্গজীব' লিখতে শুরু করেছেন।

এছাড়া আওরঙ্গজেব বা আলমগীরের ওপর আরও বহু অভিযোগ আছে। যথা (১) তিনি কাকেও বিশ্বাস করতেন না। (২) তিনি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন তাই হিন্দু কর্মচারীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, (৩) হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, (৪) বৃদ্ধ পিতাকে বন্দি ও ভাইদের হত্যা করেছিলেন (৫) কেবল হিন্দুদেরই ওপর জিজিয়া কর চাপিয়েছিলেন (৬) তাঁর অযোগ্যতাই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ।

এসবের উত্তরে শুধু কিছু বলা যায় বা লেখা যায় তাই নয় বরং প্রত্যেকটির বিষয়ের ওপর সুবিস্তৃত আলোচনা করলে দশ খণ্ড করে এক একটা ইতিহাস লেখা যায়। তাই বাহুল্য মনে করে প্রামাণ্য ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে উপাদেয় তথ্য সংক্ষেপে সমাজের চিন্তা ধারার গতি পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশন করা হল–

(১) "তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না" একথাই যদি সত্যি হয় তাহলে তিনি কখনই বা এত নামায পড়তেন, আর কখনইবা টুপি সেলাই করতেন আর কখনই কোরআন নকল করতেন আর কখনইবা তিনি রাত্রে এত উপাসনা করতেন আর কি করেইবা আকবর অপেক্ষা বিরাট বিচিত্রময় ভারতবর্ষ শাসন করতেন আর সামলাতেন? আর যদি তিনি কাউকে বিশ্বাস না করতেন তবে নিশ্চয়ই সকলেই তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন; আর অসন্তুষ্ট কর্মচারী ও চাকরদের নিয়ে ধমকে ধমকে কিছু দিন বা কয়েক মাস অথবা কোন প্রকারে কয়েকটা বছর গোঁজামিল দিয়ে কাটানো যেতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, তিনি পাঁচ-দশ বছর নয় অর্ধ শতাব্দীকাল বা পঞ্চাশটি বছর রাজত্ব করেছেন। এর দ্বারা কি প্রমাণ হয় না যে, রাজকর্মচারী কেউ-ই তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন না অর্থাৎ তিনি কাউকে অবিশ্বাস করতেন না।

যে যশোবন্ত সিংহ একবার নয়, কয়েকবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তবুও দয়ালু সম্রাট তাঁকে প্রত্যেক বার ক্ষমা করেছিলেন যদিও যশোবন্ত সিংহ মুসলমান ছিলেন না। শুধু ক্ষমা নয়, উদারতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপনে তাঁকে কাবুলের শাসনকর্তা পর্যন্ত করতেও দ্বিধা করেননি।

মারাঠা নেতা শিবাজী শুধু অমুসলমানই ছিলেন না, রাষ্ট্রদ্রোহীও ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাঁকে তিনি বিশ্বাস করে পাঠিয়েছিলেন তিনি ছিলেন একজন অমুসলমান 'জয়সিংহ'। শিবাজী যখন আওরঙ্গজেবের দরবারে ক্ষমা চাইলেন বা আত্মসমর্পণ করলেন তখন তিনি তাঁকে ক্ষমা করলেন। ইচ্ছা করলে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে অথবা অনেক মুঘল সৈন্যকে রাতের অন্ধকারে এবং অতর্কিত আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগে হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ড দিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে পরম ও চরম শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তাঁকে ক্ষমা করে মহানুভব বাদশাহ্ ক্ষমা ধর্মের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেন। শিবাজীকে একবার নয়, কয়েকবার বন্দি করেছিলেন ও ছেড়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা শিবাজীর দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন ঐ জয়সিংহের ওপর বিশ্বাস করে। যখন তিনি তাঁর ধর্মের দোহাই দিয়ে মিষ্টান্ন পাঠাবার অনুমতি চাইলেন, সম্রাট তাও দিলেন। আজ বিশ্বে কোন এমন রাষ্ট্র আছে, যেখানে জেলখানায় কয়েদিকে আত্মীয়দের মিষ্টি পাঠাবার অনুমতি দেন? তাও এক এক ঝুড়িতে দু-এক মণ করে মিষ্টি। এক কিলো দু কিলো মিষ্টির ঝুড়িতে ঢুকে পলায়ন নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। শিবাজীর পলায়নের পর এটাই স্বাভাবিকই ছিল যে, জয়সিংহকে সন্দেহ করা। যেহেতু তাঁরই রক্ষণাবেক্ষণ সত্ত্বেও শিবাজীর পলায়ন সম্ভব হয়েছিল। আজ অনেকেই মনে করেন, জয়সিংহের সাথে শিবাজীর গুপ্ত যোগাযোগ ছিল। বাইরে যতটা যুদ্ধ হয়েছে সেটা বাহ্যিক, ভেতরে ভেতরে যুক্তি ও চুক্তি ছিল অন্য রকম। সে যাইহোক, সম্রাট আলমগীর

নিঃসন্দেহে সন্দেহ করতে পারতেন, কেননা শিবাজী ও জয়সিংহ উভয়েই ছিলেন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। তবুও কোন অধিকারে আমরা বলতে পারি যে, সম্রাট কাউকে বিশ্বাস করতেন না?

(২) 'তিনি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন' কী না তার উত্তর প্রথম নম্বরেই বেশ কিছুটা অনুমেয়। তবুও আজ আমরা ঐতিহাসিকদের কৃপায় জানতে পারছি তিনি নাকি হিন্দু কর্মচারীদের তাড়িয়ে দিয়ে তাঁদের স্থানে মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। এই কথাগুলোর অসত্যতা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই শুধু পাশাপাশি সত্যের আলোকবর্তিকা আনলেই মিথ্যার অন্ধকার নিমেষে বিদূরিত হবে।

মুসলমান বিদ্বেষী কোন রাজা অমুসলমান মন্ত্রী বা সেনাপতি রাখতে পারে না, তেমনি হিন্দু বিদ্বেষী কোন মুসলমান সম্রাটের পক্ষেও হিন্দু সেনাপতি নিয়োগ সম্ভব নয়। কেননা তাতে সেনাপতির দ্বারা সামরিক অভ্যুত্থানের আশংকা সততই লেগে থাকবে। কিন্তু আওরঙ্গজেব তাঁর সেনাপতি পদে বরণ করেছিলেন অমুসলমান জয়সিংহ এবং যশোবন্ত সিংহকে। শুধু তাই নয়, রাজা ভিম সিং, যিনি উদয়পুরের মহারাজা রাজসিংহের পুত্র ছিলেন তিনিও আলমগীরের উচ্চমানের বিশ্বাসী কর্মী ছিলেন। তাঁর অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য ছিল। ইন্দ্রসিংহের মর্যাদাও আওরঙ্গজেবের কাছে অল্প ছিল না।

রাষ্ট্রদ্রোহী শিবাজীর আপন জামাতা 'অচলাজী' পাঁচ হাজারী পদের অধিকারী ছিলেন। 'আর্জজী' ইনিও শিবাজীর আত্মীয় ছিলেন। তাঁকে 'দুই হাজারী' পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। এখন যদি আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, শিবাজীর মত সামান্য একজন সৈনিককে আওরঙ্গজেবের অঙ্গুলি হেলনেই নিঃশেষ করা যেত, তাই তিনি এত লোককে এত বেশি বিশ্বাস করতেন এমনকি বিধর্মী এবং শত্রুর আত্মীয়স্বজনের হাতেও এত ক্ষমতা দিয়েছিলেন, যার জন্য তাদের স্নেহ, মমতা, স্বজনপ্রীতির পরিপ্রেক্ষিতে আওরঙ্গজেবকে কষ্ট পেতে হয়েছে, তাহলে আসল ইতিহাসটাই বাদ পড়ে গেল। আসল কথা হচ্ছে এই যে, আলমগীর নিজে ছিলেন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী তাই তিনি কাউকে বিনা প্রমাণে সন্দেহ করাকে কল্পনা করতেও পারতেন না। কিন্তু ধন্য আমাদের সৌভাগ্য। আর ধন্য আমাদের ঐতিহাসিকতা। আমরা আসল ইতিহাসটাকে হজম করে উল্টে লিখেছি "তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করতেন না।"

(৩) "তিনি হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করেছিলেন" বলে যে অপবাদটি নিরপরাধ আওরঙ্গজেবের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তা যদি সত্য হয় তবে বলতে হয় আওরঙ্গজেব ইসলাম ধর্মের আইন মানতেন না। অথচ সমস্ত ইতিহাসে শত্রু ও মিত্র ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন যে, তিনি কুরআনের নীতি মেনে চলতেন। অতএব আজ আমরা তুলে ধরছি আওরঙ্গজেবের আদর্শের উৎস ঐ কুরআনের

>Goto List

বাণীর মর্মার্থ। যথা "ধর্মে জবরদস্তি নেই"। আবার কুরআনে অনত্র হযরত মুহাম্মদকে (সা.) বলতে বলা হয়েছে– "হে অমুসলমানগণ! তোমরা যার উপাসক আমরা তার নই... তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম।" তাছাড়া হযরত মুহাম্মদ (সা.) কোন মন্দির ভেঙ্গে ছিলেন বা ভাঙ্গিয়েছিলেন সে কথা আদ্যাপি কোন মুসলিম অমুসলিম কেউ-ই প্রমাণ করতে পারেননি। আজও প্রাচীনতম উপাসনা মন্দির মক্কার কা'বা ঘর তার জীবন্ত সাক্ষী।

এছাড়া সারা বিশ্বের প্রত্যেক মুসলমান রাষ্ট্রের কম বেশি অমুসলমান বরাবর ছিল বা আজও আছে। সৌদি আরবে অনেক বিধর্মী রয়েছেন এবং নাগরিকত্ব লাভ করেছেন। শুধু কা'বাঘর এবং মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠতম ও তৎসংলগ্ন মসজিদ আর তার চারপাশের কতকটা স্থান অমুসলমানদের জন্য যাওয়া নিষিদ্ধ। কারণ সারা বিশ্বের মানুষ যখন হজ করতে আসেন তখন সেই উপাসনার দৃশ্য দেখলে মনে হয় এই সীমারেখা আরও প্রশস্ত হলে বোধ হয় ভাল হতো। কেননা ঐ স্থানে চব্বিশ ঘণ্টার একটা সেকেন্ডও 'তওয়াফ' (প্রদক্ষিণ করা) উপাসনা বন্ধ থাকে না। অতএব কোন নীতিতেই গ্রহণযোগ্য নয় যে ঠিক নামাযের সময় মসজিদে, পূজার সময় মন্দিরে, উপাসনা করার সময় গীর্জায়, অপ্রয়োজনে অ-উপাসকদের অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে।

বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের ভারতবর্ষের মস্তিষ্কস্বরূপ বঙ্গদেশেও কয়েক বছর আগে স্কুলের পাঠ্য ইতিহাসে অনেক কিছু বেশি সত্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেত। প্রমাণস্বরূপ মাত্র সেদিন ১৯৪৬ সালে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা প্রাপ্তিস্থান হতে এবং হিন্দুস্থান প্রেস ১০, রমেশ চন্দ্রদত্ত স্ট্রিট, কলিকাতা হতে মুদ্রিত 'ইতিহাস পরিচয়' বই হতে কিছুটা অংশ তুলে ধরছি–" জোর করিয়া মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যই যদি আওরঙ্গজেবের থাকিত, তবে ভারতে কোন হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্বই বোধহয় থাকিত না। সেইরূপ করা তো দূরের কথা, বরং বেনারস, কাশ্মীর ও অন্যান্য স্থানের বহু মন্দির এবং তৎসংলগ্ন বহু দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি আওরঙ্গজেব নিজের হাতে দান করিয়া গিয়াছেন; সে সকল 'সনদ' আজ পর্যন্ত বিদ্যমান।"

স্কুলের ঐ পাঠ্য পুস্তকে আরও লেখা আছে, "আওরঙ্গজেব সুদীর্ঘ ৫০ বছর রাজত্বের মধ্যে এমন কোন প্রমাণ রাখিয়া যান নাই যে, তিনি কোথাও কোন হিন্দুকে জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছেন। এমনকি, শিবাজীর পৌত্র শাহুকে তিনি আট বছর কাল মুঘল দুর্গে বন্দি করিয়া রাখিয়াও কোন দিন তাহাকে মুসলমান করেন নাই; হিন্দুবেশেই শাহু মারাঠা দিগের মধ্যে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।"

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ঐ পুস্তকে আরো লেখা আছে, "মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য যে সমস্ত মন্দিরে ব্রাহ্মণগণ প্রচার কার্য চালাইয়াছিলেন কেবল মাত্র সেই গুলিই আওরঙ্গজেব ধ্বংস করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। মন্দির তলে সমবেত হইয়া বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিলে দেবতার আশীর্বাদ লাভ করা যাইবে, এই প্রলোভন দেখাইয়া কুচক্রীগণ কোন কোন মন্দিরকে রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিল। কাজেই তাহাদের ধ্বংসের প্রয়োজন হইয়াছিল।" কিন্তু আজকের স্কুল কলেজের ইতিহাসের ধারা বিপরীত। তাই শ্রীঘোষ তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন, "তিনি ইসলামের অনুশাসন বর্ণে বর্ণে পালন করিতেন। সেই জন্য তাঁহার রাষ্ট্রনীতিতে মুসলমান ছাড়া অন্যকোন ধর্মাবলম্বীর দাবি বা অধিকার স্বীকৃত হইত না। বিধর্মীর অধিকার স্বীকার করা ইসলাম ধর্ম বিরুদ্ধ।" "... চিন্তা মন মন্দিরে গোহত্যা করিয়া তিনি সাড়ম্বরে তাহা মসজিদে পরিণত করিয়াছিলেন।" "... ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে জানাইয়াছিলেন যে, ইসলামী বিধান অনুযায়ী তিনি কোন নতুন দেবালয় নির্মাণের অনুমতি দিতে পারেন না।" ".... তারপর আরও একটি আদেশ জারি করিয়া তিনি বিধর্মী হিন্দুদের সমস্ত টোল ও চতুষ্পাঠী দেব দেউল ধ্বংস করিতে বলেন।" ইত্যাদি আরও অনেক অবান্তর ও অবাস্তব কথা।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শ্রীঘোষের ঐ 'ভারত জনের ইতিহাস' ভারতে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য ১৯৬২ সালে লেখা, আর পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য ঐ "ইতিহাস পরিচয়' বইখানি ১৯৪৬ সালে লেখা। মাত্র ষোল বছরে আমাদের ঐতিহাসিকতার এত উন্নতি অথবা এত অবনতি।

যাইহোক, সত্য সিদ্ধান্তে এটাই গ্রহণযোগ্য যে, হিন্দুদের ধর্মে হস্তক্ষেপ বা মন্দির ধ্বংস আওরঙ্গজেবের নীতি ছিল না। তবে কিছু মন্দির তার সময়ে ভাঙা গিয়েছিল' অবশ্য তার পশ্চাতে কিছু কারণও ছিল। প্রথমত মন্দিরগুলো রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, যেটা পূর্ব আলোচনাতেই উদ্ধৃতিসহ প্রমাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত আকবরের সময় অনেক মসজিদ ভেঙে সেই স্থানে মন্দির তৈরি করা হয়েছিল এবং অনেক মসজিদকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেও মন্দির তৈরি করা হয়েছিল। যেমন–'মুনতাখাবুত্তয়াবিক' ও মোকতুবাতে ইমামে রব্বানী নামক দুইটি গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ হতে পাওয়া যায়।

"Mosques and prayer-rooms were changed into store rooms and into Hindu guardrooms"

"A nu mber of mosques were destroyed by Hindus and temples erected in there place."

আওরঙ্গজেবের সময়ে সৎনামী দল নামে হিন্দুদের এক দুর্ধর্ষ সন্ন্যাসী দল বিদ্রোহ ঘোষণা করে অনেক বাদশাহী সৈন্যকে নিহত করে এবং অনেক মসজিদ ধ্বংস করে। এই দলের নায়করা প্রচার করত যারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করবে তারা করবে না, আর যদি ভাগ্যচক্রে মরেই যায় তবে এক এক জনে রক্তে আশিজন করে লোক তৈরি হবে। তাদের পোশাক ছিল অসভ্য ও অদ্ভুত। দাড়ি গোঁফ এমনকি চোখের ভ্রূ পর্যন্ত মুণ্ডিত থাকত, তাই তাদের আর এক নাম ছিল 'মুণ্ডিত'। এদের পরিচয় শ্রীঘোষের লেখা ইতিহাসেও কিছু পাওয়া গেছে। যথা–"দিল্লি হইতে প্রায় ৭৫ মাইল দূরে নারলোন জেলায় সৎনামী সম্প্রদায়ের প্রধান ঘাঁটি ছিল।"

"যদি কোন বীর সৎনামীর মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহার রক্ত হইতে আরও ৮০ জন বীরের উৎপত্তি হইবে। দেখিতে দেখিতে প্রায় পাঁচ হাজার সৎনামী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইল। স্থানীয় ফৌজদারকে বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিতে হইল, শহরও সৎনামীরা দখল করিয়া লুটতারাজ করিল। মসজিদ ধ্বংস করিল এমনকি শাসন ব্যবস্থাও চালু করিয়া ফেলিল।' (ভাঃ জঃ ইঃ)

অতএব নিরুপায় আওরঙ্গজেব কয়েক হাজার সৈন্য পাঠিয়ে তাদের রক্তে ৮০ জন করে লোক তৈরি হওয়ার ধোঁকাপ্রদক অপপ্রচারকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেন এবং তাদেরই অত্যাচারে ধ্বংস হওয়া মসজিদগুলো পুনঃনির্মাণ করেন ও তাদের প্রবর্তিত নতুন শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান। কিন্তু আজ ঐ রাজদ্রোহী দল সৎনামীদের কোন অত্যাচার অনাচার নিরপেক্ষ মানুষদের কাছে নিন্দনীয় হওয়ার কোন কারণ নেই অথচ শ্রীঘোষের ইতিহাসে লেখা হয়েছে, ' মুঘল সৈন্যদের বিরুদ্ধে সৎনামীরাও বীরের মতো যুদ্ধ করিয়া হাজারে হাজারে নিহত হইল।"

তৃতীয়ত, যাঁরা স্বেচ্ছায় নব মুসলমান হয়েছিল তারা অনেকে কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রাক্তন ধর্মের ওপর কত বিরাগী এবং নতুন ধর্মে কত আস্থাশীল তা প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু মন্দিরেরও ক্ষতি সাধন করেছিল। যেমন উত্তরবঙ্গে নব মুসলমান রাজা যদ্দুর গোঁড়ামির কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু মহানুভব সম্রাট সেগুলোর সংস্কার সাধন করে যে উদারতার পরিচয় প্রদান করেছেন তা আজকের বাজারের ইতিহাসে দারুণভাবে দুর্লভ বলা যায়।

(৪) আওরঙ্গজেবের প্রতি আর এক অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, "তিনি বৃদ্ধ পিতাকে বন্দি ও ভাইদের হত্যা করেছিলেন।"

পিতাকে বন্দি করা নিঃসন্দেহে দোষণীয়। কিন্তু বন্দি কাকে বলে, তার স্বরূপ কী, বন্দি কেন করা হয় এবং তার উদ্দেশ্যই বা কী ইত্যাদি বিষয় গভীরভাবে পর্যালোচনা করা দরকার, নচেৎ আমরা বন্দি শাহাজাহানকে ঠিক চিনতে পারব না।

বীরত্ব প্রকাশের অভিলাষে প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে শৃঙ্খলিত করে কারারুদ্ধ করার নাম বন্দি। বন্দি সাধারণত নানা কষ্টের মধ্যে উপলব্ধি করে তার পরাজয় ও প্রতিপক্ষের জয়ের দাপট বন্দিদের খাওয়া, শোয়ার ব্যবস্থার পরিবর্তে থাকে অব্যবস্থা। কিন্তু শাহজাহান বন্দি কোথায় হয়েছিলেন? তেপান্তরের মাঠেও নয় আর অন্ধকূপ বা রুদ্ধ কক্ষেও নয়, বরং সেই সুরক্ষিত সুসজ্জিত অট্টালিকায়, যা ছিল আকবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর, মমতাজ প্রমুখ খ্যাতনামা সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীদের আরাম কক্ষ, কর্মক্ষেত্র ও গার্হস্থ্য ক্ষেত্র। যেখানে ছিল শাহী পালঙ্ক, শাহী কোমল পালঙ্কের গদি–ইয়ামেনী চাদরে ঢাকা। যেখানে তাঁর খাওয়া-দাওয়া, সেবা–শুশ্রূষার জন্য ২৪ ঘণ্টা ভৃত্যেরা হাজির থাকত। শাহজাহানের পিতা জাহাঙ্গীর নেই, স্নেহময়ী মাতাও নেই আর স্ত্রী মমতাজ তো বিদায় নিয়ে চলে গেছেন তাজমহলের নিচে। তাঁরা থাকলে হয়ত তাঁরাও থাকতেন ঐ ঐতিহাসিক পরিবেশে। আছেন শুধু তাঁর অত্যন্ত স্নেহ সিঞ্চিতা কন্যা আর আত্মীয়স্বজন। প্রায় সমস্ত আত্মীয়স্বজনই শাহজাহানের সাথে সাক্ষাৎ ও অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া প্রতি মুহূর্তে পিতার খেদমতে বা সেবায় নিয়োজিতা ছিলেন। শুধু তাই নয়, আওরঙ্গজেব সারা দিন রাত্রে অন্তত একবারও রাজকার্য সেরে স্বহস্তে পিতার পদসেবা করতেন, যা আজ প্রত্যেকের মস্তিষ্কে শিহরণের পুলক সৃষ্টি করে।

শাহজাহানের জন্য যখন চারদিকে রব উঠে যায় শাহজাহান পরলোক গমন করেছেন তখন পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। তারপর সর্বশেষে যখন আওরঙ্গজেবের জয় হয় তখন দেখা গেল শাহজাহান মৃত নন বরং মৃত্যুর হাত হতে ভগ্নদেহ শাহজাহান প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। ঐ অবস্থায় তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পিতার অন্ধ স্নেহ বড় দারা শিকোকেই তিনি রাজ্য দিতে মনস্থ করেন। এদিকে বেশির ভাগ হিন্দু প্রজা দারার সমর্থক আর মুসলমানরা আওরঙ্গজেবের সমর্থক। তবুও তিনি গভীর চিন্তাসহ সমাধানের পথ খুঁজতে যাচ্ছিলেন। ঐ অবস্থায় তাঁকে রাজনীতি করতে দেওয়ার অর্থ জোর করে মৃত্যুপথে নিক্ষেপ করার নামান্তর। অতএব এক্ষেত্রে পিতার পৃথক অবস্থান আধুনিক এবং পৌরাণিক বিচক্ষণ ঐতিহাসিকদের মতে অনুপযুক্ত কর্ম নয়।

দ্বিতীয় কথা শাহজাহানের সঙ্গে সকলেই সাক্ষাৎ করতে পেলেও তাঁর রাজপ্রাসাদের বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। তাই একদিন তিনি আলমগীরকে ডেকে বললেন, "আলমগীর! তোর মত হাফেজ সন্তানের নিকট আমি কি বন্দি? উত্তরে আওরঙ্গজেব বলেছিলেন, "আপনি সারা জীবন রাজনীতি করে অন্তরের প্রকৃত শান্তি কি পেয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেন, " কোনও দিন পাইনি আর আজও পাচ্ছি না। তার ওপর মমতাজও নেই।" আওরঙ্গজেব তখন বললেন, "আল্লাহ তাঁর পবিত্র কুরআনে জানিয়েছেন, "অন্তরের শান্তি আল্লাহর স্মরণেই সম্ভব।" অতএব আমি চাই না যে, আপনি এই বৃদ্ধ বয়সে অশান্তির রাজনীতি

করুন। বরং আপনার উপাসনা, আরাধনা আর আল্লাহর স্মরণের জন্যই এই পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা। শাহজাহানের কণ্ঠস্বর আরও কর্কশ হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, “তাহলে আমার প্রিয়া, তোর মা মমতাজের স্মৃতিসৌধ তাজমহল কি আমি আমার ইচ্ছামত দেখতে পাব না?” আওরঙ্গজেব উত্তরে খুব বিনম্রভাবে নিবেদন করেছিলেন’ ‘আব্বাজান! সত্যই কি আপনার তাজমহল দেখার সাধ, নাকি তাজমহল দেখার নামে অন্য কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে? ,শাহজাহান অশ্রুপ্লুত নয়নে বলেছিলেন, যেমন করে হোক আমাকে অন্তত একবার করে প্রতিদিন তোমার মায়ের স্মৃতিসৌধটা দেখতে দাও, আমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই। উত্তরে আওরঙ্গজেব বলেছিলেন, যদি এখানে আপনার শয়নকক্ষের মধ্যে থেকেই আপনার ইচ্ছামত তাজমহল দেখতে পান তাহলেও আপনাকে বাইরে যেতে হবে? শাহজাহান বলেছিলেন, বৎস, বাইরে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়, শুধু চোখে দেখতে চাই তাজমহল। তখন টেলিভিশন ছিল না, শাহজাহানের ধারণা ছিল বাইরে না গিয়ে তাজমহল দেখা অসম্ভব। কিন্তু আওরঙ্গজেব পৃথিবীর এক মূল্যবান মণি বিজ্ঞানময় কৌশলে দেওয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়ে দিলেন তার মধ্যে দৃষ্টি দিলে দূরের তাজমহল স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যেত। এখন ইংরেজ তা খুলে নিয়ে চলে গেছে। তবুও নকল যে পাথরটি বিকল্পভাবে লাগিয়েছে তাতেও তাজমহল দৃষ্ট হয়।

আসল সত্য আরও উহ্য হয়ে আছে অনেকের কাছে। যেমন শাহজাহান ভয়াবহ মৃত্যুপীড়া হতে প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন বটে কিন্তু বিশুদ্ধ বিবেক ও জ্ঞান প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল; আর মমতাজের গর্ভ হতে গর্ভস্থ শিশুর কান্নার স্বর শোনা গিয়েছিল। (কারো মতে পেটের ভেতরে পীড়াজনিত শব্দ– শিশুর ক্রন্দন নয়)। সমস্ত চিকিৎসক ও সাধারণের কাছে ওটা ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ঐ উপসর্গই মমতাজের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। তখন শাহজাহান শিশুর মত কেঁদে বলেছিলেন, “হে আল্লাহ! আমার অর্থবল, জনবল, মনবল সবকিছুর বিনিময়েও মমতাজকে ফেরাবার কোন উপায় নেই। কারণ তোমার শক্তির সামনে আমাদের অস্তিত্ব কত অসাড়, কত অকেজো।” তাই মমতাজের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য সে যুগে বিশ কোটি বার লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাইশ বছর ধরে বহু লোকের পরিশ্রমে পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য তাজমহল তৈরি হয়েছিল। ফলে রাজকোষ প্রায় অর্থশূন্য হয়ে পড়েছিল। তাতেও বৃদ্ধ শাহজাহান মানসিক অসুস্থতা হেতু শান্তি পাননি। তুষার শুভ্র আকাশছোঁয়া তাজমহল যথেষ্ট নয় মনে করে আর একটি ভ্রমর কালো কৃষ্ণ পাথরের তাজমহল তৈরি করতে মনস্থ করলেন। ভেতরে থাকবে পান্না-হীরা-চুন্নি, পদ্মরাগ মণি প্রভৃতি অমূল্য ধাতুর অদ্ভুত সংস্থাপন। আর শুভ্র ও কৃষ্ণ তাজমহলের মাটির নিচ দিয়ে থাকবে সংযোগ রাস্তা। শাহজাহান বিশেষ কোন প্রস্তুতি এবং পরামর্শ না করে কাজ শুরু

করেছিলেন বলে কিছু ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন। আওরঙ্গজেব বুঝেছিলেন, আবার যদি দ্বিতীয় তাজমহল সৃষ্টি হয় তাহলে দিল্লির রাজদরবার অর্থনৈতিক পতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে। তার ওপর পুত্রদের কলহ বিবাদের কারণে মমতাজের মৃত্যু শোকের প্রভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি মুহূর্তে মুহূর্তে মত পরিবর্তন করতে এবং ভুলক্রমে বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর অনুমতি দান এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিতে দ্বিধা করতেন না। তার অন্যতম কারণ ছিল, শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্যের জন্য তিনি তদন্ত বা সমীক্ষার পরিবর্তে সংবাদদাতা যা প্রথমে শোনাতেন তাই তাঁর মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যেত। তারপর তা মুছে ফেলা এবং আসল কথা বোধগম্য করানো বেশ কষ্টকর ছিল। শাহজাহানের জ্যৈষ্ঠ পুত্র দারা শাহজাহানকে সেবার নামে পরনিন্দা এবং নিজের পিতার প্রতি আনুগত্য এবং সারা ভারতে দারার কত জনপ্রিয়তা ও মনপ্রিয়তা আছে তা বারবার তুলে ধরে পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, অথচ গোটা ভারতবর্ষের মুসলিম জাতি বিশেষ করে মুসলমান মন্ত্রী, সেনাপতি এবং উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের দারার প্রতি দারুণ অনাস্থা আর অবিশ্বাস ছিল। যেহেতু তিনি তাঁদের ধর্মত্যাগী বলে বিবেচিত হতেন। সুতরাং দারাকে সিংহাসনে দিলেই বিদ্রোহের দাবানল হু হু করে জ্বলে উঠতো। সারা দেশে একাধিক বিদ্রোহ দমন করা সহজ কিন্তু নিজের দরবারের বিদ্রোহ দমন করা মোটেই সহজসাধ্য নয় বরং অসাধ্য। অতএব নানা দিক দিয়ে চিন্তা করে দেখলেন, এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে হয় যে, যদি শাহজাহানের বন্দি-মার্কা বিশ্রামের ব্যবস্থা না করা হতো তাহলে অবস্থা যা হতো তা লোমহর্ষক। তাই বিচক্ষণ ইতিহাস বিজ্ঞানীদের মতে শাহজাহানকে আরাম কক্ষে আটকে রক্তনদীর স্রোতস্বিনী গতিকে স্তব্ধ ও বন্দী করা হয়েছে। বন্দি হবার পূর্বে শাহজাহান এক দুঃসাহসিক কুৎসিত পদক্ষেপ নিতে গিয়েছিলেন যা তার সদগুণ ও সুনাম যশের মৃত্যু ঘটাতো যদি না তিনি অসুস্থ, অতিবৃদ্ধ এবং স্ত্রীর বিয়োগ ব্যথায় মস্তিষ্ক বিকৃত রোগী বলে গণ্য না হতেন। তবুও তা সত্যের খাতিরে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আওরঙ্গজেব যখন দিল্লি হতে দূরে ছিলেন তখন তাঁরই পুত্র মহম্মদকে সিংহাসন দেবার লোভ দেখিয়ে বাচ্চা বয়স্ক শিশুকে বিদ্রোহী করতে চরম চেষ্টা করেছিলেন শাহজাহান। কিন্তু শাহজাহানের ঐ চক্রান্ত সফল হয়নি। আওরঙ্গজেবের সুনাম ও সদগুণাবলীর কারণে দেশ-বিদেশে, ঘরে-বাইরে তিনি 'ফকীর', 'জিন্দা পীর', 'দরবেশ', 'আলমগীর' এবং 'মহিউদ্দীন' এমন বহু নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল বজ্রের মত বিশেষত নারীর প্রতি আকর্ষণ হেতু তিনি কোন দিনও নমনীয় ছিলেন না। তাই দারা এবং তাঁর সমর্থকদের পরামর্শে আওরঙ্গজেবকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। তবে

পরামর্শ দাতারা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নতুন অগ্নি বিপ্লব ও বিদ্রোহ যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে তা তাঁরা বুঝতে পেরে ঠিক করেছিলেন আওরঙ্গজেবকে রাজদরবারে বা হেরেমে আসতে বলা হবে। তাঁর আসার সাথে সাথেই দুর্ধর্ষ তাতার যুবতীরা তাঁকে জোর করে মদ্যপান করার চেষ্টা করে সকলে মিলে হত্যা করবে। পরে রটিয়ে দেয়া হবে তিনি বাইরে মদ্যপান এবং ব্যভিচারের বিরোধী ছিলেন বটে কিন্তু হেরেমে তিনি স্বয়ং মদ্যপান করে উন্মত্ত হয়ে তাতার রমণীদের ব্যভিচারে বাধ্য করতে গিয়ে নিহত হন। এর ফলে প্রমাণ হবে আওরঙ্গজেবকে হত্যা করা হয়েছে ঠিকই হয়েছে। হয়ত কেউ কোন প্রতিবাদ না করে এটাই মেনে নেবে যে, "চকচক করলেই সোনা হয় না"। সমস্ত চক্রান্ত ঠিকঠাক। শাহজাহানকে শুধু শোনানো হয়েছিল যে, আওরঙ্গজেব পিতৃ হত্যার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করেছেন কিন্তু তাঁর সুযোগ্য পুত্র দারা এবং তাঁদের অনুচরবর্গের দ্বারা তা ব্যর্থ হয়। অতএব নিজে নিহত হবার পূর্বেই আওরঙ্গজেবের উপযুক্ত দণ্ডের প্রয়োজন আছে।

আওরঙ্গজেবকে শাহজাহানের স্বাক্ষর করা পত্র পাঠানো হল। তিনি সেদিন অসুস্থতা সত্ত্বেও পিতার আদেশে আগমন করতে প্রস্তুত হলেন। রাজদরবারে পৌঁছেও পিতার আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে কোন ত্রুটি হয়নি যদিও কুপরামর্শ দাতাদের পরামর্শে তিনি আওরঙ্গজেবের প্রতি অনেকবার পক্ষপাতিত্ব ও অবিচার করেছেন। কিন্তু তবুও সমস্ত কিছু ভুলে পিতার পদপ্রান্তে হাজির হয়ে শুভাশিস নেবেন আওরঙ্গজেব আর প্রত্যক্ষ শুভাশিস নেবেন বিখ্যাত বিদূষী ভগ্নি জাহানারার। যিনি সমস্ত কোরান কণ্ঠস্থ করেছিলেন এই সত্যের প্রতিচ্ছবি বোনদেরই কাছ হতে।

যাঁরা আজও মৌলিক ইতিহাসে চরিত্র দৃঢ়তায় স্বচ্ছ সুন্দর তারকার ন্যায় অমর হয়ে আছেন সেই পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী রওশনআরা চক্রান্তের সংবাদ অবগত ছিলেন। তবুও তাঁর সহনশীলতার সীমান্ত অতিক্রম করে গিয়েছিল। যখন বুঝতে পারলেন আওরঙ্গজেবের মৃত্যু অবধারিত তখন তিনি বিশ্বস্ত দূত দ্বারা আওরঙ্গজেবকে সংবাদ পাঠালেন এবং সমস্ত চক্রান্তের ধারা জানিয়ে দিলেন। আওরঙ্গজেব চক্রান্তকারীদের ওপর অতিশয় দুঃখিত হলেন এবং সেই সঙ্গে তাদের দমন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

প্রতিনিয়ত পিতার ঘন ঘন ভুল-ভ্রান্তির অবসান ঘটানোর একটা পথ ছিল পিতাকে হত্যা করা অথবা বন্দি করা। কিন্তু পিতৃহত্যা আওরঙ্গজেবের প্রাণপ্রিয় ধর্মের বিপরীত এবং মানবতাবিরোধী, যা তার পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে সমস্ত ফিতনা-ফাসাদের মূলোৎপাটনের জন্য সহজ-সরল স্বাভাবিক পথে সম্মানজনক ও আরামদায়কভাবে আটক রাখার ব্যবস্থা করলেন। আর এরই নাম নাকি বন্দি।

>Goto List

এবার কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন এত সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির, জিন্দাপীর, সত্যের প্রতীক বিখ্যাত পণ্ডিতের পক্ষে কীরূপে সম্ভব হয়েছিল সিংহাসনকেন্দ্রিক কোন্দল? কীরূপে সম্ভব হয়েছিল ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধ? আর এ কথা কী সত্য যে, তিনি তাঁর ভাইদের হত্যা করেছিলেন?

এবার আসুন সমীক্ষান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাক। আওরঙ্গজেব ছোট বেলাতেই সমগ্র কোরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করেছিলেন। ত্রিশ অধ্যায় যুক্ত সমগ্র কোরআন মুখস্থ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি একজন পূর্ণ আলেম, মোল্লা ও মাওলানা হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আওরঙ্গজেব সারা দিন রাতে খুব বেশি কোরআন পাঠ করতেন, তার প্রমাণ মূল ইতিহাস। আর যুক্তি হচ্ছে তিনি নিজ হাতে কোরআন কপি করতেন। তখন প্রেস ছিল না, অতএব অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও জোরালো স্মরণ না রাখলে তা অনর্গল লেখা যায় না, অথচ তার শুধু একটি অক্ষর নয় বরং একটি 'জবর' 'জের' অর্থাৎ আ-কার ই-কার পর্যন্ত গোলমাল হলে সেই কোরআন বাতিল বলে গণ্য হয়।

আওরঙ্গজেব চেয়েছিলেন, তিনি রাজ্য রাজনীতি ত্যাগ করে শুধুই সাধনা উপাসনা ও কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্য দিয়ে কাটাবেন কিন্তু শাহজাহান জানতেন ভাইদের মধ্যে আওরঙ্গজেবই একমাত্র যোগ্য। সেজন্য পিতা-পুত্রে যৌবনের পদার্পণের পর হতেই ঐ বিষয়ে মৃদু উপদেশ, আদেশ আর তিরস্কারের কষাঘাত সহ্য করতে হয়েছে আওরঙ্গজেবকে অনেকবার। শেষে জয় হলো পিতা শাহজাহানের। পিতার শেষ যুক্তি ছিল এই– "তুমি আমার চেয়ে ধর্মের দিকে শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর। সুতরাং পিতার সেই আদেশ শিরোধার্য, যদি সেই আদেশ ধর্মের প্রতিকূল না হয়। অতএব রাজনীতি করা ধর্মে অনুমোদিত না নিষিদ্ধ তুমিই ঠিক করে নিও। আমার দ্বিতীয় কথা– আমা অপেক্ষাও তুমি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বেশি ভক্ত বলে আমার ধারণা। অতএব তিনি ঘরসংসার স্ত্রীপুত্র পরিজন সমাজ ত্যাগ করে ধার্মিকতা প্রদর্শন করেছেন না সমস্ত কিছুর ভারসাম্য বজায় রেখে ধার্মিকতার শ্রেষ্টতম কৃর্তি স্থাপন করেছেন? এই সুচিন্তিত এবং সূক্ষ্ম অথচ তীব্র প্রশ্নের উত্তরে আওরঙ্গজেবকে পরাস্থ হতে হয় এবং পার্থিব জনকল্যাণকর বিষয়ে তাঁকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হতে হয়।

সেই সময়ে ভারত বিখ্যাত একজন মুসলমান ফকির এবং খুব উচ্চপর্যায়ের সাধকের দরবারে তাঁর দোয়া নেবার জন্য অনেকেই যেতেন। বাল্যকালে আওরঙ্গজেব স্বয়ং তাঁর পর্ণকুটিরে পদার্পণ করে তাঁকে দেখে অবাক হলেন। ছিন্ন তালি দেওয়া বস্ত্র, নির্ভয় চিত্ত। প্রফুল্লাবদন উদাসভাবে আর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে অবিলম্বে উত্তর দান যেন পাগল, শিশুর উত্তর প্রদানের মত।

আওরঙ্গজেব তাঁকে সালামপূর্বক বললেন– আমার কিছু বক্তব্য আছে। সাধক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, আগে বস তারপর কথা। ছেঁড়া পুরাতন মখমলের উপর

তাঁর পাশে বসলেন এবং বললেন– আমি দিল্লির সিংহাসনের জন্য দোয়া নিতে এসেছি, যেন সাড়া ভারত জুড়ে অশান্তি আর রক্তপাত না হয় আর আমার মধ্যে যেন রাজকার্য পরিচালনা করার যোগ্যতা থাকে। উত্তরে তিনি বললেন, কেন? তুমি তো দিল্লির সিংহাসন পেয়ে গেছ তার ওপরে তো তুমি বসে আছ। তারপর তার সেই ময়লা মখমলে হাত চাপড়ে বললেন– "দেখ, এটাই হলো দিল্লির সিংহাসন।"

দারা, সুজা, মুরাদ একে একে ঐ জীবন্ত দরবেশের কাছে হাজির হলেন। প্রত্যেকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্বক দিল্লির বাদশাহী পাবার অনুকূলে দোয়া প্রার্থনা করলেন। স্বনামধন্য দরবেশ প্রত্যেককে বসতে বললেন। তখন সকলেই মাটির উপর বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর দরবেশ বললেন– তোমরা তোমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে নিয়েছ। তখন সকলেই একবাক্যে উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন তাঁদের ভাগ্য ফল। দরবেশ বললেন, 'মাটিতে যারা বসেছ তারা বাদশাহী পাবার যোগ্য নয়।'

আওরঙ্গজেব অত্যন্ত যোগ্য ছিলেন বলেই সম্রাট শাহজাহান তাঁকে অনেকবার জোর তাগিদে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহ দমনে, প্রশাসনকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। ঐতিহাসিকরা একমত যে, দীর্ঘদিন যাবৎ আদিল শাহের সঙ্গে শাহজাহানের যুদ্ধ চলছিল। শাহজাহান শিবাজীর পিতা শাহজী ও আদিল শাহের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করে সম্রাট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেন। দাক্ষিণাত্য সম্রাটের করতলগত হল। এ শত্রুভাবাপন্ন দুর্ধর্ষ দাক্ষিণাত্যের শাসনভার কোন শাহজাদাকে দেয়া যায়, অনেক চিন্তা-ভাবনার পর আওরঙ্গজেবের ওপর দাক্ষিণাত্যের প্রশাসন ভার ন্যস্ত হয়। অতএব এখানে অন্য ভাইদের তুলনায় আওরঙ্গজেবের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল। শাহজাহান অন্য পুত্রদেরও দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দারা, সুজা একেবারে মাতাল ও অপদার্থ ছিলেন। অবশ্য মুরাদের মধ্যে কিছু যোগ্যতার আভাস পাওয়া যেত। ১৬৪৬ খৃস্টাব্দে আল মর্দান নামে একজন সুদক্ষ বীর সেনাপতি মুরাদের অধীনে বলখ বিজয়ে পাঠালেন। সম্রাট শাহজাহান মুরাদের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন তা সত্ত্বেও যুদ্ধে অধ্যবসায়ী ও দুরদর্শী হওয়ার মানসে সম্রাট শাহজাহান এ সমরায়োজন করেছিলেন। আলি মর্দানের যুদ্ধ কৌশলে বলখ মুঘলদের দখলে আসে। আয়েসী মুরাদ পার্বত্য প্রদেশে থাকতে চাইলেন না। সুষ্ঠু মোঘল প্রশাসন কায়েম না করে মোঘল হেরেমে ফিরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে উজবেগগণ শক্তিশালী হয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করল, বলখ মুঘলদের হাত হতে চলে গেল। সম্রাট শাহজাহান তখন তিরস্কার করে বললেন, "আমার আদেশ অগ্রাহ্য করে ফিরে এসে যে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে তাতে আমার চেয়ে তোমারই ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়েছে"।

যাইহোক পুনরায় তিনি আওরঙ্গজেবকে পাঠালেন বলখ বিজয়ে। আওরঙ্গজেব পিতার আদেশে দুরাকাত নামায অন্তে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে রওয়ানা হলেন। এখন বলখ হাতছাড়া, আবার নতুন করে বিদ্রোহ করে বলখ দখল সহজসাধ্য নয়, তবুও আওরঙ্গজেবের উৎসাহ ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব নেই। ১৬৪৭ খৃস্টাব্দে যে তিনি বীরবিক্রমে পুনরায় বলখ অধিকার করলেন এবং বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করে দেশে আবার শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন।

এদিকে আবার বুখরা হতে আবদুল আজিজ এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে আওরঙ্গজেবকে আক্রমণ করলেন। আওরঙ্গজেব আবার দুরাকাত নামায শেষে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে এক উৎসাহব্যঞ্জক ভাষণে সৈন্যদের অপরাজেয় মনোবলের অধিকারী করে তুললেন। ঐ আক্রমণকারী দলকে প্রতিহত করে তিনি তৈমুরাবাদের দিকে সসৈন্য ধাবিত হলেন। ঐ সময় তাঁর বীরত্ব বুদ্ধিমত্তা রণনিপুণতা ও দুরদর্শিতায় ভীত বা প্রভাবিত হয়ে বুখারার সুলতান সন্ধির প্রস্তাব দেন।

ঠিক ওই সময়ে মুঘল বাহিনী ভারতে ফিরে যেতে চাইলে বিচক্ষণ আওরঙ্গজেব মেনে নিয়ে ভারত অভিমুখে যাত্রা করে ১৬৪৭ খৃঃ কাবুলে এসে পৌঁছলেন। ভারত সীমান্ত পেরিয়ে এশিয়া মহাদেশের ঐ বিপদসংকুল স্থানে আওরঙ্গজেবের অভিযানের কারণ সম্রাট শাহজাহান এক সময় পুত্রদের কাছে তৈমুরের বাসভূমি ও পূর্বপুরুষদের অধিকৃত সমরখন্দ দখলের অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন। পিতার ঐ মনস্কামনা পূরণের জন্য আওরঙ্গজেব মৃত্যু ভয় উপেক্ষা করে সৎ সাহস ও পিতৃআনুগত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সৈন্য বাহিনী দীর্ঘকাল বিদেশে কাটানোর ফলে যুদ্ধবিমুখ হয়ে দেশে ফিরতে চাইলে আওরঙ্গজেব এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। উপরোক্ত আলোচ্যাংশে মুরাদের অযোগ্যতা আর পিত্রাদেশ অবহেলা সবিশেষ লক্ষণীয়। অপরদিকে আওরঙ্গজেবের যোগ্যতা, ধর্মপ্রবণতা এবং পিতৃভক্তির আদর্শ প্রণিধানযোগ্য। মধ্য এশিয়ায় দ্বিতীয় শাহ আব্বাস কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য বিশাল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলে এবারেও দূরদর্শী যুদ্ধনীতি বিশারদ আওরঙ্গজেবকেই যেতে হল মৃত্যুর মুখোমুখি হতে। ১৬৪৮ খৃস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে আওরঙ্গজেব প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে বিজয়ী হয়ে শাহজাহানকেই শুধু নয় বরং সর্বজন মনে আকর্ষিত হন।

আওরঙ্গজেবের এত বীরত্ব ও খ্যাতি অপর ভাইদের চিন্তিত করে তুলেছিল; বিশেষ করে দারাকে। তাই শাহজাহানের কানে নানাভাবে বিষবর্ষণ শুরু করেছিলেন। ঠিক ঐ সময়ে এক নতুন ঘটনা ঘটে যায়। ১৬৪৯ খৃঃ ১৬ মে আওরঙ্গজেব পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধে আপ্রাণ চেষ্টা করেও পরাজিত হন। অমনি অপরের প্ররোচনায় শাহজাহান আওরঙ্গজেবের ওপর ক্রোধান্বিত হয়ে পত্র লেখেন—"পত্র পাঠ প্রত্যাবর্তন কর, আমার আদেশ এটাই। কারণ তোমার ত্রুটিতেই পরাজয় হয়েছে।"

আওরঙ্গজেব কোন দুঃখ অভিমান ক্রোধ প্রদর্শন না করে পিতার পদপ্রান্তে উপস্থিত হলেন। সিংহাসন, বিজয়মালা, নেতৃত্ব কিছুই রাজপুত্রের যেন প্রয়োজন নেই, শুধু চান উপাসনা করার সুযোগ, পড়ার আর লেখার ফুরসত।

সম্রাট লোকের কথা শুনে যে ভুল করেছিলেন একথা তাঁকে কেউ হয়তো বলেনি কিন্তু ঠিক তার পরেই সম্রাট নিজেও চেষ্টা করলেন একবার। কিন্তু পরাজিত হলেন। আবার তৈরি হয়ে আক্রমণ করলেন। তিনবার আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়ে মুখে স্বীকার করলেও বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, আওরঙ্গজেব ত্রুটিমুক্ত। আর জয়ের সাথে পরাজয়ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে, যেমন করে আলোকের পাশে অন্ধকার থাকে সম্পর্কযুক্তভাবে।

যাইহোক, যখন সম্রাটের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ রটিয়ে দেয়া হলো সেই সময়ে আসলে সম্রাট সত্তর বছরের বৃদ্ধ শয্যাগত কঠিন মুমূর্ষু রোগী। তাঁর মৃত্যুর কথা রটিয়ে দারা দিল্লির সিংহাসনে বসেছেন। এ ঘটনাটি ঘটেছিল ১৬৫৭ খৃস্টাব্দে।

শ্রীঘোষ তাঁর ইতিহাসে দারার প্রতি দারুণ দরদ থাকা সত্ত্বেও লিখেছেন, "কিন্তু পিতার স্নেহের ছায়ায় মানুষ হয়ে তিনি যুদ্ধবিগ্রহ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে প্রায় অনভিজ্ঞ ছিলেন বলা চলে।" দ্বিতীয় পুত্র সুজার জন্য লিখেছেন, "কর্মবিমুখতা ও আলস্য তাঁর চরিত্রের প্রধান দোষ ছিল।" আরও লিখেছেন, 'স্থির হয়ে কোন কাজ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।" অন্যদিকে আওরঙ্গজেব সম্পর্কে লেখক বহু প্রকার অশ্লীল অসংযত অপবাদ সৃষ্টি করলেও দু-একটি ইতিহাসে যা বলা আছে তা বিশ্বাস করলে লেখকের নিজের লেখা অভিযোগগুলো মিথ্যায় পরিণত হয়। আর আওরঙ্গজেব সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন শ্রী ঘোষ লিখেছেন, "আওরঙ্গজেবের চরিত্র ছিল এর ঠিক বিপরীত। যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমনি স্থির বীর ও হিসাবী, কর্মক্ষম ও তৎপর ছিলেন তিনি যথেষ্ট। রাজনীতির জটিলতা সম্বন্ধে তাঁর যে প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়ী হবেন।" তিনি মুরাদের জন্য লিখেছেন, "কোন দিক দিয়ে তিনি আওরঙ্গজেবের সমকক্ষ ছিলেন না।"

মোটকথা, বিবাদ, ঝগড়া, কাটাকাটি হত্যা লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা নিঃসন্দেহে দোষণীয়। কিন্তু রাজাদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের ধ্বংসলীলা, অশোকের নরহত্যা, ভাতৃ হত্যা ও দেশকে শ্মশানে পরিণত করার ইতিহাস সাধারণ দৃষ্টিতে মন্দ হলেও রাজা-বাদশাহের ক্ষেত্রে তা বলা যায় না। বিগত ও বর্তমানের হতভাগ্য ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই বহন করছে। কিন্তু আওরঙ্গজেবের ক্ষেত্রেও ঐ দোহাই দিয়ে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করার ওকালতি করে তাঁর উজ্জ্বল ইতিহাসকে অনুজ্জ্বল না করাই শ্রেয়।

শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার পরাজয় ও মৃত্যুর জন্য দায়ী যশোবন্তসিং এবং রাজপুতগণের বিশ্বাসঘাতকতা। প্রথমে দারার বিরুদ্ধে তিন ভাই-ই একমত হলেন যে, দারাকে কোন মতেই দিল্লির সিংহাসনে রাখা যাবে না। আওরঙ্গজেব সিংহাসনলোভী ছিলেন না বরং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেককে অকল্যাণ হতে রক্ষা করতেই তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। অবিভক্ত বঙ্গে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক 'ইতিহাস পরিচয়' যা ১৯৪৬ সালের সেই পুস্তক এবং ইংরেজ ঐতিহাসিক Lanepole, Analas of Rajas than, প্রফেসর যদুনাথ সরকারের 'History of Auranjeb এবং ১৯৬৩ সালে ছাপা প্রফেসর H. R. Chaudhury A. B. Siddique প্রমুখ পণ্ডিতদের বই পুস্তক এবং 'তারিখে আলমগীর' ইত্যাদি পুস্তক হতে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

"দারার চঞ্চল স্বভাব এবং রুক্ষ মেজাজের জন্য দরবারের অনেকেই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর মতবাদ (হিন্দুবাদ) অনেকের মনে বিরুদ্ধভাব এবং ঘৃণার উদ্রেক করেছিল। তাঁর হিন্দুদের সঙ্গে মিত্রতা বরং শিয়া মতবাদের প্রতি অনুরাগ সিংহাসন লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় পুত্র বাংলার শাসনকর্তা সুজা বুদ্ধিমান এবং কৌশলী শাসক ছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ছিলেন এবং মদ্যপানের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি তাঁর অনেক সদগুণ নষ্ট করেছিল।"

শ্রী ঘোষের ইতিহাসে উদ্ধৃতি উপরে দিয়েছি তাতে তিনি যে মদ্যপানের চূড়ান্ত মাতাল ছিলেন এটা গোপন রাখা হয়েছে। আর শেষের উদ্ধৃতির মধ্যে তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা, নারীলোলুপতা ও ব্যভিচার দোষ গোপন করে শুধু লেখা হয়েছে 'আমোদপ্রিয় ছিলেন'।

তারপর অধ্যাপক চৌধুরীদের ইতিহাসে ঠিক তার পরেই লেখা আছে-"সর্বকনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন গুজরাটের শাসনকর্তা। তিনি একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়েছিলেন। তিনি চরিত্রহীন এবং ঘোর মদ্যপায়ী ছিলেন। শাসকদের যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার তাঁর মধ্যে অভাব ছিল।" অতএব রাজপুত্র চরিত্রহীন মদ্যপায়ী হলে রাজ্যের সুন্দরী সতীদের কী পরিণতি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। একজন খুব ধনী বিত্তবান ধনকুবের মদ্যপায়ী ও চরিত্রহীন হলে বাড়ির চাকরানীর ও অধীনস্থ নরনারীর ভাগ্যে কী ভয়াবহ দুর্ভোগ নেমে আসে তা অনেকের জানা আছে। অতএব আওরঙ্গজেব মাথা তুললে ভারতের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্য সূর্যের মত উদিত না হলে অন্যায়ের অন্ধকার ভারতের নির্মল নীলকাশের গায়ে জমাটবদ্ধ রূপ নিত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দারা তার পিতার স্নেহের সুযোগে আওরঙ্গজেবের ওপর যে অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালিয়ে ছিলেন তার সংক্ষিপ্ত নমুনা দেয়া হচ্ছে মাত্র।

(ক) ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য হতে আওরঙ্গজেবকে আকস্মিক অপসারণ যা অন্য কোন রাজকুমারের পক্ষে সহ্য করা সহজসাধ্য ছিল না।

(খ) কান্দাহারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার যুদ্ধের পূর্ণ আয়োজন করে আক্রমণ করার ঠিক পূর্বাহ্নে হঠাৎ সংবাদ পৌছলো নিষেধাজ্ঞার। তাও তরুণ শাহজাদা মুখ বুজে সহ্য করলেন।

(গ) মুলতান শাসনের সময় সৈন্যদের খরচপত্রের জন্য পিতার কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন পেশ করলেন। কিন্তু অসহায় অবস্থায় তাঁকে কোন সাহায্য করা হবে না বলে জানিয়ে দেয়া হল। আওরঙ্গজেব তাও মুখ বুজে সহ্য করলেন।

(ঘ) আওরঙ্গজেব নিজের পুত্রের সাথে সুজার একটা সতী সুন্দরী কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেয়ার মনস্থ করেন কিন্তু তাতেও তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন।

ইতিহাস আজও মজুত আছে ঐ সমস্ত অপকর্মের মূলে দারার কারসাজি ছিল সাংঘাতিকভাবে। যেমন প্রফেসর এইচ চৌধুরীদের ইতিহাসে লেখা আছে-"আওরঙ্গজেবের প্রতি শাহজাহানের এই ব্যবহারের মূলে দারার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রকট।" 'পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস' পুস্তকের ২৮৬ পৃষ্ঠা থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি।

'দারা তাঁর ভকিলগণের (Vokil) নিকট হতে এই মর্মে আশ্বাস লাভ করেছিলেন যে, দূর প্রদেশে অবস্থানরত শাহজাদাদের নিকট তাঁরা সম্রাট অথবা দরবারের কোন সংবাদ পাঠাবেন না। কেন্দ্রের সাথে সকল যোগাযোগ তিনি বিচ্ছিন্ন করেছিলেন এবং পথিকগণ যাতে কেন্দ্রের কোন খবর প্রচার করতে না পারে তার জন্য বাংলা, গুজরাট এবং দাক্ষিণাত্যের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর ভকিলদের সম্পত্তি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। আওরঙ্গজেবের অধীনে বিজাপুরে সংগ্রামরত কর্মচারীদের তিনি রাজধানীতে ফিরে আসার জন্য আদেশ দান করেছিলেন। শাহজাদাগণ রাজধানীতে প্রবেশের পূর্বেই তাঁদের আক্রমণ করার জন্য তিনি সৈন্যদের আদেশ দিয়েছিলেন। দারা শিকোর এই কার্যাবলি ভ্রাতৃসংগ্রামকে উদ্দীপ্ত করেছিল।" দারা শিকোর ভেতরের এত নোংরামি, অবিচার, অন্যায় ইতিহাসে না জানিয়ে শুধুমাত্র আওরঙ্গজেবের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুদের বীর এবং সজ্জন বলে মানুষের মনে মনস্তাত্ত্বিক ধারণা জন্মিয়ে দিতে কাজ শেষ করে গেছেন অনেকেই, কিন্তু এখন সমস্ত চক্রান্ত শিক্ষিত উদারচেতা মানুষদের কাছে আস্তে আস্তে ধরা পড়ছে এবং আরও ধরা পড়তে থাকবে।

আওরঙ্গজেবের ওপর এত অবিচার আর অপমানজনক অলীক অনাচার প্রয়োগ সত্ত্বেও তিনি কোন চরিত্রের মানুষ ছিলেন তা জানার জন্য বিখ্যাত ইতিহাস 'আদব-ই-আলমগীরী' হতে আওরঙ্গজেবের নিজের হাতের লেখা একটি

মূল্যবান পত্র যা তাঁর বোন হাফেজা জাহানারাকে তিনি লিখেছিলেন। সেটির অনুবাদ তুলে ধরা হচ্ছে–"যদি সম্রাট তাঁর সমস্ত চাকরদের মধ্যে কেবল আমারই অবমাননার জীবনযাপন এবং অগৌরবময় মৃত্যুবরণ দেখতে ইচ্ছা করেন, তাতেও আমি পিতার বিরুদ্ধে যেতে পারব না।... কাজেই সম্রাটের অনুমতিক্রমে যাতে রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি না হয় এবং অন্য লোকের (দারার) মনে শান্তি ব্যাহত না হয় সেই জন্য এ বিরক্তিকর জীবনযাপন হতে মুক্তি নেয়াই উত্তম। দশ বছর পূর্বে আমি এ সত্য উপলব্ধি করেছিলাম এবং জীবন বিপদাপন্ন বুঝতে পেরেই অন্য লোকের (দারার) ক্ষতির কারণ না হবার জন্যই পদত্যাগ করতে ইচ্ছে করেছিলাম।"

শাহজাহান মৃত্যু ব্যাধি হতে মুক্তি লাভ করে নভেম্বর মাসেই সুস্থ হয়ে উঠেন। কিন্তু তার আগেই দারা পিতার এত অন্ধ ভালবাসা পেয়েও সিংহাসন দখল করে নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করেছিলেন। মুরাদও লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই আহমদাবাদে রাজমুকুট ধারণ করে নিজেকে হিন্দুস্তানের বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন। সুজাও সোজাসুজি পথ ধরলেন অর্থাৎ তিনিও বাংলাদেশের স্বাধীন রাজা বলে নিজেকে ঘোষণা করলেন। আওরঙ্গজেব তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়; শুধু ভাবছিলেন এ অপদার্থ ভাইদের হাতে সিংহাসন যাওয়া মানেই বাচ্চা ছেলেদের হাতে ধারাল অস্ত্র তুলে দেয়া। তাই তিনি ইস্তেখারার নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে তাঁকে বলা হলো 'তুমি তোমার লক্ষস্থানে পৌঁছার চেষ্টা কর, তোমার সাধুতা ও রাজ্য পরিচালনা দুই-ই এক সঙ্গে সম্ভব হবে।'

তিনি এবার সসৈন্যে মীরজুমলাকে সেনাপতি করে অগ্রসর হলেন। ১৬৫৮ খৃস্টাব্দে মার্চ মাসে উজ্জয়িনীতে তিনি সৈন্যসামন্তসহ মুরাদের সাথে মিলিত হলেন। ঐ সময় সাধারণভাবে এটা অসম্ভব ছিল না যে, মুরাদকে যুদ্ধে নিহত করে পথ নিষ্কন্টক করা। কিন্তু কোন যুদ্ধই হলো না বরং মিলনের কথাই হলো।

এদিকে দারার সঙ্গে সসৈন্যে যুদ্ধ হলো ১৬৫৮ খৃঃ ১৪ মার্চ সুজার। সুজা পরাজিত হলেন কিন্তু মুরাদ আর আওরঙ্গজেবের বাহিনীকে শায়েস্তা করার জন্য দারার সেনাপতি যশোবন্ত সিং এবং কাসেম খাঁ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ১৬৫৮ খৃঃ ১৫ এপ্রিল তুমুল যুদ্ধ হয় উজ্জয়িনীর নিকট ধর্মাট নামক স্থানে। যুদ্ধে দারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। পরাজিত হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল, চরম মুহূর্তে রাজপুত সেনাপতি যশোবন্ত সিংয়ের বিশ্বাসঘাতকতা। মিঃ ঘোষও তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন-"মোঘল শিবিরে হিন্দু সেনাপতি যশোবন্ত সিং ও মুসলমান সেনাপতি কাসেম খাঁর মধ্যে মতবিরোধের ফলে আওরঙ্গজেব যুদ্ধে জয়ী হন।" এই সময় যশোবন্ত সিং পলাতক দারার দরদে দরদি হয়ে পত্র পাঠালেন, "যদি তিনি আজমীরে আসতে পারেন তবে তিনি এবং অন্য রাজপুতেরা তাঁকে সাহায্য

করবেন। এই আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে দারা আজমীরে এসে উপনীত হলেন। কিন্তু ইত্যবসরে যশোবন্ত সিং আওরঙ্গজেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আওরঙ্গজেবের পক্ষ ও ভক্ত হয়ে পড়লেন; কাজেই দারা আজমীরে এসে প্রতারিত হলেন।" (ভাঃ জঃ ইঃ)

এরচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাসে আর কী হতে পারে? সাহায্য তো দূরের কথা, একেবারে শত্রুপক্ষের সাথে হাত মিলিয়ে চরম মুনাফেকী প্রদর্শন করে ইতিহাসের পাতাকে কলঙ্কিত করেছেন। এই অবস্থায় সৈন্য নিয়ে আর বিনা যুদ্ধে পলায়নও সম্ভব নয়। তাই যুদ্ধ হলো আওরঙ্গজেবের সাথে। কিন্তু দারাকে পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য হতে হলো। ঠিক দারার এই দারুণ সংকট সময়ে দারার যাবতীয় ধন রত্ন ও মাল সামগ্রী রাজপুতগণ লুট করে দারার প্রতি মানবতাবিরোধী বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করা হয়।

উপরোক্ত তথ্যগুলো ১৯৪৬ সালে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ঐ ইতিহাস পরিচয় হতে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রফেসর যদুনাথ সরকার তার History of Aurangjeb নামক গ্রন্থে যা বলেছেন তাও গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে পরিবেশিত হলো-

"of all the actors in the drama of the war of Succession jasamant emerges from it with the worst reputation; he hed run away from a fight where he commanded in chief, he had treacherusly attacked an unsuspecting friend and he abandoned an-ally whom he had plighted his word to support and whome he hed lured into danger by his promises, unhappy was the man who put faith in Jasamant Singh, lord of marwar and chieftion of the Rather clan"

দারা গুজরাটে পলায়ন করলেন। মুরাদ এতদিন পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের পক্ষের লোক ছিলেন। হঠাৎ তাঁকে বিশেষ বিশেষ পক্ষ হতে প্রলোভন ও উৎসাহ দেয়া হলো। আওরঙ্গজেব তাঁকে মোটেই অবিশ্বাস করতে পারেননি। এই সুযোগে যদি তিনি আওরঙ্গজেবকে নিহত বা পরাজিত করতে পারেন তাহলে জনগণের কাছে প্রমাণিত হবে, মুরাদ আওরঙ্গজেবের চেয়েও সুযোগ্য। সুতরাং তার ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বল। মদের মাতাল মুরাদ এই বিরাট ভুলকে এক অপূর্ব সুযোগ মনে করে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। আওরঙ্গজেব অবাক হলেন বটে, কিন্তু কাল বিলম্ব না করে সাহস ও নিপুণ কৌশলে মুরাদের দুঃসাহস ব্যর্থ করে তাঁকে বন্দি করেন এবং গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন।

ওদিকে ভ্রাতা সুজা সুলেমানের নিকট পরাজিত হয়ে পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে আওরঙ্গজেবের ওপর সসৈন্যে আক্রমণ করলেন। খাজোয়া নামক স্থানে দুপক্ষের তুমুল সংঘর্ষ হলো। এবারে এ যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি হয়ে এসেছেন সেই বিশ্বাসঘাতক আওরঙ্গজেবের ক্ষমাপ্রাপ্ত যশোবন্ত সিং। এবার যশোবন্ত সিংহের নতুন কীর্তি ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। যদিও তা যবনিকার অন্তরালে বিরাজমান। ইতিহাস পরিচয় থেকে তুলে দিচ্ছি—"কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যশোবন্ত সিং গোপনে সুজার সঙ্গে যোগ দিয়ে একদিন রাত্রিকালে আওরঙ্গজেবের শিবির আক্রমণ করে বসলেন। এইরূপ বিপদের মধ্যে আওরঙ্গজেব বিচলিত হলেন না। শিগগিরই তিনি যশোবন্ত সিংকে পরাজিত করলেন। তখন যশোবন্ত সিং প্রাণ ভয়ে পলায়নপূর্বক পরিত্রাণ পেলেন। আর সুজা আরকানে আশ্রয় নিলেন। এরপর হতেই তাঁকে আর রাজনীতির মধ্যে দেখা যায়নি। শোনা যায়, আরকানে আততায়ীর হাতে তাঁরা সপরিবারে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর জন্য আওরঙ্গজেবের ওপর দোষারোপ শুধু নির্ভেজাল মিথ্যা তথ্য পরিবেশন নয়; বরং ইতিহাস না জানার না বোঝার তথা অযোগ্যতার চরম পরিচায়ক।

যশোবন্ত সিংয়ের আসল উদ্দেশ্য কী ছিল তা গবেষক, ঐতিহাসিক সমীক্ষার বিষয়। এত অপরাধ করার পর যশোবন্ত সিং আওরঙ্গজেবের নিকট ক্ষমা পাওয়ার আশা না করেও ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আওরঙ্গজেব সঙ্গে সঙ্গে তার পবিত্র কোরআনের আদর্শে ও হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) বাণী স্মরণ করে ক্ষমা করলেন। এ সব নতুন তথ্য খুব আশ্চর্যজনক এবং কারো কারো কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক জে এন সরকারের লেখা হতে উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে, "এরপরও যশোবন্ত সিং আওরঙ্গজেবের ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি পুনরায় ক্ষমা করেন এবং শাসনকর্তারূপে তাঁকে কাবুলে পাঠিয়ে দেন।" আজ বোঝার দিন এসেছে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুধু মৌখিক ক্ষমা নয়, আন্তরিকতার নিদর্শনস্বরূপ কাবুলের শাসনকর্তা করে পাঠানো অন্তত একজন হিন্দুকে কোন হিন্দু বিদ্বেষী গোঁড়া মুসলমানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এখন দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, তাঁকে হিন্দু বিদ্বেষী ও তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না, হিন্দুদের রাজকর্ম হতে অপসারণ করতেন প্রভৃতি কথা যাঁরা বলেছেন আজ তারাই বরং ইতিহাসের "মাছি মারা কেরানী" প্রতিপন্ন হয়ে হয়তো কোটি কোটি হৃদয় রাষ্ট্রে কলঙ্কিত হয়ে আছেন। তবে কাঁচা লেখক, অজানা না জানার কারণে যা করেছেন তা ক্ষমা পাওয়ার দাবি রাখতে পারে।

আর মুরাদকে হত্যার সহজ অপবাদ আওরঙ্গজেবের ওপর যেভাবে বারবার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তাতে ঐ তথ্য অনেকের কাছে সত্য বলে মনে হয়েছে। কিন্তু মূল ইতিহাস, যুক্তিতর্ক, বুদ্ধি ও বিবেকের কষ্টি পাথরে যাচাই না করলে ইতিহাস স্থায়ী মর্যাদা পায় না। আমাদের মনে রাখা উচিত, আওরঙ্গজেব কুরআন

ও হাদীসপন্থী সহজ, সরল, সত্যবাদী ও সদাচারী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি কাজী বা মুফতি পদে ছিলেন না। বরং বিচার, ফাতওয়া, মীমাংসা, সমাধান, ইজমা ও কিয়াসের জন্য কাজী, মুফতি আল্লামা ও উলামা কমিটি প্রস্তুত ছিল। তাঁদেরই কাজ ছিল বিচার ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করা। আর মুরাদের মৃত্যুও ছিল এই বিচারকদের বিচারের পরিণাম ফল।

আওরঙ্গজেবের সময়ে একজন সাধারণ প্রজা তাঁর আত্মীয়কে হত্যা করার অভিযোগে মুরাদের বিরুদ্ধে বাদশাহর কাছে যথাযোগ্য বিচার প্রার্থনা করেন। বাদশাহ নিজে বিচার করার যোগ্যতা রাখলেও নীতি অনুসারে বিচার বিভাগীয় প্রধান বিচারপতির কাছে মুরাদের বিচার হলো এবং সাক্ষী ও প্রমাণে অন্যায় হত্যা বলে বিবেচিত হলো। ইসলাম ধর্মে আইনানুসারে প্রাণনাশের শাস্তি প্রাণনাশ, অবশ্যই তা প্রমাণের পূর্বাহ্নে নয়। আজ ইতিহাসে সোজাসুজি আওরঙ্গজেব কর্তৃক মুরাদের নিহত হওয়ার সম্পূর্ণ তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। কিন্তু আসলে সত্য কথা হচ্ছে এই যে, বিচারকের বিচারে প্রাণনাশের অপরাধে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়েছিল। যাঁকে মুরাদ হত্যা করেছিলেন তার নাম ইতিহাসের পাতায় সুস্পষ্টভাবে সংরক্ষিত। সেই বিশিষ্ট নিহত রাজকর্মচারীর নাম ছিল 'আলী নকী খাঁ'।

আওরঙ্গজেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাকে হত্যা করেছিলেন– এ রকম কথাই হেটো ইতিহাসে খুচরো পাইকারি দরে পাওয়া যায়। দারার বিরুদ্ধে একটা ঐতিহাসিক অভিযোগ ছিল, যার শাস্তি প্রাণদণ্ড। তাঁর রাজদ্রোহিতা, গুপ্তচর বৃত্তি, শত্রু রাষ্ট্রের সাথে আঁতাত প্রভৃতি আরও অনেক অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত ছিলেন। ইসলামের আইনে কিন্তু যখন তখন মনগড়া কোন শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা নেই। যেমন বৈদ্যুতিক আঘাত দেয়া বরফের উপর দাঁড় করানো, আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা, জলে ডুবিয়ে কিংবা গরম জলে বা তেলে সিদ্ধ করা, মলদ্বারে লৌহ শলাকা প্রবিষ্ঠ করে মাথা অবধি তা পৌঁছে দেয়া, বিষপান করানো ইত্যাদি শাস্তি নিষিদ্ধ। ইসলামের আইনে প্রাণনাশ করলে, বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে এবং স্বধর্ম ত্যাগ করলে তার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। দারারও প্রাণদণ্ড হয়েছিল আওরঙ্গজেবের আদেশে নয় বরং আইনের অনুকূলে জজের বিচারে। মদ্যপান বা ব্যভিচার ও স্বধর্ম ত্যাগ একাধিক কারণে প্রাজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য পাঠক-পাঠিকাদের অনুসন্ধিৎসা থাকা স্বাভাবিক যে, দারা সত্যই ধর্মত্যাগী ছিলেন কিনা?

হিন্দু রাজপুত্র জাতি যেমন আকবরকে বেশ বশ করে মুসলমান নামধারী হিন্দু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হিন্দুতে পরিণত করেছিলেন, যুবক অবস্থায় জাহাঙ্গীরের অবস্থাও অনুরূপ ছিল এবং পরবর্তী সময়ে দারাও তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঐ পথের পথিক হয়েছিলেন। দারা ছিলেন আকবরের মত বাইরের কাঠামোধারী ছদ্মবেশী। দারা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য দুর্লভ নামী দামি ইতিহাস সংগৃহীত কিছু তথ্য পেশ করা হচ্ছে–

দারারও ধারণা হয়েছিল ভারতে হিন্দু জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং তাদের হাতে রাখার অর্থই হচ্ছে দিল্লির সম্রাট হওয়া। অতএব আকবরের নীতি অনুসরণ করে দারার নিজের ভূমিকা আরও হৃদয়গ্রাহী করতে 'দীনে ইলাহি'র ন্যায় তিনি এক নতুন ফরমূলা আবিষ্কার করেন। এছাড়া একটি ধর্মগ্রন্থও লিখলেন। বইটির নাম 'মুজমুয়াল বাইরাইন'। এর অর্থ হচ্ছে 'সাগড়দ্বয়ের মিলন'– অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম দুটি যেন দুটি সাগর আর সেই দুটির সন্ধি ঘটিয়ে খিচুড়ি তৈরি করাই ছিল দারার কল্পনা। দারা দস্তুর মত "সংস্কৃত সাহিত্যে" বিশেষত উচ্চপর্যায়ের হিন্দু শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।

একজন হিন্দু পণ্ডিত মুসলমান বেশ ধারণ করে দারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি নিজের নাম মাওলানা ফকির বলে পরিচয় দেন। বলাবাহুল্য, ঐ পণ্ডিতমশাই দারাকে বিভ্রান্ত করার জন্য মুসলমানদের কিছু বইপত্র পড়ে অল্প স্বল্প মুন্সীয়ানা হাসিল করেছিলেন। তিনি সম্রাট দারাকে উপনিষদ শিক্ষা নিতে উৎসাহিত করেন। ফকির মাওলানার কথায় তিনি বেনারস হতে কয়েকজন বিজ্ঞ সুপণ্ডিতকে আহ্বান করেন এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে উপনিষদ শিক্ষা করেন। এখান থেকেই দারার হৃদয়ে হিন্দুধর্ম গ্রহণের বীজ রোপিত হয়। মাত্র ছয় মাসের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ রাষ্ট্র ভাষা ফারসিতে উপনিষদের অনুবাদ করে নিজের যোগ্যতা প্রদর্শন ও হিন্দু জাতির প্রিয়পাত্র হতে সক্ষম হন। বইটি শুধু উপনিষদের অনুবাদমাত্রই ছিল না, তাতে ছিল তাঁর নিজের সৃষ্ট ধর্মের নানা টীকা টিপ্পনি। আর উপনিষদও তাঁর 'সাগরদ্বয়ের মিলন গ্রন্থকে প্রমাণিত করতে গিয়ে কষ্ট কল্পনা করে কুরআন ও হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা করতেও দ্বিধা করেননি। তাঁর 'মুজমুয়াল বাইরাইন' গ্রন্থের অনুবাদ করেন ফারসি কবি 'মুসাআকতাই দুর্পেয়া'।

যুবরাজ দারা সিংহাসন দখলের জন্য লড়াইয়ের পূর্বে সমাজের নেতৃস্থানীয় হিন্দু নেতাদের সহযোগিতা ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলেন; তাঁরা তাকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। দারার প্রতি যাতে বিশ্বাস আরও গাঢ় হয় সেই অভিপ্রায়ে হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র মথুরায় একটি মন্দির করেছিলেন। মথুরার মন্দিরে বহু মূল্যবান কারুকার্য খচিত পাথরের রেলিং স্থাপন করেন। দারার দ্বারা সেই সজ্জিত মন্দির এখন গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল, যার ভয়াবহ একটা দিক ছিল হিন্দুদের তীর্থস্থানে হিন্দু তীর্থ যাত্রীর ভিড় তেমন কিছু নতুন নয়। কিন্তু দারার সাহায্যপুষ্ট কেশব রায়ের মন্দির, গুজরাটের মন্দিরগুলোকে কেন্দ্র করে অনেক আশ্চর্য অলীক গল্প প্রচারিত হয়েছিল। যেমন বৃদ্ধ শাহজাহান একবার খুব অসুস্থ হলে দারা ঠাকুর দেবতার শরণাপন্ন হন এবং এক ঠাকুরের বরে বৃদ্ধ শাহজাহান আবার সুস্থ হয়ে ওঠেন। তাই দেবতার শক্তিতে অভিভুক্ত হয়ে তিনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন ইত্যাদি। ইসলাম ধর্মে মূর্তিপূজা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু সম্রাট দারার অর্ঘের ঘনঘটার বহন লক্ষ্য

করে সদাসিধে রোগগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত নর-নারীর এমন সমাবেশ হতে থাকে যে, তীর্থকেন্দ্রগুলো মুসলমান ও হিন্দুদের যুগ্ম তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং এখান থেকে দারার পক্ষ হতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হত ঐ সমস্ত ধর্মীয় পুরোহিতের দ্বারা। আওরঙ্গজেব সম্রাট হওয়ার অনেক দিন পরে কাজী মুফতির দরবারে দারার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়। সেই মোকদ্দমায় স্বহস্তে লিখিত পত্র, সনদযুক্ত লেখা এবং তার পুস্তক প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের সাক্ষ্যে দ্বারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। সেই রায় প্রকাশের সংবাদে আওরঙ্গজেব বলে পাঠিয়ে দিলেন আপনাদের রায়ের ওপর কোন প্রতিবাদ করার স্পর্ধা আমার নেই। কোরআন-হাদীসের আলোয় বিচারের বিরুদ্ধে কিছু বলার অর্থ হচ্ছে ইসলাম ধর্মে হস্তক্ষেপ করা।

আজ উপন্যাসমার্কা সস্তা হেটো ইতিহাসে 'সিংহাসনের জন্য ভাইদের হত্যা করেছিলেন' বলে যে মতটি বহুল প্রচারিত একটু গভীর চিন্তা করলেই তার অসাড়তা প্রমাণ হবে। কারণ সিংহাসনের জন্য হত্যা করলে তা সিংহাসন পাবার পূর্বেই করা হতো। কিন্তু তাঁর সিংহাসন পাওয়ার পরে যখন তিনি সম্রাট হয়ে সিংহাসনে সম্পূর্ণ অধিষ্ঠিত এবং প্রতিদ্বন্দ্বী যখন হাতের মুঠোয় বন্দি তখন এত কলাকৌশল করে হত্যা করার প্রহসন সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না। এমনি রোগগ্রস্ত হয়ে মারা গেছে বললেই যথেষ্ট ছিল। অতএব সিংহাসনের জন্য ভাইদের হত্যা করার প্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ঐতিহাসিক চরিত্রের শিক্ষাহীনতা, নীতিহীনতা অথবা অদুরদর্শিতার পরিচায়ক। ঐতিহাসিক হতে হলে তাঁকে সত্যবাদী হওয়া যেমন প্রধান শর্ত তেমনি জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনার যোগ্যতা থাকাও দ্বিতীয় শর্ত। ঐতিহাসিক মাছিমারা কেরানী নয় আর ইতিহাসকে সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যা মুখরোচক উপন্যাসে পরিণত করা দেশ ও দশের কত ক্ষতিকারক তা অবশ্যই বিবেচ্য।

(৫) কেবল হিন্দুদেরই ওপর জিজিয়া কর চাপিয়েছিলেন বলেও যে অপবাদটি ব্যাপক প্রচারিত তা নিঃসন্দেহে সম্রাট আলমগীরের সুনির্মল চরিত্রের ওপর এক জঘন্যতম আক্রমণ। অবশ্য সুবিস্তারিত আলোচনার পরেই তা প্রকট হয়ে উঠবে।

আকবর, জাহাঙ্গীর প্রমুখ বাদশাহ জিজিয়া তুলে দিয়েছিলেন। সহজেই মনে হয় তা উদারতার কারণ। আর আওরঙ্গজেব আবার তা পুনঃপ্রবর্তন করে যেন হিন্দু বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছিলেন। আসল কথা আকবর ও জাহাঙ্গীরের জিজিয়া প্রথার বিলোপ সাধন ছিল গুরুতর ইসলামবিরোধী কর্ম। আওরঙ্গজেব যদি তা পুনঃপ্রচলন না করতেন তাহলে তাও হতো ইসলাম ধর্মের পরিবর্জন নীতি অবলম্বন। তাই তাঁকে জিজিয়া কর ধার্য করতে হয়েছিল। কিন্তু জিজিয়া শুধু হিন্দুদের দিতে হতো, কোন মুসলমানকে নয়। তার আসল কারণ হচ্ছে এই যে,

>Goto List

জিজিয়া একটি সামরিক কর মাত্র, এটি 'মাথাগনতি' কর নয়। কোন হিন্দু মহিলা, বালিকা, বালক, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশু, অন্ধ, খঞ্জ, ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসীকে ঐ কর দিতে হতো না। অমুসলমানদের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধ করার শক্তি রাখতেন বা সক্ষম অথচ যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক শুধু তাঁদেরই দিতে হতো এই জিজিয়া। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে জোর করে যুদ্ধ করার জন্য অথবা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যোদ্ধাদের সাহায্যে ও সেবা শুশ্রূষা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। অপরপক্ষে ইসলাম ধর্মে এরূপ কোন সংবিধান নেই, যে জোর করে কোন হিন্দুকেও যুদ্ধে যোগদান করানো যাবে।

এছাড়া মুসলমানদের জন্য মাল বা অর্থের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ একটা কর বাধ্যতামূলক ছিল। তার নাম 'যাকাত'। এতদ্ব্যতীত উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ 'ওশর', ফেতরা, 'খুমুস', সদকা, ফিদিয়া এবং 'খারাজ'সহ আরও ছোট বড় অনেক কর মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু এ সমস্ত কর কোন অমুসলমানদের জন্য নয়– এটা ইসলামের বিধি ব্যবস্থা। তাই হিন্দুদের ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত কর রেহাই দেয়া ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে এই যে, হিন্দু প্রজাদের নিকট যে জিজিয়া নেওয়া হতো তা তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ-সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্বের ভিত্তিতেই হতো। প্রফেসর যদুনাথ সরকার লিখিত "Mughal Administration" গ্রন্থে পাওয়া যায় আওরঙ্গজেব ৬৫ প্রকার কর তুলে দিয়েছিলেন। অপর ঐতিহাসিক অনেকেই বলেছেন, যিনি ৮০টি করের বিলোপ সাধন করলেন তখন প্রশংসা পাননি কিন্তু শুধু একটি করের জন্য চারদিকে কলরব ধ্বনি। J. D. A. S-এর লেখা "Vindication of Aowrangzeb" গ্রন্থে আছে– "When Aowrangzeb abolished eighty taxes no one thanked him for his generosity. But When he imposed only an at not heavy at all, people began to show their displeasure.

এই জিজিয়া শুধু ভারতেই মুসলমান বাদশাহ কর্তৃক হিন্দুরে ওপর ধার্য হয়েছিল তা নয়; বরং বহির্ভারতেও এই কর অমুসলমানদের নিকট হতে নেওয়া হতো শুধু যিনি যুদ্ধে যেতে সক্ষম অথচ অনিচ্ছুক তাঁদেরই উপর ছিল এই কর। অতএব জিজিয়া একটি হিন্দু বিদ্বেষী কর মনে করা সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছু নয়।

জিজিয়া একটি War tax বা যুদ্ধ কর মাত্র। এই জিজিয়া কোন দিন অত্যাচার ও উৎপীড়নমূলক আদায় করা হয়নি। সম্রাট হিন্দুদের সাথে পরামর্শক্রমে এই কর আদায় করতেন। তাই স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর Mughal Administration গ্রন্থে লিখেছেন, Asses there revenue in such a why that the roy to at large mayget there dues and the government money may be collected at the right time and no yoat may be opperessed".

কোন ঐতিহাসিক বা লেখক কি প্রমাণ করতে পারবেন যে, কোন সুস্থ-সবল হিন্দু সৈন্যকেও কর দিতে হয়েছিল? অতীতেও পারেননি আর বর্তমানেও কেউ পারবেন না, তবে আগামীতে ঐতিহাসিকতার নামে ঔপন্যাসিকতা কতদূরে গিয়ে পৌঁছবে তা চিন্তা করে অনেকে শিউরে উঠছেন।

আরও মনে রাখার কথা, আওরঙ্গজেব সিংহাসনে বসেই প্রথম বছরে হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর চাপাননি বরং ১৬ বছরের মধ্যে ৮০ প্রকার কর তুলে দিয়ে তারপর সামান্য জিজিয়া ধার্য করেছিলেন। আর তাই নিয়ে ইতিহাসে এত হৈ চৈ, এত আয়োজন। বোধহয় আসল উদ্দেশ্য অন্য কিছু। যাকে 'ইসলামী কোর্ড' বলা হয় সেই আরবী 'হেদায়া' আইন গ্রন্থেরই অনুবাদ বা ছায়ালম্বিত। তাতে লেখা আছে– জিজিয়া কর প্রবর্তনের কারণ, এই কর সেই সাহায্যের পরিবর্তে, যা অমুসলিম জীবন, ধন ও মান সম্ভ্রম রক্ষার দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিয়েছেন। উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র আরও আছে– "যদি তারা জিজিয়া গ্রহণ করা মঞ্জুর করলেন তো তাঁদের হেফাজত এরূপভাবেই করা উচিত, যেমন মুসলমানদের করা হয়। তাঁদের জন্য সেই আইন প্রবর্তিত হবে, যা মুসলমানদের প্রতি হয়। কারণ হযরত আলী (রাঃ) বলে গেছেন, অমুসলিম জিজিয়া এই জন্য দান করে থাকেন যে, তাঁদের রক্ত মুসলিমদের রক্ত এবং তাঁদের ধন সম্মান মুসলিমদের ধন সম্মানের সমান।" "খলীফা হযরত ওসমান গনির (রা.) রাজত্বকালে হাবিব বিন সালমী জিজিয়াকে জয় করে নিলেন, তখন অমুসলিমগণ সৈন্যে যোগদান করে সামরিক সাহায্য করলেন তখন তাঁদের জন্য জিজিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।"

যদুনাথ সরকারও তাঁর ইতিহাসে আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে লিখেছেন, সমস্ত প্রকার কর আলমগীর তুলে দেয়ার জন্য সম্রাটের পাঁচ কোটি টাকার ওপর ক্ষতি হয়েছিল। He Aurangzeb abolished all taxes that were not santioned Islam the exchequer this last about five millions sterling a year.

তাই ফ্রান্সের বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত ডাঃ গাস্তা ওলিবান লিখেন, 'ইসলামের খলীফারা ভালভাবে বুঝেছিলেন যে, ইসলামকে তরবারির জোরে প্রচার করা সম্ভব নয়। কাজেই দেখা গেছে যেখানেই মুসলমানরা বিজয়ী হয়ে প্রবেশ করেছেন সেখানেই পরাজিত নগরবাসীদের প্রতি খুবই নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করেছেন এবং তাদের সুখ-শান্তিতে রাখার সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করে তার বিনিময়ে যতকিঞ্চিৎ কর (জিজিয়া) গ্রহণ করতেন। অমুসলিমগণ পূর্বের রাজাকে

যে কর দান করতো তার তুলনায় জিজিয়া কর অতি নগণ্য ছিল।" এ অতি স্য কথা যে, দুনিয়াতে এরূপ সংযমী ভদ্র রাজ্যবিজেতা পূর্বে কোনকালে জন্মেনি এবং এরূপ নম্র ও দয়ালু জাতি ইতোপূর্বে কখনও দেখা যায়নি।"

ডাঃ জে কে কান্তি মহাশয়া তাঁর স্পেনের ইতিহাস গ্রন্থে যা লিখেছেন তাতে জিজিয়া সম্বন্ধে কুধারণার পরিবর্তে সুধারণারই সৃষ্টি হয়। যেমন–" সেই সত্য যা পরাজিত জাতির নিকট জয়ী মুসলমানদের তরফ হতে আদায় করা হতো। তা এরূপ ছিল যে, এতে তাদের কোনরূপ কষ্টের পরিবর্তে বরং তাহাদের মনে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিত। সুতরাং পরাজিত জাতি নিজের ভাগ্যকে যা পূর্বে ছিল তা বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে তারা বুঝতে পারল যে, মুসলিমদের স্পেনে আসা নিজেদের সৌভাগ্যের কারণ হয়েছে। ধর্ম কর্ম তারা স্বাধীনভাবে পালন করত এবং তারা নিজের ধন, মান, জীবন ও গীর্জাগুলোর রক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে শান্তিতে জীবনযাপন করত। তাদের এসব সুখ বিজয়ীনীতির অনুগত হওয়ার ফলস্বরূপ ছিল এবং তাদের নিকট হতে যে জিজিয়া কর নেওয়া হতো তা খুবই সামান্য ছিল। কাজেই স্পেনের সর্ব অমুসলিমদের মনে আরবীয়গণের প্রতি এ বিষয়ে পূর্ণ আস্থা জন্মিয়েছিল যে, তারা ন্যায় ও সত্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠাতা এবং বিচারের সময় তারা পক্ষপাতশূন্যভাবে ন্যায় বিচার করে।"

ভারতের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পণ্ডিত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ দুঃখ করে লিখেছেন, "পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাস পড়াশোনার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারতের হিন্দু জনসাধারণ অনেকে 'জিজিয়া' করকে বিরাট ভুল বুঝেছেন। আসলে এটা আসল তথ্যের অজ্ঞতা। (সুলতানাতে দেহলী মে গায়ের মুসলিম' গ্রন্থে ৬৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

"ফারসিতে 'Gajiat' শব্দের অর্থ খেরাজ, যা থেকে জিজিয়া শব্দের উৎপত্তি। ইসলাম ধর্ম চৌদ্দশত বছর মাত্র জিজিয়ার কথা বলেছে তা নয় বরং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বহু পূর্ব হতে বহু দেশে নানা ভাষায় জিজিয়া করের উল্লেখ পাওয়া যায়।" (তারিখি শত্তাহেদ গ্রন্থে দ্রঃ)

কনৌজের গহরাওয়ার বংশে জিজিয়ার প্রচলন ছিল সে দেশের ভাষায় তার নাম ছিল 'তুরশকী জনডা' (Medieval Hindu India III, p-2ii)। তাছাড়া ভারতে ইসলাম আসার আগে রাজপুতদের মধ্যে ফীকস' কর আদায় হতো (Early Histoty of India by smith গ্রন্থ দ্রঃ) ডাঃ ত্রিপাটির ধারণা, ফ্রান্সে যে জিজিয়া ছিল তার নাম ছিল Host tax, আর জার্মানীতে যে জিজিয়া ছিল তার নাম Commonpiny এবং ইংল্যাণ্ড এক প্রকার জিজিয়া সম কর ছিল তার নাম ছিল 'Scontage' (some Aspects of Muslim Administration by Sir, Tripathy গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

>Goto List

নজরানাবাসীদের জিজিয়া দেবার আগ্রহ এত বেশি ছিল যে, জিজিয়া দিতে না পারলে তাঁরা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে লজ্জাবোধ করতেন।

অনেকে বলেছেন-জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করে আওরঙ্গজেব অসহায় হিন্দু জাতির ওপর নির্মম অত্যাচার করেছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য অন্য। হিন্দু প্রজাদের ওপর অত্যাচার করার উদ্দেশ্যই যদি আওরঙ্গজেবের থাকত তবে তাঁর দীর্ঘ ৫০ বছর ভারতে রাজত্ব করার পর একটি হিন্দুরও অস্তিত্ব থাকত কিনা সন্দেহ। সে কথা আগেই বলেছি। তাছাড়া শুধু আওরঙ্গজেবই নন বরং মুসলমান রাজা-বাদশাহ শত শত বছর বা প্রায় সহস্র বছর ধরে রাজত্ব করে গেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন একটা জাতি তাদের অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে যায়নি। অপর পক্ষে এই ভারতে এক ধর্মের চাপে অপর ধর্ম, এক সম্প্রদায়ের চাপে অপর সম্প্রদায় নিশ্চিহ্ন প্রায় হয়ে গেছে। যেমন-হিন্দু ধর্মের চাপে বৌদ্ধধর্ম আজ বিলুপ্ত প্রায়। তাছাড়া অনেকের মতে ভারতের বহু স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব আজ লোপ পেয়েছে বা পেতে চলেছে-এমনকি তাঁরা নিজেদের হিন্দু বলেই পরিচয় দিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ জৈন, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। অতএব আওরঙ্গজেব অত্যাচারী ছিলেন অর্থাৎ তিনি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন একথা নির্ভেজাল মিথ্যা। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক কাফি বলেছেন, "আকবরের রাজত্বকাল অপেক্ষাও তাঁর (আওরঙ্গজেব) সময়ে হিন্দু রাজকর্মচারী সংখ্যায় বেশি ছিল।" এছাড়া আরও বহু প্রমাণ ইতোপূর্বে পেশ করা হলেও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এ ক্ষেত্রেও কিছু কিছু উদ্ধৃতির উল্লেখ করা গেল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে 'আলেকজান্ডার হ্যামিলটন' ভারতবর্ষ পরিদর্শন করতে এসে ভারতে আওরঙ্গজেবের ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সূক্ষ্ম শাসন, পদ্ধতি দেখে যা বলেছিল তা হচ্ছে এই- "Every one is free to serve and worship God in his own way" অর্থাৎ প্রত্যেক স্বাধীনভাবে কাজকর্ম এবং নিজস্ব নিয়মে ঈশ্বরের উপাসনায় স্বাধীন। আরও প্রমাণস্বরূপ আলমগীরের দরবারে বড় বড় পদে ও মর্যাদায় স্থান পেয়েছিলেন যথাক্রমে রাজা রাজরূপ, কবীর সিংহ, অর্ঘনাথ সিং, প্রেমদেব সিংহ, দিলীপ রায় প্রমুখ হিন্দু ব্যক্তি। রাজা রাজরূপ সিংহকে বাদশাহ এত বিশ্বাস করতেন যে, শ্রীনগরের রাজার বিরুদ্ধে গোটা যুদ্ধটাই তাঁর অধীনে পরিচালিত হয়েছিল। কবীর সিং ছিলেন সম্রাটের খাস লোক। আসামের যুদ্ধের জন্য প্রেমদেব সিংহকেই আওরঙ্গজেব বাছাই করেছিলেন। দিলীপ রায় ছিলেন আওরঙ্গজেবের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি। এতদ্ব্যতীত পুলিশ বিভাগ, গুপ্তচর বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ প্রভৃতি বিভাগে হিন্দু রাজ কর্মচারীর সংখ্যা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হতো। রাজস্ব বিভাগে মুন্সীর পদগুলো হিন্দুদের একচেটিয়া ছিল বলা যায়। তার কারণও এই একই ছিল যে, কর আদায়ের নামে যেন হিন্দু সম্প্রদায় অত্যাচারিত

>Goto List

না হয়। "Most of the Munsts were Hindus and the proportion rapidly inereassed The Hindus had made a monopoly of the lower ranks of the Revenue depertment, "রসিকদাস ক্রোরী ছিলেন সম্রাটের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি এবং রাজস্ব বিভাগে সর্বোচ্চমানের পদাধিকারী।"

শুধু তাই নয়, বরং এমন কোন বিভাগ ছিল না যে বিভাগে সম্ভব সত্ত্বেও হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করা হয়নি। এমনকি বাদশাহ আলমগীর আইনজারী করেছিলেন যে, প্রত্যেক বিভাগে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করা আবশ্যক। অতএব আলমগীর সত্যিই শুধু উদার নয় বরং উদারতম মহান নৃপতি ছিলেন এটাই আধুনিক বিশেষজ্ঞদের এবং পুরাতন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত।

একটা প্রশ্ন থেকে যেতে পারে, তাহলে কী আওরঙ্গজেবের ওপর সকলে সন্তুষ্ট ছিলেন? তার উত্তরে পরিষ্কারভাবেই বলা যেতে পারে যে, সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তার কারণও অবশ্য বিদ্যমান। রাজদরবারে যে সমস্ত গর্হিত বেআইনি কাজ চলে আসছিল এবং আকবর, জাহাঙ্গীর প্রমুখ বাদশাহ কর্তৃক যে সমস্ত বিষয়বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল, যার ফলে সারা ধর্মের নামে, আভিজাত্যের নামে, সংস্কৃতির নামে যত আগাছা গজিয়েছিল আওরঙ্গজেব একাধারে তা উৎপাটন করতে যাঁদের অসুবিধায় পড়তে হয়েছে তাঁরাই অভিযোগ করেছেন। অবশ্য পরে নিজেদের ভুল বুঝে সর্বভারতীয় উন্নতি ও শান্তি দেখে অনেককেই লজ্জা ও অনুতাপের ইন্ধন হতে হয়েছিল।

বাদশাহদের দরবারে 'নওরোজ' বলে একটা কুপ্রথা প্রবর্তিত ছিল, যা শুধু বিলাসিতা ও অহঙ্কার প্রদর্শনের নামান্তর ছিল আর রাজদরবারে রাজ কর্মচারীদের মধ্যে মদের মর্যাদা এত বেশি বেড়ে গিয়েছিল, যা চীনের আফিং খাওয়ার মতো ভারতকে ধ্বংস হতে হতো, যদি না আওরঙ্গজেব কঠিন হস্তে তা দমন করতেন। পক্ষান্তরে মন্দির তৈরি করার একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এক এক জায়গায় যেখানে একটি মন্দিরই যথেষ্ট সেখানে গায়ে গায়ে লাগানো দশ, বিশ, পঞ্চাশ, একশত করে মন্দির তৈরি হতে লাগল, আর ধর্মের ঐ বাড়াবাড়ি দৃষ্টিকটু লাগারই কথা। মসজিদের ক্ষেত্রেও সম্রাটের মত ছিল, বিনা প্রয়োজনে মসজিদ তৈরি অথবা যেখানে মসজিদ আছে যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই মসজিদে স্থান সংকুলান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে মসজিদ সৃষ্টি করা নিষেধ। যেমন অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় বাদশাহ নবাবদের স্মৃতি স্মরণ করতে করতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় শুধু চার দিকে মসজিদ। আমাদের মতে এত মসজিদ দরকার ছিল না। যদি কেউ যুক্তি দেখান যে, স্থান সংকুলান হতো না বলেই হয়তো সে যুগে এত মসজিদের প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু আমরা বলবো অবশ্যই তা নয়; কারণ, স্থান সংকুলান না হলে মসজিদকে বাড়িয়ে যথা প্রয়োজন

>Goto List

লম্বা ও চওড়া করলেই তো চলতো শুধু সংখ্যায় ছোট ছোট মসজিদ আর কারুকার্যের ছড়াছড়ি বা বাড়াবাড়ির কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি। অনুরূপভাবে মন্দিরও এই পশ্চিমবঙ্গে একস্থানে দু-চারটা নয় এমনকি আমাদের বর্ধমান শহরের পাশে ছোট ছোট গায়ে গায়ে লাগানো ১০৮টি মন্দির আমরা দেখেছি। মন্দিরের ক্ষেত্রে স্থান সংকুলানের তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ মন্দিরের ভেতরে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ ছাড়া জনসাধারণের প্রবেশাধিকার পূর্বেও ছিল না আর এখনও নেই, পরে কী হবে বলা যায় না।

বেনারসের শানসকর্তা আওরঙ্গজেবকে গোপনে একটা পত্র পাঠিয়েছিলেন– তাতে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল, বেনারস একটা হিন্দুদের ধর্মীয় ঘাঁটি, উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী প্রত্যেকে মনে করে, সমস্ত উন্নতির কুঞ্জী ঐ মন্দিরেই দেবতার হাতে আছে আর মন্দিরের নিত্য নতুন নির্মাণ ব্যবস্থা বিদ্যামান এবং বহু অর্থব্যয়ে তাতে কারুকার্য করা চলতেছে যেন শেষ নেই, আর এক মন্দির অপর মন্দিরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিততে চায়। যদি এখানে এই মন্দিরের পুরোহিত বা ব্রাহ্মণদের ওপর কিছু শক্তি প্রয়োগ করা হয় তা ঠিক হবে কি না? তবে এখানে কেউ কেউ মনে করেন, ব্রাহ্মণদের উপাসনাভিত্তি শিথিল করতে পারলে লোকে আমাদের ইসলাম ধর্মের দিকে আকর্ষিত হতে পারে...।”

তার উত্তরে আওরঙ্গজেব যে পত্র দিয়েছিলেন তা উল্লেখযোগ্য এবং প্রণিধানযোগ্য। “... প্রজাদের উপকার সাধন এবং নিম্ন সকল সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন আমাদের দৃঢ় উদ্দেশ্য সে জন্য আমাদের পবিত্র আইন অনুসারে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, পুরাতন মন্দিরগুলো বিনষ্ট করা হবে না কিন্তু নতুন কিছু সৃষ্টি করাও চলবে না। কোন লোক অন্যায়ভাবে ব্রাহ্মণ অথবা তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অথবা তাদের ওপর কোন হামলা করতে পারবে না। তারা যেন পূর্বের ন্যায় স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত থাকতে পারে অথবা আমাদের আল্লাহ প্রদত্ত সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য সুস্থ মনে প্রার্থনা করতে পারে।”

(জেএএসবি এবং ‘ওয়াকারে আলমগীর’ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

আওরঙ্গজেব সিংহাসন আরোহণের পূর্বে ধর্ম ধ্বংসী মিথ্যা ‘দীন-ইলাহী’ ধর্মকে নিষিদ্ধ করেন ফলে যারা গোঁড়া মুসলমানবিদ্বেষী হিন্দু তাঁরাও দুঃখিত হলেন। তারা বেশ বুঝতে পারলেন আকবর জাহাঙ্গীর যে পথের পথিক ছিলেন ইনি সে পথের পথিক নন। তাই তারা চেষ্টা করেছিলেন আওরঙ্গজেবের পরিবর্তের দারা শিকোকে আকবরের পথে পরিচালিত করার। কিন্তু তাদের সেই সিদ্ধান্ত সার্থক হয়নি।

যা হোক, এভাবে সম্রাট আলমগীরকে জিজিয়া করের পুনঃপ্রবর্তনকারী গোঁড়া হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমান বলে চিত্রিত করে যারা ইতিহাসের পাতাকে কলঙ্কিত করেছেন, ইতিহাস তাঁদের ক্ষমা করবে না। প্রকৃত ও গৌরবমণ্ডিত

উপকার একে বুকে ধরেই সে চিরকাল ছুটেছিল আজও যেমনি ছুটে যাবে চলমান গতি সমুদ্রের দিকে ভ্রূপেক্ষপ না করেই আর এরই নাম ইতিহাস।

(৬) 'তাঁর অযোগ্যতাই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ' বলে যে অভিযোগটি বা অপবাদটি নিরপরাধ আওরঙ্গজেবের স্কন্ধে জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার অসাড়তা পূর্বাহ্নেই প্রমাণিত হয়েছে যে, আওরঙ্গজেব অযোগ্য তো ছিলেনই না বরং তাঁর যোগ্যতাই দ্রুত পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করেছে। অতএব মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কারণ আওরঙ্গজেবের অযোগ্যতা নয় বরং কারণ অন্যবিধ। নিচের আলোচনায় তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

সম্রাট আওরঙ্গজেবকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী করে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বহু তথ্য তুলে ধরেছেন। কিন্তু মুঘল যুগের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাঁকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী করেন না। বরং আওরঙ্গজেবকে মুঘল সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন রোধ করেছেন এ রকম মন্তব্য পাওয়া যায়। নিম্নোক্ত তথ্যগুলো আওরঙ্গজেব নির্দোষ প্রমাণ করে। অমিতব্যয় পূর্ববর্তী সম্রাটদের আমলে সৈন্যবাহিনীর ভেতর দুর্নীতি ও বিলাসিতা প্রকট হয়ে উঠেছিল। মহামতি বলে অভিহিত সম্রাট আকবর ছিলেন নারী লোলুপ, জাহাঙ্গীর ছিলেন ব্যভিচারী মদ্যপ সম্রাট, শাহাজাহান ছিলেন আড়ম্বর প্রিয়। অবাঞ্ছিত হেরেমের ব্যয় বহন, মদ্যপান ও শাহজাহানের আড়ম্বর প্রিয়তার ফলে জলের মত অর্থ ব্যয়িত হয়। সম্পদের ও অর্থের অপব্যবহার এ দুষ্ট ব্যাধি সম্রাটের হেরেম পেরিয়ে আমির ওমরাহ তথা সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সংক্রমিত হল। ইউরোপীয় পর্যটকগণ লিখেছেন–মুঘল সৈন্য শিবিরগুলো ছিল এক একটা বিলাসী শহর। বিপুল অর্থরাশি এভাবে ব্যয়িত হওয়ায় সাম্রাজ্যের আর্থিক অসচ্ছলতা দেখা দিল আর মুঘল সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে তোলে। সম্রাট আওরঙ্গজেব কোরআন-হাদীসমাফিক সাম্রাজ্যের জন্য ব্যয় নীতিগ্রহণ করেন। এর ফলে পূর্ববর্তী সম্রাটদের শূন্য রাজকোষ পূর্ণ হয়ে মুঘল সাম্রাজ্য শক্তিশালী হয়।

(উইলিয়াম হকিন্স, স্যার টমাস রোর ভ্রমণ কাহিনী দ্রঃ)

অনুদারনীতি সম্রাট আকবর উদারনীতি গ্রহণ করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রিয়মাত্র হতে চাইলেন। এমনকি সকল ধর্মের সারমর্ম নিয়ে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করবেন 'দীন-ইলাহী'। যুবরাজ দারাও আকবরের পদাঙ্ক অনুকরণ করে দরবারের রাজপুত্র রাজা ও বিভিন্ন গোষ্ঠী অধিপতিগণের সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হওয়ার জন্য লিখলেন। মুজমুয়াল বাহ্‌রাই'। যার অর্থ 'সাগরদ্বয়ের মিলন' সম্রাট আকবর ও যুবরাজ দারার উদারনীতি নিছক শঠ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ধর্মে এ উদারনীতি বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যকে পতনের মুখে ঠেলে দেয়। সম্রাট আকবর ও যুবরাজ দারার উর্বর মস্তিষ্কে স্থান পেল যে, সকল

ধর্মে কিছু সার থাকে এবং বাকি সবকিছু অসাড় বস্তু। এভাবে এ উদারনীতির দ্বারা হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চলে। তাই প্রাক আওরঙ্গজেব যুগে ব্যভিচার, মদ্যপান, উৎকোচ গ্রহণ সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি দুষ্ট ব্যাধি সম্রাট-ওমরাহ দরবার থেকে শুরু করে প্রজাবৃন্দ পর্যন্ত সকলের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করে।

সম্রাট আওরঙ্গজেব নিজে একজন বড় আলেম এবং ধর্মে আস্থাশীল ছিলেন। দরবারে আমির-ওমরাহ ও গোষ্ঠীপতিদের মদ্যপান, ব্যভিচার, অমিতব্যয় প্রভৃতি পরিহারের জন্য ধর্মীয় বিধি চালু করেন।

আওরঙ্গজেবের কট্টর সকালোচকগণও স্বীকার করেন যে, আওরঙ্গজেব নিষ্ঠাবান মুসলমান, নিরলস কর্মী, অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ এবং ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল নিষ্কলুষ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কঠোরভাবে ইসলামের অনুশাসন পালন করেছিলেন। ঐতিহাসিক মূল্যসম্বলিত ফতোয়া-ই-আলমগীরী তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়েছিল। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান কখনও অনুদার বা পরধর্ম অসহিষ্ণু হতে পারেন না। কট্টরপন্থী ঐতিহাসিকদের বর্ণিত আওরঙ্গজেবের 'অনুদারনীতি' মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী নয়। কারণ তাঁর সময়ে ধার্মিক চরিত্রবান হয়ে জাতিকে শক্তিশালী করে তুলেছিল।

ইউরোপীয় আগমন-ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ ইউরোপীয় জাতির আগমন। ভারতে ইংরেজ তথা ইউরোপীয় জাতির আগমনের বীজবপন করে গেছেন। আকবর আর জাহাঙ্গীর সেই বীজের চারাগুলোকে শক্তিশালী করতে তাঁর যথার্থ ভূমিকা নিয়েছেন আর আওরঙ্গজেব চারাগুলোকে নির্মূল করতে যথাযোগ্য চেষ্টা করে গেছেন। যদি এ কথাটুকু প্রমাণ হয় তাহলে আকবরকে ভারতবাসী ক্ষমা করে মহামতি বলে মেনে নেবেন কিনা তা পাঠকবৃন্দের দায়িত্বে আর আওরঙ্গজেবের ভূমিকা সত্যিই যদি ফুটে ওঠে তাহলে তার দিকে চিন্তাশীল নব্য ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া স্বাভাবিক।

তাই কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হতে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করছি। ইসলামী বিধান মতে অমুসলমান নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে হলে প্রথমেই তাকে ধর্মান্তরিত করতে হবে এবং এটা খুব স্বাভাবিক। তাই স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলা হয়। কিন্তু সহধমর্মিণী যদি অন্য ধর্মিণী হয় তাহলে তাকে সহধর্মিণী না বলে পরধর্ধিণী বলতে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু সারা ভারতে নয়, পৃথিবীর প্রথম রাজা প্রথম বাদশাহ আকবর যিনি ইসলাম ধর্মের এই নীতির ওপর নিষ্ঠুর উপেক্ষা প্রদর্শন ও অনাদর্শ স্থাপন করেন। খ্রিস্টান মহিলা বিবাহ করা এবং তাকে তার ধর্ম পালন এবং প্রচার ও প্রসারে সহযোগিতা করার পূর্ণ অধিকার প্রদর্শন আকবরের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটা উদারতা না বর্বরতা তা প্রত্যেক ঐতিহাসিক ও ইতিহাস অনুরাগীব চিন্তার বিষয়।

এ বিবাহকে কেন্দ্র করেই ইংরেজ ভারতে রাজ্য বিস্তারের পথ সুগম করে। রাজ দরবারে মদ্যপানের আমন্ত্রণ ইংরেজ রাজনীতিবিদগণ প্রায়ই পেতেন। মুঘল সাম্রাজ্যের সমাধি রচনার কাজ আকবর শুরু করেন এবং তাঁর মদ্যপ পুত্র জাহাঙ্গীর স্যার টমাস রো ও তাঁর মূল পুরোহিত অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত চতুর, কূটনীতিবিদ রেভারেণ্ড-ই-ফেবীকে অতি মাত্রায় প্রশ্রয়দান করে এ সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করেন। আকবরের সময় ইংরেজরা নিজেদের সুরাট বন্দরে প্রতিষ্ঠিত করে। তিন বছর ক্রমাগত মুঘল দরবারে তদবির করে স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের নিকট হতে তাঁর সকল দাবি দাওয়া মঞ্জুর করে নিতে সক্ষম হয়। ইংরেজরা অবশ্য কাজ গুছানোর তাগিদে মদ খেতেন কিন্তু তিনি ও তাঁর পুত্রগণ শুধু মদ খেতেন বললে সঠিক হবে না বরং বলা যায় মদই তাঁদের খেত।

খ্রিস্টানদের মুখে তাঁদের বীরত্বগাথা এবং প্রত্যক্ষ কিছু লক্ষ্য করে আকবর ও জাহাঙ্গীর ইংরেজ শক্তির ওপর ভীত হয়ে পড়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, ইংরেজরা সুন্দরী রমণী দিয়ে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন বা পরাস্ত করে দিয়েছিলেন তার চেতনাকে। সে যাইহোক তারা ধীরে ধীরে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য প্রকাশ করে চললেন এবং দেশের ভেতরে ইউরোপীয় ঘাঁটি তৈরি করতে তাদের অনুমতি ও সাহায্য দিলেন। তার ফলস্বরূপ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে উদীয়মান ইউরোপীয় শক্তি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়। সুতরাং মুঘল সাম্রাজ্যের পতন তথা ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার জন্য দায়ী আওরঙ্গজেব নয়, দায়ী মহামতি আকবর ও জাহাঙ্গীর। (এনসাইক্লোপিডিয়া দ্রঃ)

এছাড়া ভারতের বিশালতাও তার পতনের আর এক কারণ। তখনকার যুগে তার বেতার বা টেলিভিশনের কোন আড়ম্বর ছিল না। ফলে এক স্থান হতে অন্য স্থানের যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হতো। তাই বিশাল ভারতের কোন স্থানে বিদ্রোহ ঘোষিত হলে তা দমন করে আরেক স্থানে গমন করতে যে পরিমাণ সময়ের ব্যবধান হতো তাতে অন্য কোন স্থানে আবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে বাধা ছিল না। কিন্তু তবুও সম্রাট আলমগীর যেভাবে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে এক এক করে বিদ্রোহের অনল নিভিয়ে গেছেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় বিরল। অতএব পূর্বপুরুষদের পর্বতপ্রমাণ অপকীর্তির প্রভাবে টলায়মান মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বল ভিত্তি এক অনিবার্য প্রাকৃতিক কারণেই ধসে পড়েছিল। নিরপরাধ ও নিরুপায় আলমগীর এর জন্য দায়ী নন।

সর্বশেষে দুজন প্রসিদ্ধ ও খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের দুটি মূল্যবান উদ্ধৃতি (যাতে মুঘল ও সাম্রাজ্যের পতনের কারণ পরিষ্কাররূপে ফুটে উঠেছে) দিয়েই এ প্রসঙ্গের যবনিকা টানছি।

ঐতিহাসিক প্রিঙ্গল কেনেডি তাঁর "History of Mughals" পুস্তকে লিখেছেন, "The weakness of Akbar's empire was really military stoping the influx fresh blood from beyond the north western hills and acting on the principle of India for the Indians, he was the indirected that when the impire built by him was challenged by a hostile power, if turned out to be in capable of protecting itself," অর্থাৎ আকবরের গঠিত সাম্রাজ্যের দুর্বলতা তাঁর সামরিকনীতির মধ্যেই নিহিত। তিনি উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলের ওপার হতে সতেজ সকল স্বজাতীয় সৈন্য আমদানি বন্ধ করে এবং 'ভারত ভারতীয়দের জন্য' নীতির অনুসরণ করে তাঁর সাম্রাজ্যের (অর্থাৎ মুঘল সাম্রাজ্যের) পতনের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী হয়েছেন। তাঁর গঠিত সাম্রাজ্য যখন বিজাতীয় প্রতিকূল শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তখন তাঁর আর আত্মরক্ষা করার শক্তি ছিল না।"

লাহোরের বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবদুল্লাহ আনোয়ার বেগ এমএ এলএলবি তাঁর Since our ball" পুস্তকে লিখেছেন, "আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকামী তেজস্বী সাহসী শক্তিশালী মুসলিম বীরগণ সমস্ত উত্তর ভারত অধিকার করে এশিয়ার হৃৎপিণ্ড আফগানিস্তানকে নিজেদের নিরাপদ সৈন্য সংগ্রহের ক্ষেত্র করেছিলেন। তাঁদের সংহতি ও সহযোগিতার কারণে তাঁরা সর্বত্রই সাফল্য লাভ করতেন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু জয় (৭১১) হতে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু সময় (১৭০৭) পর্যন্ত মুসলিমগণ ছিলেন প্রধানত মহা তেজস্বী, মহা সাহসী, মহা শক্তিশালী, মহা কর্মী, আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকামী যুগ নায়ক, যুগ শাসক, মহা বীরের জাতি। তার পরবর্তী হচ্ছে মুসলিমের জাতীয় চরিত্রের অধঃপতনের যুগ, মুসলিম জাতির পতনের যুগ। এমনকি এর পূর্বেই ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের দুর্লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ সম্রাট হলে খুব সম্ভব অতি সত্বরই অবস্থান্তর বা পতন ঘটত। মুঘল সাম্রাজ্যের এ পতন স্থগিত রাখতে কৃতকার্য হয়েছিলেন ইসলামীয় তূনীরের শেষ তীর আলমগীর বা আওরঙ্গজেব। দারা ছিলেন আকবরের মত বিজাতীয় ভাবাপন্ন। বলা বাহুল্য, আকবরই (মুঘল সাম্রাজ্যের) পতনের বীজ বপন করেন। ইসলাম অনুরাগী মুহিউদ্দিন আলমগীর, আওরঙ্গজেব বিজাতীয় প্রভাব ও দুর্নীতিসমূহ হতে সাম্রাজ্যকে সংস্কার ও সংশোধন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। এ জন্য তিনি কারও সন্তোষ বা অসন্তোষ কিছু মাত্র গ্রাহ্য করেননি। তাঁর চেষ্টা অনেকটা ফলবতী হয়েছিল বলেই ভারতে ইসলাম এবং জাতি হিসেবে মুসলমান এখনও টিকে আছে বা বেঁচে আছে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এরূপ অসাধারণ

শক্তিশালী আদর্শ চরিত্র কোন ব্যক্তি আর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেননি। এটাই ভারতস্থিত তৈমুর বংশীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসের প্রকৃত কারণ-(যশোরের চিন্তাশীল লেখক শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন প্রণীত আলমগীর দ্রষ্টব্য।)

অতএব এত দীর্ঘ আলোচনার পর একথা ভুললে চলবে না যে, আধুনিক সহজলভ্য ইতিহাসে যা আছে তাই-ই অমৃতের বারিধারা বর্ষণ নয়। প্রকৃত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং যুক্তি বা সত্যের মাপকাঠিতে যা গ্রহণযোগ্য তা অবশ্যই স্মরণীয় ও বরণীয়। বাকি অংশ পরিত্যাজ্য বা পরিহার্য।

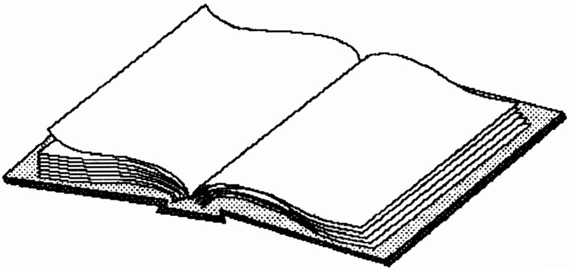

'দীনি-ইলাহী' ও আকবরের বিদায়পর্ব

বিশ্বের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মে আন্দোলন ও আলোড়ন শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষ কবীর নানক শ্রী চৈতন্য প্রমুখ মহা পুরুষগণ নানা ধর্মমত সৃষ্টি করে নানা সম্প্রদায় সৃষ্টি করলেন। ভক্তি ও মাহদী আন্দোলন জনসাধারণের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। প্রতি হাজার বছরের শেষ ভাগে ধর্মভোলা মানুষকে উদ্ধারের জন্য একজন 'মসীহ' পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন, এ ছিল মাহদীপন্থীদের বিশ্বাস। আফগানিস্তানেও অনুরূপ 'রাসনী' আন্দোলন শুরু হয়। তাদের ধ্যান ও ধারণাও অনুরূপ ছিল।

১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের শাহ আততায়ীর দ্বারা নিহত হন। পারস্যে বা ইরানে তখন একটা ইসলাম ধ্বংসী দল তৈরি হয়েছিল, নাম 'মোলহেদ'। পারস্যে নতুন শাহ সিংহাসনে বসেই চিন্তা করে দেখলেন, এ কুৎসিত নোংরা দলটি অদূর ভবিষ্যতে সুন্দর স্বচ্ছ ইসলাম ধর্মের কলঙ্কের কারণ হতে পারে। তাই ঐ মোলহেদ দলকে নিষিদ্ধ করেন এবং ওদের বন্দি করার আদেশ দিলেন। কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলে তাদের প্রধান ঘাঁটি ছিল। ঐ ঘাঁটি পারস্যের শাহ আক্রমণ করলে তারা দলে দলে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সম্রাট আকবরের সঙ্গে ঐ দল নেতারা দেখা করে নিজেদের মত ও পথের কথা বলতে গিয়ে বলে, আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি প্রত্যেক যুগে যুগে নবী আসেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদের (সা.) পর আর কোন নবী আসবেন না বটে কিন্তু ইমাম মাহদীর আগমনের কথা কিতাবে আছে। তাছাড়া প্রতি হাজার বছর অন্তর একজন মোজাদ্দেদ বা সর্বজনীন ধর্ম বিশারদ আবির্ভূত হন। এখন আরবী হিজরি সালের সেই হাজার বছর পূরণের যুগ। আমরা জানতে পেরেছি এ যুগসন্ধিক্ষণে আপনিই সেই ইমাম মাহদী এবং ধর্মপ্রচারক। অতএব আপনি এগিয়ে আসুন। পালন করুন আপনার পবিত্র দায়িত্ব। সম্রাট আকবর এ রকমই একটা সুযোগের অপেক্ষায় নয়, প্রতীক্ষায় ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী আকবর তাঁর রাজনীতির ভাল অঙ্গ হিসেবে এবং ধর্ম জগতে অমর হওয়ার বাসনায় ঐ দলের নেতাদের নিজের উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ কররেন। (হিস্ট্রী অব ন্যাশন্যালিজম দ্রষ্টব্য)।

ভারতে তিনি এক অখণ্ড সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ভারতে হিন্দুগণ সংখ্যাগুরু ছিল বলে হিন্দুদের প্রতি তিনি সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুদের বন্ধুত্ব লাভের জন্য তিনি তীর্থ কর ও জিজিয়া কর মওকুফ করেছিলেন এবং ঠিক একই কারণে তিনি বহু রাজপুত রমণীকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর হিন্দু স্ত্রীগণ হিন্দু রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানের প্রচলন করেছিলেন তাঁর হেরেমে। এসব রীতিনীতি নারীবিলাসী সম্রাট আকবরের জীবনে সুদূর প্রভাবিত হয়েছিল।

কপট সূফী ভ্রাতৃদ্বয় (ফৈজী এবং আবুল ফজল) এবং তাঁদের পিতার সঙ্গে আকবরের সান্নিধ্য লাভের ফলে আকবরের ধর্ম জীবন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তাঁরা আকবরকে দর্শন এবং ধর্মীয় আলোচনার জন্য ফতেপুর সিক্রিতে এবাদতখানা নির্মাণ করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আকবর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতদের তাঁর ইবাদতখানায় আমন্ত্রণ করতে লাগলেন। ১৫৮০ খৃস্টাব্দে আকুয়াডিভ এবং মনসারেটর জেসুইট মিশনকে (খৃস্টান মিশন) আকবর তাঁর সভায় সাদরে গ্রহণ করলেন। তিনি জোরোষ্ট্রিয় ও জৈন ধর্মের পণ্ডিতদের সভায় স্থান দিয়েছিলেন। হিন্দু পণ্ডিতগণ তো সভায় ছিলেনই।

ধর্মবিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন আবুল ফজলের পিতা শেখ মুবারক। তিনি সর্ববিষয়ে আকবরের মনোরঞ্জনের উপায় উদ্ভাবন করতেন এবং আকবর তাঁকে খুব সমীহ করতেন। শেখ মুবারক নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করে আকবরকে প্রমাণ দিলেন যে উলামা ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করেন। অপরাপর ধর্মের মধ্যেও কিছু ভুল বোঝাবুঝি আছে। যার ফলে বিদ্বেষ আর একঘেয়ে গোঁড়ামি এবং সম্প্রদায়গত আক্রমণের ভাব দেখা যায়।

নিরক্ষর প্রায় সম্রাট আকবরের ধর্মপ্রবণতা নতুন খাতে বইতে চাইল। সাম্রাজ্য লিপ্সু, হিন্দু নারী লোলুপ, উচ্চাভিলাষী সম্রাট আকবরের পূর্ব বর্ণিত পার্সী ধর্মগুরুর আশ্চর্য প্রভাব দেখা যেতে লাগল। এ সময়েই শেখ মুবারক তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, যেহেতু তিনি রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা, সেহেতু তিনি ধর্মনেতাও হতে পারেন। ধর্ম গুরু হওয়ার এ পরামর্শ আকবরের মনকে খুব প্রভাবিত করল।

শাহী মহলে মূর্তিপূজা এবং অগ্নিপূজা যেন একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হল। জালালুদ্দিন আকবর শাহ গাজী স্বয়ং কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ মালা পরে চন্দন চর্চিত দেহে হিন্দু সন্ন্যাসী বেশে দরবারে উপস্থিত হতে লাগলেন। দরবারের হিন্দু পণ্ডিতগণ ও সভাসদগণ 'সঠে সঠ্যাং' নীতি গ্রহণ করলেন। তাঁরা সম্রাটকে একেবারে আল্লাহর আসনে বসিয়ে "দিল্লিশ্বর" বা 'জগদীশ্বর' এই আওয়াজে ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত মুখরিত করে তুললেন। সম্রাটের কৃত্রিম আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগলেন। চণ্ডী, মাধবাচার্য ১৫৭৭ খৃস্টাব্দে রচনা করলেন "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" তারই ৩৭২ পৃঃ আছে-

"হেতা এক দেশ আছে নাম পঞ্চ গৌড়।
সেখানে রাজত্ব করেন বাদশাহ আকবর॥
অর্জ্জুনের অবতার তিনি মহামতি।
বীরত্বে তুলনা হীন জ্ঞানে বৃহস্পতি॥
ত্রেতা যুগে রাম হেন অতি সযতনে।
এই কলিযুগে ভূপ পালে প্রজাগণে॥"

হিন্দু পণ্ডিতদের এ ধরনের চাটুকারিতা আকবরের ভাবান্তরের অন্যতম কারণ। আর সেই যুগে কিছু স্বার্থান্বেষী মৌলবী নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও মতভেদও তাঁর ইসলাম ধর্মের ওপর অবহেলার ছোটখাটো কারণ। একদিন দরবারে আকবরের পাশে কে বেশি নিকটবর্তী হয়ে বসবেন তাই নিয়ে বিবাদ হয়, তাতেও আকবরের ভাবান্তর হয়। আকবরের উৎসাহ ও পরামর্শদাতারা তাঁকে বিশেষভাবে নতুন ধর্ম সৃষ্টিতে উৎসাহিত করলেও তেমন কেউ পরবর্তীকালে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেনি। তবে ইসলাম ধর্মের সর্বনাশ সাধন যাদের উদ্দেশ্য ছিল তারা কেবলমাত্র ঐ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কৃত্রিম আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। সময়মতো তার অনেক প্রমাণ দেয়া হবে।

ধর্মগুরু হওয়ার পথে আকবর ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চললেন। ১৫৭৯ খৃস্টাব্দে ফতেপুর সিক্রীর প্রধান মসজিদে আকবর তাঁর স্পেশাল দালাল দলকে উলামা সাজিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। পরে নিজে মসজিদের গেটে আড়ম্বরের সাথে উপস্থিত হন। তার পূর্বে ঐ মসজিদকে জমকালো করে সাজানো হয়েছিল। এবার যখনই আকবর উপস্থিত হলেন অমনি সেই নকল উলামা আর বহুরূপী সভাসদগণ নামায ত্যাগ করে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তাঁকে মসজিদের ভেতরে নিয়ে এসে মিম্বরে বসালেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময় থেকে প্রতি শুক্রবার জুমার নামাযের পূর্বে যে আরবী খোতবা হতো তা বাতিল করে আকবরের গুণগানপূর্ণ কবিতা পাঠ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর সেই কবিতার রচয়িতা ছিলেন 'ফৈজী'। সেটি আকবর নিজে পাঠ করে শোনাবেন বিরাট জনতাকে আর সকলে সমস্বরে আল্লাহু আকবর বলে শাবাশ দেবেন এবং সেই সঙ্গে আকবর এই নতুন 'দীনি-ইলাহী' ধর্মে দীক্ষিত হতে আদেশ দেবেন।

আকবর ফৈজীর লেখা নিজ গুণগান সম্বলিত কবিতা হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকীয় সংবাদ এই যে, মাত্র ছয় লাইন কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে আকবর চোখে যেন কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার দেখতে লাগলেন। তবু মনকে চাঙ্গা করে আবার আবৃত্তি করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি যেন নিজ কানে শুনতে পাচ্ছিলেন বুকের স্পন্দন। হৃদকম্পনের কারণে তাঁর একটি হাত বুকে বুলাতে লাগলেন। একটার পর একটা উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। প্রথমে চোখ বিদ্রোহ করল, তারপর কণ্ঠস্বর বিদ্রোহী হয়ে উঠল। শেষে তাঁকে মিম্বরের উঁচু ধাপ থেকে নিচে নেমে আসতে হল। সকলেই হতবাক। সমস্ত প্রোগ্রাম খতম। অবশেষে কোনক্রমে বললেন, জোর করে নয় ইচ্ছা করলে যে কেউ এই নতুন ধর্ম "দীনি-ইলাহী" গ্রহণ করতে পারে।

এই কবিতায় যা লেখা ছিল তার অনুবাদ-এই বিশ্ব নিয়ন্তা আমার রাজ্যাধিপতি আর আমায় দেয়া হয়েছে সমস্ত জ্ঞান, শক্তি আর সাহসের সবটুকু। আসল সত্য, তথ্য ও প্রেম আমার বক্ষে সঞ্চিত। তিনিই আমার পরিচালক, আমার সব তাঁরই ইঙ্গিতে। কোন ভাষা এমন নেই যে তাঁর গুণগান করি। আল্লাহু আকবর সেই মহান আল্লাহ।"

তাই এক ইংরেজ ঐতিহাসিক আকবরের হৃৎকম্প আর মিম্বর থেকে নিচে অবতরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন, "কিন্তু এই ঘটনায় সে ভাবাবেগের সঞ্চার হল, তা যে দৃঢ়চিত্তে প্রবল শত্রুর মোকাবিলায় কখনও বিচলিত হয়নি, তাকে অভিভূত করে ছিল। যে হৃদয় সকল বিপদেও শান্ত থাকত এখন তা দ্রুত স্পন্দিত হতে লাগল। যে কণ্ঠস্বর যুদ্ধের তুমুল হট্টনিনাদ ছাপিয়েও উর্ধ্বে শ্রুত হতো এক্ষণে বালিকার কণ্ঠের ন্যায়ই তা ভেঙে পড়ল। প্রথম তিন ছত্রের উচ্চারণ সমাপ্ত করার পূর্বেই এ সম্রাট নকল নবীকে সেই উচ্চ হতে নামিয়ে আসতে হল।" (টার্কস ইন ইন্ডিয়া পৃঃ ৬৯ দ্রঃ)

হযরত মুহাম্মদের (সা.) সময় হতে মুসলমানদের বিচার-আচার কুরআন ও হাদীসের ছায়াবলম্বনে কাজী বা মুফতিগণ দ্বারাই হয়ে আসছিল। আজও আমাদের মুসলমানদের বিষয়ে ভারতীয় কোন সংবিধানের সঙ্গে মুসলমানদের বাধ্য করা হয় না। যেমন ফারাজ আইন, তালাক আইন প্রভৃতি। মুসলমানদের বিখ্যাত আইন গ্রন্থ হেদায়া বা আজ সারা পৃথিবীতে নানা ভাষায় অনুবাদ বা তর্জমা করা হচ্ছে এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রে তার পূর্ণ, অর্ধেক অথবা আংশিক গৃহীত হয়েছে। বিশেষ করে ইউরোপে ব্যাপকভাবে হেদায়া থেকে আইন সংকলিত হয়েছে। মূল আইন বই হেদায়া আর তার দেহ ও প্রাণ কুরআন ও হাদীস। যাইহোক, আকবর মতিভ্রমে বা মতিক্রমে ১৫৮৭ সালে কাজীর বা মুফতির বিচার ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন। তার পরিবর্তে আকবরের নতুন আইন ও হিন্দু ধর্ম সংমিশ্রিত আইন পরিচালিত হল। এর ফলে স্বভাবত অমুসলমান পাঠক আকবরের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে পারেন। কিন্তু আকবর যদি পুরো হিন্দু হয়ে যেতেন তাহলে এ মারাত্মক অভিযোগ থেকে তিনি বাঁচতে পারতেন। তিনি হিন্দুও হননি আবার মুসলমানও বলা কঠিন। আবার দেখা যাচ্ছে তিনি ভেতরে ভেতরে মুসলমান হয়ে তওবা করে অনুতাপ ও অনুশোচনা করে নিজের জীবনে সহস্র সহস্র ধিক্কার দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাহলে তিনি হিন্দু এবং মুসলমান উভয় জাতির সঙ্গে সমানভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে গেছেন। হিন্দুদের খুশি করতে যত রকম ব্যবস্থা আছে তা তিনি করেছিলেন। আজ তা প্রমাণ হতে চলেছে। কিন্তু আসলে তার মধ্যে কোন আন্তরিকতা ছিল না, মৌখিক ছিল সবই। তাঁর রাজনৈতিক চালাকি নিছক ভণ্ডামি এবং উদারতার অভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়।

১৫৮৮ খৃঃ রাজা ভগবান দাসের ভাগ্না (দত্তক পুত্র) এবং উত্তরাধিকারী মানসিংহকে তাঁর নতুন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে অনুরোধ অথবা আদেশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি যা জবাব দিয়েছিলেন তা চমকপ্রদ। মানসিংহ বলেছিলেন, "যদি জীবন উৎসর্গ করার সংকল্পই হয় মহামান্য সম্রাটের একজন বিশ্বস্ত অনুসারী তার প্রমাণ আমি যথেষ্ট দিয়েছি। কিন্তু আমি একজন হিন্দু: সম্রাট আমাকে মুসলমান হতে বলছেন না। আমি তৃতীয় কোন ধর্মের কথা

অবগত নই।” নবরত্নের অন্যতম সদস্য রাজা টোডরমলও আকবরের ধর্ম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু অবস্থাতেই পরলোক গমন করেন।

আকবরের একান্ত অনুগত কেবল বীরবল ও অন্য ১৭ জন ছাড়া আর কেউ “দীনি-ইলাহী” ধর্মগ্রহণ করতে সম্মত হননি, বীরবলসহ ১৮ জন কেবল উঁচু রাজপদ ও অর্থের লোভে এ নতুন ধর্মগ্রহণ করেছিলেন। অথচ সহায় সম্বলহীন যেকোন ফকির-দরবেশ মৃত্যুর পূর্বে হাজার হাজার মুরিদ (শিষ্য) রেখে যেতে পারেন। এখানেও আকবরের হলো সবচেয়ে লজ্জাকর পরাজয়। আকবরের মৃত্যুর পর আকবর অদৃশ্য হন বটে, কিন্তু তাঁর রোপিত বিষবৃক্ষ ভারতের বুকে ইসলামের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর দারুণ আঘাত হানে।

আকবর এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে আকবরের ভাবাদর্শে ও জাহাঙ্গীরের প্রযত্নে মুসলমান লেখক দ্বারা এমন কিছু বই লেখানো হয়েছিল হিন্দি ভাষায়, যার ভাব ছিল বৈদিক। মুসলমান অথচ সমাজের সর্বনাশের জন্য কুরআন, পুরাণ ও রাম রহিমের খিচুড়ি ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যায় না। যেমন পুস্তকগুলোর নাম ‘মদন শতক’, ‘সামুদ্রিকা’ ইত্যাদি। এ পুস্তকগুলোর সূচনায় লেখকগণ গণেশ, রামচন্দ্র, প্রমুখ দেবতার বন্দনা গেয়েছেন। ‘রামভূষণ’ নামক পুস্তকের লেখক ইয়াকুব খান তাঁর পুস্তকে রাধাকৃষ্ণ, সরস্বতী ও গৌরীশঙ্করের অতি কীর্তন এবং এসব দেবদেবীর অতি পূজা নিবেদন করে ধর্মীয় উদারতা অথবা খিচুড়ি প্রবণতা প্রদর্শন করেছেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফিরিস্তা লিখেছেন, “তারা মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে মূর্তিপূজা করত, বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে দেবদেবীর স্তুতি বন্দনা করত, গান গাইত। এ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে কনফেডারেসী অফ ইন্ডিয়া পুস্তকে।

ডাঃ স্মিথ বলেন, “এই ধর্ম বিশ্বাস ছিল হাস্যকর, আভিজাত্য এবং অসংযত স্বৈরাচারের স্বাভাবিক ফল।” অন্যত্র তিনি বলেছেন, “এটা আকবরের ভুলের সৃষ্টি, জ্ঞানের নয়।”

আজও ভারতের হিন্দু অনেকে খামের ওপর ৭৪॥ লেখেন। এর অর্থ হচ্ছে অত্যাচারী মুসলমানরা এত হিন্দু ব্রাহ্মণ হত্যা করেছিল, যাদের উপবীতের (পৈতার) ওজন হয়েছিল ৭৪॥ মণ। কিন্তু কথা হচ্ছে কে সেই মুসলমান অত্যাচারী ব্যক্তি? হয়ত নাম না জানলে মনে হতে পারে আওরঙ্গজেব, হুমায়ুন, শেরশাহ, বাবর প্রমুখ রাজা বাদশাহ কেউ; না হয় নাদির অথবা মুহাম্মদ বিন কাসিম। কার ওপর আন্দাজ করে ধরবে পাঠক-পাঠিকা? এখন যদি বলি আকবর তাহলে অবশ্যই অবিশ্বাস্য হবে। তার উত্তরে আসবে গোঁড়া মুসলমানরা আকবরকে দেখতে পারে না। তাই তার ওপর এত বিদ্বেষ ভাব।

তাই বলি "দুর্গে দুর্গে" নামক ইতিহাস পুস্তিকার তৃতীয় সংস্করণের প্রথম পাতায় লেখক লিখেছেন "চিতোর গড়ের কথা।" তারই কয়েক লাইন হুবহু তুলে দিচ্ছি। "সাড়ে চুয়াত্তর কথাটা শুনেছ নিশ্চয়? কথাটার ব্যবহার কেন হয়েছিল জান? চিঠি লিখে খামের পেছনে সারে চুয়াত্তর লেখা হয়, কেননা যাতে করে খামটা কেউ না খোলে। যদি খোলে তাহলে পাপের ভাগী হবে। গল্পটা ইতিহাসের। আকবর বাদশাহ হুকুম দিলেন যুদ্ধে যত লোক মরেছে তাদের পৈতাগুলো ওজন করতে। তাই করা হল। দেখা গেল ওজন হয়েছে সারে চুয়াত্তর মণ। যদি পৈতার ওজন সারে চুয়াত্তর মণ হয়, তাহলে অনুমান করত কত হাজার লোক মরেছিল যুদ্ধে? গল্পটা আজ হয়ত ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। তবে ঘটনাটি ঘটেছিল চিতোরে।"

তবুও তাঁকে মহামতি বলতে হবে যত হত্যাই করুক, হোক না ব্রাহ্মণ হত্যা। তবু তো আকবর মুসলমান ধর্মের শত্রুতা করেছিলেন। অতএব তাঁকে মহামতি বানালে অন্তত মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা আকবরের মত হিন্দু ভাবাপন্ন হয়ে যাতে 'উদার' উপাধি পায় সেই রাস্তা পরিষ্কার হয়েছে। ইংরেজদের ইনজেকশন সত্যই সাংঘাতিক। ঐ 'দুর্গে দুর্গে' ইতিহাস পুস্তিকাটির লেখকের নাম হচ্ছে শ্রীবেনু গঙ্গোপাধ্যায়।

একটা বিকৃত চরিত্রের পুরুষের চরিত্রে যত প্রকার দোষ থাকা সম্ভব আকবরের ক্ষেত্রে তা পূর্ণ মাত্রায় অথবা অতিমাত্রায় ছিল। যেমন দাবা খেলায় মানুষ ঘুঁটি ব্যবহার করে, কারো ঘুঁটি কাঠের, কারো হাড়ের, কারো হাতির দাঁতের, কারো রুপোর, আবার কারো সোনার ঘুঁটি। আকবর দাবা খেলতেন তাঁর ঘুঁটি হয়তো সোনার কিংবা মূল্যবান পাথরের হবে বলে সাধারণের ধারণা। কিন্তু আগেই বলেছি তাঁর চরিত্র বিকৃতি মাত্রাতিরিক্ত ছিল। আকবরের দাবা খেলার ঘুঁটি ছিল জড়পদার্থ নয় জীবন্ত ষোড়শী যুবতী সুন্দরী নারী। সেই নারী নিয়ে হার-জিত হতো আর জিতে নেয়া নারীদের ব্যবহার করা হতো ব্যভিচারের ইন্ধনরূপে।

ভারতে তথা পৃথিবীতে অনেক মৃত মানুষের স্মৃতি রক্ষার জন্য স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে আগ্রার তাজমহল, কুতুব মিনার প্রভৃতি। কিন্তু অনেকে তা অর্থের অপচয় অথবা অর্থের শ্রাদ্ধ বলে অভিহিত করেন, আকবর সেখানেও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন। 'হিরণ মিনার' তার সাক্ষী। নব্বই ফুট উঁচু আর নানারকম কারুকার্য করা দেখার মত এ মিনারের নিচে শুয়ে আছেন নিশ্চয় কোন বিখ্যাত ব্যক্তি। কিন্তু না; সেটা একটি হাতির সমাধি। (শ্রীগঙ্গপাধ্যায় 'দুর্গে দুর্গে' ফতেপুর সিক্রীর অধ্যায়ে পৃঃ ৯৬)।

আকবর তাঁর তৈরি বহু প্রাসাদের দেয়ালে জীবজন্তুর ছবি অঙ্কন করেছেন। ইসলাম ধর্মে অপ্রয়োজনীয় জীব জন্তুর ছবি বৈধ নয়। আর যা বৈধ নয় তাকে

বৈধ করা সম্রাট আকবরের বৈশিষ্ট্য। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে অনেক জীবজন্তুর নারীর মূর্তির উলঙ্গ ও অর্ধোলঙ্গ ছবির অপসারণ করা হয়। তুর্কী মহলে বংশীধারী মানুষের ছবি শ্রীকৃষ্ণকে মনে করে দেয় এবং অমুসলমান দর্শকগণ আকবরের প্রতি ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। লর্ড কার্জন দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানে অনেক চিত্র পুনরাঙ্কন করেছেন। প্রস্তর নির্মিত উলঙ্গ নারীমূর্তি, ডানাওয়ালা পরী প্রভৃতি যা দেখলে সহজেই মনে হবে রাজা-বাদশারা বোধ হয় সব সময় উলঙ্গ উন্মাদনায় মত্ত হয়ে থাকতেন আসলে তা নয়।

শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা "ফতেপুর সিক্রি" অধ্যায় থেকে কতকগুলো উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি। "এই হামাম বা স্নানাগারটি আকবর তাঁর তুর্কী বেগমের জন্য নির্মাণ করেন। একটি ছোট বীথিকার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ পথ, তপ্ত ও শীতল জলের ফোয়ারার ব্যবস্থা ছিল এখানে। আকবরের পাঁচ মহলের বর্ণনায় লেখক বলেছেন, "এই সৌধে তিনি বেগমদের ঈদের চাঁদ দেখার ব্যবস্থা করেছেন। হিন্দু বেগমদের সূর্য প্রণামের ব্যবস্থা করেছেন। পাঁচ মহলের দক্ষিণ দিকে আকবরের খৃস্টান বেগম মেরিয়ম জামানির মহল। সোনালী রঙে এই সৌধের দেওয়াল চিত্রিত ছিল তাই এটির নাম "সোনহেরা প্রাসাদ"। ফেরদৌসির শাহনামা চিত্র, হিন্দুদের পুরাণ চিত্র, খৃষ্ট জীবনীর চিত্র প্রভৃতি প্রাসাদ গাত্রে অলঙ্কিত ছিল।"

আকবরের নিকট বিয়ে ও ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য ছিল না। তাই কোন কোন পণ্ডিতদের মতে বিকানীর রাজকন্যাকে আকবর বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে খৃস্টানদের অবাধ মেলামেশা করতে আকবরেরও উৎসাহ ছিল। তাঁর গর্ভে একটি সুন্দর সুস্থ সন্তান হয়েছিল। আকবর তাঁর নতুন নাম রেখেছিলেন তাঁর মদ্য পানের সাথী মিঃ দানিয়েলের নাম অনুসারে দানিয়েল।

তিনি লিখেছেন, 'পঁচিশী কোর্ট' সুন্দরী সুবেশা তরুণীদের দাঁড় করে ছক কাটা ঘরে পাশা খেলতেন সম্রাট আকবর।" ইসলাম ধর্মে ভাগ্য গণনা, হাত গণনা প্রভৃতি বিশ্বাস করা মারাত্মক অপরাধ। আকবর ইসলামের প্রতি সেখানেও আঘাত হেনেছেন। একজন হিন্দু জ্যোতিষীকে বসিয়ে রাখতেন তাঁর দরবারের চবুতারায় এবং তিনি যা বলতেন আকবর তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেনে নিতেন। যুদ্ধ যাত্রা, প্রমোদ ভ্রমণ, প্রাসাদ নির্মাণ প্রভৃতি কাজে জ্যোতিষীর রায় গৃহীত হতো। কিন্তু তাঁর বহু ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যায় পরিণত হয়েছিল যেমন "দীনি ইলাহী" ধর্মের সারা ভারতে জনপ্রিয়তার কথা। কিন্তু যাঁকে বহুদিন ধরে ভক্তি করে এসেছেন তাঁকে ভক্তি করতে ইচ্ছা না হলেও অনেককে খুশি রাখতে মৌনতা পালন ছাড়া উপায় ছিল না।

আকবরের চরিত্রের কলঙ্ক সমুদ্রের সমস্তটুকু ঢাকা দিয়ে কিছু ঐতিহাসিক ঐগুলো ভাগ করে প্রত্যেক মুসলমান বাদশাহ, মন্ত্রী, সেনাপতিগণের চরিত্রে কাল্পনিক বণ্টন ব্যবস্থা করে সহজেই অনেকে ডক্টরেট উপাধি নিতে যেন মেতে উঠেছেন।

আজও ভারতে অসভ্য, অনাচার, ইসলাম ধ্বংসী কাজ, শিরক, বিদআত, বাউল-আউল ও মিথ্যা মারফতি ও অসভ্য ফকির দলের নোংরামির উৎস আকবরের উৎসাহ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনেই সৃষ্টি। আওরঙ্গজেব বহু বর্বরতা দূর করেছিলেন। কিন্তু আগাছার চাষ করার প্রয়োজন হয় না, সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, এমনিই গজিয়ে ওঠে। তাই আজ এই আধুনিক যুগে মাথা উঁচু করে গজিয়েছে ঐ আগাছা জঙ্গল ও বিষাক্ত কণ্টক।

আকবর কিন্তু মৃত্যুর পূর্বাহ্নে তাঁর অভিনয়ের খোলস খুলে ফেলেছিলেন। দীর্ঘ ৪৭ বছর রাজত্ব করার পর ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে শত শত স্ত্রীকে বিধবা করে পরলোক গমন করেন। আকবরের শেষ দশ বছরের ইতিহাস ভালভাবে পাওয়া যায় না। কারণ তাঁর মৃত্যুর দশ বছর আগে বিখ্যাত ঐতিহাসিক বদায়ুনীর মৃত্যু হয়। আর একজন প্রতিভাধর ঐতিহাসিক আবুল ফজল আকবরের মৃত্যুর ১২ বছর পূর্বেই নিহত হন। আকবর নিজের মৃত্যুকে স্বাভাবিক মনে করে এবং চোখের সামনে ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ করে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। যেমন (ক) আকবরের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহ। (খ) জনৈক হিন্দু আততায়ী কর্তৃক তাঁর আবাল্য বন্ধু দার্শনিক ও উপদেষ্টা আবুল ফজলের হত্যা (গ) তাঁর 'দীনি ইলাহী' ধর্মে দীক্ষিত বীরবল আর অনুগত মহেশ দাসের আফগানদের হাতে শোচনীয় পরাজয় ও মৃত্যু। আসলে ক, খ, গ কারণগুলো আসল নয়, মূলের শাখা কিংবা প্রশাখা। হিজরীর ৯৯৯ সালে আকবর ভাবলেন, মাত্র আর এক বছর বাকি ১০০০ হিজরী সন পূর্ণ হবে। আকবর নতুন নবী বলে খ্যাতি লাভ করতে পারল কই। যিনি প্রতীক্ষা করে আসছিলেন ইমাম মাহদী ও মসহীরূপে নিজকে আত্ম প্রকাশ করতে? তিনি ১০০০ হিজরী সনে বেশ বুঝতে পারলেন তাঁর সমস্ত স্বপ্ন স্বপ্নই নয় বরং জাগরিত অবস্থায় দুঃস্বপ্ন দর্শন। তাই "টার্কস ইন ইন্ডিয়া" গ্রন্থে মিঃ কীসি বলেছেন, "পরবর্তী বছরটি ছিল ৯৯৯ হিজরী সাল এবং তার পরেই এল ১০০০ হিজরী সাল। এক সহস্র বছরের যে আশা ব্যাপকভাবে পোষণ করা হয়েছিল তার সমাধি রচিত হল ঐ ১০০০ হিজরী সালেই।"

আকবরের মৃতদেহ কিন্তু দাহ করা বা নদীর বক্ষে নিক্ষেপ অথবা পশ্চিম দিকে পা রেখেও সমাধি হয়নি, হয়েছিল সাধারণ মুসলমানদের মতই। কিন্তু বড়ই পরিতাপ ও অবাক হওয়ার কথা যে, অমুসলমানদের জন্য তাঁর এত কাণ্ড, এত পরিকল্পনা তারাই আকবরের কবর খুঁড়ে অস্থিগুলোকে পর্যন্ত যতদূর সম্ভব অপবিত্র করে তুলে ফেলে দেয়। হয়তো বিধাতার বিধানের ইঙ্গিতেই এই সব।

>Goto List

পঞ্চম অধ্যায়

আওরঙ্গজেব ও মারাঠা শক্তির উত্থান

শিবাজী ॥

বড় বড় পর্বত শ্রেণী মহারাষ্ট্রের দুদিকে বেষ্টন করে রেখেছে। পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা উত্তর থেকে দক্ষিণে। আর সাতপুরা ও বিন্ধ পর্বতমালা পূর্ব থেকে পশ্চিমে। দেশটি অতি পর্বতসঙ্কুল তাই মহারাষ্ট্রের প্রাকৃতিক পরিবেশে আত্ম রক্ষা ও আক্রমণের জন্য এক স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্গে পরিণত হয়েছে।

১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে তালিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগর রাজ্যের এক ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের পরপরই দক্ষিণ ভারতে মুসলমান আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে মারাঠাগণ বাহমনী ও পরবর্তী আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি সুলতানের অধীনে কাজ করত। যে কয়টি মারাঠা পরিবার সুলতানদের অধীনে রাজকর্মে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তাঁদের মধ্যে ভোঁসলে পরিবার অন্যতম। ভোঁসলেদের পারিবারিক বৃত্তি কৃষিকর্ম। শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে প্রথমে নিজাম শাহী সুলতানের অধীনে পরে বিজাপুরের আদিল শাহী সুলতানের অধীনে কাজকর্মে নিযুক্ত থেকে বেশ প্রতিপত্তি বাড়িয়েছিলেন। উত্তর ভারতে মোঘল আর দক্ষিণ ভারতে সুলতানদের যুদ্ধ বিগ্রহের সুযোগে তাঁরা সুলতানী ও মোঘল সাম্রাজ্যে দুর্গ দখল ও লুটতরাজ আরম্ভ করত। এটাই মারাঠাদের জাতীয় চরিত্র। ধর্মগুরু রাম দাসের শিক্ষায় দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ শিবাজী মারাঠীদের জাতীয় চরিত্র আরও সুসংগঠিত করেন।

শিবাজী জুনারের কাছে শিবনের পার্বত্য দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। স্বামীর অনাদরের জন্য জিজাবাঈ ও শিশু শিবাজী দাদাজী কোন্দদেব নামে এক ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মারাঠীদের শৌর্যবীর্যের ঐতিহ্য ছিল তাঁর চরিত্রের ভিত্তি। এছাড়া আর কোন শিক্ষা বিশেষ তিনি পাননি।

শিবাজীকে সাধারণ ইতিহাসে মনে হয় তিনি আদর্শ বীর, বিরাট যোদ্ধা, সুকৌশলী এবং আওরঙ্গজেবের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী। আরও বদ্ধমূল ধারণা হয় যেন আওরঙ্গজেব শিবাজীর কাছে বারবার পরাজয়বরণ করে নাজেহাল হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, শিশুকাল থেকে এ ধারণা মনে ঠাঁই পায় যে, শিবাজী কেবল মারাঠা জাতির গৌরব নন; বরং ভারতে পরিচয় দেয়ার মত রাজা শিবাজী। তাই তিনি জাতীয় বীর। ভারতে প্রধানতম ফটক বোম্বাই-এ তাই বীর শিবাজীর মূর্তি বীর বেশে দণ্ডায়মান।

>Goto List

কিন্তু অপর পক্ষ শিবাজীকে সামান্য সৈনিক, দস্যু, পাহাড়ি ইঁদুর, বিশ্বাসঘাতক এবং অকৃতজ্ঞ বলে মনে করেন। নিরপেক্ষ পাঠকদের কাছে সমীক্ষার প্রয়োজন। তাহলে দুই মতের মধ্যে সমন্বয় অথবা তৃতীয় মতের উপর উদ্ভব হতে পারে। তবে আকবরের ভুল ভ্রান্তি, চরিত্রহীনতা জেনে বুঝে ঢাকা দিয়ে যাঁরা তাঁকে মহামতি, “আকবর দি গ্রেট”, “দিল্লীশ্বর” ও “জদগীশ্বর” উপাধি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি তাঁরা নিজ গুণে ঠিক বিপরীত পন্থায় আওরঙ্গজেবকে নিন্দা বা তাঁকে খাটো করে প্রকাশ করতে পারেন। মোটকথা আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যাঁদের বিবাদ বিসম্বাদ তাঁরাই হবেন তত বীর তত বাহাদুর। শিবাজীর ক্ষেত্রেও অনেকের মতে তাই।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে এক নতুন জাতির অভ্যুত্থান হয়। এটাই মারাঠা জাতি। এই মারাঠা জাতি আসলে যাযাবর দস্যু আর দস্যুবৃত্তিতে চিরদিনের জন্য ইতিহাসে কুখ্যাতই ছিল। রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে আক্রমণ করত নিরীহ গ্রামবাসী ও শহরবাসীর ওপর। তারপর লুটতরাজ ও অগ্নি সংযোগ করে ধন-দৌলত-অর্থ গহনা নিয়ে চম্পট দিত। আমাদের বাংলাদেশে পর্তুগীজ মগ দস্যুদের মত মারাঠা জাতিও কুখ্যাত ছিল। তাদের অত্যাচারের কাহিনী গ্রামীণ লোকগাথায় ইতিহাসের পাতায় মজুত আছে। তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে মানুষ এত আতঙ্কগ্রস্ত ছিল যে, কচি বাচ্চাদের কান্না থামাবার জন্য মা “মারাঠা বর্গীয়দের” অত্যাচারের আলেখ্য তুলে ধরতেন। যেমন-

“ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল।
বর্গী এল দেশে॥
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।
খাজনা দেব কিসে॥

সাতবাহনদের রাজত্বকাল থেকে মারাঠা জাতির বহু হিংস্র মানুষকে সভ্য ও শিক্ষিত করে যুদ্ধের জন্য সৈন্য বিভাগে লাগানো হতো। তুর্কী সুলতান ও মুঘল বাদশারাও তাদের বিভিন্ন বিভাগে চাকরি দিতে কার্পণ্য করেননি। শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে আহমদ নগরের উচ্চ পর্যায়ের সামরিক কর্মচারী ছিলেন। ১৬৩৬ খৃঃ মুঘলদের হাতে আহমদনগরের পতনের পর তিনি বিজাপুরের সুলতানের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। এখানে তিনি প্রভুকে সন্তুষ্ট করে কর্ণাটে এক জায়গীর লাভ করেন। হঠাৎ উন্নতির আতিশয্যে অনেক সুন্দরীর সহজপ্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর প্রথমা স্ত্রী জিজাবাঈকে উপেক্ষা করতে থাকেন। জিজাবাঈ শিশু শিবাজীকে নিয়ে মুসলমান বিদ্বেষী গোঁড়া ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ প্রকৃত শিক্ষিত ছিলেন না। তবে শিবাজীকে এই শিক্ষাই ভালোভাবে দিয়েছিলেন তা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ মুসলমান হিন্দুর শত্রু। অতএব শক্তি সঞ্চয় করে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। যুদ্ধে জিতলে লাভ আর মরলেও স্বর্গ। নিরক্ষর ও শিবাজীর বক্ষ ফলকে কোন্দদেবের মন্দ কথা বিষবৃক্ষ রোপণের এক বৃহৎ বুনিয়াদ বলা যায়।

শিবাজী বড় হয়ে কোন্দদেবের মন্দ কথা কাজে পরিণত করতে লাগলেন। সেই সময় মাওয়ালী নামে সম্পূর্ণ অসভ্য পার্বত্য জাতির সঙ্গে শিবাজীর মিল হয়ে যায়। শিবাজী তাদের সংগঠিত করলেন এই আশ্বাস দিয়ে যে, তোমরা আমার অধীনে যদি লুঠতরাজে শামিল হও তাহলে প্রত্যেকের অংশে মোটামুটি বখরা পড়বে। আর ভবিষ্যতে আমরা মুঘল রাজধানী পর্যন্ত লুট করতে পারব। তখন আমাদের সুদিন ও সুনাম দুটিই হাতে এসে যাবে। ঐ মাওয়ালী জাতির কথা এক হ্যাঁ তো হ্যাঁ আর না তো না। শিবাজী মাওয়ালী জাতিকে নিয়ে একটি সৈন্য বাহিনী গঠন করে বিজাপুর রাজ্যে বারবার হানা দিলেন। বিজাপুরের সুলতান শিবাজীর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে শিবাজীর পিতা শাহজীকে বন্দি করলেন। পিতাকে উদ্ধার করার শক্তি শিবাজীর ছিল না এবং সম্মুখসমরের নীতিও ছিল না মারাঠা জাতির। তাই শিবাজী সম্রাট শাহজাহানের অনুনয় বিনয় করে আবেদন রাখলেন। সম্রাট শাহজাহানের মধ্যস্থতায় শাহজী মুক্ত হন।

কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর ১৫৫৬ খৃঃ শিবাজী পুনরায় অন্যায়ভাবে এবং বিশ্বাসঘাতকতার সাথে জাওয়ালী অধিকার করেন। আওরঙ্গজেব তখন বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। এই অবসরে মুঘল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম ভূভাগ তিনি আক্রমণ করেন।

সম্রাট সংবাদ পেয়েই সেখানে মুঘল সৈন্য প্রেরণ করে মারাঠা হানাদারদের বিতাড়িত করেন। শিবাজী হতমান হলেও পুনঃ আক্রমণের সংকল্প তাঁর ছিল। এই সময় ইতিহাসের রুচীশীল অনুরাগীগণের মনে রাখা অবশ্য প্রয়োজন যে, আওরঙ্গজেব পিতার অসুস্থ সংবাদে দিল্লি ফিরে যান। তখন ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ। শিবাজী এক পরম সুযোগ মনে করলেন। কারণ সম্রাট আওরঙ্গজেবকে তিনি খুব ভয় করতেন। দিবালোকে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করার সাহস আদৌ তাঁর ছিল না।

শ্রী ঘোষও তাঁর পুস্তকে ৪৫২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "পিতার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণ্যতা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন (১৬৫৮) তারপর শিবাজীর মৃত্যুর দুই বছর পরে আবার দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসেন।" শিবাজীর মৃত্যু হয় ১৬৮০ খৃস্টাব্দে। অতএব ১৬৫৮ থেকে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ২২ বছর আর শিবাজীর মৃত্যুর দু বছর পর মোট ২৪ বছর পরে আবার সম্রাট আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে আসেন। আওরঙ্গজেব শিবাজীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হলে এই সময়ের মধ্যে সারা দাক্ষিণাত্য জয় করে নিতে পারতেন। বলাবাহুল্য, শিবাজী সারা জীবনে আওরঙ্গজেবকে দেখতে পেয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। এই সময় ১১ বছর কুমার শাহ আলম, ছয় বছর বাহাদুর খাঁ, চার বছর শায়েস্তা খাঁ, দু বছর জয় সিংহ, এক বছর দিলির খাঁ দাক্ষিণাত্যে সুবাদারি করেন। আওরঙ্গজেব দিল্লি থেকে যা ফরমান পাঠাতেন তাঁতেই ছত্রপতি শিবাজীর দারুণ দুর্দশা হয়েছিল। তাঁর সেনাপতিগণ বারবার পরাস্ত করেছেন শিবাজীকে, বারবার বন্দি করেছেন শিবাজীদের এবং সম্রাট আওরঙ্গজেব বারবার ক্ষমা করেছেন শিবাজীদের।

প্রথম জীবনে শিবাজী বিজপুরের অনেক দুর্গ মাওয়ালীদের সহযোগে আয়ত্ত করেছিলেন। সুলতান ক্রুদ্ধ হয়ে দশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করলেন। সেনাপতি ছিলেন আফজল খাঁ। তার পরেই ঘটনা প্রবাহ চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক "ইতিহাস পরিচয়" এ আছে। "শিবাজী দেখলেন, প্রকাশ্য যুদ্ধে তিনি পারবেন না। তাই তিনি এক মতলব আঁটলেন, সন্ধির প্রস্তাব করে তিনি আফজল খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। দুই জনে সাক্ষাৎ হল। সাক্ষাতের সময় কোন পক্ষেরই বেশি লোকজন ছিল না। সাক্ষাৎকালে উভয়ে যখন উভয়কে আলিঙ্গন করতেছিলেন সেই সময় তাঁর পোশাকের নিচে লুকায়িত 'বাঘনখ' নামক অস্ত্র দ্বারা হঠাৎ আফজল খাঁকে আক্রমণ করে তাঁকে নিহত করলেন। ফলে আফজল খাঁর সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল, তখন শিবাজী তাদের আক্রমণ করে অনায়াসে পরাজিত করলেন।"

প্রাচীনকাল হতে আজ পর্যন্ত নিয়ম আছে সন্ধি করার সময়, কোন চুক্তি করার সময় শত্রু পক্ষকে হত্যা করা মানবতাবিরোধী। কিন্তু শিবাজীর এই রকম বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাসে বিরল। মারাঠা ভক্ত ঐতিহাসিকগণ উল্টো আবার আফজল খাঁকেই দায়ী করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে তুলে ধরা হয়, আফজল খাঁ আলিঙ্গনের সময় শিবাজীকে গলাটিপে মারার চেষ্টা করলে তখন শিবাজী 'বাঘনখ, দিয়ে তার বক্ষ বিদীর্ণ করেন। কিন্তু যিনি সুশিক্ষিত শক্তিশালী দশ হাজার সৈন্যের সেনাপতি তাঁর পক্ষে শিবাজীকে মারবার জন্য যুদ্ধই যথেষ্ট ছিল এবং সেটাই বীরত্বের নামান্তর হতো। কিন্তু তিনি শিবাজীর দুর্বল কাতর কণ্ঠের আবেদন মঞ্জুর করে বীরত্বের মহত্ত্বের দিকে খোলা মনে খালি হাতে অগ্রসর হয়েছিলেন। আফজলের মৃত্যুতে শিবাজী নিজের নামে জয় ঢাক বাজিয়ে বীরত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে গর্ববোধ করতে লাগলেন।

শিবাজীর সুনাম চরম সীমায় তোলার আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে যুব প্রস্তুতি নিয়ে মাওয়ালী জাতি ও মারাঠা জাতির বাছাই করা সৈন্য নিয়ে মুঘল ঘাঁটি আক্রমণ করলেন। সংবাদ পেয়ে আওরঙ্গজেব পাঠালেন শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীকে শায়েস্ত করতে। শায়েস্তা খাঁ মারাঠাদের বিতাড়িত করে পুনা, চাকান দুর্গ ওকল্যান অধিকার করেন। যুদ্ধ শেষে পুনায় রাত্র-শয্যায় বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় রাতের অন্ধকারে শিবাজী অতর্কিতে শায়েস্তা খাঁর কক্ষে সশস্ত্র আক্রমণ করলেন। শায়েস্তা খাঁ নিদ্রা থেকে উঠে দেখলেন দরজায় তরবারি হাতে শিবাজী। তাই তিনি সবলে জানালা ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। এই সময় শিবাজীর তরবারির আঘাতে শায়েস্তা খাঁর দুটি আঙুল কাটা যায়। অত্যন্ত পরিতাপ ও বিপজ্জনক ঘটনার এই খানেই শেষ নয়। শিবাজী শায়েস্তা খাঁর এক নিরপরাধ পুত্রকে পেয়ে গেলেন এবং তিনি নিজে তাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করলেন। এই ঘটনাটি ঘটে ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে।

আবার ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজী সুরাট লুণ্ঠন করেন, এমনকি তীর্থ যাত্রীদের জাহাজ পর্যন্ত তাঁর অত্যাচার হতে নিষ্কৃতি পায়নি। এই সংবাদে সম্রাট আওরঙ্গজেব বললেন, যে সম্মুখে আসে না, মানবতার ধার ধারে না, এই রকম একটা দস্যু বা পার্বত্য মুষিক না হয়ে শিবাজী যদি একজন রাজা বা বীর হতো তাহলে আমি কয়েক দিনের জন্য গিয়ে সমুচিত শিক্ষা দিতাম। সম্রাট আওরঙ্গজেব জয় সিং এবং দিলির খাঁকে পাঠালেন পাহাড়ি ইঁদুর শিবাজীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

মুঘল বাহিনী পুরন্দুর দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গের ভেতর শিবাজী সপরিবারে বাস করতেন। যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত এবং পরাজিত হলে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে মনে করে শিবাজী পুরন্দুর চুক্তি করেন (জুন ১৬৬৫)। চুক্তি অনুযায়ী তাকে ২৩টি দুর্গ ও ১৬ লক্ষ বাৎসরিক রাজস্বের সম্পত্তি দিতে হল এবং নিজে মুঘল আনুগত্যের বিনিময়ে রাজগড়সহ ১২টি দুর্গ ও বাৎসরিক ৪ লক্ষ টাকা রাজস্বের সম্পত্তি রাখতে অনুমতি পান। যদিও শিবাজীর বিশ্বাসঘাতকতা তাঁদের জানা ছিল, তা সত্ত্বেও বাদশার আইনে কেউ সন্ধি করতে এলে তাঁকে উপেক্ষা না করে স্বাগত জানাতে হবে। তাই শিবাজীকে প্রাণে মারা হল না। তাঁকে বন্দি করে ১৬৬৬ খৃস্টাব্দে মে মাসে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে যথা সময় খবর পৌছাল পাহাড়ি ইঁদুর খাঁচায় বন্দি। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে হত্যার অপরাধে দায়ী তবুও তোমাকে ক্ষমা করলাম আর আগামীতে প্রজাদের ওপর যেন কোন অত্যাচার না হয়। শিবাজী দস্যুত্ব জানতেন, সম্রাটের সঙ্গে শালীনতা বজায় রেখে কথা বলতে জানতেন না। তাই শিবাজীর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে আওরঙ্গজেব আদেশ দিলেন শিবাজীকে নজরবন্দি রেখে শিষ্ঠাচার শেখাতে। আরও আদেশ দিলেন যে, বন্দির প্রতি সর্ব রকম সুব্যবহার করতে। শিবাজীর দেখাশোনার ভার ছিল তাঁর এক মারাঠী আত্মীয়ের ওপর। বন্দি অবস্থায় শিবাজী দরবারে আবেদন করলেন আমি ধর্ম পালনের জন্য বজরাভর্তি মিষ্টি দরিদ্র ব্রাহ্মণদের জন্য পাঠাতে চাই। সম্রাট আওরঙ্গজেব বললেন, ধর্ম পালনের কথা বলেছে, অতএব আবেদন মঞ্জুর না করলে তার ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হবে। এইভাবে ঝুড়িতে করে মিষ্টি পাঠানোর অজুহাতে শিবাজী নিজেই ঝুঁড়িতে বসে পলায়ন করলেন।

দাক্ষিণাত্যে হাজির হয়ে শিবাজী প্রথমে চুপচাপ থেকে মারাঠাদের আরও সংগঠিত করতে লাগলেন। তারপর ১৬৭০ খৃস্টাব্দে পুনরায় মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পূর্বেকার মত সুরাটবন্দর লুণ্ঠন করে বলপূর্বক চৌথ আদায় করেন এবং নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করলেন। ১৬৭৮ খৃস্টাব্দে রায়গড়ে তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। শিবাজী রাজা হয়ে "ছত্রপতি" উপাধি গ্রহণ করেন, সম্রাট আওরঙ্গজেব তখন বহু দূরে উত্তর সীমান্তে পাঠান উপাজাতিদের

বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত। আওরঙ্গজেব যখন শিবাজীর এই চরম পর্যায়ের সংবাদ শুনে বুঝলেন, শিবাজীকে পাহাড়ি ইঁদুর মনে করে উপেক্ষা করা ঠিক হয়নি, তাই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিদ্রোহ দমন করে দাক্ষিণাত্যের দিকে নজর দিলেন, তখন সংবাদ পেলেন শিবাজীর মৃত্যু হয়েছে (৩ রা এপ্রিল ১৬৮০)। এই সংবাদ শুনে তিনি পারসিক কবিতা পাঠ করলেন যার অর্থ–আমার দয়া, ক্ষমা, উদারতা সহনশীলতা এবং দাক্ষিণাত্যে আমার অনুপস্থিতির সুযোগেই শিবাজী ক্ষণিকের 'ইঁদুর রাজা' হয়ে মরল।

সম্রাট আওরঙ্গজেব সংবাদ পেলেন শিবাজীর পুত্র শম্ভুজী পিতার সমকক্ষ দুষ্ট ও বিদ্রোহী। শম্ভুজীর পরিচয় আওরঙ্গজেব পূর্বেই পেয়েছিলেন। যেহেতু শম্ভুজীকেও শিবাজীর সাথে বন্দি করে আগ্রা দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তিনিও শিবাজীর সঙ্গে মিষ্টির ঝুড়িতে পলায়ন করেছিলেন। তাঁর দ্বারা বহু রাষ্ট্রদ্রোহী প্রকাশ পেয়েছিল। এখানে আর একটা জরুরি কথা মনে রাখা দরকার দাক্ষিণাত্যে মারাঠা জাতি শুধু মাওয়ালীদের সহযোগে দৌরাত্ম্য করত তা নয়, তাঁরা পেয়েছিল আওরঙ্গজেবের এক অবাধ্য সন্তানকে, নাম আকবর, যেমন করে "মহামতি" আকবরকে প্রশংসার মালা পরিয়ে তাঁর স্বকীয়তা নষ্ট করা হয়েছিল। ঠিক সেইরূপ উপায়ে জাহাঙ্গীরকেও প্রথম জীবনে বিভ্রান্ত হতে হয়েছিল আর শাহজাহানের পত্র দ্বারা শিকোহকে ঐ একই করচেই পঙ্গু করা হয়েছিল। ঐ একই পন্থায় আওরঙ্গজেবের শত্রুবৃন্দ মারাঠা মাওয়ালী ও সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতৃবৃন্দ তাঁকে বুঝিয়েছিল যে, নাম আকবর কাজেও আকবর হলে সারা ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। তাই অদুরদর্শী অপরিণত বয়সের আকবর সরল মনে বিশ্বাস করে পিতার বিদ্রোহী হয়ে ত্যাজ্য পুত্রের মত দাক্ষিণাত্যে পিতার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন।

যাই হোক, বৃদ্ধ সম্রাট আল্লাহর ওপর ভরসা করে যুবকের মত মনোবল আর সাহস নিয়ে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে পর পর আক্রমণ করলেন 'বিজাপুর' এবং গোলকুণ্ডা। কারণ 'বিজাপুর' এবং গোলকুণ্ডার সুলতানগণ শিবাজী ও শম্ভুজীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করত। ঐ সুলতানগণের পতনের পর পরাজিত সুলতান সৈন্য শম্ভুজীর দলে যোগ দেয়। সুলতানদের পালা শেষ করে সম্রাট আওরঙ্গজেব মারাঠাদের দিকে দৃষ্টি দেন। ১৬৮৯ খৃঃ শম্ভুজী সম্মুখসমরে দণ্ডায়মান হলেন।.আওরঙ্গজেব ২ রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। উপাসনান্তে আওরঙ্গজেব সৈন্যদের উৎসাহবর্ধক ভাষণ দান করেন। মুঘল সৈন্য উত্তাল তরঙ্গরাজির মত যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যেমন শুরু তেমনি শেষ। শম্ভুজী ভীষণভাবে পরাজিত ও নিহত হলেন। ন্যায় বিচারের মাপকাঠিতে শম্ভুজী শিবাজী অপেক্ষা বড় বীর ছিলেন। কারণ তিনি অন্তত একবার যুদ্ধের জন্য সাহস সঞ্চয় করেছিলেন এটাই তাঁর কৃতিত্ব। মারাঠা শক্তি বিধ্বস্ত হওয়ার পর শিবাজীর

রায়গড়সহ বহু মারাঠা দুর্গ আওরঙ্গজেবের হস্তগত হয় এবং শাহুসহ শম্ভুজী পরিবার বন্দি হয়। ১৬৮৯ খৃস্টাব্দে আওরঙ্গজেব কেবল উত্তর ভারতের নয় দাক্ষিণাত্যেরও অধীশ্বর হন। আওরঙ্গজেব শব্দের অর্থই সিংহাসনের "শোভা"। সত্যই তাঁর নামের সার্থকতা জ্বলন্ত ও জীবন্ত হয়ে রয়েছে আসল ইতিহাসের পাতায়।

শিবাজী ও শম্ভুজীর মৃত্যুর পর মারাঠারা সংগ্রাম শুরু করে। তাঁর ছোট ভাই রাজারাম মহারাষ্ট্রের নেতা হন। সেনাপতি শান্তাজী ও ধনজীর প্রযত্নে মারাঠা সৈন্য খুব শক্তিশালী হয়। অপরপক্ষে সম্রাট মনে করেছিলেন মারাঠাদের তেমন মাথা তোলবার কেউ নেই। এই ধারণা মুঘলদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। ১৬৯০ খৃঃ রাজারাম মুঘলদের অতর্কিতে আক্রমণ করে কয়েকটি মুঘল ঘাঁটি দখল করে নেন। পরে মুঘল সৈন্য শান্তাজীকে হত্যা করে। ১৭০০ খৃস্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হলে নেতৃত্ব নিয়ে মারাঠাদের মধ্যে লড়াই বাধে। শেষে রাজারামের তৃতীয় শিবাজীর রিজেন্ট হন বীরাঙ্গনা তারাবাঈ। বীরাঙ্গনা তারাবাঈসহ অনেকে পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁদের সমস্ত পরিকল্পনা ৯০ বছরের বৃদ্ধ আওরঙ্গজেবকে এতটুকু টলাতে পারেনি। ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেবের ইহকালে প্রস্তুতি শেষ, পরকালের জন্য তৈরি হচ্ছেন তিনি। সারা জীবন কৃচ্ছ্র সাধন; ফকিরী জীবনযাপন করে শুকনো রুটি আর খেজুর পাতার বিছানায় শুয়ে মদ, নারী, গীতাবাদ্য বা কোন রকম বিলাসিতা হতে বহু দূরে থেকে ১৭০৭ খৃস্টাব্দে মৃত্যুর মুখো হয়ে জীবনের শেষ নামায পড়লেন এবং আল্লাহর কাছে অনুযোগ করলেন, হে আল্লাহ! তোমার আইন মত কতটুকু বা চলেছি? যত ভাল কাজ করেছি তার জন্য তুমি প্রশংসার দাবিদার আর যত খারাপ কাজ আমি করেছি তার জন্য দোষী আমি নিজে। তুমি আমায় ক্ষমা কর।" তারপর বিশ্ব নিয়ন্তা আর বিশ্ব পয়গম্বরের নাম উচ্চারণ করে মুখ ও চোখ বন্ধ করলেন।

হাল ইতিহাসে মারাঠা জাতিকে বীরের জাতি বলা হয়। তাই মারাঠা বা বর্গীয় শিবাজীকে জাতীয় বীর বলা হয়। বাংলায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ও স্বদেশী আন্দোলনে ১৯০৫ খৃস্টাব্দে শিবাজী উৎসব পালন করা হয়। অনেক দূরদর্শী ঐতিহাসিকের মতে এটা একটা ঐতিহাসিক ভ্রান্ত পদক্ষেপ। কারণ যদি জাতীয় হিন্দু বীর হিসেবে খাড়া করতে হয়, তাহলে প্রতাপ সিংহই উপযুক্ত শ্রেষ্ঠতর বীর। মারাঠা জাতি বা "বর্গীয় হাঙ্গামা" সত্য ইতিহাসের পাতায় খুব বেশি অপরাধী। এই জন্য যে, শোষক জাতিকে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে তারাই প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছিল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও লর্ড ওয়েলেসলীর "অধীনতা মূলক মিত্রতা" নীতি গ্রহণ করার ফলেই ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয়। (১৮০২)।

প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাসে মারাঠা বা বর্গী হাঙ্গামাকারীরা যেভাবেই চিত্রিত হোকনা কেন আসলে যে তারা দস্যু বা লুণ্ঠনকারী ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রমাণস্বরূপ নিচে কতকগুলো উদ্ধৃতি উল্লেখ করা গেল–

(ক) "ইংরেজ বণিকেরা বর্গীয় হাঙ্গামার সুযোগ পেয়ে নবাবের কোন অনুমতি গ্রহণ না করে কলিকাতায় দুর্গ নতুন করে গড়তে আরম্ভ করল।"

(খ) "এই রূপে রঘুজী (মারাঠা) পুনঃ পুনঃ বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করতে লাগল, আলিবর্দী কিছুতেই তাদিগকে পরাস্ত করতে না পেরে গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা নিহত করল।"

(গ) "মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যরা এদেশে বর্গী নামে পরিচিত। আলিবর্দী খাঁর সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব হতেই তারা সময়ে অসময়ে মুঘল সাম্রাজ্য আক্রমণ করে লুটপাট করত। আলিবর্দী খার আমলে এদেশে যে আক্রমণ ও লুণ্ঠন চলতে থাকে তাই 'বরীর হাঙ্গামা' নামে পরিচিত।'

(ঘ) তখনকার শ্রেষ্ঠ ধনী জগৎ শেঠের বাড়ি লুণ্ঠন করে প্রায় আড়াই কোটি টাকা লয়ে প্রস্থান করে।" [উপরোক্ত লেখাগুলো শ্রী অজয়কুমার সু লিখিত "ঐতিহাসিক প্রশ্নোত্তর" পুস্তক দ্রষ্টব্য]

H. G. Rawlinson M.A.I. F. A. প্রণীত "Sivaji the Maratha" পুস্তকে আছে, "দক্ষিণ ভারতে মুসলমান সুলতানরা মারাঠাদের বিশ্বাস করে তাঁদের দায়ীত্বপূর্ণ পদগুলো ও রাজ্য পরিচালনার ভার দান করেছিলেন। কিন্তু এই অতি উদারতা ও বিশ্বাসের ফলে তাঁদের ও মুসলিম জাতির পক্ষে মারাত্মক হয়েছিল। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের বিদ্রোহ ও তদ্দ্বারা আফজল খাঁর হত্যায় নিরীহ জনসাধারণের অসহ্য অত্যাচার উপদ্রব ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন ইত্যাদি ব্যাপারে তার নিদর্শন।"

জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন, "মারাঠা দেশ নায়করা হিন্দু রাজ্য সংস্থাপনের অভিলাষ করেছিলেন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস মুসলমানরা হিন্দুদের প্রতি উৎপীড়ন করতেন বলে শিবাজী মুসলমানদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র মুসলমান শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধভাব মারাঠাদের অভ্যুত্থান চেষ্টার একমাত্র কারণ নহে। আসল কথা এই যে, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে সমস্ত ভারতবর্ষে বিশেষত দাক্ষিণাত্যে ধর্ম সমাজ সাহিত্য প্রভৃতির একটা সংস্কারের যুগ এসেছিল। মুসলমানদের সঙ্গে কেবল বিরুদ্ধ সংঘর্ষের আঘাতেই যে এই সংস্কারের চেষ্টা জেগেছিল তা সত্য নয়। বরং মুসলমান ধর্ম ও সাহিত্যের সংস্পর্শেই তথাকার হিন্দুচিত্তে একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চার করেছিল তাহাতে সন্দেহ নেই। রাজস্ব বিভাগের ও ধনকোষের কর্তৃত্ব হিন্দুরা লাভ করেছিল। মারাঠারা সৈন্যদল ভুক্ত হয়ে যেমন অর্থোপার্জন করত তেমনি যুদ্ধ বিদ্যায় দিন দিন উন্নতি লাভ করতেছিল। দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শাসনকর্তারা অনেকেই হিন্দু

মহিলা বিবাহ করতেন। এইরূপ হিন্দু মুসলমান বৈবাহিক সম্বন্ধ মুসলমান রাজ্যগুলোতে হিন্দু জাতিকে বাড়িয়ে তুলেছিল। যে সকল হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের দ্বারাও হিন্দুদের ক্ষমতা বেড়ে উঠতেছিল। এদেশের মুসলমানরা কদাচ গোঁড়া হয়ে উঠতে পারেননি। সময়ে সময়ে মুসলমানরা যৎসামান্য অত্যাচার করেছেন তা উল্লেখযোগ্য নয়। সাধারণত এদেশের মুসলমানরা হিন্দু প্রজাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতেন এবং সর্ব প্রকার রাজকার্যের ক্ষমতা হিন্দুদের হস্তে অর্পণ করতেন। ক্রমে বাহুবলে ও বুদ্ধি সুকৌশলে শাসন ও সৈন্য বিভাগে হিন্দুরাই প্রাধান্য লাভ করেছিল। মুসলমান শাসনে হিন্দুদের ক্ষমতার লেশমাত্র ব্যাঘাত না পেয়ে দিন দিন বেড়ে উঠতেছিল। ক্রমশ হিন্দু এমন প্রবল হয়ে উঠছিল যে মুসলমানরা নামে মাত্র শাসনকর্তা ছিলেন। হিন্দুরাই রাজ্যের সর্বত্র ক্ষমতা চালনা করার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, আহমদনগর ও বিদব এই মুসলমান রাজ্যগুলোর সকল ক্ষমতা মারাঠী নীতিবেত্তা যোদ্ধাদের অধিগত ছিল। এই রূপে মারাঠা জাতি শক্তিশালী হয়ে যখন মুসলমান শাসনের বন্ধন ছিন্ন করে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে উঠল তখন এক নতুন বিপদ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হল।” (শরৎ কুমার রায়ের “শিবাজী ও মারাঠা” দ্রষ্টব্য।

মাননীয় শরৎ কুমারের লেখা পর্যালোচনায় গোলাম রব্বানি (বর্ধমানী) সাহেব লিখেছেন, ‘মারাঠাদের পক্ষে উক্ত নতুন বিপদ হইতেছে আওরঙ্গজেবের আবির্ভাব।” আওরঙ্গজেবের পূর্বে ও পরে এমন একটিও বার্ষিক রাজনীতিবিদ দেখা যায়নি, যিনি তাঁর সমকক্ষ। সারা সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়েও রাজকোষ থেকে এক পয়সাও নিতেন না। টুপি সেলাই আর পবিত্র কোরআন কপি করে যা পেতেন তাই দিয়ে খেতেন শুকনো রুটি আর মধু। সারা ভারত এবং বহির্ভারতে ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তার। এত ব্যস্ততার মধ্যেও সময়মত নামায, যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামায, গভীর রাত্রে আল্লাহর কাছে দণ্ডায়মান হয়ে প্রার্থনারত, তদুপরি জ্ঞানার্জনের জন্য পড়াশোনা কখন যে কি করতেন, কেমন করে করতেন তা আজ চিন্তা করলে কিনারা পাওয়া যায় না।

আওরঙ্গজেবের ব্যবহারিক চরিত্র ছিল অত্যন্ত মধুর। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের স্বর্ণোজ্জ্বল মুহূর্তগুলো লিপিবদ্ধ করলে একটি সুখপাঠ্য পুস্তক তৈরি হবে যদিও এই বক্ষমাণ পুস্তকে তারই দু-একটা মাত্র ঘটনা তুলে ধরা হলো–

সম্রাট আলমগীর তাঁর পুত্রের জন্য একজন গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। একদিন মৌলবী সাহেব প্রচণ্ড বৃষ্টির দিনে কোন রকমে ভিজে ভিজে জমাটবদ্ধ কাদা পেরিয়ে এসে হাজির হলেন তাঁর কর্মস্থলে। রাজপুত্র দেখেই বললেন, ইস! একদম গোটাই ভিজে গেছেন যে! আজ এত কষ্ট করে না এলেই পারতেন। মৌলবী সাহেব বললেন, তা হয় না বাবা, কর্তব্য কাজে অবহেলা করা অপরাধ।

>Goto List

যাহোক এখন পাদুটো ধোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু রাজপুত্রকে দিয়ে তো পা ধোয়ার পানি আনা যায় না, তাই মৌলবী সাহেব ইতস্তত করতে লাগলেন। বাদশাহ পুত্র ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ছুটে গিয়ে পানি এনে দিলেন। কিন্তু তাতেও আর এক অসুবিধা এক হাতে পানি ঢেলে আর এক হাতে কাদা পরিষ্কার করা বড় মুশকিল হচ্ছে। মৌলভী সাহেব কোন রকমে সংকোচ কাটিয়ে বললেন, বাবা পানিটা একটু পায়ে ঢেলে দিতে পার? রাজপুত্র ততক্ষণাৎ পানি ঢালতে লাগলেন। এমন সময় রাজ দরবারে যাওয়ার পথে স্বয়ং বাদশাহ আলমগীর ব্যাপারটি লক্ষ্য করে গেলেন। মৌলভী সাহেবের বুকের ভেতরটা ধক্ ধক্ করে উঠল। আজ আর ঘাড়ে মাথা থাকে না বোধ হয়। রাজপুত্র দিয়ে পায়ে পানি ঢালানোর ব্যাপারটা স্বয়ং বাদশাহ দেখে গেছেন। মৌলবী সাহেব নিজেকে একটু শক্ত করে ভাবল, শিক্ষকের স্থান সবার উপরে অতএব তার ভয় কিসের?

এমন সময়ে দরবারে মৌলবী সাহেবের ডাক পড়ল। মৌলবী সাহেব তো ভয়েই দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য। কোন রকমে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন বাদশা আলমগীর বলতে লাগলেন, "দরবারে আসার পথে দেখলাম আমার ছেলে আপনার পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছে আর আপনি নিজ হাতে কাদা পরিষ্কার করছেন। এটা কি বেয়াদবী নয়? কেন, সে কি নিজ হাতে আপনার পায়ের কাদাটুকু পরিষ্কার করে দিতে পারে না? এটা আমার পুত্রের উপযুক্ত কাজ হয়নি। শিক্ষকের স্থান বাদশাহেরও উপরে।"

সমস্ত শুনে মৌলবী সাহেব অশ্রুসিক্ত নয়নে কান্না ভেজা কণ্ঠে বললেন, বাদশাহ, আপনি সত্যই মহৎ।

এছাড়া আধ্যাত্মিক উন্নতিতেও তাঁর এমন বিশেষ ভূমিকা ছিল, যা একটি একটি করে তুলে ধরলে পৃথক একটি পুস্তকেই সম্ভব। তবু প্রমাণস্বরূপ পেশ করার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতেই একটি মাত্র ঘটনা লিপিবদ্ধ করা গেল।

মুসলমান হয়ে প্রত্যহ পঞ্চীয় প্রার্থনা নামায না পড়লে তাকে শাস্তি নিতে হতো। আর হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর সময়ে তো পৃথিবীতে এমন একটিও মুসলমান ছিলেন না, যিনি প্রত্যহ নামায পড়তেন না। তবে শাস্ত্রানুযায়ী পাগল, শিশু প্রভৃতির জন্য তা প্রযোজ্য নয়।

একদিন সম্রাট আলমগীরের নিকট সংবাদ এল 'একজন লোক নাকি নামায পড়েন না এবং সব সময় উলঙ্গ থাকেন। অথচ তিনি একজন নামকরা পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত। তাঁর অনেক অলৌকিক প্রভাবে লোক তাঁর দিকে আকর্ষিত।' এই সংবাদে সম্রাট একদিন স্বয়ং তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কাপড় না পরা শক্ত অপরাধ তা কি আপনি জানেন না?" তিনি হেসে উত্তর দিলেন, "পাবো কোথায়?" সম্রাট একখানা পোশাক পরিয়ে দিয়ে বললেন, "আজ শুক্রবার, জুমআর নামায পড়া ফরজ (অবশ্য পালনীয়) তা কি আপনি স্বীকার করেন?"

>Goto List

তিনি বললেন, "অবশ্যই, নামায পড়া খুব দরকার, আমি আজ নামায পড়তে যাব।" তারপর মসজিদের প্রথম সারিতে নামায পড়তে পড়তে চিৎকার করে বললেন, " হে ইমাম, তোর খোদা আমার পায়ের তলায়।" তার পর ছুটে মসজিদ থেকে বেরিয়ে পলায়ন করেন। পরে তাঁকে ধরে এনে মোরতাদ (পথভ্রষ্ট) বলে প্রাণদণ্ড দেওয়া হলো। কিন্তু সম্রাট আলমগীরের মনে বারবার একটা প্রশ্নের উদয় হতে লাগল তিনি কি ঠিক করলেন না ভুল করলেন? রাত্রে দু রাকাত নামায পড়ে শুয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলেন, হযরত মুহাম্মদ (দ.) যেন বিচারাসনে বসে আছেন আর সেই প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি এক হাতে নিজের কাটা মাথাটা ধরে ফরিয়াদ করে বলছেন, "হে নবী, আলমগীর আমার প্রাণদণ্ড দিয়েছে আপনি বিচার করুন।" উত্তরে হযরত যেন বলছেন, "তুমি আমার প্রতিষ্ঠিত প্রিয় শরীয়তের আইন অমান্য করেছিলে কেন? অতএব আমার আলগীর যা করেছে ঠিকই করেছে।" আওরঙ্গজেবের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি তাঁর শিক্ষক মোল্লাজিকেও সমস্ত ব্যাপারে খুলে বললেন। মোল্লাজিও বললেন, "তোমার প্রাণদণ্ড দেওয়া ঠিক হয়নি। কারণ তিনি পূর্ণ পাগল ছিলেন তা না হলে কখনই উলঙ্গ থাকতেন না। আর তোর খোদা আমার পায়ের তলে কথাটায় তোর শব্দটা যোগ না থাকলে নিশ্চয়ই অমার্জনীয় অপরাধ হতো। এখন মনে হচ্ছে যিনি নামায পড়িয়েছেন সেই ইমামের কিছু ত্রুটি আছে।" ইমাম সাহেবকে ডাকার পর জিজ্ঞাসা করা হল তিনি স্বীকার করলেন যে, হ্যাঁ, আমি অনিচ্ছাকৃতভাবেই ভাবছিলাম আমার কন্যাগুলোর বিবাহের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন।" যদি আমার কুরআন পাঠ সুন্দর ও চিত্তাকর্ষণ হয় তাহলে হয়তো সম্রাট খুশি হয়ে আমার অভাবের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে পারেন।" মোল্লাজিও বললেন শরীয়তের সমাধান এই যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে নামায অবস্থায় যে কথাই উদয় হোক নামায তো নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে পূর্ব হতে উদ্দেশ্য যদি সম্রাটকে মুগ্ধ করা আর অর্থোপার্জন হয় তাহলেই সর্বনাশ।"

যাই হোক, মোল্লাজিও সম্রাটকে বললেন, ঠিক যেখানে দণ্ডিত লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল সে জায়গাটি খুঁড়তে আদেশ কর। সম্রাটের আদেশে তাই করা হলো। কিন্তু আশ্চর্যের দৃশ্য দেখা গেল সেখানে স্বর্ণ রৌপ্যের মুদ্রাভর্তি একটা বড় পাত্র। মোল্লাজিও বললেন, এখানে তোর খোদা বলতে এই মুদ্রাগুলো।

অনেক সময় মহান মানুষের অন্তরে এমন অনেক কথার উদয় হয়, যা পরে সত্যে পরিণত হয়। এরই নাম মোজেজা, কেরামত ইত্যাদি। অবশ্য তা আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। ইন্দ্রজালের সঙ্গে কেরামত বা মোজেজা পার্থক্য এখানেই যে, ইন্দ্রজাল ইচ্ছা করলেই সম্ভব আর কেরামত বা মোজেজা ইচ্ছা করলেই সম্ভব হয় না।

আরেকটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা সেদিনেও বহুল প্রচারিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সব যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। পাঞ্জাবে একটি গ্রামের নাম ছিল 'আলমগীর'। একদিন সম্রাট আলমগীরের একজন মুসলমান সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য বাহিনী ওই পল্লীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণের এক অপরূপ সুন্দরীর গোলাপের ন্যায় মুখশ্রী দেখে লোভাতুর সেনাপতি তার পিতার নিকট মেয়েটিকে বিয়ে করলে প্রস্তাব দেন এবং সিদ্ধান্ত জারি করেন যে, আজ থেকে এক মাস পরেই সে তার বাড়িতে বর বেশে উপস্থিত হবে।

কন্যার পিতা স্বয়ং আলমগীরের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁকে সমস্ত ঘটনা বলে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। সম্রাট তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "যাও, নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যাও; নির্দিষ্ট দিনে আমি তোমার বাড়িতে উপস্থিত থাকব'। ব্রাহ্মণ নানা চিন্তার ঝুঁকি নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। সত্যিই কি সম্রাট স্বয়ং আসবেন? না তাঁর পক্ষ হতে কোন প্রতিনিধি পাঠাবেন। আর যদি সত্যিই তিনি আসেন তবে সঙ্গে নিশ্চয়ই লোক লস্কর, হাতী, ঘোড়া পাঁচ শ'র কম হবে না। তাঁদের সে থাকতে দেবে কোথায় ইত্যাদি অনেক চিন্তা।

অবশেষে সমস্ত চিন্তার অবসান ঘটিয়ে বিবাহের আগের দিন সম্রাট আলমগীর একাই এসে উপস্থিত হলেন ব্রাহ্মণের বাড়িতে। ব্রাহ্মণ তো অবাক। অতঃপর ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক জীর্ণ কামরায় সারারাত এবাদত (উপাসনা) ও মোনাজাতে (প্রার্থনা) অশ্রু বিসর্জন করে কাটালেন। ইনি কাঁদছেন কেন? এঁর কিসের অভাব? সকলে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগল কিন্তু প্রকাশের অনুমিত নেই। একি শুধু তোমার মেয়ে এযে আমারও মেয়ে।

পরদিন মুঘল সেনাপতি বর বেশে ব্রাহ্মণের ঘরে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করেই দেখলেন উলঙ্গ তরবারি হাতে সম্রাট আলমগীর স্বয়ং। উদভ্রান্ত যৌবনের বুকভরা আবেগ আর মুখভরা হাসি নিমিষেই মিলিয়ে গেল। যাঁর দাপটে শত্রু সৈন্য থর থর করে কাঁপে, যাঁর হৃদয়ে ভয়ভীতি অথবা দুর্বলতা কখনও স্থান পায় না, আজ সেই হৃদয় কাল বৈশাখী ঝড়ের মত দুরু দুরু শব্দে যেন কেঁপে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু দুঃখ, লজ্জা, শাস্তি আর অপমানের আশঙ্কায় জ্ঞানহারা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন বলিষ্ঠ দেহ সেনাপতি। কন্যার পিতা সম্রাট আলমগীরের সুবিচার, দায়িত্ববোধ অসাম্প্রদায়িক ভূমিকা দেখে আনন্দে অশ্রু গদ গদ কণ্ঠে বললেন, আপনি আমার বিশেষ করে আমার কন্যার ইজ্জত রক্ষা করেছেন। আপনার এই ঋণ অপরিশোধ্য। সম্রাট ব্রাহ্মণকে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করে বললেন, ভাই এই মহান দায়িত্ব আমার। আমি যে আমার দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পেরেছি এতেই আমি ধন্য।

সম্রাট আলমগীর আজ নেই সত্য, কিন্তু তাঁর মহমান্বিত অমর আলেখ্য মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে রয়েছে ঐ গ্রামের প্রতিটি অণু পরামাণুতে। ঐ ঘটনার পরই ঐ পল্লীর নামকরণ হয় 'আলমগীর' গ্রাম, আর যে কামরায় সম্রাট আলমগীর এবাদত করেছিলেন এখনও পর্যন্ত সেখানে কেউ জুতো পায়ে দিয়ে প্রবেশ করে না।

এমনিই এক মহৎ ও উদার চরিত্রের সাধককে ইতিহাসে হিন্দু বিদ্বেষী বলে চিত্রিত করতে ঐতিহাসিকদের কলম এতটুকু কেঁপে ওঠেনি।

আজও ঐতিহাসিক মন্দির "বালাজী বা বিষ্ণু মন্দির" যেটি চিত্রকূটের রামঘাটের উত্তর দিকে অবস্থিত, সেই মন্দিরে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে লেখা আছে "সম্রাট আওরঙ্গজেব নির্মিত বালাজী মন্দির।" মুসলমানকে মূর্তিপূজায় অংশগ্রহণ বা মূর্তি, মন্দির নির্মাণে নিষেধ আছে। কিন্তু যখন হিন্দু প্রজা বা সংখ্যালঘু প্রজাদের মন্দির যে কোন রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেখানে তাদের ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব মুসলমান বাদশাহের ওপর পড়ে। অতএব এত উদার সম্রাট আওরঙ্গজেবকে কুরঙ্গে রঞ্জিত করা নিঃসন্দেহে বিকৃত মানসিকতার বিকাশ। যদি পচা ইতিহাসের পোকাটে পাতায় ইতিহাসের সব তত্ত্ব ও তথ্য আছে বলে কেউ দৃঢ়মনে বিশ্বাস করেন তাহলে কিছু বলার নেই। নচেৎ অনুরোধ করব, হিন্দু তীর্থস্থান বারানসী ধামে গিয়ে দেখুন। সেখানে বহু পুরাতন মন্দিরের রক্ষক ও সত্ত্বাধিকারীদের নিকট সংরক্ষিত সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলের বহু ফরমান বা দলিল দেখে অবাক হতে হবে। মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হিন্দু বিদ্বেষী আওরঙ্গজেব হিন্দু মন্দিরসমূহের রক্ষাকল্পে জায়গীরস্বরূপ প্রচুর সম্পত্তি দিয়েছিলেন।

"এই প্রকার কাশ্মীর প্রদেশে হিন্দু মন্দির রক্ষার্থে বাদশাহ কর্তৃক যে সমস্ত জমি ও বৃত্তিদান করা হয়েছে সেই ফরমান দেখিয়ে অবগত হওয়া যায় যে তার মধ্যে অধিকাংশ ফরমানে আওরঙ্গজেবের নাম অঙ্কিত রয়েছে। (দ্রঃ Islam and civilization)

বেনারস বা কাশীতে কয়েকজন নবদীক্ষিত মুসলমান অতিভক্তির নামে হিন্দু মন্দির ও পূজারীদের কিছু ক্ষতি করেছিল। সংবাদ পেয়ে সম্রাট ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রচুর অর্থ এবং তার স্থায়িত্বের জন্য একটি ফরমান জারি করেন। বিদ্যোৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাঠিকাদের জন্য তার বঙ্গানুবাদটি এখানে উল্লেখ করছি–"প্রজাদের মঙ্গলার্থে ব্যথিত হৃদয়ে আমরা ঘোষণা করছি যে, আমাদের ছোট-বড় প্রত্যেক প্রজা পরস্পর শান্তি ও একতার সঙ্গে বাস করবে এবং ইসলামী বিধান অনুসারে আরও ঘোষণা করছি যে, হিন্দুদের উপাসনালয়গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ বা তত্ত্বাবধান করা হবে। যেহেতু আমাদের কাছে আকস্মিক সংবাদ পৌঁছেছে যে, কতিপয় লোক আমাদের বারানসী ধামে অবস্থিত হিন্দু প্রজাগণের সঙ্গে অসম্মানজনক নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে এবং ব্রাহ্মণগণকে তাদের প্রাচীন

>Goto List

ন্যায়সঙ্গত উপাসনার অধিকারে বাধা দিতে মনস্থ করেছে। এবং আরও আমাদের কাছে জানানো হয়েছে যে, এই সমস্ত অত্যাচারের ফলে তাদের মনে দারুণ দুঃখ ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব আমরা এই ফরমান প্রকাশ করছি এবং এটা সাম্রাজ্যের সর্বত্র জানিয়ে দেওয়া হোক যে, এই ফরমান (অর্ডিন্যান্স) জারি হওয়ার তারিখ হতে কোন ব্রাহ্মণকে যেন তার উপাসনার কাজে বাধা দান বা কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করা হয়। আমাদের হিন্দু প্রজাগণ যেন শান্তির সঙ্গে বাস করতে পারে এবং আমাদের সৌভাগ্য ও উন্নতির জন্য আশীর্বাদ করেন।" (ইসলামিক রিভিউ দ্রঃ)

আজ যে সাম্যবাদ সারা বিশ্বের মানুষের মস্তকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, যে সাম্যবাদের অভিনব বন্যায় পৃথিবীর পুরাতন সব ঐতিহাসিক রাজা বাদশাহ ও তাঁদের শাসননীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি 'মধ্য যুগের অসভ্যতা' বলে অনেকের ধারণা হয়েছে, কার্লমার্কসের যে নতুন চিন্তাধারা নতুন পথ আর পাথেয় দান করে পৃথিবীকে রক্ষা করতে উপস্থিত হয়েছে সেই সম্বন্ধে আজ প্রমাণিত সত্য কথা এই যে, মুসলমান রাজা বাদশাদের উদার ব্যবহার, সাম্যবাদ ও অর্থনৈতিক নৈপুণ্য বর্ণনা করে গেছেন ঐ বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং ফরাসী পর্যটক 'বার্নিয়ে' আর পর্যটক 'তার্ভার্নিয়ের'। তাঁদের লেখা হতে জানা যায়, শাহজাহানের প্রখ্যাত পুত্র আওরঙ্গজেবের সাম্যবাদ, অর্থনীতি, শাসননীতির এত সুব্যবস্থা ছিল, যা যেকোন নিরপেক্ষ মানুষের মনকে আনন্দ এবং বিস্ময়ে অভিভূত করে। কার্লমার্কস ইতিহাসের ঐ অধ্যায় পড়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে গিয়েছিলেন। কার্লমার্কস এও বুঝেছিলেন, আওরঙ্গজেবের রাজত্বের যত বৈশিষ্ট্য সবই কিন্তু ইসলাম ধর্ম তথা কুরআন আর হাদীসের বৈশিষ্ট্য। কারণ আওরঙ্গজেব কুরআনবিরোধী কোন কাজ করতে কোনদিনই ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি এই সঙ্গে আরও বুঝেছিলেন, যে মুসলমান বাদশাহ যত অন্যায় করেছেন তিনি তত কুরআনের নীতি থেকে দূরে ছিলেন; তাই আজ কার্লমার্কসের কমিউনিজম বৃক্ষেও ইসলামী ফল, ফুল, আর লতা-পাতার সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সৌন্দর্যমণ্ডিত এ বৃক্ষটি সুস্থ ধর্মীয় সমাজে গ্রহণযোগ হয়ে ওঠেনি। তার কারণ বৃক্ষটির শিকড় ও মূল কেটে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ নাস্তিকতা নীতিই তার মূল কারণ।

যদি নাস্তিকতা নীতির পরিবর্তন করে কোন নতুন নেতা সাম্যবাদকেই পরিবেশন করতে এগিয়ে আসেন তাহলে আজ যে মুসলমান ওলামা, মুফতিগণ দূরে দাঁড়িয়ে ভাবছেন তাঁরা প্রত্যেকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন সারা বিশ্বে ঐ নীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের ন্যায়নীতিতে মার্কস যে মুগ্ধ হয়েছিলেন তা শ্রীঘোষকেও কিঞ্চিৎ স্বীকার করতে হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "বার্নিয়েরের বিশ্লেষণ পাঠ করে কার্লমার্কসের মত মনীষীও মুগ্ধ হয়েছিলেন।" (ভারত জনের ইতিহাস, ৪৮৭ পৃ:)

এত দীর্ঘ আলোচনার পর সমীক্ষান্তে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে আমরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি ভারতবাসী একথাই বলতে পারি যে, মহানুভব রাজাধিরাজ হযরত হাফেজ মাওলানা আলমগীর (রহ.)-এর সুমহান চরিত্র মাধুর্য যেন সারা ভারত তথা পৃথিবীর মানুষের এই নৈতিক অধঃপতনের যুগসন্ধিক্ষণে প্রকৃত দিশারীরূপে অন্ধকারের মাঝে দেদীপ্যমান আলোকবর্তিকস্বরূপ বরণীয়, গ্রহণীয় ও অনুকরণীয় হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহীয়সী জেবন্নেসার বিকৃত চরিত্রের আসল তথ্য

পূর্বেই বলেছি হিংসা স্বর্থের নেশায় মাতাল হয়ে সম্রাট আলমগীরকে ছোট করে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তাঁর কন্যা, বোন, প্রমুখকে এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে, একজন বেশ্যার বিরুদ্ধেও ঐ রকম উলঙ্গ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয় কোন ভদ্র কলমনবীশের পক্ষে।

বর্তমানে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাজসিংহ' বই পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হয়েছে। তাতে আওরঙ্গজেবের অতি আদরের কন্যা গুণবতী, চরিত্রবতী ও প্রতিভাবতী জেবন্নেসাকে ভ্রষ্টা ও পতিতা অপেক্ষাও চরিত্রহীনা করে প্রমাণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবাদ করার উপায় নেই। সেটি নাকি ইতিহাস নয়, ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাই তাতে কিছু কাল্পনিক রঙ চড়িয়ে পৃথিবী বিখ্যাত বিদূষী ও সতীদের ওপর দোষারোপ করলেও দোষ নেই। অথচ আর একজন বুদ্ধিজীবী বলেন, এর চেয়ে বড় পাপ, বড় অন্যায় এবং কালি-কলম সমাজের মস্তিষ্কে পোকা ধরিয়ে দেওয়ার মত ব্যভিচার আর নেই। পৃথিবীর বুকে বহু নরনারী এমন মেলে, যাঁরা জীবনে বিয়ে করেননি। অতএব কষ্ট করে উপন্যাস লিখতে গেলে চিরকুমার আর চিরকুমারীদের চরিত্রহীন আর চরিত্রহীনা করে না লিখলে উপন্যাস সরস আর উলঙ্গ হবে কী করে? তাই সমস্ত কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থকারিণী 'হাফেজা' ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী জেবন্নেসাকেও উপন্যাস মার্কা ঐতিহাসিক বুলেটের আঘাত থেকে রেহাই দেওয়া হয়নি।

হাফেজ মাওলানা হযরত আলমগীরের (র.) চরিত্র বিকৃত করলে যেমন পরোক্ষভাবে কুরআন ও হাদীসকে অকেজো এবং নেশার সামগ্রী প্রতিপন্ন করে মুসলমান সমাজকে ধর্মবিমুখ করা যায় ঠিক অনুরূপ এই মহীয়সী মহিলা

হাফেজা জেবন্নাসাকেও যদি ভ্রষ্টা চরিত্রহীনা প্রমাণ করা যায় তাহলে মুসলিম নারী জাতিকেও কুরআন ও হাদীসের বিপরীত দিকে চালানো সম্ভব হবে–এই চাতুর্যপূর্ণ মতলব নিয়েই ইতিহাসে বিষ প্রয়োগ করার পাকাপাকি ব্যবস্থা।

তাই আকীল খাঁকে তাঁর প্রণয়ী বলে লিখেছেন কিছু অমুসলমান লেখক। আর ঋষী বঙ্কিম মহাশয়ের মতে, জেবন্নেসা মোবারক খাঁর অবৈধ প্রেমিকা। ('রাজ সিংহ' দ্রষ্টব্য)। আবার সম্রাট আওরঙ্গজেবের বোন জাহানারাকেও ঐ সামান্য সৈনিক ব্যভিচারের নেশার উৎভট সাধনার কথা বর্ণনা করে নতুন ইনভেনটারের খ্যাতি লাভ করেছেন অনেকে সস্তা কাগজের পাতায়। কিন্তু নিরপেক্ষ মানুষের মাথার মগজের সংবাদ তার বিপরীত।

কুমারী জেবন্নেসার চিরকুমারীত্বের বিশুদ্ধতায় বিখ্যাত এক ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতির অনুবাদ এখানে তুলে দিচ্ছি–"যেহেতু জেবন্নেসা দিবানিশি কাব্যানুশীলন ও পুস্তক অধ্যয়নের গবেষণায় রত থাকতেন এবং বিবাহ হলে যেহেতু স্বামীসেবা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যাবে ফলে অধ্যয়ন, গবেষণা ও কাব্য রচনার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে বলে চিরজীবন চিরকুমারী থেকে বিবাহে বর্ধমান ঝঞ্ঝাটের মধ্যে নিজের স্বাধীন সত্তাকে সায় দেওয়াতে পারেননি।" (উর্দু গ্রন্থ 'জেওয়েরে জেবন্নেসা দ্রষ্টব্য)

কোন কোন কুৎসিত প্রতিভাধারী লেখক জেবন্নেসাকে ছত্রপতি শিবাজীর প্রণয় ভিখারিণী বলতে বা বইয়ে লিখে নাটক ও যাত্রারূপে তা সমাজে প্রচারের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দিতেও লজ্জানুভব করেননি। ফলে সমাজে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় রোগ ছড়িয়ে পড়েছে।

আবার কোন কোন লেখক নাসীর খাঁর সঙ্গেও জেবন্নেসার অবৈধ প্রেম ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেই সব কুপন্থী জঘন্য রুচী কলমনবীশদের লেখার সময় মনে রাখা উচিত ছিল যে, তাদেরই মতে সম্রাট আওরঙ্গজেব খুবই নাকি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। অতএব গোঁড়া মুসলমানের মেয়েরা কোন পরপুরুষ দেখতে পায় না এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং গোঁড়া আওরঙ্গজেবের হেরেমে সংরক্ষিতা রাজকন্যাদের অপর পুরুষের সাথে অবাধ মেলা মেশার সুযোগ থাকতে পারে কীভাবে? তাই মনে হয় ভেজাল দেওয়ার উন্মাদনায় সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে।

হাফেজা জেবন্নেসা সম্বন্ধে যে যুগের বড় বড় জ্ঞানী, গুণী, লেখক ও কবিগণ তাঁদের কাব্য কবিতায় যা লিখে গেছেন তাদের জানা আছে তাঁরা অবশ্যই জেবন্নেসার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন চিরকাল। মির্জা সাঈদ আশরফ তাঁর জেবন্নেসার ভৃত্যগণ তাঁর কাজ করত অথচ তাঁকে দেখতে পেত না। (মূল উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ)

এগুলো সবই মুসলমানদের উদ্ধৃতি তাই অনেকের কাজে গ্রহণীয় নাও হতে পারে। তাই বিখ্যাত হিন্দু লেখক লছমী নারায়ণের লেখা উদ্ধৃতি দিচ্ছি– (বঙ্গানুবাদ) "জেবন্নেসা তৈমুর বংশীয়া উজ্জ্বলতার আলোকবর্তিকা, এ যুগের নারীকুল মুকুটমণি। তাঁর অধ্যবসায়, আরাধনা, কাব্য সাধনা ও ধর্মপ্রবণতা তাঁকে সুনামের অধিকারিণী করেছে। তাঁর সুখ্যাতি অনেকের কাছে পবিত্র কা'বা ঘরের মত। হযরত মুহাম্মদের (সা.) পত্নী খাদিজার (রা.) মত তিনি ছিলেন পাপ ও কলঙ্কশূন্য কুমারী।"

আরও অমুসলমান লিখিত বিশেষ করে হিন্দু লেখক লিখিত জেবন্নেসা সম্পর্কে জানতে হলে বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত লছমী নারায়ণ সংকলিত 'গুলেরানা হস্তলিপি' দ্রষ্টব্য।

আজ ভারতে সাম্য, শান্তি, মৈত্রী-মিলন স্থায়ী করতে হলে প্রত্যেক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা আবশ্যক। গোড়ায় গলদ রেখে বাহ্যিক সমাধান করলে তা সোনার মত যত চকচকই করুক আসলে মূল্যহীন। এই সমস্ত অপকীর্তি বন্ধ করতে হলে প্রথমেই "ঐতিহাসিক উপন্যাস" লেখার পথ বন্ধ করতে হবে।

আমাদের দেশে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যিনি আবিষ্কারক অথবা প্রবর্তক তিনিই হচ্ছেন আমাদের সর্ববরেণ্য ঋষী আর সাহিত্য সম্রাট উপাধিপ্রাপ্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনিই-১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 'রাজসিংহ' লিখে উপন্যাস মার্কা ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। আর এরই প্রদর্শিত পথে চললেন শ্রী ভুদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অঙ্গুরী বিনিময়' বইয়ে শিবাজীকে নায়ক আর রোসিনারাকে নায়িকা করে। ভুদেব বাবুর লেখার স্রোতে আওরঙ্গজেবের কথা রোসিনারাকে একেবারে পশু চরিত্রে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ আওরঙ্গজেবের রোসিনারা নামে কোন কন্যাই ছিল না। অনেকের ধারণা, ভুদেব বাবুর ইতিহাসে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবেই এত বড় ভুল হয়েছে। অবশ্য ভুদেব বাবুর রচনায় বাঁচার একটা রাস্তা অবলম্বন করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, যদিও রোসিনারা নামে আওরঙ্গজেবের কোন কন্যা নেই তথাপিও এটা যে উপন্যাস। আর আগেই বলেছি উপন্যাস কল্পনার মিথ্যার পালিশ চড়ালে যেন অপরাধের কিছু নয়। অতএব ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের মতে, প্রখ্যাত চরিত্রবতী জেবন্নেসাকেও চরিত্রহীন বললেই বা দোষ হবে কেন?

এমনিভাবে ১৯০৯ খৃস্টাব্দে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একটি বই লিখেছেন তার নাম "ভারতের বিদূষী'। 'বিদূষী' 'বিদ্যান'-এর স্ত্রী লিঙ্গ। কিন্তু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থখানায় জেবন্নেসা যে স্থান পেয়েছেন এটাই মুসলমানদের সৌভাগ্য বলতে হবে। তবে তিনিও শিবাজীর প্রেম প্রণয়ী বলে জেবন্নেসাকে চিত্রিত করেছেন। তেমনিই ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সুনীতি দেবীর "The Beautifull princess" নামে একটি পুস্তকে শিবাজীর প্রণয়িনী বলে জেবন্নেসার সুউচ্চ চরিত্র গাত্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করেছেন।

তাছাড়া আজকাল প্রায় নানা পত্রপত্রিকায় এত বেশি উৎকট ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি হচ্ছে যে নিরপেক্ষ পাঠকের সামনে যখন ওগুলো বারবার ফুটে ওঠে তখন আমার মত অনেকেরই মনে পড়ে 'একটা মিথ্যাকে বারবার প্রচার করতে করতে তা সত্যে পরিণত হয়"। এছাড়া আমাদের বাংলা ভাষাতেও একটা প্রবাদ বাক্য আছে 'যা রটে কিছুও ঘটে।' কিন্তু আজ বোধহয় নতুন প্রবাদ বাক্য তৈরি করতে হবে "যা না ঘটে তাও রটে।"

অথচ প্রকৃতপক্ষে যাঁরা ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন, যেমন কাফি খাঁ, মনুচি, ওট্যাভর্নার, স্যার যদুনাথ সরকার প্রমুখ পণ্ডিতদের লিখিত ইতিহাসে এসব অভিযোগ বা অপরাধের 'অ'ও লেখা নেই বরং প্রশংসার প্রাচুর্য আছে। স্যার যদুনাথ সরকারের একটি পুস্তকের নাম 'শিবাজী' আর একটির নাম 'ঔরঙ্গজেব'। কিন্তু এগুলোর মধ্যে ঐসব গাঁজারে গল্পের কোন স্থান নেই। তবে আগামীকাল নতুন সংস্করণে বা নতুন নতুন মুদ্রণে কী হবে তা বলার স্পর্ধা আজ অনেকেরই নেই।

বঙ্গের বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের মধ্যে যদুনাথ সরকার প্রথম শ্রেণীর সন্দেহ নেই। তিনি ১৯১৭ খৃস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে "Modern Review" পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তার নাম "Love affairs of jeban nessa"। তাতে তিনি জোরালো ভাষায় গুরুগম্ভীর ভঙ্গিমাতে প্রকাশ করেছেন–"ঐ সমস্ত কাহিনী একেবারে মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন।"

আর একজন খ্যাতনামা চরিতকার শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "মোগল বিদূষী" পুস্তকে ঐ সমস্ত প্রেম কাহিনীকে মিথ্যা এবং কাল্পনিক বলে শুধু লেখা নয় বরং প্রমাণ করতেও সক্ষম হয়েছেন।

একদিন সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর ঐ কন্যা জেবন্নেসার জন্মের পূর্বে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার যথার্থ বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। তিনি স্বপ্নে দেখছেন তাঁর এক কন্যা তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে দিচ্ছে এবং নানা ধর্মীয় উন্নতির জন্য নতুন অনেক তথ্যাদি সংগ্রহ করে পিতার করকমলে পেশ করছে। স্বপ্ন সব সময় সত্য হয় না, কিন্তু বড় বড় বুজুর্গ বা আল্লাহর আদর্শ ওলীদের স্বপ্ন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক ও সার্থক হয়। আলমগীরের স্বপ্ন কতটা সফল হয়েছিল তা আজ বিচারের দিন।

আওরঙ্গজেব নিজেই পছন্দ করে নাম রেখেছিলেন জেবন্নেসা-অর্থাৎ ললনাশ্রী। তিনি যখন কুরআন মুখস্থ করতেন তখন পুরনো পড়া ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না কারণ তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। হাফেজা হওয়ার পর আরবী, ফারসী ও উর্দুতে পূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এছাড়া আরও অন্যান্য ভাষায় জেবন্নেসার দখল ছিল যথেষ্ট।

জেবন্নেসার প্রতিভার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। একবার পারস্যের বাদশাহ স্বপ্নের মধ্যে একটি কবিতা মুখস্থ করেন–“দুররে আবলাক ক্যাসে কমদিদা মওজুদ”। বাদশাহ সমস্ত কাব্যবিদ ও কবিদের ঐ বাক্যের সাথে মিলিয়ে অর্থ, ছন্দ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঐ রকম আর একটি বাক্য তৈরি করে দিতে আহ্বান করেন। অনেকেই করলেন বটে কিন্তু তা বাদশাহের পছন্দসই হয়নি। সেইজন্য সকলের পরামর্শে ঐ বাক্যটি হিন্দুস্থানের কবি কাব্যকারদের জন্য দিল্লির রাজদরবারে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সকলেই ইতস্তত করতে লাগলেন, কারণ পারস্যের মাতৃভাষা পারসী। অতএব সেখানকার লোকেরা যখন পারেননি তখন না জানি কত কঠিনই হবে। বাক্যটির অর্থ ছিল “বাগাফটকা মতির প্রত্যক্ষদর্শী বিরল।”

অবশেষে ভারত বিখ্যাত বিদূষী জেবন্নেসার নিকট অন্তঃপুরে তা পাঠানো হল। তিনি একটু চোখ বুলিয়ে ঐ বাক্যের নিচে একটি বাক্য লিখে দিলেন–

“মাগার আশকে বুতানে সুরমা আলুদ”।

অর্থাৎ–সুরমা পরা চোখের অশ্রু বিন্দু ঐ মতির প্রাচুর্য।

সাধারণ একটা বাক্যের সঙ্গে জেবন্নেসার রচিত এই অসাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি বিজড়িত উচ্চ শ্রেণীর ছন্দ সৃষ্টিতে ভারতের জ্ঞানী গুণীরা তো মুগ্ধ হয়ে ছিলেনই, সেই সঙ্গে ঐ কবিতাটি যখন পারস্যে পৌঁছেছিল তখন তাঁকে পারস্যবাদী এত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন যে, তাঁর জ্ঞানমুগ্ধ ও গুণমুগ্ধের দল অনেক পুস্তক পুস্তিকায় লিখে ফেলেও ছিলেন।

পারস্যের পণ্ডিতবৃন্দ সেখানের সুলতানকে অনুরোধ করেন একবার ঐ বিখ্যাত নারীকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর। কিন্তু সুলতান জানতেন বাদশার নারী মহলে এত পর্দা প্রথার প্রচলন যে, তাঁর ঐ আমন্ত্রণ হয়তো উপেক্ষিত হবে ফলে তিনি অপমানিত হতে পারেন। তাই শেষে জেবন্নেসাকে বিখ্যাত কবিকে দিয়ে কবিতার ভেতর দিয়ে মনের কথা জানালেন-‘তুবা ত্র্যায় মহজেরী বে পরদা দিদান আরজু দারাম...” অর্থাৎ “হে চন্দ্রাপেক্ষা সুন্দরী, আমাদের ব্যবধান দূরীভূত হোক আর পর্দার বাইরে আপনার দর্শনের আশা নিয়ে যেতে চাই।

উত্তরে কথিত গোঁড়া সম্রাটের গোঁড়া কন্যা লিখে পাঠালেন-“বুয়ে গুল দার বারগে গুল পুশিদাহ আম দর সোখন বিনাদ মোরা”-অর্থাৎ ‘পুষ্পের সুঘ্রাণের মত পুষ্পেই আমি লুকিয়ে আছি। আমায় যে কেউ দেখতে চায়, সে আমায় দেখুন আমারই লেখায়”। এই রকম পর্দার পক্ষপাতিনী নারী হয়েও জেবন্নেসাকে আজ মর্মান্তিক ও ঘৃণ্য অভিযোগের শিকার হতে হয়েছে। বলাবাহুল্য ঐ নিষ্ঠুর ভূমিকার নেপথ্যে জেবন্নেসা, রশিনারা আর জাহানারা প্রমুখ রমণী পর্দা বজায় রেখে, পাণ্ডিত্য অর্জনের যে ইতিহাস রেখে গেছেন তা চাপা দেওয়া এবং তাঁদের পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক নিক্ষেপ করার প্রয়োজন এই জন্যই যে, যদি শিক্ষিতা নারী সমাজ

>Goto List

পর্দার পক্ষাবলম্বন করেন তাহলে উদ্দেশ্য যাঁদের সফল হয় না তাঁরাই প্রমাণ করতে চান কুরআন আর হাদীসের শিক্ষাপ্রাপ্ত পর্দায় থাকা রাজকুমারীরা পর্দায় থাকলেও অন্তরে তাঁদের পর্দা ছিল না। তাই যাকে তাকে প্রেম বিতরণ করেছেন। সুতরাং যত দোষ যেন তাঁদের মতে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা। অতএব মুসলিম নারীকে এমন পর্যায়ে আনতে হবে, যাতে তাঁরা কুরআন-হাদীসের শিক্ষা হতে দূরে সরে থাকেন এবং প্রথা হতে মুক্তি নিয়ে অপর অসভ্য স্রোতের টানে উলঙ্গ অথবা অর্ধোলঙ্গ স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিণী এবং নকল উন্নতির শেষ সীমার ব্যভিচারিণী হয়ে উঠেন। অবশ্য তাঁদের শ্রমের সার্থকতা আজ প্রমাণিত। সুফিয়া খাতুন আজ মিস্ সুপ্রিয়ায় পরিণত হয়ে পোশাক পরিচ্ছদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক এগিয়ে পড়েছেন। এমনকি বিচারকের সামনে প্রায় উলঙ্গ হয়ে দেশ সুন্দরী বিশ্ব সুন্দরী পুরস্কার নিতেও পিছিয়ে নেই। প্রকৃতপক্ষে এগুলো উন্নতি না অবনতি তা আজ গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন।

সপ্তম অধ্যায়

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরবর্তী মুঘল বাদশাহ

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর পরবর্তী বংশধরগণ সম্রাট আওরঙ্গজেবের মত এত যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না, কিন্তু তাই বলে অযোগ্যও ছিলেন না। আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ আলম বাহাদুর শাহ উপাধি নিয়ে ১৭০৭ খৃস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। সম্রাট শাহ আলম বা বাহাদুর শাহ বীর পণ্ডিত ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সকল শত্রুই স্বাভাবিকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু শাহ আলমের বীরত্ব গাম্ভীর্য ও কলাকৌশলের ভূমিকা অবলোকন করেই অনেকে শান্ত ও ক্ষান্ত হয়। কিন্তু শিখ জাতি শক্তিশালী হয়ে বান্দার নেতৃত্বে এগিয়ে এলেন। বান্দার আদেশে শিরহিন্দে লুটপাট শুরু হয়। বাহাদুর শাহ কোন সেনাপতি নিয়োগ না করে নিজে বীরবেশে সুশিক্ষিত সৈন্যসহ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নামলেন। যুদ্ধে শিখ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হল এবং বান্দা কোন রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। চারদিকে শাহ আলমের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। শাহ আলম মুঘল বাহিনীকে শক্তিশালী করে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। কিন্তু ১৭১২ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করেন শাহ আলম। স্বল্পায়ু না হলে শাহ আলম আওরঙ্গজেবের মত অমর হয়ে থাকতেন। তিনি সিংহাসনে বসে রাজা তদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনের

ব্যবস্থা করেছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বন্দি শম্ভুজির পুত্র শাহুকে মুক্তি দিলেন। এমনিভাবে পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা, সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা, সর্বোপরি ধর্ম প্রবণতা তাঁকে মহীয়ান করে তুলেছিল।

সম্রাট শাহ আলমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জান্দাহার শাহ সম্রাট হন। তিনিও বিচক্ষণ ছিলেন। দুষ্ট দমনে তিনি ছিলেন খুব নির্ভীক। ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে এক বছর রাজত্ব করার পর তিনি গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন। এখানে অপমৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী নন। ভারতে গান্ধীজি, পাকিস্তানের লিয়াকত আলী খান, আমেরিকার মিঃ কেনেডিকে হত্যা করা হয়েছিল। যাঁরা হন্তা তারাই কলঙ্কিত আর যাঁরা নিহত তাঁরা ইতিহাসের আসল পাতায় চির জীবন্ত হয়ে রয়েছেন। সম্রাট জান্দাহারের পরে বাহাদুর শাহের পৌত্র ফাররুক শিয়র সিংহাসনে বসেন ১৭১৩ খৃঃ। পূর্ব পুরুষদের আকস্মিক মৃত্যু লক্ষ করে স্থির করলেন মৃত্যুর পূর্বে এমন যোগ্য প্রতিনিধি তৈরি করতে হবে, যাতে তাঁরা যেকোন মুহূর্তে সাম্রাজ্যের হাল ধরতে পারে। তাই সম্ভ্রান্ত বংশের যোগ্য দুই ভাই (ইতিহাসে সৈয়দ ভাতৃদ্বয় বলে পরিচিত) সৈয়দ হুসাইন আর সৈয়দ আবদুল্লাকে সঙ্গে নিলেন এবং রাজকার্যে এমন সুযোগ্য করে তুললেন যাতে সম্রাটের অসুস্থতা, অনুপস্থিতির কারণে সম্রাটের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। অপরপক্ষে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন সম্রাট ফররুকশিয়র সৈয়দ ভাতৃদ্বয়ের হাতের পুতুল ছিলেন। আসলে তাঁরা সম্রাটের উচ্চ চিন্তা বুঝতে পারেননি। ঐ সময় মারওয়ার রাজা অর্জিত সিং বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সম্রাট তা কঠোর হস্তে দমন করেন। অজিত সিং পরাজিত হয়ে অত্যন্ত আগ্রহে সম্রাট ফ্যারুকশিয়রের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং নিজ কন্যাকে সম্রাটের সহিত বিবাহ দেন। পূর্বে বর্ণিত শিখ নেতা বান্দা আবার শক্তি সঞ্চয় করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফরুকশিয়র বিপুল বিক্রমে বান্দাকে পরাজিত এবং নিহত করেন। ১৭১৯ খৃস্টাব্দে আততায়ীর হাতে সম্রাট নিহত হন।

এমনিভাবে বাহাদুর শাহের চতুর্থ পুত্র জাহান শাহ মুহম্মদ শাহ উপাধি নিয়ে সম্রাট হলেন (১৭১৯-৪৮)। পতনোনন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের তিনিই ছিলেন শেষ প্রতাপশালী সম্রাট। তাঁর সময়ে দরবারে ওমরাহগণ ইরানী ও তুর্কী দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে সাম্রাজ্য অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রকাশ পায়। তাঁর উজির নিজাম উল মুল্‌ক দাক্ষিণাত্যের সুবাদার থেকে স্বাধীন শাসক হয়ে উঠলেন, হায়দরাবাদ রাজ্যের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। এই সময় সাফাবী বংশ উচ্ছেদ করে তুর্কী নাদির শাহ পারস্যের মসনদে বসে ভারত আক্রমণ করেন। তাঁর প্রচণ্ড আঘাতে মুঘল সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। সুবাদারগণ চারদিকে স্বাধীন হয়ে দাঁড়ালেন। অযোধ্যার শাদাৎ খাঁ, বাংলা দেশে আলিবর্দী, রোহিল খণ্ডে আফগানরা। মারাঠাগণ এই সময় খুব প্রবল হয়ে মালব, বুন্দেল খণ্ড গুজরাট,

>Goto List

বেবার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত দখল করেন। বাংলাদেশে মারাঠাদের লুটপাটকে লোকে বর্গীয় হামলা বলত।

নাদীর শাহের পর আহম্মদ শাহ আব্দালির ভারত অভিযানে মুঘল সাম্রাজ্য একবারে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ল। মুহম্মদ শাহের পরে আহম্মদ শাহ (১৭৪৮-৫৪), দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-৫৯), দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬), দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-৩৭) ও দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-৫৮) সম্রাট হয়েছিলেন। ১৭৫৭ খৃঃ পলাশীল যুদ্ধে বৃটিশ রাজশক্তির উভ্যুদয় হয় দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বকালে। তার একশত বছর পর (১৮৫৭-৫৮) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের আমলে জাতীয় বিদ্রোহ হয়। ঐ বিদ্রোহের নায়ক হিসেবে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দি হয়ে রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন এবং তাঁর পুত্র পৌত্রদের তাঁর সামনে দিল্লিতে মিঃ হডসন গুলি করে মারেন। সম্রাট মুহম্মদ শাহ থেকে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ পর্যন্ত সম্রাটদের অনেক সমালোচক ও ঐতিহাসিকগণ অযোগ্য বিলাসী প্রভৃতি বলে আখ্যায়িত করেন। ইংরেজ এবং দেশের দালালগণ ভারতের বিরুদ্ধে যেভাবে বিরোধিতা করেছিল সেখানে সাহস ও যোগ্যতা প্রদর্শন ইতিহাসে আত্মহত্যার নামান্তর বলে গণ্য হতো। হৃদয়ে খোদাই করে রাখার মত ঘটনা এই যে, শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ সিপাহি বিদ্রোহ আন্দোলনে (১৮৫৭) সারা ভারতে বিদ্রোহই হিন্দু মুসলমানদের নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সারা ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। সারা ভারতে সকলের মাঝে সকলের বিচারে সম্রাট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার মত যোগ্যতা তাঁর ছিল একথা সর্বজনবিদিত।

অষ্টম অধ্যায়

সম্রাট বাবর

আমরা আকবর বা আওরঙ্গজেবসহ প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তির আলোচনায় দুটি জিনিস তুলে ধরেছি– একটি হচ্ছে ঐতিহাসিক বিকৃতির ছবি আর দ্বিতীয় যেটি হচ্ছে বিকৃতি করার বৈজ্ঞানিক কারণ। সেই জন্য মুঘল বংশের ধারাবাহিকতা সাময়িকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমরা পুনরায় মুঘল শাসনের ধারাবাহিক আলোচনায় ফিরে আসছি।

মুঘলগণ বহুবার ভারত আক্রমণ করেছিল এবং ফিরে গিয়েছিল নিজেদের বাসভূমিতে। তাই তাদের কাজ কর্মে প্রমাণিত হয়েছে তারা বিদেশী বা আক্রমণকারী। কিন্তু ঐ মুঘল বংশীয় অর্থাৎ এশিয়ার বিশ্ব বিখ্যাত দিগবিজয়ী বীর তৈমুরলঙ্গের রক্তের সঙ্গে মাতার দিক দিয়ে চেঙ্গিসখাঁর রক্ত সন্ধিক্ষণে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন বাবর।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক সম্বন্ধে ইতিহাসে অনেক মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যার আবরণে আবরিত করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনার অবকাশ রইল। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পর ফিরোজ শাহ তুঘলক বংশের মর্যাদা বা পূর্ব সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সক্ষম হননি। সেই সময় ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে আফগান সামন্তদের বিবাদ কোন্দল খুব জোরালো রূপ ধারণ করে। ঠিক ঐ সময় এগার বছরের এক পিতৃহীন বালক যেন উন্নতি উদয়ের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনিই বাবর। পাঞ্জাবের শাসকনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও পদচ্যুত করার জন্য বাবরকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি ১২ হাজার সুসজ্জিত সৈন্যসহ এগিয়ে এলেন। ১৫২৬ খৃস্টাব্দে পানিপথে যুদ্ধ হয় বাবরের সঙ্গে ইব্রাহিম লোদীর। লক্ষাধিক বিপক্ষ সৈন্য থাকা সত্ত্বেও বাবর দারুণভাবে জয়লাভ করেন। ইব্রাহিমের ভরসা ছিল তাঁর সৈন্যাধিক্যের ওপর। কিন্তু বাবর সারারাত নামাজ (আরাধনা উপাসনা) শেষে সৈন্যদের সামনে ভাষণ দান করলেন এবং সার কথা জানালেন জয় পরাজয় সব আল্লাহর হাতে। তবে আমাদের প্রাণপণে লড়তে হবে।

বাবর জানতো তাঁর সৈন্যদের মধ্যে অনেকে মদ্যপান করতেন, যা ধর্মে মহাপাপ। তাই যুদ্ধের পূর্বাহ্নে, মদ্যপানের বিরুদ্ধে তাঁদের জোর করে ক্ষেপিয়ে না তুলে ১২ হাজার সৈন্যসহ আল্লাহর দরবারে হাত তুলে মোনাজাত বা প্রার্থনা করতে হাত উঠিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর জীবনে মদ্য পান করবো না, পূর্ব অপরাধ ক্ষমা কর এবং পরিবর্তে

>Goto List

যুদ্ধে ইজ্জত রক্ষা কর।” এত জোরে শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন যে, সমস্ত সৈন্যের ভাবান্তর হয় ও তাঁদেরও বেশির ভাগের চক্ষু অশ্রুপ্লুত হয়েছিল এবং দলের মধ্যে যাঁরা মধ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা সেদিন হতে মদ্যপান ত্যাগ করেন। এটা বীর বাবরের সুন্দর ধর্মীয় কৌশল বা কঠিন কূটনীতির নিদর্শন। তাই অনেক ঐতিহাসিক বাবরের জন্য লিখেছেন, তিনি মদ্যাপায়ী ছিলেন। কিন্তু তা একেবারেই ভুল। বাস্তবিক তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান উপাসক মুসলমান।

তিনি আসলে আধ্যাত্মিক শক্তিরও অধিকারী ছিলেন। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, তাঁর পুত্র হুমায়ুন যখন কঠিন পীড়াগ্রস্ত হয়ে শয্যাগত হয়েছিলেন, যখন সমস্ত চিকিৎসক জবাব দিলেন তখন বাবর বললেন, “আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, ‘তোমরা নামাযের সঙ্গে ও ধৈর্যের সঙ্গে চাও’। অতএব ডাক্তার জবাব দিয়েছে সত্যি কিন্তু খোদা তো জবাব দেননি।” তাই ওজু (নামাযের জন্য হাত, পা, মুখ ধোয়া) করে সন্তানের শয্যার পাশে নামায পড়লেন, তারপর দুই হাত তুলে দোয়া করলেন, “হে খোদা! তুমি সর্ব শক্তিমান, তোমার শক্তি যুগে যুগে মানুষ দেখে এসেছে আমায় তোমার শক্তির আর একটি কণা দেখাও; আমার নিজের প্রাণ তোমার দরবারে সমর্পণ করছি বিনিময়ে হুমায়ুনকে তুমি সুস্থতা ও আয়ু দান কর।” সঙ্গে সঙ্গেই ভোজবাজির মত হুমায়ুন উঠে বসলেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন আর বাবর সঙ্গে সঙ্গে পীড়িত হলেন ও সন্তানের শয্যাতেই শয়ন করলেন এবং ঐ শয্যাতেই তাঁর মৃত্যুর ডাক এসেছিল। মহা মিলন হয়েছিল তাঁর মহান স্রষ্টার সাথে ১৫৩০ খৃস্টাব্দ পানি পথের যুদ্ধেও বাবরের জয় শুধু দৈহিক নয় মানসিকতা ও আধ্যাত্মিকতাকেও অস্বীকার করা যায় না।

বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে নিজের অনেক দোষও বর্ণনা করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি তুর্কি ভাষায় সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ছিলেন। বাবর সম্বন্ধে ইতিহাসে খুব একটা বেশি বিকৃতি ঘটানো হয়নি। তবে মদ্যপানের ব্যাপারটি বেশ মারাত্মক। অনেকে সহজেই মনে করতে পারেনি মদ্যপান তত দোষের নয়, যদি হতো তাহলে এত বড় সুনাম বিজয় আর অলৌকিকতা পরিলক্ষিত হতো না বাবরের জীবনে। কিন্তু সূক্ষ্ম সমীক্ষকদের মতে তা ঠিক নয়। বাবরের চরিত্র ও চেহারা মুসলমানের মতই নির্ভেজাল ছিল।

হুমায়ুনের আগমন

বাবরের পুত্র সম্রাট হুমায়ুন ১৩ বছর বয়সে পিতাকে হারান। হুমায়ুনও সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি ও তাঁর চেহারা ও পোশাক পরিচ্ছদে পূর্ণভাবে পিতার মত। হযরত মুহম্মদ (সা.) চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। ১৫৩০ হতে ১৪৫৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাদশাহ ছিলেন। হুমায়ুনের জন্য ইতিহাসে অন্তত একটি ইন্‌জেকশনও দেওয়ার প্রয়োজন ছিল ইতিহাস বিকৃতকারীদের। যেহেতু

>Goto List

তিনিও একজন পরহেজগার মুসলমান ছিলেন তাই তাঁকে আফিম খোর বলে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তিনি একজন বিশিষ্ট বীর ও নিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। কঠিন রোগমুক্তির পরই দুর্বল দেহে এবং পিতার মৃত্যুতে শোকার্ত হুমায়ুন দেখলেন, গুজরাটে বাহাদুরশাহ নামে এক প্রতাপশালী রাজা নিজ শক্তি বৃদ্ধি ও রাজ্যসীমা বৃদ্ধিতে চলমান, অন্যদিকে বিহারে পাঠানবীর শের আফগান প্রবল শক্তিতে দণ্ডায়মান। বাহাদুরের বিরুদ্ধে হুমায়ুন যুদ্ধ করে তাঁকে পরাস্ত করেন। তারপর বিপুল বিক্রমে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে শের আফগানকে পরাস্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নিজেই পরাজিত হলেন। আসলে এই যুদ্ধে ধর্মের জন্য বা শৃঙ্খলার জন্য ছিল না, যুদ্ধে ছিল শুধু বংশীয় মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন, তাই ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে আবার উভয়ে যুদ্ধ করলেন এবং শের আফগান দিল্লী ও আগ্রা দখল করলেন। একথা সঠিক যে, শের আফগানের ধর্মগুণ, বীরত্ব, মহত্ব, চরিত্র, কূটনীতি ও রাজনীতি ক্ষমতা হুমায়ুন অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না; বরং উৎকৃষ্টই ছিল। যাই হোক হুমায়ুনকে পারস্য পলায়ন করতে হয়। ঐ দুরবস্থার মধ্যে অমরকোট নামক স্থানে তাঁর আকবার নামে এক পুত্রের জন্ম হয়।

পারস্য সম্রাটের সাহায্য পেয়েই হুমায়ুন ১৫৫৫ খ্রীঃ ভারত আক্রমণ করলেন এবং দিল্লী ও আগ্রা দখল করে পূর্ব মর্যাদা ফিরে আনলেন। বিজয়ী হয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি তাঁর লাইব্রেরিতে সিঁড়ি হতে পড়ে যান এবং আহত হন। আল্লাহর নাম বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন আর জানালেন সকলকে শেষ বিদায়। সেটা ছিল ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ।

একবার হুমায়ুন যুদ্ধক্ষেত্র হতে খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। প্রাণ বাঁচানো দায় হয়েছিল, সেই সময় এক ভিস্তিওয়ালা তাঁর ছাগল চামড়ার ভিস্তিটি তাঁকে সাঁতার কেটে পৌঁছে দিয়ে হুমায়ুনের প্রাণ রক্ষা করে উপকার করেছিলেন। হুমায়ুন বলেছিলেন, আমি যদি দিল্লীর সিংহাসন পাই তুমি দেখা করবে। আমি তাই উপহার দেব, যা তুমি চাইবে। যখন হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন পেলেন সেই সময় ছেঁড়া ময়লা জামা পরিহিত কাঁধে সেই ছাগল চামড়ার ভিস্তি নিয়ে ভিস্তিওয়ালা হুমায়ুনের ফটক প্রহরীকে প্রস্তাব করলেন 'আমায় বাদশার কাছে যেতে দাও।' প্রহরী ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে দাঁড় করিয়ে গুপ্তচর অথবা পাগল মনে করে আটকে রেখে বাদশাহকে জানাতেই কর্মরত হুমায়ুন জানালেন, 'খুব সম্মানজনকভাবে একেবারে আমার কাছে নিয়ে এসো।' অদ্ভুত বেশে ভিস্তিওয়ালা ঘরে রাজ প্রাসাদে হুমায়ুনের কক্ষে প্রবেশ করতেই হুমায়ুন ছুটে গিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমি আপনার উপকৃত হুমায়ুন। বলুন আপনি কী চান? আমি ইনশা আল্লাহ বিনা দ্বিধায় আপনাকে তাই দেব।' ভিস্তিওয়ালা বললেন, 'আমি চাই তোমাকে সরিয়ে সিংহাসনে বসতে।' সমস্ত সভাসদ অবাক। হুমায়ুন মাথার পাগড়ি খুলে ভিস্তিওয়ালার মাথায় পরিয়ে তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে

সভাসদকে জানিয়ে দিলেন, আজ হতে ইনিই দিল্লীর বাদশাহ, আমি এর নগণ্য খাদেম।' গোটা দিল্লীতে তোলপাড়। হুমায়ুন বহুভাবে জিজ্ঞাসিত হলেন কেন তিনি এরকম করেছেন। হুমায়ুন উত্তর দিলেন, পবিত্র কোরআনে আছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা অবৈধ সুতরাং আমি তো ডুবে মরেই যেতাম। তাই তিনি যা চাইবেন তাই দেব বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। একদিন এক রাত্রি যাপনের পর মহামান্য ভিস্তিওয়ালা হুমায়ুনকে আলিঙ্গন করে তাঁর মাথার মুকুট পরিয়ে তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে হাত তুলে দোয়া করে করমর্দন করে বলে গেলেন আমি বড় পুরস্কার পেয়েছি তা হচ্ছে আপনার মানবতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা।

আর একবার এক বিধবা রানী কর্ণাবতী তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে রাজ্য সামলাতে পারছিলেন না। ঠিক সেই সময় তাকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি চলে। কয়েক গাছি সূতোর বৃত্তাকার চুড়ির মত যাকে রাখি বলা হয়, পাঠিয়েছিলেন হুমায়ুনকে আর লিখে পাঠিয়েছিলেন 'আমি আপনাকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করতে এই রাখি পাঠালাম, আপনি হাতে পরবেন আমাকে বোন হিসেবে এবং আমার শিশু পুত্রকে ভাগ্নে হিসেবে সসৈন্যে এসে রক্ষা করবেন।' হিন্দু রমণীর সেই সুতা হুমায়ুন অশ্রুসজল নয়নে হাতে পরলেন এবং স্বয়ং একদল সৈন্য নিয়ে চললেন হিন্দু বোন, ভাগ্না আর তাঁদের রাজ্য রক্ষা করতে। একটি যুদ্ধ যাত্রায় কত লক্ষ টাকা খরচ তা অল্প মূল্যের সুতোর চেয়েও কম দাম মনে করে দীর্ঘদিন পর পৌঁছলেন সেই বোনের রাজ্যে কিন্তু তাঁর পৌঁছবার পূর্বেই রাণী ভয়ে ভীতা হয়ে বিষপান করে দেহত্যাগ করেছেন। হুমায়ুন এই সংবাদে এতই কেঁদেছিলেন যে, হঠাৎ কেউ দেখলে অবাক না হয়ে পারতো না যে, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক বীর বাদশাহ তাঁর পাতানো বোনের জন্য এমন শিশুর মত কাঁদতে পারেন। ঠিক এই সুযোগেই শেরশাহ শক্তি সঞ্চয় করে হুমায়ুনকে পরাস্ত করে দিল্লী ও আগ্রা দখল করেছিলেন। (দ্রঃ প্রসাদ কুসুম, শিবরতন মিত্র)

অতএব এহেন এক দয়ার বাদশাহের চরিত্রে আফিংখোরের অভিযোগ আরোপ করে ইতিহাসের পাতাকে যেভাবে কলুষিত করা হয়েছে তা আজ আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নেই।

শের শাহ

১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দ হতে ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময় শেরশাহ রাজত্ব করেন। মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করেন তিনি। এই অল্প সময়ের মধ্যেই শুধু যুদ্ধে নয় সর্ববিষয়ে তিনি যে রাজনৈতিক ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন তা চমকপ্রদ। গোটা রাষ্ট্র কতকগুলো প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। প্রত্যেক প্রদেশকে কয়েকটি সরকার, প্রত্যেক সরকারকে আবার কয়েকটা পরগনায়, প্রত্যেক পরগনা কতগুলো গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো। প্রদেশের শাসককে বলা হতো 'ইক্তেদার'। ইক্তেদারের অধীনে ছিল 'সিকদার-ই-মুনসিফান'। এমনিভাবে মুনসিফ, ফোতাদার, কারকুন,

আমিন. দেওয়ান প্রভৃতি প্রচুর পদবিন্যাস করেছিলেন আর সব উপরে ছিলেন শের শাহ স্বয়ং। চারজনই ছিলেন নিজের বিভাগে সুপণ্ডিত এবং সৃজনী শক্তিধর। (১) 'দেওয়ান-ই-গুজারত' বা রাজস্ব মন্ত্রী (২) 'দেওয়ান-ই-রিসালাত' বা পররাষ্ট্র মন্ত্রী (৩) 'দেওয়ান-ই-আরিজ বা সেনা বিভাগের মন্ত্রী (৪) 'দেওয়ান-ই-ইন্সা বা দলিল ও ভূ-মন্ত্রী। সমগ্র রাষ্ট্রের জমি জরিপ. প্রজাদের 'পাট্টা' এবং 'কবুলিয়াৎ' দান. শস্য হতে কর প্রদানের সুবিধা এবং ভারতে চিঠিপত্র আদান প্রদান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রথম চালু হয় এই শের শাহের আমলেই। ভারতীয় মুদ্রা 'তঙ্কা'কে রুপেয়া নাম তাঁরই দেওয়া।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, শেরশাহ যেভাবে নীচুতলা হতে উপরতলা পর্যন্ত শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন তা আজও শুধু ভারতে নয়. সারা বিশ্বে কোথাওবা সামগ্রিকভাবে অথবা আংশিকভাবে প্রচলিত রয়েছে এবং শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা এত সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ ছিল যে. কাউকে ঘরে খিল বা তালা লাগাবার প্রয়োজন হতো না। রাস্তায় লুটপাট বা ছিনতাই বন্ধ করেছিলেন। ছোট বড় অনেক রাস্তা নির্মাণ করেছিলের। কলকাতা হতে পেশোয়ার পর্যন্ত নির্মিত বিখ্যাত রাস্তাটির ধারে ধারে বরাবর হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের জন্য পৃথক পৃথক সরাইখানা স্থাপন করেছিলেন। সেই রাস্তার ধারে বসেই আমরা ইতিহাসের ইতিহাস লিখছি। এই ঐতিহাসিক রাস্তাটির নাম শেরশাহ রোড না হয়ে ইতিহাসের পাতায় ইংরেজি নাম 'গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড' আমরা সংক্ষেপে লিখি জি.টি রোড।

তিনি একবার বলেছিলেন, "যদি আমার 'হায়াত' (আয়ু) আরও আল্লাহ বাকি রাখেন তাহলে আমি এমন একটি রাস্তা তৈরি করতে চাই, যেটা ভারত হতে খাইবার গিরিপথ দিয়ে একেবারে আরব দেশ মক্কা শরীফ পর্যন্ত লম্বা হবে, যেটির উপর দিয়ে আমার ভারতীয় যে কোন বোন বোরকা পরে একা হাঁটতে হাঁটতে হজে যেতে পারেন।" কিন্তু তাঁর সে সাধ পূরণ হয়নি, হঠাৎ একদিন বারুদের স্তূপে আগুন লেগে যায় এবং তিনি তাতেই মৃত্যু বরণ করেন। এই মহৎ ও চরিত্রবান বাদশাহের জন্য শ্রীবিনয় ঘোষ ভারতজনের ইতিহাস ৩৯৪ পৃঃ যা লিখেছেন তাতে তাঁকে মুসলমান ধর্ম অমান্যকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে– "সম্রাট ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত শক্তির আধার ও উৎস। এই রাজ তত্ত্ব শেরশাহও মানিতেন।" উপরোক্ত কথা আদৌ সত্য নয় কোন মুসলমান ঐ রূপ ধারণা রাখতে পারেন না।

হুমায়ুন ও শেরশাহের পর আকবরের আগমন। তাঁর সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই এই পুস্তকের এক বিস্তৃত স্থান জুড়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে একটা কথা অবশ্যই তাঁদের মনে পড়বে. যাঁরা আকবরের ইতিহাস ইতিপূর্বে পড়ে ফেলেছে. সেটি হচ্ছে এই যে আকবরের চরিত্রহীনতা. নারী লোলুপতা. মূর্খতা প্রভৃতির প্রাবল্যে মোগল সামাজ্য কয়েক মাসের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যেত যদিই সম্রাট

>Goto List

শেরশাহ রাজ্য চালানোর পথ প্রস্তত করে না যেতেন। সুতরাং আধুনিক চিন্তাশীলদের কাছে এটা স্পষ্ট যে, আকবরের রাজত্ব ও তার স্থায়ীত্ব পর্দার অন্তরালে শেরশাহের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

জাহাঙ্গীর

আকবরের মৃত্যুর পর ১৬০৫ খৃস্টাব্দে জাহাঙ্গীর সিংহাসন লাভ করেন। তিনি চরিত্রে, চেহারায়, পোশাক-পরিচ্ছদে পুরোপুরি ইসলামবিরোধী ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা এই ইতিহাসের ইতিহাসে করা হয়েছে। কিন্তু শুধু তাঁর চরিত্রের কালো দিকটাই তুলে ধরা হয়েছে, এছাড়া তাঁর একটা ভাল দিক আছে, সেটি হচ্ছে এই– হযরত আলফেসানী আহমাদ সাহেবকে তিনি কারাগারে বন্দি করেছিলেন। কারণ আকবরের বিরুদ্ধে অভিযান তিনিই সৃষ্টি করেছিলেন এবং প্রকারান্তরে আকবরকে পরাজিত করেছিলেন ঐ আলফেসানী সাহেবই আকবরের নতুন ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্র। আর তাই দেখা যায় পৃথিবীর বেশির ভাগ নবী, পয়গম্বর দরিদ্র হয়েও সহস্র সহস্র শিষ্যের নেতা আর যাঁর হাতে সারা ভারতের চাবিকাঠি, যিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সারা জীবনে তাঁর মাত্র ১৮ জন শিষ্য। তাও তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই বিকল ধর্মের অচল অবস্থা। এর পেছনে হাত ছিল শিরহিন্দের মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা আহমাদ আলফেসানীর ধর্মীয় প্রচার অভিযান।

জাহাঙ্গীরকে আশফজাহ পরামর্শ দিলেন বাদশাহী কর্মচারী উজির-নাজির যেভাবে মুজাদ্দিদে আহমাদ সাহেবের শিষ্য হতে শুরু করেছেন তাতে একদিন রাজনৈতিক বিপ্লব আসতে পারে, তাই তাঁর দিকে লক্ষ রাখা দরকার। মদ্যপ জাহাঙ্গীর বড় বড় সেনাপতি রাজকর্মীদের তাঁর পরামর্শে দূরে দূরে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর মুজাদ্দেস আহমাদ সাহেবকে রাজ দরবারে আসতে সংবাদ পাঠালেন। তিনি জানতেন জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রত্যেক সেজদা বা প্রণিপাত করতে হতো, আর করতে হতো সম্মুখে নত হয়ে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে কুর্নিশ। জেনে শুনেই আহমাদ সাহেব জাহাঙ্গীরের দরবারে ঘৃণাভরে সদর্পে মাথা উঁচু করে গিয়ে দাঁড়ালেন। জাহাঙ্গীর জানতে চাইলেন তিনি দরবারের আইন অনুসারে সেজদা বা কুর্নিশ করলেন না কেন? আর অন্তত আসসালামু আলাইকুমও তো বলতে পারতেন? কপর্দকহীন হযরত আহমাদ সাহেব বললেন, "আমি জাহাঙ্গীরের দরবারের ভৃত্য নই বরং আমি আল্লাহর দরবারের ভৃত্য। তাই তাঁর আইনই আমার কাছে আইন আর বাকি সব কিছু আমার কাছে বেআইনি। তবে তোমাকে সালাম দেইনি এজন্য যে, তুমি অহংকারী। হয়ত উত্তর দেবে না তখন আমার সালাম দেওয়ার অর্থ হবে প্রিয় নবীর একটা সুন্নতকে পদদলিত করানো।"

জাহাঙ্গীর রেগে তাঁকে বন্দি করে গোয়ালিয়র দুর্গে কারাগারে পাঠান। এই সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেই জাহাঙ্গীরের উপর লোক আরও অসন্তুষ্ট হয়ে

>Goto List

উঠল। মহব্বত খান কাবুলে জাহাঙ্গীরের কর্মী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনিও মুজাদ্দিদ সাহেবের শিষ্য ছিলেন। তাই ক্রোধে আগুন হয়ে তিনি বিদ্রোহ করলেন। শুধু তাই নয়, নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করলেন এবং জাহাঙ্গীরকে বন্দি করলেন। এদিকে মুজাদ্দিদ সাহেব মহব্বত খাঁকে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে জানালেন এবং তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দিতে বললেন। মুহব্বত তাই করলেন।

জাহাঙ্গীর এবার মুজাদ্দিদ সাহেবকে সসম্মানে দরবারে আমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু মুজাদ্দিদ সাহেব জানালেন তাঁর কতগুলো শর্ত পালন করতে হবে। তবে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করতে পারেন নচেৎ দেখা হওয়ার কোন উপায় নেই– (ক) দরবার হতে ইসলামবিরোধী সেজদা বা প্রণিপাতের ও কুর্নিশ প্রথার উচ্ছেদ করতে হবে। (খ) ধ্বংস করে দেওয়া মসজিদগুলো পুনঃ নির্মাণ করতে হবে। (গ) যুদ্ধকরের পুনঃ প্রবর্তন করতে হবে। (ঘ) জাহাঙ্গীরকে নিজে ইসলাম অনুযায়ী চলতে হবে এবং রাজ্য ইসলামের আইন মতে চলবে। (ঙ) বিচার আগের মত কাজী বা মুফতি মৌলভীরা করবেন। জাহাঙ্গীর সমস্ত শর্ত মেনে নিলেন, নিজে মুজাদ্দিদ সাহেবের শিষ্য হলেন এবং মদ্যপান ত্যাগ করলেন। পাঁচবার নামায, কুরআন পাঠ প্রভৃতি শুরু করলেন। মুহাদ্দিদ সাহেবকে প্রধান পরামর্শদাতা মদ্যপ চরিত্রহীন ধর্মত্যাগী প্রায় জাহাঙ্গীর যেন ইসলামের স্নিগ্ধ আলোতে নব শিশুর মত নির্মল জীবন আরম্ভ করলেন। মাত্র পাঁচ বছর তাঁর এই নতুন জীবন স্থায়ীত্ব লাভ করেছিল। তিনি নূরজাহানকে আর পূর্বের মত বাইরের ভূমিকা পালন করতে নিষেধ করে দিলেন। একটি কূপের মত গভীর গর্ত তৈরি করালেন সেটা সোনা রুপোর টাকা দিয়ে ভর্তি করলেন সেটা হতে জাহাঙ্গীর দীন, দুস্থ, অনাথ, বিধবা হিন্দু মুসলমান প্রজাদের দান করতেন।

একদিন যে জাহাঙ্গীর ছিলেন নূরজাহানের হাতের পুতুল প্রজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ অনুভবের অবকাশ ছিল না। আজ তিনি মুজাদ্দিদ সাহেবের পরামর্শে দরবারের বাইরের ফটকে একটি শিকল রাখলেন যেটি একেবারে জাহাঙ্গীরের শয়নকক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘণ্টাও বাঁধা ছিল। যেকোন অত্যাচারিত, উপবাসী, অবহেলিত, মুসলমান, অমুসলমান প্রজা রাজকর্মচারীদের দ্বারা যাঁর কাজ সমাধা হয়নি তিনি শিকল টানলেই বাদশা জাহাঙ্গীর তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে ডাকতেন এবং তাঁর সন্তোষজনক সমাধান করে তবে ক্ষান্ত হতেন।

একদিন রূপ লাবণ্যের জীবন্ত প্রতীক নূরজাহান আয়নার সামনে তাঁর রূপচর্চা করছিলেন এমন সময় এক বিকৃত মস্তিষ্ক হিন্দু প্রজা কেমনভাবে একেবারে নূরজাহানের কক্ষে উপস্থিত হয়ে পড়ে। নূরজাহান সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করেন। হিন্দু প্রজা মারা যায়। মৃতের আত্মীয় শিকল টানলেন এবং জাহাঙ্গীরের নিকট বিচারপ্রার্থী হলেন নূরজাহানের বিরুদ্ধে। জাহাঙ্গীর তাঁর

প্রিয়তমা বিশ্ব সুন্দরী নূরজাহানের বিচার করে রায় দিলেন নূরজাহানের প্রাণদণ্ড। সকলেই অবাক হলেন। সেদিনের জাহাঙ্গীর আর আজকের জাহাঙ্গীরের মধ্যে অনেক দূরত্ব, অনেক ব্যবধান। আগে ছিলেন ধর্মমুক্ত রাজা, এখন হচ্ছেন ধর্মযুক্ত বাদশাহ। সারা ভারতে যিনি সব চেয়ে অবাক হয়েছিলেন তিনি তাঁর সহধর্মিণী, সহকর্মিণী, চিরসঙ্গিনী নূরজাহান। নূরজাহান কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, "হে স্বামী পুরনো দিনের কোন কথা কি আপনার মনে নেই! আমার সমস্ত প্রেম-ভালাবাসা, মায়া, সেবা সমস্ত কিছু একটু মনের তুলাদণ্ডে ওজন করলে হতো না?" জাহাঙ্গীর চোখ ভরা জল নিয়ে বললেন, "প্রিয় নূরজাহান, আমি আমার মনের তুলাদণ্ডে তোমার সারা জীবনের সবকিছু এক পাল্লায় চাপিয়েছি আর অন্য পাল্লায় চাপিয়েছি হযরত মুহাম্মদের (সা.) আইনকে। বারে বারেই ভারী হয়েছে ইসলামের আইনের নির্দেশ। ইসলামের আইনে তুমি তাকে হত্যা করতে পারতে প্রাণদণ্ডের বা ব্যভিচারের অপরাধে। কিন্তু সে দোষ তার ছিল না। আসলে সে ছিল বিকৃত মস্তিষ্ক, অতএব আবার বলছি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তোমার প্রাণদণ্ড।" বিচার প্রার্থী স্বপ্ন দর্শনের মত নাটকীয় ইসলামী বিচার ব্যবস্থা দেখে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "হে বাদশাহ! আমরা আর প্রাণদণ্ড দেখতে চাই না, নূরজাহানকে আমরা ক্ষমা করলাম। আমরা আজ বুঝলাম ইসলাম সত্যিই শান্তি ও সত্যের নিরপেক্ষ ধর্ম।"

অনেক কান্নাপ্লুত অনুরোধে নূরজাহান তাঁদের নিকট ক্ষমার সাথে প্রচুর ক্ষতি পূরণ দিয়ে প্রাণ ফিরে পেলেন। জাহাঙ্গীর এত সুন্দর, আদর্শ চরিত্রের প্রভাব তাঁর সানদের উপর পড়া অস্বাভাবিক ছিল না।

শাহজাহান

১৬২৭ খৃস্টাব্দ হতে ১৬৫৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল। বুন্দের খণ্ডের আফগান সর্দার খানজাহান লোদী বিদ্রোহী হন কিন্তু সম্রাট তাঁকে দমন করেন। তারপর ১৬৩২ খৃস্টাব্দে আহমদগর দখল করেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের তিনি শান্তিপূর্ণভাবে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করবার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু তাঁরা যুদ্ধই পছন্দ করেন। অবস্থা অশুভ বুঝে বিজাপুরের সুলতান বাৎসরিক ২০ লক্ষ্য টাকা কর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সন্ধি করলেন। এমনিভাবে ১৬৩৪ খৃস্টাব্দে বিজাপুরের আদিল শাহী ও গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী সুলতানের সঙ্গে সন্ধি করে শাহজাহান নিজের আধিপদ্য বিস্তার করেন। ঐ সময় বঙ্গদেশে পর্তুগীজরা ঘাঁটি তৈরি করে বাণিজ্য ও অত্যাচারে বেশ উন্নতি করেছিলেন। তখন বাংলার সুবাদার ছিলেন কাসিম আলি খাঁ। সম্রাট শাহজাহান তাঁকে আদেশ দিলেন হুগলী আবরোধ করে পর্তুগীজদের যেন উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্রাটের আদেশে যুদ্ধ ঘোষিত হলো, পর্তুগীজরা পরাজিত ও বহু নিহত হয় এবং অজস্র পর্তুগীজ বন্দি হয়ে আগ্রায় প্রেরিত হয়।

শাহজাহানের পোশাক-পরিচ্ছদ একজন পূর্ণ মুসলমানের মতই ছিল এবং জাহাঙ্গীরের ধর্মীয় ভাবান্তর ও ইসলামে আত্মসমর্পণের ছাপ শাহজাহানের ওপরও পড়েছিল। তিনি যদি মাতাল ধর্মহীন, দাড়ি মুণ্ডিত আকবরের মত বা জাহাঙ্গীরের প্রথম অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারতেন তাহলে তার বিরুদ্ধেও অভিযোগ থাকতো না বরং তিনি বহু সুনামের অধিকারী হতে পারতেন। মিঃ ঘোষ খৃষ্টান লেখক মিঃ স্মিথ, মিঃ ভিন্সেন্ট প্রমুখ ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি দিয়ে তার ইতিহাসে যা লিখেছেন তাও তাৎর্যপূর্ণ – "স্মিথ বলেছেন এবং ঠিকই বলেছেন বাদশাহ শাহজাহানের ঐশ্বর্য বিলাস, স্থাপত্য-প্রীতি, প্রাসাদ, দুর্গ, বিশেষ করে তাজমহল নির্মাণ অনেককে অবাক করে দিয়াছে কিন্তু এই বিলাসিতার অন্তরালে অনেক নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নৃশংস হত্যা কদর্যতা লুকিয়ে রয়েছে!" (৪৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু দাড়িওয়ালা সম্রাটকে স্পষ্ট ভাষায় চরিত্রহীন না বললেও সরল পাঠক সহজে বুঝবেন না, সেই জন্য আবার লেখা হয়েছে 'মমতাজের মৃত্যু হয় ১৬৩১ খ্রীস্টাব্দে এবং তার পর জীবনের ৩৫ বছর শাহজাহান তাজমহলে সমাধিস্থ প্রিয় পত্নী মমতাজের ধ্যান করিয়া কাটাননি। স্মিথ বলছেন "During the remaining thirty five years of his life he disgraced himself by grass licentiousness বাকি ৩৫ বছর নির্বিচার উচ্ছৃঙ্খলতায় শাহজাহান নিজের জীবনকে কলুষিত করতে কুণ্ঠিত হননি।"

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, মমতাজের মৃত্যুজনিত শোকে শাহজাহানের মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিয়েছিল এবং তিনি মমতাজের মৃত্যুর পর শুধু শোকে নয়, নানা শারীরিক ও মানসিক পীড়ায়ও পীড়িত ছিলেন, তাই দূরবর্তী শ্রেষ্ঠতম শাহজাদা আমগীরের মূল্যনির্ধারণ করতে না পেরে নিকটবর্তী অপদার্থ দারা শিকোহকেই আশাতিরিক্ত স্নেহ ও সুযোগে সিক্ত করে সুপথের পরিবর্তে তাঁর ঐতিহাসিক মঞ্চ হতে পলায়নেরই পথ নির্মাণ করেছিলেন।

শাহজাহানের তাজমহল, দিল্লির লালকেল্লা, দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস, মতি মসজিদ, দিল্লির জুমআ মসজিদ, ময়ূর সিংহাসন প্রভৃতি শাহজাহানের অক্ষয় কীর্তি, যার সঙ্গে তাঁর স্থাপত্য শিল্প ও ধর্মানুরাগী মনেরও পরিচয় বিজড়িত।

একবার শাহহাজান রাতের স্বপ্নে একটি মসজিদ দর্শন করলেন। ঘুম ভাঙার পর তাঁর ইঞ্জিনিয়ারদের ডাকলেন এবং আদেশ দিলেন, আমার বর্ণনা অনুযায়ী আপনারা ঐ মসজিদের ছবি এঁকে আমায় দেখান। সকলেই বহুরূপে বহুভাবে কল্পিত মসজিদের একটা করে ছবি আঁকলেন বটে কিন্তু একটি ছবিও বাদশাহের মনের মত হলো না। সেই সময় মস্তবড় এক সাধক বা দরবেশ খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। অবশেষে তাঁরই শরণাপন্ন হতে হয় বাদশাহকে ঐ ছবির জন্য। দরবেশ বাদশাহকে জানালেন, আমা অপেক্ষাও বড় দরবেশ যিনি আপনার রান্না করেন। বাদশাহ অবাক হয়ে দাড়িওয়ালা ছোট জামাপরা রাঁধুনীকে ডেকে

ছবির কথা বলতেই তিনি বললেন, আমার চেয়েও বড় বুযুর্গ যিনি আপনার পায়খানা পরিষ্কার করে। বাদশাহ অবাক হয়ে মেথরকে ডেকে বললেন, আপনার মত মহান মানুষ নিজেকে গোপন রাখার জন্য এই কৃচ্ছ্রসাধনার ওপর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আর ক্ষমা চাইছি আপনাকে এর আগে চিনতে না পারার জন্য। মেথর ফকির তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে বললেন, "উহা 'মোফাত্তেশ'রা (Engineer) আঁকতে পারবে কেন? উহা যে বেহেশতের মসজিদ। (দ্রঃ রাজমুকুট পৃঃ ১৩) মেথর ফকির একজন শিল্পীকে ডাকিয়ে আনলেন এবং নিজে একটি মসজিদ ছবি এঁকে তাঁকে দেখালেন। বাদশাহ খুব অবাক হলেন যে এ ছবি তাঁর স্বপ্নে দেখা ছবির সাথে হুবহু সঙ্গতিপূর্ণ। ফকীর শেষ কথা বললেন, 'ভ্রাতঃ স্মরণ থাকে, যে ব্যক্তির কখনও নামায কাযা হয়নি কেবল তিনিই এই মসজিদের প্রথম প্রস্তরখানি প্রথিত করবেন।" (দ্রঃ রাজমুকুট পৃঃ ১৩, ১৯২৩ খৃঃ মুদ্রণ) আরও কথিত আছে, ঐ ঘটনার পরের দিন হতে সেই ফকিরকে আর লোকালয়ে দেখা যায়নি।

দিল্লীর জুমআ মসজিদ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনায় সম্রাট বহু আলেম সুফী আমীর ওমরাদের বললেন, "আমি এমন লোক দ্বারা মসজিদের প্রথম ইট বসাতে চাই, যাঁর ১২ বছর কোনদিন তাহাজ্জুদের নামায কাজা হয়নি।" প্রতিদিন গভীর রাতে নিয়মিতভাবে ঐ নামায পড়া বেশ কঠিন কাজ। তাই নানা কারণে কেউ এগিয়ে আসেন না। বাধ্য হয়ে বাদশাহ নিজেই প্রথম ইট বসালেন এবং কেঁদে বললেন, হে আল্লাহ! আমি জানতাম না যে, তুমি আমাকে এমনিভাবে প্রকাশ করে লজ্জিত করবে, হে আল্লাহ! তোমার শোকর (কৃতজ্ঞতা) যে আমার ১২ বছর তাহাজ্জুদ বাদ যায়নি।" লোকে প্রশ্ন করলেন, "বাদশাহ দিল্লির শাহী মসজিদ এত বিরাট উঁচু জায়গায় নির্মাণ করছেন কেন?" উত্তরে সম্রাট বলেছিলেন, "আমার মৃত্যুর পর আমার ছোট বড় প্রজারা যখন উচ্চ স্থানে স্থাপিত মসজিদে খোদাকে সেজদা করবে আমি তখন আমার প্রজাবৃন্দের পায়ের নিচে, অনেক নিচে কবরে তাঁদের দোয়ার ভিক্ষুক হয়ে প্রতীক্ষায় থাকব।"

দিল্লীর বুকে আজও সেই মসজিদ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদে অপবিত্র অবস্থায় প্রস্রাবান্তে শৌচাদি ব্যতিরেখে কোন মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রবেশ করার অনুমতি নিষিদ্ধ, কিন্তু আজ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পুরুষ ও স্ত্রী প্রতিদিন যেভাবে মসজিদে প্রবেশ, বিচরণ ও পর্যবেক্ষণ করেন তা যেকোন প্রকৃত মুসলমানের জন্যে হৃদপিণ্ডে আঘাত দেয়ার মত অপরাধ।

আজ আমাদের সূক্ষ্ম বিচার দণ্ড ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণা করে দেখতে হবে যে, সারা ভারতের অধীশ্বর যে সম্রাট শাহজাহান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে কাছে পেয়েও, পাশে পেয়েও আল্লাহর স্মরণের জন্য মমতাজের সমস্ত আকর্ষণ উপেক্ষা করে তাজাজ্জোদের নামাজে মগ্ন হতে পারেন তিনি প্রকৃতপক্ষে উচ্ছৃঙ্খল না, উচ্ছৃঙ্খল তাঁরাই, যাঁরা তাঁর নির্মল নিষ্কলুষ চরিত্রের ওপর কলঙ্কের

কালিমা লেপন করতে দ্বিধা করেননি? ১২ বছরের নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি জাগরণের ইতিহাসটিকে হজ করতে পারলেই বাজিমাৎ হবে মনে করে যাঁরা অবিশ্রান্ত বিষাক্ত কালি বর্ষণ করে গেছেন তাঁদের কোন ভূষণে ভূষিত করবেন তা সূক্ষ্মদর্শী পাঠক-পাঠিকাদের বিবেচনাধীন।

শাহজাহানের শাসনকালে দু-একটি বিদ্রোহ ছাড়া শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়নি। B.P. Saksena বলেন, "In shahjahan's reign the Mughal Empire attained to the zenith of prosperity and affuence." অর্থাৎ- শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য এবং প্রাচুর্যের উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। ফরাসী ঐতিহাসিক ও পর্যটক তাভার্নিয়ের বলেন, "শাহজাহান রাজা হিসেবে প্রজাদের শুধু শাসন করা নয়, পরিবার এবং সন্তানদের ন্যায় তিনি প্রজাদের শাসন করতেন।"

এরপর মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে আওরঙ্গজেব ও তাঁর পরবর্তী বংশধরগণের ইতিহাস ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে বলে এখানেই এ অধ্যায়ের যবনিকা টানছি।

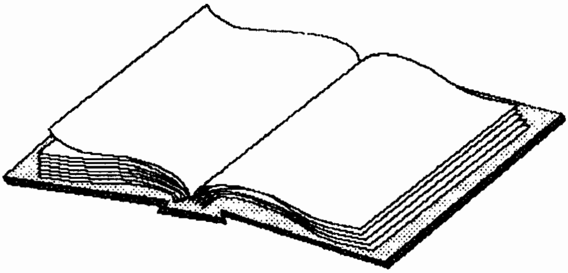

>Goto List

নবম অধ্যায়

ভারতীয় রাষ্ট্র মঞ্চে গজনী ও ঘুর শাসকদের অভিযান

সবুক্তগীন-নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রবল পরাক্রান্ত তুর্কীরা আলপ্তগীনের নেতৃত্বে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন। সবুক্তগীন এই আলপ্তগীনেরই ক্রীতদাস। আলপ্তগীনের মৃত্যুর পর ৯৭৭ খৃ: ২০ এপ্রিল সবুক্তগীন গজনীর সিংহাসনে বসেন। আফগানের পার্বত্য এলাকায় রাজশক্তি দৃঢ় করে তিনি শাহীরাজা জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সবুক্তগীনের কয়েকজন কর্মীকে বন্দি করার অপরাধে জয়পালের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি যুদ্ধ যাত্রা করলে জয়পাল আজমীর, কলিঞ্জর, কনৌজ প্রভৃতির রাজাদের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও জয়লাভ করতে পারলেন না। তিনি ৯৯৭ খৃ: পরলোকগমন করেন।

সুলতান মামুদ-সুবক্তগীনের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র সুলতান মামুদ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ৯৯৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য পরিচালনা করেন।

সুলতান মামুদ খুব উৎসাহী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ সৈন্যাধ্যক্ষের অন্যতম এবং একজন শ্রেষ্ঠ বিতেজা ছিলেন। তাঁর সতেরবার ভারত আক্রমণ করার পশ্চাতে ভারতীয় রাজাগণ বর্ত্তৃক সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ ও তাঁর আনুগত্য অস্বীকার এবং ভারতীয় মিত্রবর্গকে উৎপীড়ন প্রভৃতি অনিবার্য কারণ। ১০০০ খৃষ্টাব্দে মামুদের প্রাথমিক অভিযানের ফলস্বরূপ সীমান্তস্থিত কয়েকটি দুর্গ অধিকৃত হয়। পরের বছর তিনি জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযান চালালে জয়পাল তাঁর পুত্র পৌত্রসহ বন্দিত্ব বরণ করে অবশেষে পরাজয়ের গ্লানি হতে আত্মরক্ষার নামান্তরে আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেন। ১০০৫ খৃষ্টাব্দে মুলতান অধিকৃত হয়। অতঃপর মুলতানের শাসনকর্তা দাউদকে বিদ্রোহাত্মক কার্যে সহায়তার অভিযোগে মামুদ জয়পালের পুত্র আনন্দ পালের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ অভিযান প্রেরণ করেন। আনন্দপালের সন্ধিনীতির ফলে সম্মিলিত হিন্দু বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েও পরিশেষে মামুদের জয় হয়। ১০০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নারায়ণপুরের রাজাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ১০১২ খৃষ্টাব্দে থানেশ্বরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে তাহা অধিকার করেন। ১০১৮ খৃষ্টাব্দে এক বৃহৎ সেনাবাহিনীর পুরো ভাগ থেকে তিনি গজনী রওনা হলেন। এই সময় বারনের রাজা ১০ হাজার সৈন্যসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন। এক কথায় তাঁর সুদীর্ঘ ৩৩ বছর কালব্যাপী ক্রমাগত যুদ্ধে তিনি একবারও পরাজয় বরণ করেননি।

>Goto List

সুলতান মামুদের ইতিহাসে সোমনাথ মন্দির অভিযান এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১০২৫ খৃস্টাব্দের শেষাংশে গজনী ত্যাগ করে সুলতান মামুদ ১০২৬ খৃস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি সোমনাথের দ্বারে উপস্থিত হলে হিন্দুরা প্রবল বাধা দান করেও পরাজিত হয়। এই সোমনাথকে কেন্দ্র করেই আধুনিক চিরাচরিত ইতিহাসে সুলতান মামুদের ন্যায় স্বচ্ছ চরিত্র বীরের ওপর "ভারতীয় মন্দিরসমূহ ধ্বংস করে ইসলাম ধর্ম প্রচার", মূর্তিভঙ্গ, অর্থ লোলুপ, হন্তা ও লুণ্ঠনকারী ইত্যাদি অসংখ্য অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। অথচ প্রকৃত ইতিহাসে এই সমস্ত ধারণার একটিও সত্য নয়। তাঁর ভারত আক্রমণ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাপার। তদানীন্তন সময়ে ভারতের ধন-সম্পদ এমনকি অনেকের মতে জলদস্যুরাও তাদের লুণ্ঠিত অর্থ সোমনাথ মন্দিরে গচ্ছিত রাখত। এই সব নানা কারণে সোমনাথ যখন মন্দিররূপী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল তখন আর মামুদের আক্রমণে কোন বাধা ছিল না।

ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদও এ কথার সমর্থনে বলেন, "The temples of India which Mahmud raided were store houses of enormous and untold wealth and also some of these were political centres." অর্থাৎ-মাহমুদ ভারতের যে মন্দিরগুলো আক্রমণ করেছিলেন তাতে বিপুল ও বর্ণনাতীত ধনরত্ন পূর্ণ ছিল এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি ছিল রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপের কেন্দ্রস্থল। প্রত্যক্ষদর্শী বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল-বিরুনী বলেন, "বিদেশী বণিকদের কাছে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থে যে সমস্ত হিন্দু ধনী হয়েছিল, তাদের দানের প্রাচুর্য দিয়েই এই সমস্ত ধনরত্ন সঞ্চিত হয়েছিল।"

অতএব ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে তিনি মন্দির ধ্বংস করেছিলেন একথা আদৌ সত্য নয়। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার ডব্লিউ হেইগ বলেন, "His religious policy was based on toleration and though zealous for Islam, he maintained large body of Hindu troops and there was no reason to believe that conversion was a condition of their services." অর্থাৎ তাঁর ধর্মীয় নীতি সহিষ্ণুতার ওপর গড়ে উঠেছিল এবং যদিও ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ যথেষ্ট ছিল তথাপি তিনি এক বিরাট হিন্দু সৈন্যদল পোষণ করতেন। একথা বিশ্বাস করার কোন হেতু নেই যে, ধর্মান্তরিতকরণই এই কাজের মূল উদ্দেশ্য। Prop. Habib বলেন, "The non religous character of hisexpedition will be abvious to the critic who has grasped the salient fetures of the age. It is impossible to read a religious motive in them" অর্থাৎ সমালোচকদের কাছে তাঁর অভিযানের ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রতীয়মান হবে, যদি তাঁরা যুগ ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। এর মধ্যে ধর্মীয় উত্তেজনার বাস্তবিকই অভাব ছিল।

সুলতান মামুদের ধর্মনীতি সম্বন্ধে মিঃ এলফিনস্টোন বলেন, "এরকম ঘটনা কোথাও দেখা যায়নি যে, যুদ্ধ ব্যতীত কোথাও কোন হিন্দুকে তিনি প্রাণদণ্ড দান করেছেন।" তাঁর সামরিক বাহিনীর ইতিহাসে তিলক রায়, হাজারী রায় এবং সোনীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি গজনীতে হিন্দু সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানের জন্য একটি কলেজ ও একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ধর্মান্ধ হলে এ সমস্ত কাজ কী করে তাঁর দ্বারা সম্ভব হতো? উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতে হিন্দু রাজন্যবর্গ ও মধ্য এশিয়ার মুসলমান রাজাদের সাথে তাঁর ব্যবহারের কোন তারতম্য ছিল না।

তদুপরি ভারত অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে মন্দির ধ্বংস ও লুণ্ঠনের জন্য যে সমস্ত অভিযোগকারী তাঁকে লুণ্ঠন প্রিয় ও হিন্দু বিদ্বেষী বলে প্রচার করতেন বা আজও করেন তাঁদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এ সমস্তই যুদ্ধের ন্যায় স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হয়েছিল এবং তাঁর পূর্ববর্তী ও তদানীন্তন পৃথিবীতে ইহা আদৌ অসঙ্গত ছিল না। তদানীন্তন প্রচলিত নীতি অনুসারে বিজিত জাতির লুণ্ঠিত ধন সম্পত্তিতে বিজয়ী সৈন্যদলের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করা হতো। মামুদ এই প্রচলিত নিয়ম পালন করেছেন মাত্র। এটা তাঁর নতুন কিছু আবিষ্কার নয়।

মামুদের চরিত্র—আধুনিক সহজলভ্য ইতিহাসে সুলতান মামুদের চরিত্রে যে সমস্ত কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছে তা অনেকটাই অবিজ্ঞতাপ্রসূত ও স্বকপোলকল্পিত মন্তব্য ছাড়া কিছু নয়। সামগ্রীকভাবে তিনি ছিলেন দেহ-মনে নানাবিধ গুণের সমাবেশে অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর ব্যবহারিক চরিত্র ছিল অত্যন্ত মধুর ও উদার।

একবার এক দরিদ্র হিন্দু প্রজা সম্রাটের কাছে অভিযোগ নিয়ে এলেন, সম্রাটের ভাগ্নে নাকি তাঁর অসহায় স্ত্রীর ওপর প্রতি নিয়ত পৈশাচিক অত্যাচার চালায়। সম্রাট তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে নির্দেশ দিলেন এবার যখনই তাঁর ভাগ্নে তার বাড়িতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন সম্রাটকে তা অবগত করান। তার হাতে একটা কার্ড দিয়ে বললেন, এটা দেখালেই যে কোন মুহূর্তেই রাজভৃত্যরা তাকে সরাসরি সম্রাটের কাছে পৌছে দেবে। তাই সেদিন রাতে সম্রাটের ভাগ্নে তাদের বাড়িতে উপস্থিত হল। হিন্দু প্রজা এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। সে এবার পরখ করবে মুসলমান বাদশাদের ঐস্লামিক বিচার পদ্ধতি। তৎক্ষণাৎ বাদশাহের নিকট খবর পৌছালো বাদশাহ তরবারি হাতে সেই দরিদ্র প্রজার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। বাদশাহ এক টিমটিমে আলোয় দেখলেন এক উন্নতমস্তক যুবক ঘরের

ভেতর হিংস্র মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ইশারায় আলোটি নিভিয়ে দিতে বলে উলঙ্গ তরবারী দিয়ে পেছন দিক থেকে এক চোটে তাকে দ্বিখণ্ডিত করলেন, তারপর গৃহকর্তাকে আলো জ্বালাতে নির্দেশ দিয়ে এক গ্লাস জল চাইলেন। গ্লাসটি বসে তিন নিঃশ্বাসে শেষ করলেন। অতঃপর দুরাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করলেন, "ওগো আল্লাহ, আমি যে তোমার পছন্দনীয় ইসলামের নিয়মানুযায়ী আমার এই হিন্দু প্রজার বিচারের ভার নিজ হস্তে সুসম্পন্ন করতে পারলাম তার জন্য তোমার অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।" তাঁর হিন্দু প্রজা তাঁকে আলো নেভানো ও জলপান করার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আঁবল্য স্নেহ সিক্ত ভাগ্নের শিরোশ্ছেদের পথে মায়া মমতার কোন বাধা সৃষ্টি না হয় তার জন্যই আলো নেভানোর নির্দেশ! আর আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যথক্ষণ পর্যন্ত না আপনার অভিযোগের সুবিচার করতে পারছি ততক্ষণ জল স্পর্শ করব না। তাই এর মাথা কেটেই জলপান করতে চেয়েছিলাম কারণ আমি তখন পিপাসায় কাতর ছিলাম। আরও অবাক হওয়ার কথা এই হতভাগ্য যুবক আমার কোন ভাগ্নে নয়, সামান্য একজন রাজকর্মচারী মাত্র। ইসলামের এহেন বিচার পদ্ধতি দেখে সম্রাটের হিন্দু প্রজা সেদিন আশ্চর্যান্বিত হয়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি নিয়মিত কোরআন পাঠ ও মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়তেন। শাহ নামা রচয়িতা কবি সম্রাট ফিরদৌসী মহাপণ্ডিত আলবিরুনী, ঐতিহাসিক উৎবী, দার্শনিক ফারাবী প্রমুখ মনীষীর দ্বারা তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত থাকত।

মুহাম্মদ ঘুরী–সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গজনী বংশের অভ্যন্তরীণ সুযোগ নিয়ে ১১৭৩ খৃস্টাব্দে গিয়াসুদ্দিন ঘুরী ও তার ভাই মৈজউদ্দিন ঘুরী ঘুর বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মৈজউদ্দিন ইতিহাসে মুহাম্মদ ঘুরী নামে খ্যাত। দ্বাদশ শতাব্দীর চতুর্থ ভাগে মুহাম্মদ ঘুরী তাঁর ভারত অভিযান শুরু করে প্রথমে মুলতান, পেশোয়ার, লাহোর, পাঞ্জাব প্রভৃতি অধিকার করার পর তারাইনের প্রথম যুদ্ধে পৃথ্বিরাজের কাছে পরাজিত হলেও দ্বিতীয় যুদ্ধে ১১৯২ খৃস্টাব্দে পৃথ্বিরাজকে পরাজিত ও নিহত করে উত্তর ভারতে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

>Goto List

দশম অধ্যায়

দাস বংশের প্রতিষ্ঠা

কুতুবউদ্দিন আইবক– কুতুবউদ্দিন মুহাম্মদ. ঘুরীর মৃত্যুর পর ‘দাস বংশ’ নামে এক নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে ১২০৬ খৃস্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন এবং মাত্র চার বছর রাজত্ব পরিচালনার সুযোগ লাভ করে ১২১০ খৃস্টাব্দে ‘চৌগান’ খেলায় ঘোড়ার পিঠ হতে পড়ে গিয়ে হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। অতি অল্প সময়ে এই শাসন ব্যবস্থাতেও তিনি অত্যন্ত সুখ্যাতি লাভ করেন।

সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক ন্যায় বিচারক ছিলেন। তিনিও হিন্দু-মুসলমান সকলকে সমান চোখে দেখতেন। সুলতান কুতুবউদ্দিনের আলেমদের সঙ্গে গাঢ় সম্পর্ক ছিল। তাঁর দরবারে কাজী হামীদুদ্দিন ইসতেকার, আলীবিন্ আমরুল মাহমুদী. ফকরে মুদাব্বার সদরুদ্দিন, হাসান নিজামী. মাওলানা বাহাউদ্দিন উশী প্রমুখ পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা অবস্থান করতেন। তিনি শরীয়ত (শাস্ত্র)বিরোধী ট্যাক্স গ্রহণ বন্ধ করে শরীয়তসম্মত ট্যাক্স আদায় করতে নির্দেশ দেন।

কালঞ্জর, বেনারস. কালপী, দিল্লী, আজমীর, আজাইন এবং বাদাউনির যুদ্ধে তিনি মন্দির ধ্বংস করেছিলেন বলে যে বর্ণনা সচরাচরভাবে পাওয়া যায় তা সত্য হলে তুর্কীয় আক্রমণে উত্তর ভারতে একটি মন্দিরও অবশিষ্ট থাকত না এবং হাজার হাজার মসজিদ হতো। কিন্তু বাস্তব অবস্থা অন্যরকম– উত্তর ভারতে তখন ১২টি মসজিদও ছিল না. পক্ষান্তরে সেই সময়ে হাজার হাজার মন্দির বিদ্যমান ছিল। দু-একটা মন্দির যা ধ্বংস হয়েছে তা কোন ধর্মীয় প্রোগ্রাম অনুযায়ী হয়নি, যুদ্ধের হাঙ্গামার ফলেই হয়েছে।

(সালাতীনে দেহলীকে মজহারী রুজহানাত. পৃ: ৫৮, ৯০-৯৭ দ্র:)

ইলতুৎমিস–কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আরাম শাহকে সুলতান মনোনীত করা হয়। কিন্তু তাঁর অযোগ্যতার ফলে ওমরাহগণের অনুরোধে ইলতুৎমিস ১২১১ খৃ: সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি লাহোর. মুলতান, বুদাউন, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর দুই বৃহৎ প্রতিদ্বন্দ্বী তাজউদ্দিন ও নাসিরউদ্দীনকে পরাস্ত করেন। ১২৩০-৩১ খৃ: ইখতিয়ার উদ্দীনকে পরাজিত করে বাংলার সিংহাসন দখল করেন। ১২৩২ খৃ: গোয়ালিয়র তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। ১২২৯ খৃ: বাগদাদের খলিফার নিকট হতে তিনি “সুলতান উল হিন্দ” উপাধি লাভ করেন।

>Goto List

ইলতুৎমিস নিজের সদগুণের দ্বারা ইতিহাসে এক অমর কীর্তি স্থাপন করেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনজাহ উস্ সিরাজ বলেন, "এই রকম ধার্মিক, দয়ালু, আল্লাভক্ত ও বিদ্বানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে আর কখনও আরোহণ করেননি।" Never was a sovereign so virtuous, kind hearted and reverent towards the learned and divines at upon the throne of Delhi. (Minhaj-us-Siraj)

দিল্লীর কুতুবমিনার ও আজমীরের অপূর্ব সুন্দর মসজিদ তাঁর স্থপতি বিদ্যার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের কথাই ঘোষণা করে তিনিই সর্বপ্রথম আরবী মুদ্রার প্রবর্তক। ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ ও আরও অনেক ঐতিহাসিকের মতে তিনিই ভারতে দাস বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

সুলতান ইলতুৎমিস সপ্তাহে তিন দিন, রমজান মাসে প্রত্যেক দিন, জিলহজ্ব এবং মহররম মাসের ১০ তারিখে ওলামা সম্প্রদায়দের নিয়ে ওয়াজের (বক্তৃতা) সভা করতেন। তিনি পঞ্চীয় নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন এবং জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও তার জন্য নামাযের ব্যবস্থা ছিল এবং ইমাম ও বক্তা প্রত্যেক যুদ্ধে তাঁর সঙ্গী হতেন। সুলতান সামসুদ্দিন ইলতুৎমিস আনুগত্য এবং উপাসনায় লেগে থাকতেন। জুমআর দিনে মসজিদে যেতেন এবং ফরজ ও নফল নামায পড়ার জন্য সেখানে অবস্থান করতেন। সমস্ত রাতি জেগে নতশিরে আল্লাহর দরবারে বসে থাকতেন। হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়ার (র.) বর্ণনা, তিনি রাত জাগতেন কাউকে জাগাতেন না। (তবকতে আকবরী ১ম খণ্ড ৬৩ পৃ: ও 'ফাওয়ায়েদুল ফাওয়াদ', ২১৩ পৃ: দ্র:)

'সালাতীনে দেহলীকে মজহাবী রুজহানাত' পুস্তকের ১০৮ পৃষ্ঠা হতে জানা যায়, রাতে যখনই কেউ তাঁকে দেখত তখনই দেখতে পেত তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় উপসনায় মগ্ন আছেন। নিজেই পানি আনতেন, ওজু করতেন। চাকরদের কখনও জাগাতেন না বরং বলতেন, যারা আরাম করছে তাদের কী করে কষ্ট দিই?

গোলাম সরওয়ারে উক্তি– যদিও বাদশাহীর (রাজত্ব) সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রকাশ্যে, অন্তরে তিনি ছিলেন ফকীর এবং ফকীরই তাঁর বন্ধু ছিল। (খাজিমাতুল আসফিয়া, ১ম খণ্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা)।

ঐতিহাসিক বারণী বলবনের উক্তি নকল করে বলেছেন, ঐ রকম বুযুর্গ এবং পবিত্র মানুষ তিনি কখনও দেখেননি বা শোনেননি। ('তারিখি ফিরোজ শাহী', ৭০ পৃঃ)

ইলতুৎমিস নয়-দশ বছর বয়সে বোখারার বাজারে বিক্রীত হন। একদিন তাঁর মনিব তাঁকে বাজার থেকে আঙ্গুর কিনে আনতে বলেন। তিনি পথে পয়সাটি

>Goto List

হারিয়ে ফেলেন। ছোট্ট বালক কাঁদতে থাকলে একজন ফকির তাঁকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করে নিজের পকেট হতে পয়সা দিয়ে আঙ্গুর কিনে দেন এবং বলেন, "দেখ, তুমি যখন বড়লোক হবে তখন ফকির-দরবেশদের সম্মান করবে এবং তাঁদের অধিকারকে স্বীকার করা নিজের অবশ্য কর্তব্য মনে করবে।" এই সামান্য ঘটনা তিনি চিরজীবন মনে রেখেছিলেন এবং অনেক সময় দরবারে সগৌরবে তা বর্ণনা করতেন।

আর একদিন কতকগুলো সঙ্গীসহ উপবিষ্ট খাজা মইনুদ্দিন চিশতীর পাশ দিয়ে রাখাল বালক ইলতুৎমিস ধনুক হাতে যাচ্ছিলেন। খাজা সাহেব দেখা মাত্র বললেন, "এই বালকই একদিন দিল্লীর সম্রাট হবে।" চিশতী সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যই একদিন বাস্তবে যথার্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

সুলতানা রাজিয়া– মুসলমান নারী হিসেবে রাজিয়াই সর্বপ্রথম ১২৩৬ থেকে ৪০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সময়ে চারদিকে বিপদ ও বিদ্রোহ দেখা দিলেও সাহস ও উন্নত কুটবুদ্ধির দ্বারা তিনি শিগগিরই সমস্ত দমন করতে সক্ষম হন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ বলেন, "লক্ষণাবতী হতে দেবল এবং দানরিলা পর্যন্ত সমস্ত দেশের তিনি মালিক ছিলেন এবং আমীরগণ তাঁর আনুগত্য ও প্রভুত্ব স্বীকার করে নেয়।" তিনি আরও বলেন, "রাজিয়া একজন শ্রেষ্ঠ সুলতানা, জ্ঞানী, ন্যায়বতী, মহানুভবা, বিদ্যোৎসাহিনী, সুবিচারিকা, প্রজাদের রক্ষাত্রী এবং সৈন্যবাহিনীর সুপরিচালিকারূপে চিত্রিত হয়েছেন।"

সুলতানা নাসিরুদ্দিন মাহমুদ– নাসিরুদ্দিন মাহমুদ কুড়ি বছর (১২৪৬-৬৬) কাল রাজত্ব করেছিলেন। তিনি একজন অমায়িক সুবিচারক, উদার, মহানুভূতিশীল, সরল এবং ধার্মিক বাদশাহ ছিলেন। তিনি অবসর সময়ে কোরআন নকল করে বাজারে বিক্রি করতেন। সুলতানের লেখা কোরআন বলে লোকে সীমাতিরিক্ত দাম দিতে পারে মনে করে তিনি নিজের নাম গোপন করতেন। তিনি বিনা অজুতে মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম নিতেন না। একদা মুহাম্মদ নামে তাঁর এক সেবককে তিনি তা-জুদ্দিন বলে ডাকতেন। নামের বিকৃতি শুনে সুলতান অসন্তুষ্ট হয়েছেন মনে করে সেবকটি কয়েকদিন দরবারে হাজির না হলে বাদশাহ তাকে সমস্ত বুঝিয়ে বললেন যে, ঐ সময় তাঁর অজু ছিল না।

নাসিরুদ্দিন অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। একবার তাঁর কোরআন শরীফ পড়া অবস্থাতে এক ব্যক্তি এসে বললেন, "এই জায়গাতে ভুল আছে, ওঠা কেটেদিন। নাসিরুদ্দিন ওটাকে কেটে দিয়ে লোকটি চলে গেলে পুনরায় তা লিখে দিলেন। সেবক এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "ঐ লোকটির ভুল বলাটাকে অস্বীকার করলে তিনি মনোক্ষুণ্ন হতেন। জেনে রাখো মানুষের মনের তুলনায় কাগজের উপর থেকে দাগ মিটিয়ে দেওয়া সহজ।" তিনি রাজকোষ হতে

পয়সা নিতেন না। তাঁর স্ত্রী বাঁদী রাখার প্রস্তাব দিলে তিনি তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন যে, "রাজকোষ খোদার বান্দাদের, আমার নয়।"

সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন– বলবন প্রথম জীবনে মোঙ্গলদের হাতে বন্দি হয়ে বাগদাদের খাজা জালাল উদ্দিন বসরীর নিকট বিক্রীত হন। ১২৩২ খৃস্টাব্দে অন্য ক্রিতদাসদের সঙ্গে তাঁকে দিল্লী আনা হলে ঐ দলটিকে শামসুদ্দিন ইলতুৎমিস ক্রয় করেন এবং বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেন। অবশেষে ১২৬৬ খৃস্টাব্দে সুলতান নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর গিয়াসুদ্দিন বলবন উপাধি ধারণ করে ষষ্ঠ বছর বয়সে সিংসাহন আরোহণ করেন। তিনি নানা সংস্কারমূলক কাজ করেছিলেন। জায়গীর প্রথার বিলোপ সাধন, মোঙ্গল দুর্ধর্ষদের দমন, বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ, তুগ্রিল খাঁর বিদ্রোহ দমন ইত্যাদি অনেক কাজ তিনি করেছেন। রাজাকে পৃথিবীতে আল্লার প্রতিনিধি মনে করে চারটি প্রধান কর্তব্য পালনের ওপর তাঁর পারলৌকিক মুক্তি নির্ভর করে বলে জানতেন। যথা (১) ধর্ম রক্ষা করা এবং শরীয়তের শাসনকে কার্যকর করা; (২) দুর্নীতি এবং পাপ কার্য নিবারণ করা; (৩) ধার্মিক এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের রাজকার্যে নিযুক্ত করা; (৪) সুবিচার এবং সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করা।

সুলতান বলবনের রাজত্ব শুধু ভারতেই নয়, ইসলামী জগতের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তাতারীরা মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করলে তিনি কেবল নিজের রাজ্যই রক্ষা করেননি হাজার হাজার হতভাগ্যকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

বলবনের চরিত্র– তিনি প্রথম জীবনে কিছুটা মদ্যপায়ী ও আরামপ্রিয় হলেও সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁর জীবনে সামগ্রিকভাবে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। সমস্ত অবৈধ জিনিস হতে তিনি সর্বদা দূরে থাকতেন। মদ্যপান থেকে কঠোর তওবা করেন, এমনকি মধ্যপায়ী ব্যক্তিদের নামোচ্চারণ করতেও তিনি ঘৃণাবোধ করতেন। তিনি নিজে দৈনন্দিন পাঁচবারের নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করতেন এবং সন্তানদেরও তাগিদ করতেন। ফজরের নামাজের পরিবর্তে শুয়ে থাকলে অথবা জামাতের সাথে নামায আদায় না করলে তিনি তাদের সঙ্গে এক মাস পর্যন্ত বাক্যালাপ করতেন না। কোন মসজিদে ওয়াজের (বক্তৃতা) খবর পেলে তৎক্ষণাৎ গিয়ে সাধারণ মানুষের মত বসে থাকতেন। তিনি সর্বদা অজু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করতেন এবং সাধারণত এবাদত করতেন। তিনি জানাযায় (মৃত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা পর্ব) অংশ গ্রহণ করতেন। জুমআর নামাযের পর তিনি কবর জিয়ারত করতেন। (তারিখি ফিরোজশাহী ৪৬-৪৭ পৃঃ দ্রঃ)

লক্ষৌতি থেকে ফিরে আসার সময় হিন্দু-মুসলিম সকলে মিলে তাকে অভ্যর্থনা জানাত। তিনি প্রজাদের সার্বিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। শেখ হামীদুদ্দিন সাওয়ালী (র.) এবং শেখ নিজামুদ্দিন আওলিয়া (রা.) তার নামের সঙ্গে রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন। এর দ্বারা তাঁর যথেষ্ট বুজুর্গীর

পরিচয় পাওয়া যায়। (তারিখি ফিরোজ শাহী দ্রঃ)

কায়কোবাদ– মুহাম্মদ– মুহাম্মদের মৃত্যুর পর বলবন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুগরা খানকে রাজ্যের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে বললে তিনি তা অস্বীকার করায় অভিজাত সম্প্রদায় বলবনের মৃত্যুর পর বুগরা খানের পুত্র কায়কোবাদকে ১২৮৭ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে বসান। তিনি সর্বমোট দু বছর রাজত্ব করেছিলেন।

সুলতান মোয়েজুদ্দিন কায়কোবাদ নামায-রোযা করতেন না। তিনি শরাবখোর ও আরামপ্রিয় ছিলেন। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর পিতৃহন্তা কায়কোবাদকে শতরঞ্জিতে জড়িয়ে দারুণ মার দিয়ে যমুনার জলে ফেলে দেয়। এমনি নৃশংস ও অমর্যাদার সাথেই তাঁর মৃত্যু হয়। (সালাতীনে দেহলীকে মজহবী রুজহাতান ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

পাঠক পাঠিকারর্গকে এখানে স্বধর্মে আদর্শ বিচ্যুতির শোচনীয় পরিমাণ দর্শন করতে অনুরোধ করি।

একাদশ অধ্যায়

খলজী বংশের উত্থান

খলজী বংশের আদি পরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে খলজী বংশকে তুর্কী জাতি সম্ভূত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘকাল আফগানিস্তানে বসবাসের ফলে তাঁরা আফগানি জাতির সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছিলেন বলে জিয়াউদ্দিন বারানী ও অন্য ঐতিহাসিকগণ ভ্রম বশত তাঁদের আফগানিস্তানের অধিবাসী বলে বর্ণনা করেছেন।

সুলতান জালালুদ্দিন খলজী– কায়কোবাদের মৃত্যুর পর ওমরাহ্ এবং খলজীদের মধ্যে সিংহাসনকেন্দ্রিক ঝগড়াতে খলজীদের জয় হয়। অবশেষে জালালুদ্দিন খলজী ১২৯০ খ্রীস্টাব্দের ১৩ জুন ৭০ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেই দৌলতখানায় প্রবেশ করে দুরাকাত শুকরানা (কৃতজ্ঞতা) নামায পড়লেন। (সালাতীনে দেহলীকে মজহবী রুজহানাত, ১৯৬ পৃঃ দ্রঃ)

১২৯২ খৃস্টাব্দে হালাকুর নাতী আবদুল্লাহ ভারত আক্রমণ করলে জালালুদ্দিন তাঁর মোকাবিলা করেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই জালালুদ্দিনকে পিতা বলে সম্বোধন করতে থাকলে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। এরপর চেঙ্গিস খাঁর এক নাতি 'আলাগু' সদলবলে মুসলমান হয়ে ভারতের ইতিহাসে 'নব মুসলমান' (New Mussalman) নামে খ্যাতি লাভ করেন। সাইদী মাওলানাকে হত্যা করা জালালুদ্দিনের রাজত্বকালের অন্যতম প্রধান ঘটনা। (ঐ পুস্তকের ২০৪-২০৫ পৃঃ দ্রঃ)

>Goto List

যাই হোক, সুলতান জালালুদ্দিন শরিয়তের খুব পাবন্দ ছিলেন। তিনি নামায-রোযার প্রতি অত্যধিক যত্নবান ছিলেন। এমনকি রোযাবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। রমজান মাসে ভাইপো এবং জামাই আলাউদ্দিনের সাথে কাটরা যান। ইফতারের সময় হঠাৎ নুসরাত খানের ইঙ্গিতে মুহম্মদ সেলিম তাঁকে আক্রমণ করেন। অতঃপর তাঁকে শহীদ করা হয়। মৃত্যুর সময় তিনি কালেমা শাহাদাত (অর্থাৎ ইসলামের মূলমন্ত্র) পড়ছিলেন।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজী– জালালুদ্দিনের মৃত্যুর পর ১২৯৬ খৃঃ নানা বিপদকে সঙ্গী করে আলাউদ্দীন খলজী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। একদিকে জালালী প্রধানগণ বৃদ্ধ সুলতানের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণে সচেষ্ট, অপরদিকে রাজমাতা মালিকা জাহানের চক্রান্তে রুকনুদ্দীন ও ইব্রাহিমের সিংহাসন লাভ, তদুপরি উপর্যুপরি মোঙ্গলদের আক্রমণ।

বস্তুত ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম পথ প্রদর্শনই আলা উদ্দীনের সর্বপ্রধান কীর্তি। আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্য বিস্তারনীতিকে উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্য এই দুভাগে ভাগ করা যায়। ১২৯৭ খৃঃ গুজরাট ১৩০১ খৃঃ রণথম্ভোর, ১৩০৩ খৃঃ চিতোর ও ১৩০৫ খৃঃ মালব আলাউদ্দীনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চিতোর প্রসঙ্গে আলাউদ্দীন পদ্মিনীর যে উপাখ্যান বহুল প্রচলিত আছে তার মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। সেনাপতি মালিক কাফুরের সহায়তায় দাক্ষিণাত্য বিজয়াভিযানে আলাউদ্দীন একে একে দেবগিরি বরঙ্গল, মাদুরা প্রভৃতি নিজ অধিকারভুক্ত করে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত মুসলিম প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করে ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

শাসন ব্যবস্থা– আলাউদ্দিনের শাসন ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল মোটামুটি এইরূপ ঃ তিনি সামরিক বিভাগের সংস্কার সাধন করে সৈন্যদের বেতন নির্ধারণ করেন, জিনিসপত্রের দর বেঁধে দেন, মদ্যপান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন, দেশের বিভিন্ন স্থানের খবরাখবর আনয়নের জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করেন, আমীর ওমরাহদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ সুলতানের অনুমতি ব্যতিত নিষিদ্ধ করেন ইত্যাদি।

চরিত্র ও কৃতিত্ব– মুঘল কুলগৌরব রবি আলমগীরের কথা বাদ দিলে তাঁর পূর্বে কোন মুসলমান এত বড় বিশাল রাজ্যের শাসক ছিলেন না। তাঁর ব্যক্তিগত চারিত্রিক কলঙ্কের কথা ব্যতিরেকে শাসনগত যোগ্যতা ও কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ধর্ম সম্বন্ধে বেপরোয়া মনোভাব, স্বার্থপরতা, পাপপ্রবণতা, কূটনীতির নামে প্রতারণার সূক্ষ্ম কৌশল তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে মসিলিপ্ত করেছিল। বলাবাহুল্য, আলাউদ্দীনের এরূপ ধর্মদ্রোহীতাই পরবর্তী যুগে তাঁর উত্তরাধিকারীদের অনুপযুক্ততা ও মালিক কাফুরের ক্ষমতা লাভের ফলে খলজী বংশের পতনের অন্যতম কারণ।

তবে ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন, "আলাউদ্দিন হিন্দুদের অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছিলেন বলে যে তথ্যটি প্রচারিত তা সত্য নয়।" (Medieval India, Ishari Prasad, P-208)

মুরল্যাণ্ড এবং প্রফেসর হাবীব লিখেছেন, "বারণী যেখানে 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁর উদ্দেশ্য হল যুত, মুকাদ্দাম, চৌধুরী ইত্যাদি। এরা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। সুতরাং রাজনীতির প্রয়োজনে তাদের শক্তিহীন করার প্রয়োজন ছিল।" (Agrariam system during the Muslim Rule in India by more land, P-225 & An introduction to the study of Madieval India, by Prof: Habib. P-45, Aligarh University magajin) অর্থাৎ যুত, মুকাদ্দাম, চৌধুরীকে এবং হিন্দুদের তিনি ধর্মের কারণে নিধন করেননি। ডাঃ ত্রিপাঠী লিখেছেন, "তিনি মুসলমানদেরও ছাড়েননি; অতএব হিন্দুদের কীভাবে ছাড়া সম্ভব?" (Some aspects of Mulsim administration, by Dr. Tripathi. P-258)

বারণী— জনাব জিয়াউদ্দিন বারণী খলজী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। তার 'তারিখি ফিরোজ শাহী' এক অমর ঐতিহাসিক সৃষ্টি। গ্রন্থটি হতে সমসাময়িক বাদশাহদের জীবন-বৃত্তান্ত ও বহু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। একালের ঐতিহ্য সিকরা তাঁর এই গ্রন্থ হতে বহু তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও বিচারবোধের প্রশংসা করেছেন।

আমীর খসরু— উর্দু সাহিত্যের জনক মহাকবি খসরু ছিলেন তাপস শ্রেষ্ঠ খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সর্ব প্রিয় শিষ্য। তাঁর আসল নাম আবুল হাসান। তিনি ১২৫৩ খৃঃ জন্মে ১৩২৫ খৃঃ দিল্লীতে মারা যান। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন। একবার বলবন পুত্র বুগরা খানের সৌজন্যে অনুষ্ঠিত কবিদের সভায় তাঁর স্বরচিত কাব্য শুনিয়ে একখানা মোহর পেয়েছিলেন।

পীর শ্রেষ্ঠ নিজামউদ্দীন (র.) আমীরকে অত্যধিক ভালবাসতেন। তাই মনীষী তাঁর শেষ জীবনের প্রার্থনা শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন— "আমীরকে দেখছি না কেন? আমার ডাক এসেছে, যেতে হবে। যদি আল্লাহ তায়ালা বলেন, পৃথিবী থেকে কী এনেছিস আমার জন্য?" তখন বলব, "পৃথিবী ঘুরে তোমার জন্য এনেছি এক সুমহান কবি, যার হৃদয় ফুলের মত সুন্দর, নাম তার আমীর খসরু।" নিজামুদ্দিন (র.)-এর মৃত্যু সংবাদ শুনে শিশুর মন কাঁদতে কাঁদতে কবি ছুটে এলেন বাংলাদেশ থেকে দিল্লীতে। তারপর দিবানিশি যোগীর কবরের পাশে শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ বিসর্জন করলেন "ভারতের তোতা পাখি' নামে খ্যাত দিল্লী তথা সারা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি ও ঐতিহাসিক আমীর খসরু।

>Goto List

দ্বাদশ অধ্যায়

তুঘলক বংশের আবির্ভাব

গিয়াসুদ্দিন তুঘলক– দোর্দণ্ড প্রতাপ আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরদের মধ্যে সিংহাসনকেন্দ্রিক কোন্দল, চক্রান্ত ও হত্যাকাণ্ডে দেশে অশান্তি দেখা দিলে আমীর ওমরাদের সবিশেষ আবেদন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দীপলপুরের শাসক গাজী মালিক 'গিয়াসুদ্দিন তুঘলক' নাম ধারণ করে ১৩২০ খৃস্টাব্দে সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে 'তুঘলক বংশ' নামে এক নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩২৩ খৃস্টাব্দে তেলেঙ্গানার কাকতীয়রাজ প্রতাপ রুদ্রের বিরুদ্ধে অভিযান তাঁর প্রধান কীর্তি। ১৩২৫ খৃস্টাব্দে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

তিনি সুশাসক এবং আল্লাহ ভক্ত ছিলেন। জিয়াউদ্দিন বারণী লিখেছেন, "পাঁচ ওয়াক্তের নামায তিনি জামাতের সঙ্গে আদায় করতেন। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এশার নামায না পড়তেন হেরেমে প্রবেশ করতেন না। তারিখি ফিরোজ শাহী, ৪৪৩ পৃঃ। জুমআ এবং দুই ঈদের নামায তাঁর কখনও ছুটে যেত না। রমযান মাসে রীতিমত তারাবীহ পড়তেন এবং রোযা রাখতেন। অধিকাংশ সময় ওজু অবস্থায় থাকতেন এবং সারারাত এবাদতে নিমগ্ন থাকতেন– তবকাতে আকবরী প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য। শরীয়ত অনুযায়ী শাসন করার ফলে কাজী, মুফতি প্রমুখের সম্মান যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল– তারিখি ফিরোজ শাহ, ৪৪১ পৃঃ। তিনি নিজেও মদ খেতেন না আর জনসাধারণকেও মদ খাওয়া থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করতেন।

মুহাম্মদ বিন তুঘলক– গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জুনা খাঁ 'মুহাম্মদ বিন তুঘলক' নাম দিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৩২৫ থেকে ১৩৫১ খৃঃ পর্যন্ত।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন ভারতের ইতিহাসে এক অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বাদশাহ। ধর্মের দিক দিয়ে তিনি যেমন স্বচ্ছ জ্ঞানের অনুসারী ছিলেন, তেমনি রাজনীতিতে বৈপ্লবিক চিন্তা-ধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর সম্পূর্ণ কোরআন মুখস্থ ছিল এবং পূর্ব উল্লিখিত 'হেদায়া'র মত ফেকাহ শাস্ত্রের কঠিন গ্রন্থও কণ্ঠস্থ ছিল (মাসালিকুল আবসার, পৃঃ ৩৭ দ্রঃ) তিনি উপদেশ দিতে গিয়ে কোরআনের শ্লোক উদ্ধৃত করতেন। বারণী লিখেছেন, যখন শব্দ তাঁর কানে যেত তিনি লাফিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং আজান শেষ হওয়া পর্যন্ত একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। ফজরের নামায পড়ার পর অধিক সময় পর্যন্ত অন্যান্য অজিফা

(এক বিশেষ প্রাত্যহিক উপাসনা) পড়তেন–(তারিখি ফিরোজ শাহী ৫০৬ পৃঃ দ্রঃ) ঐতিহাসিক ফিরিস্তা সুলতানের নফল এবং মুস্তাহাবে আগ্রহের বর্ণনা দিয়েছেন– তারিখি ফিরোজ শাহী এবং মাআশার রহিমী ১ম খণ্ড ৩৪৫ পৃঃ দ্রঃ)। তিনি শুধুমাত্র রমযান মাসে নয়, অসুস্থ অবস্থাতে এবং গ্রীষ্মের দারুণ ক্লান্তিতেও মহররম মাসের ১০ তারিখে রোযা রাখতেন। ছোটখাটো ব্যাপারেও ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতেন। শরিয়তসম্মতভাবে জবেহ করা হয়নি বলে মনে হলে সেই পশুর মাংস খেতেন না– (আজায়েবুল আসফার, ১৭৬ পৃঃ)। শেইখ আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলবীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, সিংহাসনে বসার পর তিনি কোন উপাধি ধারণ করেননি। মুহাম্মদ নামই তাঁর কাছে মানব সন্তানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাম হিসেবে বিবেচিত। তবে তিনি নিজেকে 'মুহীয়ে সুনান খতামান্নাবিইন, অর্থাৎ শেষ নবীর সুন্নাতকে (জীবন ব্যবস্থা) জীবিত কারক বলে অভিহিত করতেন। ঐতিহাসিক বারণী লিখেছেন, ব্যভিচার ইত্যাদি অবৈধ কাজের দিকে তিনি নজর দিতেন না, অপ্রয়োজনীয়, অশ্লীল এবং কুৎসিত দ্রব্য থেকে যতদূর সম্ভব নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। হেরেমে প্রবেশের সময় না মোহরেম (যাদের বিবাহ করা অবৈধ) মেয়েরা তাঁকে দেখে পর্দা করত এবং তিনিও তাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া অত্যন্ত দোষের জ্ঞান করতেন। (তারিখি ফিরোজ শাহী ৫০৬ পৃঃ দ্রঃ)

তিনি তাঁর মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর কোন আদেশেরই তিনি বিরোধিতা করতেন না। তিনি মদের ঘোর শত্রু ছিলেন। মদ্যপানের অপরাধে একজন আমীরের তিনি সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। শাহাবুদ্দিন আল আমরী শিবলী বলেন, সে সময় দিল্লীতে প্রকাশ্যে মদ পাওয়া যেত না। তিনি মসজিদে জামাতের সঙ্গে নামায পড়ার জন্য খুব জোর দিতেন। ইবনে বতুতা লিখেছেন, বাদশাহ মুসলমানদের নামাযের ব্যাপারে খুব জোর দিতেন। জামাতের সাথে নামায না পড়ার অপরাধে তিনি তাঁর একজন নিকট আত্মীয়কেও কঠোর শাস্তি দান করেন। ভারতে ইনিই প্রথম বাদশাহ, যিনি শাসন ব্যবস্থায় নামাযকে অঙ্গীভূত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নাচ-গান করা মেয়েরাও নামাযে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সুলতান মাহমুদ বিন তুঘলক তবলীগের সমর্থক ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিতও ছিলেন। সেই যুগে তিনি সতীদাহ প্রথা তুলে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দু ধর্মে বিরোধিতা বা হস্তক্ষেপ হবে বলে বিরত হন।

মুহম্মদ বিন তুঘলকের মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঐতিহাসিকদের হৃদয় বিকৃতি?

মুহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন সর্বগুণের সমন্বয়ে এক অদৃশ্যপূর্ব ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয়, খোদাভক্ত এবং নিরলস সংগ্রামী বাদশাহ। অতএব এহেন এক মধুর চরিত্র সম্রাটের ঘাড়ে 'পাগল', 'বিকৃত মস্তিষ্ক' আর 'রক্ত লোলুপ'-এর ষ্ট্যাম্প না লাগালে ঐতিহাসিক হওয়া যাবে না অথবা প্রভুভক্ত ভারতপ্রেমিক হওয়া সম্ভব

হবে না। তাই তাঁকেও দুর্নামের শিকার হতে হয়েছে। কারণ এ কথা প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ভারতীয় মুসলমান বংশধররা যেদিন থেকে তারা ইসলামের ছায়া অবলম্বনে গঠিত হবে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শে আদর্শবান হবে, উন্নত-আদর্শ রাজা-বাদশাদের চরিত্র মাধুর্যের রঙে রঙিন হবে সেদিনই ভারত প্রভু ইংরেজদের লোটা-কম্বল কাঁধে নিয়ে এ ভারত ভূমি ছেড়ে সুদূর পশ্চিমদেশে পাড়ি দিতে হবে। তাই ইংরেজ প্রভু ও তাঁদের পোষ্য পুত্রের দল প্রায় সমস্ত আদর্শ মুসলিম রাজা-বাদশাদের চরিত্রেই কলঙ্কের বিষাক্ত ইনজেকশন প্রয়োগ করেছেন, এমনকি অনেক স্থানে পবিত্র ইসলামের ওপরও নির্মম আঘাত হেনেছেন। প্রধানত চারটি কারণে মুহাম্মদ বিন তুঘলককে ইতিহাসে পাগল, নিষ্ঠুর এবং খামখেয়ালীর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। কারণগুলো এইরূপ (১) রাজ্য জয়ের পরিকল্পনা (২) রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তরকরণ (৩) দোরাব এলাকায় করভার স্থাপন ও (৪) তাম্র মুদ্রার প্রচলন। এবার কারণগুলোর যথার্থতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

১। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারণী লিখেছেন, খোরাসান অভিযানের উদ্দেশ্যে মুহম্মদ বিন তুঘলক ৩৭০.০০০ সৈন্য সংগ্রহ করে অবশেষে এই পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এতে তাঁর বাস্তব জ্ঞানের অভাব ও অদূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে, বারণী সাহেবের লেখা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। কারণ তিনি তাঁর রচনায় খোরাসান জয়ের পরিকল্পনা কেন ত্যাগ করা হয়েছিল তা বলেননি। তবে সে তথ্য আমাদের হাতে মৌজুদ। পারস্য ও মিসরের মধ্যে মনোমালিন্যের পরিপ্রেক্ষিতেই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে পারস্যের আবু সৈয়দ ও মিসরের আন-নাসিরের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। তখন বাধ্য হয়েই মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁর পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। অতএব এক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানের অভাব বা অদূরদর্শিতার পরিচয় তো পাওয়া যায়ই না; বরং তাঁর শান্তিকামী মনের পরিচয় ফুটে ওঠে এবং দেশে ক্ষতির পরিবর্তে যে বিরাট লাভ হয়েছিল তা হচ্ছে এই যে, যুদ্ধে অনভিজ্ঞ প্রজাবৃন্দের বিরাট একটা অংশ যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিল, যা আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মতে এক উল্লেখযোগ্য অবদান।

এছাড়া বারণী তাঁর রচনায় মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চীন অভিযানের মিথ্যা স্বকপোলকল্পিত ঘটনাকে স্থান দিয়ে ইতিহাসকে দূষিত করেছেন। বাস্তবপক্ষে মুহাম্মদ বিন তুঘলক চীন অভিযান তো করেনইনি, চীন অভিযানের কল্পনাও তাঁর মস্তিষ্কে স্থানলাভ করেনি কোনও দিন। অবশ্য চীন ও ভারতের সীমান্তবর্তী কারাচল বা কুর্মাচলে তিনি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু তার পশ্চাতেও যথেষ্ট বাস্তব যুক্তির ইন্ধন রয়েছে। উদ্ধত পার্বত্য সর্দারকে আয়ত্তাধীনে আনার জন্যই তাঁর এই অভিযান, শুধু তাই নয়, এই অভিযানের ফলস্বরূপ কারাচলের রাজা সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করতেও বাধ্য হন।

২। দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহম্মদ বিন তুঘলকের ন্যায় এক অভিজ্ঞ, দূরদর্শী ও অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে যেভাবে কলঙ্কের মসিলেপন করা হয়েছে তাতে ঐতিহাসিকরা নিরপেক্ষতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেননি। রাজধানী পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐতিহাসিক ইবনে বতুতা যেভাবে কল্পনার তুলি দিয়ে চমকপ্রদ উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন তাতে সত্যতার লেশমাত্র নেই। তিনি বলেছেন, দিল্লীর লোকদের শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি দাক্ষিণাত্যে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।” কিন্তু এই উক্তি ভিত্তিহীন এবং প্রকৃতপক্ষে সত্যের অপলাপ। ঐতিহাসিক বারণীও অনুরূপ ঔপন্যাসিক কৃতিত্বের পরিচয় দিতে ভোলেননি। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই যে–

পিতার শাসনকালে বরঙ্গল অভিযানে নিযুক্ত থাকার সময় মুহম্মদ বিন তুঘলক দাক্ষিণাত্যের বিপজ্জনক সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সিংহাসন লাভের পরেই এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনি দেবগিরিতে দৌলতাবাদ নামক একটি রাজধানী স্থাপন করতে প্রয়াসী হলেন। কেননা, দেবগিরি ছিল সাম্রাজ্যের অপেক্ষাকৃত মধ্যবর্তী এবং দাক্ষিণাত্যের শাসন প্রণালী পর্যবেক্ষণ করার অধিকতর নিকটবর্তী স্থান। সুদূর দিল্লীতে অবস্থান করে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিপতি সুলতানের পক্ষে সমগ্র দেশ পরিচালনা করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। তাছাড়া দিল্লী ভারত সীমান্তের নিকটবর্তী হওয়ায় মোঙ্গল আক্রমণের লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। এই সব কারণে সুলতানের নতুন রাজধানী স্থাপনের নিছক পাগলামি বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না; বরং এর পশ্চাতে তাঁর যোগ্য শাসন, ক্ষমতা ও দূরদর্শী মনের কৃতিত্ব লুকিয়ে রয়েছে।

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্তমান গতানুগতিক ইতিহাসে পাওয়া যায়–তিনি নাকি জোর করে দিল্লীবাসীদের ঘটিবাটি, শিশু সন্তানসহ ৭০০ মাইল পথ অতিক্রম করে দৌলতাবাদে যেতে বাধ্য করেছিলেন। ফলে অপারগ অনেক শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নানা কষ্টে পথে মৃত্যুবরণ করে। ইবনে বতুতার বর্ণনায়, “দিল্লী নগরী তখন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল।” তিনি আরও বলেন, “এক পঙ্গু ব্যক্তিকে পথে নিক্ষেপ করা হয় এবং একজন অন্ধকে দিল্লী হতে দৌলতাবাদে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।”

কিন্তু এ সব উক্তি প্রকৃত সত্যের বিপরীত। ১৩২৭ এবং ১৩২৮ খৃ: দুটি সংস্কৃত অনুশীলনলিপি হতে জানা যায়, সুলতান সাধারণ প্রজাবর্গ অথবা হিন্দুদের রাজধানী ত্যাগ করতে আদেশ দেননি। প্রকৃত ঘটনার বেশ কয়েক বছর পর ইবনে বতুতা ভারতবর্ষে এসে হাটুরে গল্পের ভিত্তিতে তিনি তাঁর মত প্রকাশ করে গেছেন। দিল্লী যে কখনও জন পরিত্যক্ত ছিল না অথবা কোনও দিন তার রাজধানীর মর্যাদা হারায়নি, এই অমোঘ ঐতিহাসিক সত্য সমীক্ষাই তাঁর উক্তির অসারতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণ করে। তাছাড়া ইবনে বতুতার উক্তি সঠিক হলে

১৩২৯ খৃ: মুলতানে যে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে এক বিরাট ও শক্তিশালী সৈন্য গঠন করা ঐ জনশূন্য দিল্লী থেকে সুলতানের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই যে, রাজধানী পরিবর্তনের যে কথা জোরেশোর প্রচার করা হয়ে থাকে সেটাই আসলে ঠিক নয়। তিনি রাজধানী পরিবর্তন করেননি তবে শাসন কার্যের সুবিধার জন্য দৌলতাবাদকে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন মাত্র। আর দিল্লীবাসীকে দেবগিরি প্রেরণের পশ্চাতে আসল তথ্য হচ্ছে এই যে, দাক্ষিণাত্যের মুসলমানরা সেই সময় ধর্মবিমুখ হয়ে অত্যাচারী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল, তাই তাদের ইসলামের আলো দেখানোর জন্য দিল্লী হতে শুধু একদল মুসলমানকেই দেবগিরি পাঠানো হয়েছিল। এছাড়া আরও অন্যান্য অঞ্চলে তিনি ইসলাম প্রচারক দল পাঠিয়েছিলেন। বিখ্যাত আলেম শামসুদ্দিন ইয়াহইয়াকে ডেকে বলেছিলেন, "আপনি এখানে বসে কী করছেন? কাশ্মীরে যান এবং খোদার সৃষ্টিকে স্রষ্টার দিকে ডাক দিন।" তাই মনে হয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে বতুতা সাহেব কিংবদন্তির ভিত্তিতেই এই উপাদনগুলোকে বিকৃত ইতিহাসে স্থান দিতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে বসেছেন।

তবে একথাও ঠিক যে, ঐতিহাসিকরা কোন নবী, পয়গম্বর বা অবতার নন। তাঁরাও রক্ত-মাংসের মানুষ। অতএব ভুল-ত্রুটি তাঁদেরও কিছু কিছু থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়। ঐতিহাসিক বারণী বা ইবনে বতুতার ক্ষেত্রেও এ সত্য প্রযোজ্য।

তাছাড়া ইবনে বতুতা ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এসে প্রায় আট বছর ধরে মুহম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক দিল্লীর প্রধান কাজীর বিচারক পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এমন এক অমার্জনীয় অপরাধ তাঁর দ্বারা হয়ে যায়, এর বিচার সুলতানকেই করতে হয় এবং তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। কারামুক্তির পর যদিও তিনি সুলতানের প্রীতি ফিরে পেয়েছিলেন তথাপি শাস্তির কথা ভুলতে পারেননি। তাই তাঁর পুস্তকে সুলতানের প্রতি কিছুটা ঘৃণা ও অবজ্ঞাকে তিনি শত চেষ্টা করেও বোধহয় চাপা দিতে পারেননি। দ্বিতীয়ত অপরাধপর পর্যটকদের ন্যায় তিনিও ঘটনার সাথে গল্পের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন এবং অলীক জনশ্রুতিকেই অধিক প্রাধান্য দান করেছেন। অবশ্য এর জন্য তাঁকে আমরা সম্পূর্ণরূপে দায়ী করতে পারি না। কারণ অধিকাংশ ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ দেখার সুযোগ পাননি। তাই প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁকে জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। তবে জনতার দলের চরিত্র নিরীক্ষণ না করায় অপরাধকে অস্বীকার করা যায় না।

তবুও আমরা দ্বিধামুক্তচিত্তে বলতে পারি যে, তাঁর রচনায় সে যুগের অনেক মূল্যবান সংবাদ বা তথ্য ইতিহাস সম্ভারকে পরিপূর্ণতা দান করেছে।

তদুপরি উপর্যুপরি অনাবৃষ্টির কারণে স্বাভাবিকভাবেই দোয়াববাসীর ভাগ্যে দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল। মুহম্মদ বিন তুঘলক এর জন্য দায়ী নন। আজও আমাদের বর্তমান বিশ্বে কোন নিরপরাধ মুহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্রে নিষ্ঠুরতার আর এক অপবাদের আলেখ্য অঙ্কন করা হয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, দোয়াবে সুলতান দশ হতে বিশগুণ কর বৃদ্ধি করে রায়ত শ্রেণীকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করাতে বাধ্য করেন এবং কৃষক শ্রেণীর ওপর নিষ্ঠুর স্টীম রোলার চালিয়ে গেছেন। বলা যেতে পারে, প্রবাদ বাক্যের মত এই মতকেই সাদরে গ্রহণ করে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা তাতে আরও কল্পনার রঙ ছড়িয়ে প্রকৃত ইতিহাসকে হজম করে ফেলেছেন। কিন্তু তাঁরা তো আর নীলকণ্ঠ নন তাই আবার তার উদগিরণ শুরু হয়ে গেছে বর্তমান লেখনী জগতে। কিন্তু জানিয়ে রাখা ভাল যে, জিয়াউদ্দিন বারনী কদাচ সুলতানের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না; তাছাড়া তাঁর ইতিহাসের ঘটনা বিন্যাসও ধারাবাহিকভাবে নয়। যখন যে শোনা ঘটনা তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে তখন সেটাকেই তিনি অগ্রে স্থান দিয়েছেন। ফলে তাঁর বর্ণনায় মুহম্মদ বিন তুগলকের সমস্ত কার্যকলাপই কার্যকর নীতিবিবর্জিত এক পাগলামি ক্রিয়াকাণ্ড বলে মনে হয়েছে।

খলজী বংশের পতনের পর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার কারণে দোয়াব অঞ্চল হতে কর আদায়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তাই মুহম্মদ বিন তুঘলক আলাউদ্দিন খলজী অপেক্ষাও কম হারে পূর্ব আরোপিত করের পুনঃপ্রবর্তন করেন মাত্র। আজও আমাদের স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রে দু-তিন বছরের অপরাগ অনাদায়ীকৃত করকে একসঙ্গে আদায় করা হয়। এটা যদি শিক্ষিত যুগের শিক্ষিত মানুষের কাছে দোষণীয় না হয় তবে মুহম্মদ বিন তুঘলকই বা দোষী কিসের জন্য?

কৃষিপ্রধান রাষ্ট্রে পরপর দু বছর বৃষ্টিপাত না হলে গণজীবন বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু মুহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে দোয়াব অঞ্চলে এক বছর, দু বছর, তিন বছর নয়– পর পর সাত বছর অনাবৃষ্টি হয় এবং এর ফলে সেখানকার জনসাধারণকে এক দারুণ দুর্ভিক্ষের প্রকোপে পড়তে হয়েছিল। মুহম্মদ বিন তুঘলকের মত এক উদারচেতা ও অসীম সাহসী বাদশাহের পক্ষেই এরকম ভীষণ সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছিল। কারণ তিনি এ বিপদে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন না করে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের সাহায্যের নিমিত্ত খাদ্য দান, ঋণ দান, কূপ খনন, চাষের বীজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে জনকল্যাণকামী মনোভাবের পরিচয় দান করেছিলেন। কথিত আছে, হাতেমতাই এবং অন্যেরা এক বছর যা দান করতেন তিনি একবারেই তা করতেন। তাই ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ দুঃখ করে বলেছেন, “প্রায় এক যুগ স্থায়ী মারাত্মক দুর্ভিক্ষ তাঁর রাজত্বের গৌরব অনেকখানি বিনষ্ট এবং প্রজাদিগকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তাঁকে নীরো এবং ক্যালিগালের মত নিষ্ঠুর এবং রক্তপিপাসু দানব বলে অভিহিত করলে তাঁর মহান প্রতিভার প্রতি অভিচার

করা হয় এবং দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধের জন্য তাঁর প্রকৃত চেষ্টা ও বিভিন্ন উন্নতিমূলক সংস্কারের পরিকল্পনা হেতু মহান কৃতিত্বের দাবিকে অবজ্ঞা করা হয়।"

(৪) মুহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর রাজত্বের প্রথম ভাগ স্বর্ণ-রৌপ্যের পরিবর্তে তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। মিঃ থমাসের মতে তিনি ছিলেন Prince of Moneyers" অর্থাৎ 'তঙ্কা নির্মাতার রাজা'। "তাঁর প্রবর্তিত মুদ্রা নতুনত্ব এবং গঠন-বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ। নমুনা এবং কার্যকারিতার দিক দিয়ে এই মুদ্রার শিল্পসম্মত পরিপূর্ণতা প্রশংসনীয়.....।"

সাধারণত এ কথাই বলা হয়ে থাকে যে, সুলতানের অপরিমিত উদারতা, দুর্ভিক্ষ, রাজধানী স্থানান্তরকরণ জনিত ব্যয় বাহুল্য, দিল্লীতে পুনর্বাসনের ব্যয় প্রভৃতির ফলে রাজকোষ শূন্যপ্রায় হয়ে পড়লে সুলতান এই সমস্যার সমাধানের জন্য তাম্র মুদ্রার অসাফল্যের ফলে সমস্ত তাম্র মুদ্রার বিনিময়ে জনসাধারণকে দেয়ার জন্য তখনও সুলতানের হাতে যথেষ্ট স্বর্ণ ছিল, যেহেতু স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে রাষ্ট্রের সমস্ত তাম্র মুদ্রা তিনি ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেটা আজ নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এক অকল্পনীয় বিজ্ঞানময় কীর্তি।

এছাড়া আরও বলা হয়, তাঁর যথার্থ সতর্কতা অবলম্বনের অভাবেই তাম্র মুদ্রা প্রচলনের অসাফল্যের কারণ। আমরা এ কথার সাথেও একমত নই। কেননা যদি এ কথাই সত্যি হয় তবে কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি সমস্ত তাম্র মুদ্রা ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হলেন কীভাবে? বলাবাহুল্য, তাঁর এই অভিনব পদ্ধতিতে জনসাধারণের ভুল বোঝাবুঝির কারণেই এই ব্যর্থতা। আজকের শিক্ষিত জনসাধারণ তাঁর যুগের তদানীন্তন উৎকট মুদ্রাস্ফীতিকে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে আয়ত্তে আনার ঐতিহাসিক ঘটনার প্রশংসা না করে পারেন না।

মোট কথা, মুহম্মদ বিন্ তুঘলকের সামগ্রিক জীবনী আলোচনা করে আমরা নিঃসংকোচে বলতে পারি তিনি একদিকে যেমন আদর্শ বাদশাহ, উন্নত চরিত্র সাধক, প্রতিভাশালী শাসক, যুগোত্তীর্ণ পণ্ডিত, অসাধারণ বক্তা ও অতুলনীয় দাতা ছিলেন তেমনি অপরদিকে তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষবিদ্যা, দর্শন, গণিত এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞানেও তাঁর বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য ছিল। বারণী বলেছেন, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় মুহম্মদ ছিলেন 'সৃষ্টির বিস্ময়'। বদায়ুনী তাঁকে ' বৈপরীত্যের সংমিশ্রণে বলেছেন। ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদ বলেছেন, "Muhammad Tughlak was unquestionaly the ablest man among the crowened leads of the Middle ages." অর্থাৎ মধ্য যুগের রাজা-বাদশাহদের মধ্যে মুহম্মদ তুঘলক প্রশ্নাতীতভাবে সর্বাধিক ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন।

তাঁর সময়ের হিন্দুদের লেখা হতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তৎকালীন হিন্দু প্রজারা সুলতানের ওপর খুব ভাল ধারণা পোষণ করতেন। চৌদ্দ শতকের শেষের

দিকে বিহারের বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের লেখা বিখ্যাত বই 'পুরুশা পরিশকা'তে মুহম্মদ বিন তুঘলকের অত্যন্ত প্রশংসা করা হয়েছে। (Vidyapati Thakur's Purusa Pariska' P-20-24, 4-44, Allaha-bad)

১৩২৭ ইং শ্রী ধারাণী ব্রাহ্মণের বই-এ তাঁর রাজত্বকে হীরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁকে সাকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। (Cataloque of the Delhi Museum of Archaclogy-J.P. Vagel, Calcutta 1908,P-29)

রতন নামে জনৈক হিন্দুকে মুহম্মদ বিন তুঘলক সিন্ধু প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। (আজায়েবল আসফারেজ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯)

এমনিভাবে মহা পণ্ডিত হাফেজে কুরআন মুহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর হিন্দু মুসলিম প্রজাবৃন্দের মধ্যে এক মিলন ঐক্য গড়ে তুলে মূল ইতিহাসে চির অমর ও অক্ষয় হয়ে আছেন কিন্তু সাধারণ ইতিহাসে তিনি আজ বিপরীত।

ফিরোজ শাহ তুঘলক ঃ মুহম্মদ বিন তুঘলকের আকস্মিক মৃত্যুতে সৈন্য বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাঁর ভাইপো ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫১ খৃস্টাব্দে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ১৩৮৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

তাঁর রাজত্বকালে মুফতি ও কাজীগণ বিচার করতেন। মুফতি আইন ব্যাখ্যা করতেন আর কাজীগণ রায় দিতেন। তিনি অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। যেমন অসংখ্য প্রাসাদ, মসজিদ, সরাইখানা, স্নানাগার, উদ্যান, খাল খনন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, দীনহীন জনসাধারণকে সাহায্য দান, রাজপথ, মতভেদে প্রায় ১০০০ বিদ্যালয় অসংখ্য অক্ষয় কীর্তি তাঁর দ্বারাই স্থাপিত হয়েছিল।

ঐতিহাসিক মোহাম্মদ এহিয়া খান বলেন, "There has been no king at Delhi so just and merciful, so kind religious or such a builder as Firuj shah."- (Tarikhi Mubarak Shahi.)

অর্থাৎ ফিরোজ শাহের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু ধর্মপ্রাণ ও নির্মাতা কোন সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেননি। ঐতিহাসিক হ্যাভেলও তাঁর প্রশংসা করে গেছেন।

বস্তুত মুহাম্মদ ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন এক আদর্শ চরিত্রের শাসক। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই ওমরাহদের ডেকে বললেন, "আপনারা যখন আমার কাঁধে এই বিরাট দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন তখন একটু অপেক্ষা করুন, ওজু করে নিই। ওজু সমাপ্ত করে দু রাকাত নামায পড়লেন। তারপর সিজদায় গিয়ে কেঁদে বললেন, "ওগো আল্লাহ! রাজ্যের ব্যবস্থা এবং রাজত্বের গতি নির্ধারণ মানুষের চিন্তাশক্তির বাইরে। রাজ্য ব্যবস্থা সুসম্পন্ন তোমারই নির্দেশে। হে

খোদা! তুমি আমার শান্তিদাতা এবং আশ্রয়স্থল।" এরপর তিনি হাতীর পিঠে চড়ে ফুফুর। (পিসি) কাছে গিয়ে দেখা করলে ফুফু তাঁকে বক্ষে ধারণ করে মুহম্মদ তুঘলকের স্মৃতি জড়িত টুপি স্বহস্তে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলেন। যার দাম এক লক্ষ তনকাহ (টাকা)।

কিন্তু তবুও ফিরোজ শাহ তুঘলক সাধারণ ইতিহাসে মহামান্য ঐতিহাসিকদের বিষাক্ত কলমের খোঁচা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেননি। জিজিয়া কর আদায়ের জন্য তাঁর ওপর বিদ্বেষমনা ও ধর্মান্ধতার দোষ আরোপ করা হয়। কিন্তু আগেই জিজিয়া কর প্রসঙ্গে আলোচনায় বলা হয়েছে, জিজিয়া কোন অত্যাচারী বা সাম্প্রদায়িক কর নয়। মাথা গুনতি যেকোন অমুসলমানের কাছে থেকেই জিজিয়া নেওয়া হতো না। তাই জিজিয়াকরের দোহাই দিয়ে সচ্চরিত্রের ফিরোজ শাহের মাথায় অপরাদের বোঝা চাপানোর পশ্চাতে কোন মনোভাবের পরিচয় লুকিয়ে রয়েছে সূক্ষ্মদর্শী পাঠক-পাঠিকারাই তা নির্ণয় করবেন।

বীর তৈমুর ঃ ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র পৌত্রদের মধ্যে কলহ শুরু হলে দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি বিঘ্নিত হয় এবং বিশৃঙ্খলার বহ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় ১৩৯৮ খৃস্টাব্দে তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন। তিনি ট্রান্স অক্সিয়ানার কেশ অঞ্চলের শেবজার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তুরঘাই ছিলেন তুর্কদের দলপতি আর মাতা নাগিনা ছিলেন চেংগিস খানের বংশীয়। তৈমুর আঠার বছর বয়স পর্যন্ত অশ্বারোহণ, যুদ্ধবিদ্যা, লেখাপড়া প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করে ৩৫ বছর বয়সে অদ্বিতীয় প্রতিপত্তিতে বীরপুরুষ বলে মানুষের হৃদয়ের ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি জ্ঞাপনের বস্তুতে পরিণত হলেন। এই সময় তাঁর মনে বিশ্ববিজয়ের অভিলাষ জাগে। বাস্তবিক তাঁর সামগ্রীক জীবনী আলোচনা করলে জানা যায়, রুশ সাম্রাজ্যের অধিকাংশ, চীনের প্রাচীর ও নীলনদ পর্যন্ত তার বিজয়কেতন উড্ডীন ছিল; তাছাড়া তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। পৃথিবীর সকল ঐতিহাসিকই একমত যে, বিজেতা হিসেবে তৈমুর অদ্বিতীয়। আলেকজাণ্ডার, সীরাজ, হানিবল, শার্লিমেন, চেঙ্গিস, নেপোলিয়ন কেউ তাঁর সমকক্ষ নন। এক কথায় তৈমুর নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সাংগঠনিক ক্ষমতা, রাজনৈতিক দক্ষতা, অপরিসীম সাহস ও অধ্যবসায়ের গুণে ভূমধ্য সাগর হতে গঙ্গা এবং ভল্‌গা ও ইপটিস্ নদী হতে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত নিজের সাম্রাজ্যের পরিধিকে বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তৈমুরের দিল্লী অভিযান ভারতের ইতিহাসে এক রক্তক্ষয়ী অধ্যায়।

অনেকে বলেন, তৈমুর হিন্দু বিদ্বেষী। কিন্তু তা ঠিক নয়। হিন্দু বিদ্বেষের বশে তিনি ভারত আক্রমণ করেননি: তিনি তাঁর উৎকট দিগ্বিজয়ের বাসনাকে চরিতার্থ করতেই শুধু ভারত নয় বিশ্বগ্রাসে মেতে উঠেছিলেন।

অবশেষে ১৪০৬ খৃস্টাব্দে চীন জয়ের পরিকল্পনাতে রাজধানী সমরখন্দ হতে কয়েকশত মাইল দূরে প্রবল শীতে বিশ্বগ্রাসোদ্যত মহাবীর তৈমুর ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

তুঘলক বংশের পতন ঃ ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দিন তুঘলক সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর আমোদ প্রমোদ ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁরই পিতৃব্য পুত্র আবু কবর তাঁকে হত্যা করে ১৩৮৮ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু নাসিরুদ্দিন মুহাম্মদ নামে নগরকোটের এক শাসনকর্তা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন। নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। অতঃপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাসিরুদ্দিন মাহমুদ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই ছিলেন তুঘলক বংশের শেষ সুলতান। তিনি ২০ বছর রাজত্ব করে ১৪১৩ খৃস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই তুঘলক বংশের পতন শুরু হয়।

এখানে অবশ্যই একথা লক্ষণীয় যে, বাদশাদের ইতিহাসে যেখানে যে বাদশাহ তাঁর নিজ ধর্মের (ইসলামের) আদর্শ হতে দূরে সরে পড়েছেন সেখানেই তাঁর পতন অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সুলতান মোয়েজুদ্দিন কায়কোবাদ, দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দিন প্রমুখ বাদশাহর জীবনে এ সত্যেরই বিকাশ অতি প্রকটরূপে দেখা যায়। তাহলে কি একথা ঠিক নয় যে, ধর্মবিমুখ বাদশাহরাই ইতিহাসে স্বেচ্ছাচারিতা আর দুর্নীতির আলেখ্য অঙ্কন করে গেছেন আর যারা ধর্মপ্রাণ তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সৎ, চরিত্রবান, প্রজাপালক এবং উন্নত আদর্শ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রাদেশিক মুসলিম রাজ বংশ

বঙ্গদেশ ঃ সুলতানাতের পতনের ফলে কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন অংশে কতকগুলো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। বঙ্গদেশই সর্বপ্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

১২০১ খৃস্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী নদীয়া অধিকার করে বঙ্গদেশের প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু বলবনের সময়ে তুঘ্রিল খাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষিত হলে সুলতান নিজপুত্র বুগরা খাঁনকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অবশেষে ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ পূর্ব বঙ্গে এবং আলাউদ্দিন আলী শাহ পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে অবিভক্ত বাংলাদেশ দুই স্বাধীন সুলতানের শাসনাধীনে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। পরে অবশ্য শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৫৩) দুই দেশের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে অখণ্ড বাংলার স্বাধীন সুলতানরূপে নিজেকে ঘোষণা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তস্যপুত্র সেকেন্দার শাহ সুলতান হয়েছিলেন। তিনি আদিনাতে (পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী) এক সুবৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী সময়ে রাজা গণেশ নামে এক ব্রাহ্মণ জমিদার ১৪০৯ খৃস্টাব্দে সিংহাসন দখল করেন। অনেক পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকের মতে তিনি দুই ক্রীড়নক, সুলতানের নামে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

এই গণেশকে কেন্দ্র করেই ইতিহাসে এক উপভোগ্য অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। মুসলমানদের গৌড়বঙ্গ বিজয়ের দু'শ বছরেরও অধিক পরের ঘটনা। তখন গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের প্রধান মন্ত্রীত্বের পদে নিয়োজিত ছিলেন। সুলতান সাইফুদ্দিন হামজার দুর্বলতার অজুহাতে গণেশ তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে স্বয়ং একদিন সিংহাসন দখল করে বসেন। বলাবাহুল্য, এই গণেশই সুলতানকে রাজ্য শাসনের মোহে নানা অপকীর্তিতে ডুবে থাকতে প্ররোচিত করতেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে উৎকোচ দান করে অর্থলোভী মুসলমান জমিদার ও আমীর ওমরাহদের মুখ বন্ধ করেন এবং পরে মুসলমান প্রজাবৃন্দের ওপর অকল্পনীয় অত্যাচার শুরু করেন। তখন অনন্যোপায় প্রজাবৃন্দ শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা বদরুল ইসলাম সাহেবের কাছে এর প্রতিকার দাবি করেন। মাওলানা সাহেব মুখপাত্র হিসেবে গণেশের দরবারে উপস্থিত হলেন ও অত্যাচারে বিরত থাকতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু উদ্ধত রাজা তাঁর কোন কথায় কর্ণপাত না করে তাঁকে কুর্নিশ করতে বললেন। মাওলানা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে,

রাজাকে কুর্নিশ নয়. বরং রাজাই কোন শাইখুল ইসলাম রাজদরবারে এলে সিংহাসন থেকে নেমে মুকুট হাতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবে– এটাই হলো 'রাজানুমোদিত নীতি'।

কোনক্রমেই যখন পেরে ওঠা গেল না তখন রাজা গণেশ এক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। একটা নিম্নদ্বারবিশিষ্ট জনশূন্য কক্ষে আলোচনার জন্য মাওলানা সাহেবকে আমন্ত্রণ জানানো হল। মাওলানা সাহেব এসে দেখলেন গণেশ ভেতরে বসে। আর এই নীচু দ্বার দিয়ে মাথা হেঁট করে প্রবেশের অর্থই হলো তাকে প্রণাম করা। অতএব গণেশের এই সুপরিকল্পিত চাতুর্য উপলব্ধি করে মাওলানা পেছন হেঁটে ঘরে প্রবেশ করেন। অপমান আর ক্রোধের বশে রাজা গণেশ সেই দিনই হযরত মাওলানা বদরুল আলম সাহেব ও আরও কয়েকজন বিজ্ঞ আলেমকে নদীগর্ভে ডুবিয়ে হত্যা করান।

অতঃপর নিরুপায় মুসলমান সমাজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেই সময়ে ওলীকুল শ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ নূর কুতুবুল আলম সাহেবের দারস্থ হন। মনীষী কুতুবুল আলম তখন ইব্রাহিম শারকীকে বাংলাদেশ আক্রমণ করতে নির্দেশ দেন। হযরতের আদেশ পেয়ে বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে শারকীয় ফিরোজপুরে শিবির স্থাপন করেন। এই সংবাদে ভীত হয়ে রাজা গণেশ মনীষীর আশ্রয় প্রার্থনা করেন। মনীষী তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেন। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে তিনি নিজে মুসলমান না হয়ে পুত্র যদুকে তাঁর হস্তে সমর্পণ করে সস্ত্রীক কাশীযাত্রা করেন। এই যদুই পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দিন মহাম্মদ শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন।

ডাঃ কিরণচন্দ্র চৌধুরী এমএএলএলবি,ডি,ফিল লিখেছেন, যদু ইসলাম গ্রহণ করে জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহ নাম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর যদু অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে ওঠেন। বিশেষভাবে হিন্দুদের ওপর অবিচার ও অত্যাচার তিনি অপ্রতিহতভাবেই চালিয়ে ছিলেন।" ডাঃ চৌধুরীর এই উদ্ধৃতিতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ধর্ম মানেই অত্যাচারী এবং অমুসলিম বিদ্বেষী ধর্ম। কিন্তু মাছি মারা কেরানী সাম্প্রায়িক মনোভাবাপন্ন না হয়ে যাঁরা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞ তাঁরা প্রত্যেকেই (মুসলিম অমুসলিম যাই হোন) এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, ইসলামের কোথাও অমুসলমানদের ওপর অত্যাচার করার নির্দেশ নেই। যুগে যুগে দেশে অসংখ্য অমুসলমান মনীষী ইসলামের মধুর ও অনুপম আদর্শে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, যদুর ধমনীতে কোন মুসলমানী রক্ত প্রবাহিত নয়; বরং তিনি কেবল মাত্র হিন্দু ছিলেন না পাকা ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে ছিলেন। অতএব তিনি যদি অপ্রতিহতভাবে অত্যাচারই করে থাকেন যদি হিন্দু বংশ ধ্বংস করার জন্য রক্ত মেতেই উঠে থাকে তবে তার জন্য দায়ী তাঁর বর্ণশ্রেষ্ঠ রক্ত, দায়ী তাঁর পূর্ব সমাজ, তাঁর পূর্ব সভ্যতা, তাঁর পূর্ব ধর্ম, দায়ী তিনি নিজে; ইসলাম নয়।

>Goto List

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর সম্বন্ধে বলেন, "গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করে তিনিও হিন্দু কবি ও পণ্ডিত দিকের পৃষ্ঠপোষকতায় পরাঙ্মুখ হননি। যদুর অনুগৃহীত পণ্ডিত দিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন বৃহস্পতি মহিন্তা। (বাংলা সাহিত্যের কথা– ডক্তর শ্রী সুকুমার সেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ ১৯৩৯)

যাইহোক, যদু ওরফে জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহের পর তাঁর পুত্র শামসুদ্দিন আহমদ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু গুপ্ত ঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যু হলে রাজা গণেশের বংশের পতন ঘটে এবং পুনরায় ইলিয়াস শাহী বংশের অভ্যুদয় হয়। ইলিয়াসের পৌত্র নাসীরুদ্দিন অতঃপর তাঁর পুত্র রুকনুদ্দীন বরাবক শাহ এবং তারপর হাবসী রাজারা ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। শেষে আলাউদ্দিন হুসেন সিংহাসনে বসলেন। উড়িষ্যার সীমান্ত হতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত তাঁর সামাজ্য পরিধি বিস্তৃত ছিল। ডাঃ এবিএম হাবিবুল্লাহ বলেন, "একমাত্র আসাম ব্যতীত সকল অভিযানই সার্থকমণ্ডিত হয়েছিল।"

তাঁর সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের মতবাদ প্রচার করেন, বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয়। জ্যেষ্ঠপুত্র নসরত খাঁ তার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সাহিত্য ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। গৌড়ে দুটি মসজিদ নির্মাণ করাান, একটির নাম 'বড়সোনা' ও অপরটি 'কদম রসূল'। একজন প্রাসাদ রক্ষী দ্বারা ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি নিহত হলে গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ বাংলাদেশে হুসাইন শাহী বংশের শেষ স্বাধীন সুলতানরূপে সিংহাসন লাভ করেন। অতঃপর শের ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে গৌর অধিকার করলে তিনি বঙ্গদেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। শেরশাহের মৃত্যুর পর সোলাইমান কররানী বঙ্গদেশ অধিকার করে আফগান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আফগান বংশের পতন হলে বাংলাদেশ মুঘল অধিকারভুক্ত হয়।

জৌনপুর ঃ তুঘলক বংশের শেষ সুলতানের রাজত্বকালে সরওয়ার ওরফে খাজা জাহানের নেতৃত্বে জৌনপুরও স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে সরওয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর পোষ্যপুত্র সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তিনিও ১৪০০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। অবশেষে সুলতানের ছোট ভাই শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এব্রাহীম শাহ সিংহাসনে সমাসীন হন। তাঁর শাসনকালে জৌনপুর মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। 'আতানা মসজিদ' তাঁর স্থাপত্য শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শনস্বরূপ আজও বিদ্যামন। ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে এব্রাহীম শাহের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র মহম্মদ শাহ সিংহাসনে বসেন। বিখ্যাত 'লাল দরজা' তাঁরই নির্মিত। অবশেষে বাহলোল লোদী কর্তৃক জৈনপুরের শেষ স্বাধীন নবাব হুসাইন শাহ বিতাড়িত হলে এর স্বাধীনতার অবসান ঘটে।

মালব ঃ আলাউদ্দিন খলজী অধিকৃত মালবও সর্বশেষে দিলওয়ারের নেতৃত্বাধীনে স্বাধীন হয়ে পড়ে। দিলওয়ারের পর পুত্র হুসাং খা সিংহাসন অধিকার করে রাজধানী মণ্ডুতে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু মন্ত্রী মাহমুদ খাঁ তাঁকে হত্যা করে ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে বলপূর্বক সিংহাসন দখল করেন। তাঁর সময়ে হিন্দু

>Goto List

পাশাপাশি বাস করত। মালবের মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তারপর শান্তিপ্রদ নীতির মধ্য দিয়ে গিয়াসুদ্দিন সিংহাসনে বসলেন। দ্বিতীয় মাহমুদ ছিলেন এই বংশের শেষ সুলতান। তাঁর সময়েই গুজরাটের বাহাদুর শাহ মণ্ডু অধিকার করে মালব রাজ্যের স্বাধীনতা খর্ব করেন। অবশ্য পরবর্তীকালে যথাক্রমে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন কর্তৃক ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ কর্তৃক ১৫৪২ খৃস্টাব্দে এবং আকবর কর্তৃক ১৫৬১ খৃস্টাব্দে মালব অধিকৃত হয়।

গুজরাটঃ গুজরাটও শেষে স্বাধীনতা লাভ করে। সুলতান আলাউদ্দিন খলজী দ্বারা ইহা প্রথম বিজীত হয় ১২৯৭ খৃস্টাব্দে। তখন থেকেই এটা মুসলমান শাসনাধীনে শাসিত হয়ে আসছিল। ১৪০১ খৃস্টাব্দে জাফর খান মুজাফফর শাহ উপাধি বরণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর পর তার পৌত্র আহমদ শাহ সিংহাসনে বসেন। অনেকের মতে ইনিই গুজরাটের প্রতিষ্ঠাতা। এঁর পৌত্র মাহমুদ বিগরহ্ পরবর্তী শ্রেষ্ঠ সুলতানরূপে অভিষিক্ত হন। ১৫১১ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র দ্বিতীয় মুজাফ্ফর সিংহাসনে বসে মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। অতঃপর পৌত্র বাহাদুর শাহ গুজরাটের সুলতান হন। এই প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট পর্তুগীজদের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৫৩৭ খৃস্টাব্দে মৃত্যু সংবরণ করলে গুজরাট বিশৃঙ্খলার এক কেন্দ্রস্থানে পরিণত হয়।

কাশ্মীর ঃ মুসলিমপ্রধান কাশ্মীর ১৩৪৯ খৃস্টাব্দ অবধি হিন্দু শাসকদের দ্বারা পরিচালিত হলেও শাহ মির্জা, শামসুদ্দিন নাম নিয়ে ১৩৪৯ খৃস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন করেন। কাশ্মীরে শাসককুলের মধ্যে জয়নুল আবেদীন ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তিনি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন এবং প্রজাদের করভার লাঘব করেন। তাঁর সময় 'মহাভারত' ও 'রাজতরঙ্গিনী' পারস্য ভাষায় অনূদিত হয় এবং অনেকগুলো আরবী ও পারস্য ভাষার গ্রন্থ হিন্দীতে ভাষান্তরিত করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীগণের অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে হুমায়ুনের এক আত্মীয় হায়দার মির্জা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৫৪০) কাশ্মীর অধিকার করেন। ১৫৮৬ খৃস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আকবর এটা অধিকার করেন।

বাহমনী রাজ্য ঃ সুলতানী শাসনের দুর্বলতার সুযোগে যে সমস্ত প্রাদেশিক রাজ্যসমূহ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল বাহমনী রাজ্য তার মধ্যে অন্যতম। হাসান আবুল মুজাফ্ফর আলাউদ্দিন বাহমন শাহ উপাধি ধারণ করে বাহমনী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে মনে করেন হাসান গঙ্গ বাহমনী নামে এক ব্রাহ্মণ্য জ্যোতিষীর ভৃত্য ছিলেন এবং ঐ পৃষ্ঠপোষকের নামানুসারেই তাঁর বংশের নামকরণ হয়েছে। কিন্তু এই মতের পেছনে কোন ঐতিহাসিক সমর্থন নেই। কারণ পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ এই প্রচলিত গল্পকে স্বীকার করেন না এবং কোন কোন ঐতিহাসিক উপাদান হতেও এর যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যাইহোক, আলাউদ্দিন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম মহম্মদ শাহ সিংহাসন লাভ করে সুন্দর সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। পরবর্তী বাদশাহ দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহও শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। ফিরোজ শাহও (অষ্টম শাসক) ছিলেন একজন সুশাসক। তারপর তাঁর ভাই সিংহাসনে বসেই বিজয়নগর আক্রমণ করে সেখানকার রাজাকে অনাদায়ী কর দিতে বাধ্য করান। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আলাউদ্দিন সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন 'কঠোর শাসক, শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ও বিদ্যোৎসাহী'। ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহাম্মদ গাওয়ান নামক জনৈক সহৃদ ব্যক্তিটি তাঁর শিশুপুত্র নিজাম শাহের রাজকার্য পরিচালনা করতেন। শেষে ঐ শিশু সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা তৃতীয় মুহাম্মদের রাজত্বকালে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে ভূষিত হন। কিন্তু "শত্রু দাক্ষিণাত্য দলের" ষড়যন্ত্রে তিনি সুলতান কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। Meadows Taylor বলেন, "with him depertid all the cohesion and Power of the Bahmani Kingdom. অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে বাহমনী রাজ্যের সংহতি ও ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে গেল। তিনি ছিলেন তদানীন্তন সময়ের একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, একজন সমর কুশলী সেনাপতি, একজন সুদক্ষ শাসক ও বিজেতা। তিনি সাম্রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগের কিছু কিছু সংস্কার সাধন করে উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করেন। বিদরে এক বিরাট কলেজ নির্মাণ তার অক্ষয়কীর্তি। মুহাম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর শিশু সুলতান মামুদের রাজত্বকালে প্রাদেশিক রাজাদের স্বাধীনতা ঘোষণা, দাক্ষিণাত্য ও বিদেশীদের মধ্যে দলাদলি, সুযোগ্য মন্ত্রী মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যু ইত্যাদি কারণে বাহমনী রাজ্য ধ্বংসের মুখে পতিত হয় ও পতন ঘটে। অতঃপর বাহমনী রাজ্য বেরার, বিরাজপুর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিদর এই পাঁচ ভাগে খণ্ড হয়ে পাঁচটি স্বাধীন সুলতানের অধীনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথাক্রমে ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে ফতেউল্লাহ ইমাদ শাহ কর্তৃক ইমাদ শাহী বংশের, ১৪৮৯ খৃঃ ইউসুফ আদিল কর্তৃক আদিল শাহী বংশের, ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে আহম্মদ নিজাম শাহ কর্তৃক নিজাম শাহী বংশের, ১৫১২ খৃঃ কুলি কুতুব শাহ কর্তৃক কুতুবশাহী বংশের এবং ১৫২৬ খৃঃ আমীর ফরিদ শাহ কর্তৃক ফরিদ শাহী বংশের অভ্যুদয় হয়।

এমনিভাবে তফ্‌দি নদীর তীরে অবস্থিত খন্দেশ রাজ্য ও মালিক রাজার নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জন করে। অবশ্য ১৬০১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর আসিরগড় দুর্গ অধিকার করে পরে খান্দেশ নিজের সাম্রাজ্য সীমার অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

চতুদর্শ অধ্যায়

ভারতের ইতিহাসে পীরদের অবদান

পলাশীর যুদ্ধে পূর্ব পরিকল্পিত পরাজয়ই হচ্ছে মুসলিম সাম্রাজ্যের জীবন্ত সমাধি সাধন। ভারতে অন্তত মুসলিম জনসাধারণ মাটি ফুঁড়ে মাথা উঁচু করে উঠতে চেষ্টা করেছে বারবার কিন্তু সহযোগিতার অভাবে তা ফলপ্রসূ হয়নি। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ফকির বিদ্রোহ হয়েছিল। কিন্তু কারা সেই ফকির? কারা সেই দরবেশ? কারা সেই তাপস সম্প্রদায়? আজ ইতিহাসে ‘ফকির বিদ্রোহ’, ‘মোপলা বিদ্রোহ’ প্রভৃতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিরাট অভ্যুত্থান যদিও ঐতিহাসিক সত্য তবুও তা চাপা পড়ে গেছে কিসের কারণে? কারা এই বিদ্রোহী? বলাবাহুল্য মুসলমান মুবাল্লিগ, মওলভী, মোজাহেদ আর মোল্লার দলই হচ্ছে ঐ সকল বিদ্রোহের নায়ক এবং ধারক।

ইতিহাসে দেখা যায় আল্লাহ ভক্ত ও ফকির তাপসের দল যখনই কোন অন্যায় অত্যাচার অবিচার এবং অধর্মের আঘাতে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হতে দেখেছেন তখনই তাঁরা বিদ্রোহী হয়েছেন, প্রয়োজনে কারাবরণ করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন অকাতরচিত্তে। তাই দেখা যায় কখনো বা তাঁরা লড়েছেন আকবর ও জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে আবার কখনোবা শিখদের বিরুদ্ধে, কখনোবা ইংরেজ ও তার দালালদের বিরুদ্ধে। সুতরাং এরূপ দৃঢ়চেতা সংগ্রামী মনীষীদের ইতিহাস কিঞ্চিৎ না লিখলে যেন সত্যের অপলাপ হয়, ইতিহাস যেন অসমাপ্ত থেকে যায়। তাই মণি মাণিক্যের সমুদ্র হতে গোটা কয়েক নুড়ি পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরা হলো।

হযরত ইমদাদুল্লাহ আলফারুখী থানভী মোহাজেরে মক্কী (রহঃ)

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম সাধকদের ইতিহাসে যাঁরা অবর্ণনীয় খ্যাতি লাভ করে চির অমর হয়ে রয়েছেন আলহাজ হযরত ইমদাদুল্লাহ ফারুখী (রহ.) তাঁদের অন্যতম। তাঁর সামগ্রিক জীবনালেখ্য ইতিহাসের পাতায় এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। ভারতের বিপ্লবী নেতা হিসেবেও তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে আছে। সে ইতিহাস পরে আসছে।

তিনি ১২৩৩ হিজরীতে শাহারানপুর জেলার নানুতাহ গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাফেজ মোহাম্মদ আমিন ছিলেন মুজাফ্‌ফারপুর জেলার থানাভবন গ্রামের অধিবাসীর বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও আলেম. মাওলানা শেইখ মোহাম্মদ থানবীর পৌত্র। তাঁর মা ছিলেন সচ্চরিত্রা মহিলা। তাঁর পূর্ব

>Goto List

পুরুষগণ দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকের (রা.) বংশ সম্ভূত। তাই তাঁকে ফারুখী বলা হয়। তিনি ষোল বছর বয়সে মাওলানা মামলুক আলী নানতুবী সাহেবের সৎ পরামর্শে ও সহযোগিতায় দিল্লীতে গিয়ে নানা অভিজ্ঞ আলেম ও বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের (হাদীসশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিত) কাছে বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানার্জন করে ২৯ বছর বয়সে তিনি খ্যাতনামা পীর মাওলানা নাসীরুদ্দিন দেহলভীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

তাঁর জীবনে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা আছে। একদিন রাত্রে তিনি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখছেন, এক মজলিসে হযরত মোহাম্মদ (সা.) কতকগুলো শিষ্যসহ বসে আছেন। সেই মজলিসে দরবারে নববীর মধ্যে তিনি প্রবেশ করতে উদ্যোগী হলেন কিন্তু ভয়ে পারলেন না। তাঁর এই অবস্থা দেখে হাফেজ বোনাকী নামে তাঁর এক আত্মীয় তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে হুজুরের (সা.) কাছে হাজির হলেন। হযরত রসূলে করীম (সা.) তাঁকে দেখে তথায় বসতে আদেশ করলেন এবং স্নেহের সুরে বললেন, "বৎস! এক্ষণি তুমি মিয়াজিউ চিশতীর আস্তানায় গিয়ে তাঁর সাথে দেখা কর।"

সহসা ইমদাদুল্লাহর নিদ্রা ভেঙে গেল এবং স্বপ্নে শোনা রাসূলুল্লাহ (সা.) এই নির্দেশটি চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে ওস্তাদ মাওলানা কলন্দর জালালাবাদীকে তাঁর স্বপ্নের সমস্ত কথা বললেন, ওস্তাদ সাহেব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে মিয়াজিউ চিশতীর ঠিকানাটা বলে দিলেন যে তুমি লোহারুর অন্তর্গত ঝনঝনা নামক স্থানে গেলেই তাঁর সাক্ষাৎ পাবে।

তথায় গিয়ে ইমদাদুল্লাহ চিশতী সাহেবের সৌম্য মূর্তি দর্শন করেই ভক্তিপ্লুত অন্তরে সাধক প্রবরের পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন। সাধক তাঁকে বুকে নিয়ে হাস্যবদনে বললেন, "বাবা, স্বপ্নাদেশ কি সত্যি হয়েছে?" এই কথা শুনে ইমদাদুল্লাহ ফারুকী সাহেব বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

যাইহোক, চিশতী সাহেব তাঁকে চিশতীয়া তরিকায় (পদ্ধতিতে) শিক্ষা দান করে খেলাফতি দানকালে বললেন, "বাবা, তুমি কি কিনিয়া অর্থাৎ স্বর্ণ প্রস্তুত বিদ্যা শিখবে। এতে তোমার যথেষ্ট উপার্জন হবে। আমি তোমাকে স্বর্ণ প্রস্তুত শিখিয়ে দেব।" ইমদাদুল ফারুখী লজ্জিত হয়ে বললেন, "হযরত! পার্থিব সম্পদ আমি চাই না। আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমার একমাত্র কাম্য। সেই জন্যেই আমি আপনার সান্নিধ্যে এসেছি। আপনি দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমার মনোবাসনা পূর্ণ করেন।" একথা শুনে হযরত মিয়াজিউ খুবই আনন্দিত হলেন এবং হযরত ইমদাদুল্লাহ ফারুখীর জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করলেন।

তিনি জীবনে কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেননি। মাওলানা গাঙ্গুহী (রহ.)-এর কাছে একবার বলেছিলেন যে, মক্কা যাত্রার সময় তোমার সাথে দেখা করে যাব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হযরত ফারুখী সাহেবের মক্কা যাত্রার পূর্বেই হযরত মাওলানা

গাঙ্গুহী (রহ.) বৃটিশ কারাগারে বন্দি হন। জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, এক রজনীতে ফারুখী সাহেব জেল গৃহের সন্নিকটে এসে উপস্থিত হন। জেল প্রহীরা তখন জাগরিত ছিল। ফারুখী সাহেব যখন জেলে প্রবেশ করেন তখন তাঁকে কেউ-ই দেখতে পায়নি। তিনি আমার নিকট এসে অনেকক্ষণ কথার্বাতা বলে চলে যান। প্রতিশ্রুতি পালনের কি অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখুন, জেলখানায় বন্দি অবস্থাতেও তাঁর সাথে দেখা করে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে গেছেন।

মাওলানা গাঙ্গুহী (রহ.)-এর কাছ হতে বিদায় নিয়ে এসে হযরত ফারুখী সাহেব সেই রজনীতেই মক্কা যাত্রা করেন। বহু কষ্টে কোন রকমে পথ অতিক্রম করে অতি সংগোপনে আম্বালা নগরে এসে পৌছান। এখানে রাও আবদুল্লাহ খান নামক এক ব্যক্তি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। ফারুখী সাহেব দীর্ঘ পথ ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে রাও সাহেবের বাড়িতেই সে রাতের মত আশ্রয় গ্রহণ করেন। যদিও রাও সাহেব জানতে দেশের স্বার্থে ফারুখী আজ রাজদ্রোহী তবু তিনি নিঃসংকোচে আশ্রয় দিলেন। বাইরের কোন লোক যেন জানতে না পারে তার জন্য অন্ধকার আস্তাবলের একটা কামরায় তিনি অবস্থান করতে লাগলেন।

একদিন চাশত নামাযের সময় তিনি সকলকে বললেন, আমি এখন নামাযে প্রবৃত্ত হব। অতএব আপানারা একটু বাইরে যান। অতঃপর ফারুখী সাহেব সেই কক্ষে ওজু সমাপনের পর জায়নামাজ বিছিয়ে নামাযে দণ্ডায়মান হলেন।

এদিকে আর এক বিপদ দেখা দিল। দুইজন ইংরেজ কর্মচারী হন্তদণ্ড হয়ে ছুটে এসে আস্তাবলের সামনে দাঁড়াল। রাও সাহেব অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁদের উপবেশনের আসন প্রদান করলেন। ইংরেজ কর্মচারীদ্বয়ের একজন বলল, শুনলাম আপনার অশ্বশালায় কিছু উৎকৃষ্ট অর্শ্ব বর্তমান আছে। তাই সেগুলোকে দেখার জন্যই আমরা আপনার এখানে এসেছি। এই বলে পরক্ষণেই তাঁরা অশ্বশালায় ঢুকে চারদিকে ইতস্তত, দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও কোথাও কোন লোককে দেখতে পেল না। অল্পক্ষণ পরেই তারা সে কক্ষ হতে বের হয়ে ফারুখী সাহেব যে কক্ষে নামায পড়ছিলেন সেই কক্ষের দ্বারে এসে উপস্থিত হলো। তারপর দ্বার ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। বিপদ অবশ্যম্ভাবী দেখে রাও সাহেব শিউরে উঠলেন। কিন্তু কর্মচারীদ্বয় এ কক্ষেও কিছু দেখতে না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। রাও সাহেব যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় ওই কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ ফারুখী সাহেব নামায অবস্থায় ধ্যানরত। নামায শেষে রাও সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে হাজী সাহেব বললেন, ইংরেজ কর্মচারীদ্বয়ের ঢোকার সময়েও আমি নামায পড়ছিলাম এবং কোরআন শরীফের এই আয়াতটি পড়ছিলাম "আ মানার রসুলু.....”। তাই আল্লাহ তায়ালা আমাকে শত্রুর কোপ দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া (রহ.)

হযরত নিজামুদ্দিন (রহ.) ১২৩৮ খৃস্টাব্দে বদায়ুননগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসেনের পবিত্র বংশ সম্ভূত। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তেজস্বী ও প্রতিভাশালী বালক নিজামুদ্দিন শৈশবে বদায়ুন নগরের একটি মক্তবে মনোযোগের সাথে বিদ্যাভ্যাস করেন। তদানীন্তন সময়ে দিল্লী নগরে "শামসুল মূলক" অর্থাৎ ভারতের সূর্য উপাধিপ্রাপ্ত মহাপণ্ডিত জনাব মাওলানা খাজা সামসুদ্দিন খারেজমী নামে জনৈক আলেমের নিকট তিনি তাফসির, হাদীস, ফেকাহ্, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। তাঁর স্মৃতি শক্তি এত প্রখর ছিল যে, 'মাশারেকুল আনোয়ার' নামক একখানি বৃহদাকার গ্রন্থ আদ্যোপান্ত তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

খাজা সাহেবের প্রভাব সারা ভারতের ওপর বিস্তৃত ছিল। সম্রাট আলাউদ্দিনের তৃতীয় পুত্র কুতুবউদ্দিন মোবারক তাঁর শাসনকালে মহামান্য খাজা সাহেবের ওপর অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতার সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করলেন। তারপর সম্রাট সহসা একদিন পেটের বেদনায় আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। অনেক চেষ্টা চরিতেও কোন কাজ হলো না দেখে দরবারস্থ ওমরাহবৃন্দ বললেন– খাজা সাহেবকে সন্তুষ্ট না করলে এ .পীড়ার উপশম হবে না। যাইহোক, আমন্ত্রিক খাজা সাহেব সম্রাট জননীর আকুল অনুরোধে বিগলিত হয়ে করুণাময় আল্লাহর সমীপে দু রাকাত নামায পড়ে প্রার্থনা করলেন। তৎক্ষণাৎ সম্রাটের বেদনার উপশম হলো।

আবার একদিন সম্রাট স্বীয় সভাসদ কাজী গজনভীকে জিজ্ঞাসা করলেন, খাজা সাহেব লোকদেরকে প্রচুর পরিমাণে দান করেন তা তিনি পান কোথায়? উত্তরে তিনি বললেন, আপনার আমীর ওমরাহদের অনেকেই তাঁর শিষ্য, তাদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থই তিনি দান করেন। সম্রাট আদেশজারী করে খাজা সাহেবের নিকট উপহার প্রেরণ বন্ধ করে দিলেন। তখন পান্থশালার অধ্যক্ষ রাজা ইকবাল আয়ের কোন উপায় নাই দেখে খাজা নিজামুদ্দিন (রহ.) -র নিকট নিবেদন করলেন এত বড় পান্থশালা চলবে কী করে? খাজা সাহেব বললেন, করুণাময় আল্লাহর পবিত্র নাম স্মরণ করে তোমার সম্মুখস্থ তাকের ভেতর হাত দিলেই যত টাকা প্রয়োজন পাবে। কি আশ্চর্য ব্যাপার। আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান মহা পুরুষের কি অসীম প্রভাব। খাজা ইকবাল সাহেব তাঁর প্রয়োজন মত টাকা ঐ তাকে হাত দিলেই পেতেন।

এভাবে যখন কোন প্রকারেই অত্যাচারী কুতুবুদ্দিদন খাজা সাহেবকে পেরে উঠলেন না তখন তিনি আদেশজারী করে খাজা সাহেবকে সংবাদ পাঠালেন, তাঁকে প্রত্যেক দিন সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হতে হবে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ

করতে হবে। কিন্তু খাজা সাহেব তাঁর এই আদেশকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। আদেশ রক্ষা না করায় সম্রাট ক্রুদ্ধ হয়ে আবার সংবাদ পাঠালেন, তাঁকে সপ্তাহের একদিন সম্রাটের সাথে দেখা করতেই হবে। খাজা সাহেব এবারও রাজ আদেশ প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে সম্রাট পুনর্বার সংবাদ পাঠালেন, যদি খাজা সাহেব আগামী মাসে প্রথম তারিখে শাহী দরবারে সম্রাটের সম্মুখে উপনীত না হন, তবে রাজ সৈন্যরা তাঁকে বলপূর্বক ধরে আনবেন এবং সম্রাটের ক্ষমতা আর খাজা সাহেবের কৃতিত্বের পরীক্ষা হবে।

রাজদরবারের অনেকেই এমনকি সৈন্যরাও খাজা সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ফলে সম্রাটের আদেশ শুনে তাঁরা তখন ভীত হয়ে খাজা সাহেবের কাছে গিয়ে বিনীত স্বরে বললেন, হুজুর! আমরা আপনাকে অত্যধিক শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমরা রাজ আদেশের দাস। যদি সম্রাট আমাদেরকেই আপনাকে অসম্মানজনকভাবে বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন তখন আমরা কী করব? আমরা কি রাজশক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ করব?

শিষ্যদের উত্তেজিত ভাব দেখে খাজা সাহেব সান্ত্বনার সুরে বললেন, কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, তোমরা রাজ আদেশের দাস কিন্তু আমি যে রাজার দাস তিনিই আমার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করে রেখেছেন। নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই তোমরা সব দেখতে পাবে। অনেকেই সেদিন খাজা সাহেবের এই হেঁয়ালীর তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। হয়ত ভেবেছিলেন কোন স্বর্গীয় ফৌজ বা বাহিনী এসেই বোধ হয় খাজা সাহেবকে রক্ষা করবে।

যাইহোক, নির্দিষ্ট দিনের কয়েক মাস পূর্বে খাজা সাহেব মাওলানা বুরহানউদ্দিন, মাওলানা ইয়াকুব প্রমুখ শিষ্যদের খেলাফতি বা প্রতিনিধিত্ব দান করে যথাক্রমে দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিনি প্রত্যেককে একটি করে পাগড়ি, জামা ও জায়নামাজ (নামায পড়ার বিছানা) দান করেছিলেন।

এভাবে তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। দরবারে হাজির হওয়ার পূর্ব দিনে গভীর রজনীতে তিনি একটি ফারসি কবিতা পাঠ করেছিলেন যার মর্মার্থ– "হে জম্বুক! তুই কোন্ সাহসে সিংহের সাথে যুদ্ধ করতে আসলি? এই জন্য তোর এই দুর্দ্দশা হল।"

খাজা সাহেব প্রায় চার মাসকাল পীড়িত থাকা অবস্থাতে দরবারে উপস্থিত দিন হওয়ার প্রত্যুষেই রবিউল আওয়াল মাসের ১৮ তারিখে বুধবার এই মরজগৎ ত্যাগ করেন। এত দিনে শিষ্যরা বুঝতে পারলেন 'যথাযথ ব্যবস্থার' তাৎপর্য। মোবারকের আদেশে পদাঘাত করে তাঁর দরবারের পরিবর্তে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিয়ে লক্ষ লক্ষ ক্রন্দনরত শিষ্যদের কাছ হতে তিনি চির বিদায় নিলেন।

শাহ ইসমাইল গাজী (রহ.)

সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শাহের (৮৬৩-৮৭৮) রাজত্বকালে হযরত ইসমাইল গাজী (রহ.) বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁর আদি বাসস্থান ছিল আরবের মক্কা নগরীতে। সেই সময়ে মক্কা নগরীতে হাসানুদ্দিন নামক জনৈক মাওলানার কাছে প্রায় শতাধিক সঙ্গীসহ তিনি ধর্মের আলোচনা করতেন। এক সময় কামালুদ্দিন নামে মাওলানা সাহেবের এক ভাই কোরআন পাঠ করছিলেন। তিনি পড়ছিলেন-"আল্লাহর জন্যে যাঁরা শহীদ হবেন, তাঁরা প্রভূত পুরস্কার পাবেন।" এই বাণী শোনার পর হতেই ইসমাইলের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। শাহাদত বরণের লোভ সংবরণ করতে না পেরে তিনি ও তাঁর তাবলীগ জামাতের সঙ্গীরা পারস্য সীমান্তে উপনীত হয়ে তথা হতে ভারত অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। অবশেষে উক্ত সুলতানের রাজধানী লখনৌতি নগরে এসে পৌঁছান।

এই সাধকের জীবনেও বহু অলৌকিক ঘটনার সংমিশ্রণ আছে। যে বাদশাহ রুকনুদ্দিনের রাজত্বে ছুটিয়া পাটিয়া নামক একটা নদীতে বর্ষাকালে প্রবল বন্যায় জনসাধারণের পারাপারে দুর্দশার সীমা থাকত না।

তিনি গভীর চিন্তা করে সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন, কিন্তু নদীটি এত খরস্রোতা ছিল যে, সেখানে পিলার বা থাম বসানোর কোন উপায় ছিল না। শাহ ইসমাইল তখন দু রাকাত নামায শেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আর অমনি বেগবতী স্রোতস্বিনী আশ্চর্যজনকভাবে কমে গিয়ে শান্তরূপ ধারণ করল। সকলেই তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় অতিমাত্রায় অবাক হয়েছিল। যা হোক সেতু নির্মিতি হলে আবার পুনরায় উভয় পারের যোগাযোগ অব্যাহত থাকল এবং জনসাধারণের কষ্টের উপশম হল।

মান্দারণ বিজয় তাঁর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। মাত্র তাঁর ১২৫ জন সঙ্গীকে নিয়ে তিনি বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মান্দারণ দুর্গাধিপতি রাজদ্রোহী গজপতিকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ফলে মুগ্ধ হয়ে সুলতান তাঁকে মান্দারণের শাসক নিযুক্ত করেন।

কামরূপ বিজয়ও তাঁর জীবনের আর এক স্মরণীয় অধ্যায়। তিনি নিজেকে আল্লাহর একজন সৈনিক মনে করতেন। কামরূপ অভিযানে তাঁর অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখে কামরূপ অধিপতি মহারাজ কামেশ্বর স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। ইসমাইলের মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল।

আগেই উল্লেখ করেছি, ইসমাইল শাহ ছিলেন মান্দারণ দুর্গের শাসনকর্তা। ঘোড়াঘাট নামক স্থানে ভান্দার্সী রায় নামক একজন সেনাপতি সুলতানের কাছে নানা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে শাহ ইসমাইলকে বিদ্রোহীরূপে চিত্রিত করেন। সুলতান

ক্রুদ্ধ হয়ে একদল সৈন্য পাঠালেন ইসলমাইলকে হত্যা করতে। এই প্রেরিত সৈন্যদের দ্বারাই মনীষী হযরত শাহ ইসমাইল গাজী (র.) ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে শাহাদতবরণ করেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এখানে ভান্দার্সী রায়ের দ্বারা মিথ্যা ষড়যন্ত্রে হযরত ইসমাইল গাজীকে নিহত করার ব্যবস্থাও যতখানি ঘৃণ্য ও দোষণীয়, সুতলান বারবক শাহের বিনা তদন্তে নিরপরাধ ইসমাইল গাজীকে হত্যা করার নির্দেশ দানও ঠিক ততখানি দোষণীয় ও নিন্দনীয়।

হযরত আহ্মাদ ফারুকী সারহিন্দী মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহ.)

মোজাদ্দেদ সাহেব সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু আলোচনা করা হয়েছে। তবু জানা দরকার যে তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত উমারের (র.) বংশধর, যিনি হযরত মুহাম্মদের (সা.) খলিফা বা প্রতিনিধি ছিলেন। তাই তাঁকে ফারুকিও বলা হয়। জন্মভূমি নাম সিরহিন্দ। সিরহিন্দের অর্থ বাঘদের জঙ্গল "Sirhind is really Shiarhand, which means the forest of tigers." ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় একজন মুসনান ফকির একটা দাগে লাঠি দিয়ে বলেছিলেন, এখানে ভবিষ্যতে একজন মস্তবড় মুজাদ্দেদ জন্ম নেবেন। যেহেতু ঐ পণ্ডিত অসাধারণ পণ্ডিত ও বুজুর্গীর অধিকারী ছিলেন। তাই ওখানে ফিরোজ তুঘলকের আদেশে বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল এবং পরে মুজাদ্দেদ সাহেব ওখানেই জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি কোরআনের হাফেজ হয়েছিলেন এবং দিল্লী কলেজে আরবী, ফারসী প্রভৃতি নানা ভাষায় দক্ষতার সঙ্গে জ্ঞান লাভ করে পদক ও পুরস্কার পেয়েছিলেন।

সেই সময় আকবরের রাজত্ব চলছিল। আর ঠিক ঐ সময়ে ফৌজী ও আবুল ফজল যথাক্রমে বাদশার ডানহাত ও বামহাতের মত মূল্য নিয়েও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আহমদের প্রতিভা ও পণ্ডিত ও গুণাবলি দেখে তাঁরা একে নিজেদের মধ্যে পেতে চাইলেন এবং তাঁদের আশা ছিল তাঁকে নিয়ে আকবরের দশরত্ন সভা সাফল্য লাভ করবে। কিন্তু ইসলামের আইন অবহেলা যথা– নামায না পড়া এবং পোশাক পরিচ্ছদ বা শরীয়তের তাদের অরুচি দেখে মোজাদ্দেদ সাহেব তাঁদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। আকবরের সঙ্গে হযরত মোজাদ্দেদের লড়াইয়ের বীজ ওখানেই শুরু হয়। তাঁর জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা আছে, সে আলোচনা নিষ্প্রোয়জন। আসল কথা বিত্তহীন দরিদ্র মোজাদ্দেদ সাহেব আকবর ও জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে হিমশীতল ধর্মীয় লড়াই চালিয়ে কেমনভাবে বিজয়ী হয়েছেন তাই চিন্তার বিষয়।

হযরত মুজাদ্দেদ সাহেবকে জাহাঙ্গীরের বন্দি করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু জাহাঙ্গীরের কন্যা পিতার মত শরীয়তের বিরোধিতা করতেন না। তিনি একবার নামাজান্তে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি

জানালেন যদি তাঁর প্রিয় আহমাদ সাহেবকে কারাগার হতে মুক্ত করে না দেওয়া হয় তাহলে জাহাঙ্গীরকে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। রাজকন্যা ঘুম ভাঙার পর পিতাকে এই মারাত্মক স্বপ্নের কথা জানালে জাহাঙ্গীর ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। (দ্রঃ রওজাতুল কাইউমিয়াত)

যে জাহাঙ্গীর সারা জীবন ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা করলেন তিনিই আবার মুজাদ্দেদ সাহেবের বৈদ্যুতিক পরশে ধার্মিক, দয়াল, প্রজাপালক প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত হয়ে এক অভিনব চরিত্রে রূপান্তরিত হলেন। এও তাঁর বৃহত্তর অলৌকিকতা সন্দেহ নেই। (দ্রঃ জোবদাতুল মাকামাত)

হযরত মোজাদ্দেদ সাহেব মহানবী হযরত মুহাম্মদকে (সা.) সর্ব বিষয়ে অনুসরণ ও অনুকরণ করতেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে একবার তিনি বলেছিলেন, আমি হযরত মুহাম্মদকে (সা.) সর্ব বিষয়ে অনুসরণ করতে চাই, এমনকি তিনি মাত্র ৬৩ বছর পৃথিবীতে ছিলেন, ওখানে আমার কোন হাত নেই, তবে হৃদয় চায় আমায় যেন আল্লাহ ৬৩ বছরই পৃথিবীতে রাখেন। হয়েছিলও তাই। আরবী ৯৭১ হিজরীতে জন্মে ১০৩৪ সালে আরবী সফর মাসে হঠাৎ একদিন রাত্রে স্নান করলেন, ভাল পরিচ্ছদ পোশাক পরলেন, গায়ে সুগন্ধি আতর লাগিয়ে নৈশ্য নামায তাহাজ্জোদ পড়লেন, মোনাজাত করলেন প্রাণভরে, অশ্রুসিক্ত নয়ন নিয়ে উত্তর দক্ষিণে লম্বা হয়ে মক্কা শরীফের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়লেন আর উচ্চারণ করতে লাগলেন ইসলামের মূলমন্ত্র কালেমা। একটু পরেই যেন তন্দ্রা অথবা নিদ্রার আগমন হলো, কিন্তু নিদ্রা নয় এটা ছিল মহা নিদ্রা! মহা মিলন হলো মহান স্রষ্টার সঙ্গে।

হযরত হামীদ বাঙালি দানেশমন্দ (রহ.)

বাদশাহদের যুগে বিচার করতে নিযুক্ত থাকতেন আলিম সম্প্রদায়। তাই উলামা ও মুফতিদের মধ্যে বাছাই করে যাঁদের বিচারের আসনে বসানো হতো তাঁদেরই বলা হতো কাজী। কাজীদের নির্বাচনের সময় শুধু তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতাই দেখা হত না; বরং তাঁদের বংশগত পরিচয়ের প্রমাণ নেওয়া হতো, অর্থাৎ পিতা, পিতামহ প্রমুখের পরিবেশ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখার নিয়ম ছিল। বঙ্গদেশে বর্তমান জেলায় মঙ্গলকোটে উপরোক্ত সম্ভ্রান্ত কাজী বংশে ১৫৯৮ খৃস্টাব্দে হামিদ সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট শাহজাহানের আশীর্বাদ গ্রহণের কথা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। এই মঙ্গলকোটে তাঁর পূর্বেও অনেক সাধু পুরুষ এসেছিলেন তাই আজও মঙ্গলকোটকে আঠার আওলিয়ার গ্রাম বলা হয়।

গ্রামে তিনি তাঁর পিতা কাজী দেলওয়ার হোসেন সাহেব এবং গ্রামের আলেমদের নিকট প্রাথমিক পাঠ্যিয় কোর্স শেষ করে লাহোরে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হন এবং খ্যাতনামা একজন আলেম হয়ে প্রকাশিত হন। প্রথমে তিনি পীর বুজুর্গদের আধ্যাত্মিকতা বিশ্বাস করতেন না, পরে পুর্বোল্লিখিত মোজাদ্দেদ

সাহেবের অধিবেশনে গিয়ে তাঁর অলৌকিক প্রভাবে এত প্রভাবিত হন যে তাঁকে বাধ্য হতে হয় তাঁর সঙ্গ গ্রহণ করতে। তিনি তখন আধ্যাত্মিকতা কি তা বুঝলেন এবং ঐ বিভাগের উন্নতি করার জন্য তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। পূর্ণতা লাভ করতে হামিদ সাহেবের অসুবিধা হয়নি। তিনি খেলাফত লাভ করলেন। আর তাঁকে মোজাদ্দেদ সাহেব মঙ্গলকোটে ফিরে গিয়ে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করতে লাগলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে সূর্যের মত প্রদীপ্ত হৃদয় গুরু হতে বিদায় নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হতে হলো। আসার সময় মোজাদ্দেদ সাহেবের ছোড়া জুতো দুখানি চেয়ে নিয়েছেলেন। কিন্তু মঙ্গলকোটে সে দুটি তিনি কোনদিন পায়ে লাগাননি; বরং খুব যত্ন করে একটি বাক্সে রেখে দিয়েছিলেন। যখন হামিদ সাহেবের মৃত্যু নিকটবর্তী হলো তিনি আদেশ করলেন তাঁর বাড়ির নিকটবর্তী একটি পুকুরে তা ফেলে দিতে। তাই করা হয়েছিল। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয়, এই মঙ্গলকোট ছোট হাসপাতাল এবং খ্যাতনামা পাসকরা একাধিক চিকিৎসক তাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও ভেবে পাচ্ছেন না প্রতিদিন শত শত মাইল দূর হতে কুকুরে কামড়ানো রোগী বিনা ওষুধ ও ইনকেজশনে ঐ পুকুরে স্নান করে আর তার অপরিচ্ছন্ন জল পানে নিষ্কৃতি পাচ্ছে কুকুরের বিষ হতে, কেমনভাবে।

একদিন বাদশাহ শাহজাহান তাঁর নিকট দিল্লীর সিংহাসন পাবার জন্য এসেছিলেন এই গ্রামে, পূর্বে তা উল্লেখ করা হয়েছে। দূর দূরান্ত হতে কত শিক্ষার্থী আসতো বিদ্যা ও জ্ঞান আহরণে। আজ নেই সেই মাদ্রাসা, নেই সেই পরিবেশ। আছে শুধু মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ন্যায় অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, মন্দির আর কবরের ধ্বংসাবশেষ। একদিন ছিল সেখানে বিরাট লাইব্রেরী, যা সারা দেশের গর্ব ছিল আর সেই বইগুলো তাঁরা পড়েছিলেন তাঁদের পবিত্র চক্ষু দিয়ে এবং ধরেছিলেন তাঁদের পবিত্র করকমলে। এছাড়া তাঁর শিষ্য, প্রশিষ্য ও পরশিষ্যগণ যা লিখে গেছেন আরবী ও ফারসীতে তার একটা অংশ মাটির জীর্ণ ঘরে অসতর্কতার সঙ্গে ছিল। বইগুলো যেন মঙ্গলকোটের পূর্বপুরুষদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের পুস্তকরূপী সাক্ষী। বইগুলো যেন আজও হীরা কাঞ্চন প্রসব করতে চায়। কিন্তু বহু যুগ ধরে মনীষী হামিদ বাঙালী বর্ধমানীর (র.) মাতৃভূমিতে সেদিনের মত কোন পাঠকও নেই আর সেই পরিবেশও নেই।

ঐ গুন্থগুলোকে কেন্দ্র করে ভারতের বর্তমান বঙ্গের বিখ্যাত বৃহত্তম ও প্রথমতম দাওরায়ে হাদীস পড়ার পূর্ণাঙ্গ মাদ্রাসায় দেওয়া হয়। তাই বোধহয় হযরত হামীদ বাঙালী (রহ.) অমর আত্মার পরিতৃপ্ত তাই তাঁর স্বপ্নের সার্থকতার সাক্ষীস্বরূপ বর্ধমানের মেমারী টাউনের মদিনা মার্কেটে মহান মাদ্রাসা আজ উচ্চ শিরে দণ্ডায়মান।

>Goto List

অবশেষে আরবী হিজরী ১০৫০ সনে সারা ভারতের উজ্জ্বল রত্ন হযরত হামীদ বাঙালী (রহ.) মহা প্রস্থান করলেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের গৌরব ও প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস যেন আজও মঙ্গলকোটের অণু-পরমাণুতে মিশে রয়েছে! আজও যেন নীরব মাটির বুক চিরে প্রতিধ্বনিত হয়, ধন্য হামিদ বাঙালী! ধন্য হে অমর মনীষী!!

হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রহ.)

আমাদের আলোচ্য অধ্যায়ে কিছু সাধকের বুজুর্গী লেখার উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমান রাজা বাদশাহরা সাধারণত রাজ্য-রাজনীতি নিয়ে থাকতেন সেই সঙ্গে ধর্মও। বলাবাহুল্য এই প্রকৃত ফকিরদের দল, রাজা-বাদশাহ, মন্ত্রী, কর্মচারী চরিত্র গঠনের ভার নিতেন এবং সারা ভারতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নিজেদের চরিত্র মাধুর্য বা অনুপম আদর্শ সামনে রেখে অমুসলমানদের নিজেদের দিকে আকর্ষণ করতেন ফলে অসংখ্যা মানুষ তাঁদের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় নতুন ধর্ম গ্রহণ করতেন।

এমনিভাবে মুহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর ৩২০ বছর মুসলমান সুলতানগণ দিল্লীতে রাজত্ব করেন। দাস বংশ, খলজী বংশ, তুঘলক বংশ ও লোদী বংশ। সুলতান সাহাবুদ্দিন, মুহাম্মদ ঘোরী ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ইসলামী ভাব ধারায় নিজেকে পরিচালিত করেছেন। তাঁর একজন নগণ্য দাসকে নিজের রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া এবং তাঁকে সিংহাসনে বসানো দুটিই ইসলামের মহান নীতির প্রতিফলন। তিনি হচ্ছেন কুতুবুদ্দিন। আবার কুতুবুদ্দিন তাঁর দাসকে জামাতা হিসেবে বরণ করে সিংহাসনে বসালেন যাঁকে, তাঁর নাম শামসুদ্দিন আলতামাস, আমরা পূর্বে ইলতুৎমিস লিখেছি যেহেতু আলতামাস শুদ্ধ নামকে ঐতিহাসিক অনেকে ইলতুৎমিস লিখেছেন। আলতামাস বললে আধুনিক ছাত্রছাত্রীর পক্ষে বোধহয় বোঝা কঠিন হয়ে পড়ত তাই সোজা পথে ভ্রমণ। যাইহোক, এরা দিল্লির সর্বময় কর্তা হলেও পারস্য হতে আগত বিখ্যাত ফকির হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীর (র.) কথায় উঠতেন-বসতেন। ভারী মজার কথা সারা ভারত সম্রাটের অধীনে আর সম্রাট ফকিরের অধীনে আর ফকির শুধু আল্লাহকেই মূলধন করেছেন। এই কুতুবুদ্দিন কাকীর (র.) স্মৃতি রক্ষায় বাদশাহ দুরাকাত নামায পড়ে আল্লাহকে বললেন, ' হে আল্লাহ! একটি লোহার মিনার তৈরি করবো যেন সহজে তাতে লোক উঠে তোমার ফকিরদের সহস্র সহস্র কবর দর্শন করে, মৃত্যুকে স্মরণ করে আর তোমার রাজ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করে এবং ঈদের সময় নামাযের পূর্বে উপবাসী রোজাদার প্রজারা চাঁদ দেখে ধন্য হয়। এটি কবুল (মঞ্জুর) কর আর তোমার তরফ হতে কোন খুশুসিয়্যাত (বৈশিষ্ট্য) এতে দান কর। অবশেষে ১২১০ খৃস্টাব্দে ২৪২ উচ্চ লোহার মনুমেন্ট, ভেতরে সহজ সুন্দর সিঁড়ি নিয়ে গড়ে উঠল যা আজও বিদ্যমান,

আজও তা মরীচা ধরে ধ্বংস হয়নি. আজও আধুনিক যুগের নিয়মানুযায়ী তাতে রঙ লাগানোর প্রয়োজন হয় না।

হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতী (রহ.)

ভারতের প্রভাবশালী রাজা পৃথ্বিরাজের সময়ে ভারতের বাইরে হতে আগমন করলেন খাজা মইনুদ্দিন (র.)। তিনি পৃথিবীর প্রখ্যাত ফকিরকুল শিরোমণী হযরত মহীউদ্দিন আব্দুল কাদেরের (র.) আত্মীয় ছিলেন। তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে ও দোয়া নিয়ে, একটি ভারতের মানচিত্র অঙ্কিত অলৌকিক আপেল ও একটি তবলীগ জামাত নিয়ে ভারতে আগমন করেন। তাঁর নম্র বাহিনীকে অনেক বাধা দেওয়া হয়, ফলে রাজার সমস্ত যুদ্ধের উটগুলোর চলৎশক্তি রহিত হয় এবং আজমীরের একটি বড় জলাশয় হঠাৎ শুকিয়ে যায়, ফলে শহরে লোক হাহাকার করে। আবার খাজা সাহেবের দোয়ায় জলাশয় ভর্তি হয় এবং উটগুলোও সুস্থ হয়ে উঠে। তারপর সারা দেশের সেরা জাদুকরগণকে রাজা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ডাক দেন। তাঁরা মন্ত্রবলে জাদু খেলায় আকাশে উড়তে সক্ষম হন, কিন্তু পরক্ষণেই খাজা সাহেব তাঁর জুতাকে জাদুকরদের ওপর নিক্ষেপ করেন, ফলে জুতা দুটি পাখির মত উড়তে শুরু করে এবং উড়ন্ত জাদুকরদের মাথায় পরিমাণ মত জোরে আঘাত করে নামিয়ে আনে। এমন অত্যাশ্চর্য ঘটনায় জাদুকর সকলেই খাজার হাতে মুসলমান হন এবং সহস্র সহস্র অমুসলমান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। পৃথ্বিরাজের নিজের কর্মচারী বা সৈন্যদের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ইসলামের ওপর চিন্তিত হয়ে পড়ে। ঐ সময় ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী অল্প সৈন্য নিয়ে পৃথ্বিরাজকে আক্রমণ করেন। পৃথ্বিরাজের সৈন্য ছিল অনেক বেশি যথা-দুলক্ষ অশ্বারোহী, তিন হাজার গজারোহী (দ্রঃ ফিরিস্তার লেখা)। মুহাম্মদ ঘোরী পরাজিত হন। তারপর খাজা সাহেব কর্তৃক আজমীরে উপরোক্ত ঘটনা বা ক্রিয়াকাণ্ড ঘটে তারপরই অমুসলমান জনসাধারণ সৈন্য সাধারণের মনোবল দুর্বল হয়। তারপরের বছরে তরাইনে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হয়। এবারও পৃথ্বিরাজের সৈন্য আরও কয়েক লক্ষ বেশি ছিল কিন্তু পৃথ্বিরাজকে পরাজিত হতে হয় এবং তিনি নিহত হন। এমনিভাবে ওলি-ফকিরের দল বাদশাহের জয়ের পথ সুগম করেন। খাজা মইনুদ্দিনের (রহ.) সমাধিতে আজও হিন্দু-মুসলমান লক্ষ মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন পূর্ব ইতিহাসের কথা। ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.)

হুগলী জেলায় বালিয়াবাসন্তী গ্রামে ১২৩৬ হিজরী সনে মওলুবী হাজী মোঃ মোকতাদির সাহেবের আবু বকর নামে এক সুযোগ্য সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। আধ্যাত্মিকতায় তিনি অসাধারণ উন্নতি সাধন করেছিলেন। পরে তিনিই হয়েছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিকি (রহ.) সাহেব।

ঐ বালিয়াবাসন্তী গ্রামের নাম পরিবর্তন করে 'ফারে ফারাহ' কিংবা 'ফর ফরা' রাখা হয়েছিল। পরে তা থেকে পরিবর্তিত হয়ে হযরতে ফুরফুরা নামে খ্যাতি লাভ করে। তিনি মুরীদ হয়ে ছিলেন হযরত সৈয়দ ফাতেহ আলীর (র.) নিকট। আর হযরত ফাতেহ আলীর (র.) পীর ছিলেন হযরত সুফী নূর মোহাম্মদ (র.) সাহেব। আবার হযরত নূর মোহাম্মদ সাহেবের (র.) পীর ছিলেন হযরত সৈয়দ আহমদ ব্রেলবী (রহ.)। যিনি বিশ্ব বিখ্যাত পীরে কামেল ছিলেন আবার ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান নায়কও ছিলেন। ইংরেজদের বলে বলীয়ান শিখ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। আঘাতপ্রাপ্ত ইংরেজ তাঁর ওপর ক্রোধ ও ঈর্ষা বশত ওহাবী বলে আখ্যা দিয়েছে। অথচ ওহাবী বলে কোন দল ভারতে কোন দিনই ছিল না, আজও নেই। অবশ্য অধুনা যাদের ওহাবী বলে আমরা প্রচার করে থাকি তাদের কেউ-ই আদৌ ওহাবী নয়; বরং অন্য কিছু হতে পারেন।

যাইহোক, সুফী হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) বাংলা ১৩৫৪ সালে ৩ চৈত্র ৫টা ৪৫ মিনিটে ইহধাম ত্যাগ করেন। বাংলা তথা ভারতের মানুষ আজও তার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রত্যেক ফকির ও অলিআল্লাহর জীবনী যদি মাঝারিভাবেও লেখা যায় তাহলে অন্তত এক হাজার জীবনী কমপক্ষে ইতিহাসে স্থান পাবেই। সুতরাং তা পৃথক পুস্তকেই সম্ভব। তাই সংক্ষেপে বলা যায়, হযরত বাইজিদ বোস্তামীও ঐ রকম একজন ফকির ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। এমনিভাবে হযরত শাহ সুলতান বলখী যিনি ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে আগমন করেন হযরত শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী। বাবা আদম শহীদও ভারতের উল্লেখযোগ্য ফকির। তাঁর মৃত্যুর সঠিক তারিখ পাওয়া যায় না, তবে সুলতান জালালুদ্দিন ফতেহশার শাসনকালে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে নির্মিত একটি মসজিদের শিলালিপি হতে তাঁর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। শাহ নিয়ামতুল্লাহ ঢাকা শহরে ইসলাম প্রচারক হিসেবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া মঙ্গলকোটে মখদুম শাহ গজনভী, বীরভূমের আবদুল্লাহ সাহেব, ঢাকার সৈয়দ আলী তাবরেজী, বগুড়ার শাহতুর্কান শহীদ, পাবনার মখদুম শাদৌল্লা (র.) উল্লেখযোগ্য ফকির ছিলেন।

রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের শেষের দিকে ১২১৩ খৃষ্টাব্দে জালালুদ্দিন তাবরেজী লক্ষ্ণৌতে এসেছিলেন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। ঠিক তার দশ বছর পূর্বে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ারের বঙ্গের রাজধানী লক্ষনাবতী ও নবদ্বীপ বিজয়ের ঘটনা ঘটে। এমনিভাবে আর একজন জালাল সাহেবের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। অনেকে দুজনকে একই মনে করেন কিন্তু তা নয়। মালদহ জেলার জালাল সাহেব ১৩ শতাব্দীর এবং সিলেটের শাহ জালাল সাহেব ১৪ শতকের ফকির ছিলেন। (দ্রঃ Social and Cultural History of Wast Bengal)

শেখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া সাহেবও নেতৃস্থানীয় ফকির ছিলেন। আখি সিরাজুদ্দিন ও শেখ আলাউল হক যথাক্রমে ১৩৪২ ও ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। এরা উভয়েই সুফী ঐ ফকির ছিলেন। আলাউল হকের এক প্রখ্যাত পুত্র নূর কুতুবুল আলমও পিতা অপেক্ষা বেশি প্রভাবশালী ছিলেন। রাজা কংসকে আক্রমণ করার জন্য সুলতান শরকী এক বিরাট সেনাবাহিনী পাঠান। রাজা যুদ্ধ সম্ভব নয় ভেবে ফকির সাহেবের আশীর্বাদ প্রার্থী হন। কুতুব সাহেব বললেন, আমার দোয়া প্রার্থনা করার চেয়ে আপনি আমার মত হয়ে যান না? শুধু ইসলাম মেনে নিলেই তা সম্ভব। তিনি সপরিবারে মুসলমান হতে চাইলেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী বাধা দেওয়ায় তাঁর পুত্র যদুকে ইসলাম ধর্মে দান করলেন। কুতুব সাহেব তার নাম জালালুদ্দিন রাখলেন আর সুলতান শর্কী একটি ছোট্ট পত্র লিখলেন, যাতে তিনি কংসকে আক্রমণ না করেন। পত্র পেয়ে তিনি বিনা বাক্যে ফিরে গিয়েছিলেন। কুতুব সাহেবের কথামত যদুকেই সিংহাসনে বসানো হয়েছিল। কিন্তু বিপদ কেটে যাওয়ার পরেই অত্যাচারী কংস পুত্রকে সরিয়ে নিজে সিংহাসনে বসে দনুজমর্দন নাম ধারণ করলেন এবং এক নিরেট সোনার গাভী তৈরি করে ব্রাহ্মণদের পরামর্শ অনুযায়ী টুকরো টুকরো করে কেটে তা ব্রাহ্মণদের মধ্যে দান করে দিলেন। অতঃপর জালালুদ্দিনকে আবার যদুতে পরিণত করা হলো। এইবার কংস পূর্বাপেক্ষা মুসলমানদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করতে থাকেন এবং কুতুব সাহেবের পণ্ডিত পুত্র আনোয়ারকে হত্যা করলেন। তাছাড়া আরও দুজন দরবেশ বদরুল আলম ও শেখ হোসাইনকে রাজা হত্যা করেন। কুতুব সাহেব পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধে প্রতিবাদ কিছু না করে দু-রাকাত নামায পড়ে আল্লাহকে বললেন, বিচার তুমিই কর। রাজা অসুস্থ হলেন, শুধু প্রতি রাতে দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন।

এই বার নূর কুতুব আলম সাহেব যদুর সঙ্গে দেখা করলেন। যদু দেখলেন কুতুব সাহেব হাসিমুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন অথচ তাঁর পা মাটিতে লেগে নেই। তিনি আবার মুসলমান হলেন এবং পূর্ব নাম গ্রহণ করলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের ডাকলেন যারা স্বর্ণ গাভীর ভাগ নিয়েছিলেন। কৈফিয়ত চাইলেন এই নতুন বিধান ধর্মের কোন পুস্তকে আছে? কিন্তু প্রমাণাদি দেওয়া সম্ভব হয়নি। তখন তিনি বললেন, আপনাদের প্রত্যেককে গোমাংস খেতে হবে কারণ সোনার গাভীর যেমন করে ভাগ বন্টন করে খেয়েছেন তেমিন করে মাংসের গাভীও খেতে হবে। এই আপনাদের মনমত ধর্ম বিধান তৈরির শাস্তি। বাধ্য হয়ে সকলকে তা খেতে হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটুকু না জানা থাকলে জালালুদ্দিনের এই বাড়াবাড়ি বিচার ব্যবস্থার জন্য মুসলমান জাতি আর মহান ইসলাম দুটোই দায়ী হতে পারে। তাছাড়া হয়েছেও অনেক ক্ষেত্রে। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে কুতুব সাহেবের পরলোক প্রাপ্তি হন।

উপরোক্ত শহীদ আনোয়ারও বিখ্যাত ওলি বা ফকির ছিলেন। কুতুব সাহেবের যাহেদ নামে এক পুত্র তিনিও বিখ্যাত ফকির ছিলেন। ১৪৫৫ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

শেখ হুসামুদ্দিন (মৃ: ১৪৭৭), বিয়াবাণী, শাহগাদা, শাহ কাকু (মৃ: ১৪৭৭ খৃ:) উলুগই আজম খাঁর পরিচয় পশ্চিম দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে প্রাপ্ত শিলালিপিতে প্রমাণিত হয়। শিলালিপিটি মসজিদে বসানো হয়েছিল। ১২৯৭ খৃ: ১৯ অক্টোবর। তিনিও ইসলাম প্রচারক ছিলেন।

শাহদৌল্লা শহীদের কবর রয়েছে পাবনায়। তখন অমুসলমান রাজা তাঁর ইসলাম প্রচারে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এবং তাঁর ২১ জন নামজাদা সঙ্গীকেও শহীদ করেছেন। সব কবর এক জায়গায় সারিবদ্ধভাবে সাজানো আছে। মুহাম্মদ আতা ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তিনিও উচ্চ শ্রেণীর ফকির ছিলেন। শাহ মোয়াজ্জেম বাগদাদ হতে এসেছিলেন তখন বঙ্গে সুলতান নসরৎ খাঁনের শাসনকাল চলছিল। তিনি ১৫১৯ হতে ১৫৩২ খৃ: পর্যন্ত সিংহাসনে ছিলেন। রাজা হুসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩ হতে ১৫৫৯ খৃ: পর্যন্ত ঐ সময়ে বিখ্যাত ফকির মাখদুম জালালুদ্দিন রূপোস আরব হতে আগমন করেন। নির্যাতিত অনেক অমুসলমান তাঁর উদারতা, সেবা ও চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হয়। ১১৭ বছর বয়সে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি ধরাধাম ত্যাগ করেন। শেখ বদরুদ্দিন দিনাজপুরে সমাধিস্থ। তাঁর ইসলাম প্রচার এবং রাজা মহেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস যদিও নানা মতের ওপর দোদুল্যমান তবুও রাজা মহেশের রাজবাড়িতেই তাঁর সমাধি দেখে একটা সঠিক সিদ্ধান্ত না দেয়ার মত কোন কারণ নেই।

এমনিভাবে শরীফ জিন্দানী, শাহ কলন্দর প্রমুখ সাধক প্রবর যথাক্রমে ঢাকা ও রংপুরে সমাধিস্থ। শাহ তুর্কান শহীদের নামও ভোলার মত নয়। তাছাড়া প্রকৃত ফকির মোবাল্লিগদের মধ্যে শেখ ইয়াহিয়া (কুমিল্লা), শাহ মুহাম্মদ বাগদাদী, কুতুবুল আওলিয়া, শাহ কামাল, সৈয়দ মীরণ শাহ, শাহ মালেক ইয়ামিন, কুতুবশা প্রমুখ মনীষীও পণ্ডিত প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমনিভাবে ১২৬০ খৃষ্টাব্দে এসেছিলেন শেখ শরীফুদ্দিন আবু তাওয়ামাহ। তখন গিয়াসুদ্দিন বলবনের রাজত্বকাল চলছিল। শাহ আলী বাগদাদী, শাহ মান্নাহ জালাল হালবী, বদর শাহ, শেখ ফরিদ, ও শাহ আদম কাশ্মীরি, হাজী সালেহ প্রমুখ মনীষী বিরাট বিরাট প্রতিভা ও সাফল্যের অধিকারী ফকির ছিলেন। এরা যথাক্রমে ১৫৭৭, ১৮৮৩, ১৫৩৭, ১৪৪০, ১২৬৯, ১১০৯ ও ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। এমনি আরও মুবাল্লিগদের মধ্যে শাহ সুফী শহীদ যিনি ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে শহীদ হন পাণ্ডুয়াতেই তাঁর সমাধি আছে, জাফর খাঁ গাজী ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর কবর আছে ত্রিবেণীতে, আনোয়ার কুলী হালবী হুগলি জেলার মোল্লাসিমলায় কবরস্থ হয়েছিলেন। মক্কা শরীফ থেকে এসেছিলেন সৈয়দ

আব্বাস সাহেব, ডাক নাম গোরাচাঁদ। সম্রাট গিয়াসুদ্দিন তোঘলকের সময়ে নিজের পীর শাহ হাসানের সঙ্গে ১৩২১ খৃস্টাব্দে বঙ্গে ২৪ পরগনা জেলায় ইসলাম প্রচার করতে চেষ্টা করেন। অনেক অলৌকিক ঘটনাও ঘটেছিল তাঁর জীবনে। তবুও তাঁকে অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয় এবং শেষে ১২৬৫ খৃস্টাব্দে শহীদ হতে হয়। চন্দ্রকেতু নামক এক রাজাই ছিলেন তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। আব্বাস সাহেবের এক বোনের নাম ছিল রওশনারা, তিনিও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ প্রাপ্তা বিদূষী ছিলেন। তিনিও তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে মক্কা হতে একই সাথে এসেছিলেন। হাড়োয়ায় তাঁর কবর হয়েছিল। শরীক শাহ গাজী সম্বন্ধে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ দেওয়া কঠিন, তবে আব্বাস সাহেবের সঙ্গী অথবা সমসাময়িক ব্যক্তি হতে পারেন। তার কবর ঘুটিয়ারী শরীফে বর্তমান। এমনিভাবে বরখান গাজী, মুবারক গাজী প্রমুখ বিজয়ীদের নামও স্মরণীয়। দিগ্বিজয়ী তৈমুরের সময় এসেছিলেন তবলীগ করার জন্য সৈয়েদুল আরেফিন। তাঁর আসল নাম এটি নয়, এটি হচ্ছে তাঁর উপাধি, যার অর্থ হচ্ছে ফকিরদের সর্দার। একদিল শাহও ছিলেন বিখ্যাত বুজুর্গ, যিনি বারাসতে কবরস্থ। খানই জাহান খুলনায় সমাধিস্থ। এরা সকলেই ইসলাম ধর্মের প্রচারক ছিলেন।

শাহ মাহমুদ গজনভীর সমাধি মঙ্গলকোটে আছে। রাজা বিক্রমকেশরী নামক এক হিন্দু রাজার সময়ে তিনি ইসলামের আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা করেন। অনেকে তাঁর শিষ্যের তালিকাভুক্ত হন। কিন্তু রাজা কেশরী, মাহমুদ এবং তার শিষ্যদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করেন। ঐ সময় দিল্লী হতে সম্রাটের পক্ষ হতে একটি ফারসী ভাষায় লেখা পত্র নিয়ে এক দূতের আগমন ঘটে। কিন্তু রাজা ঐ পত্রের পূর্ণ পাঠোদ্ধারের জন্য ফকির সাহেব মাহমুদকে দরবারে ডাক দিলেন। তিনি তা পড়ে দিলেন। তাতে জানতে চাওয়া হয়েছিল তাঁর অত্যাচার সম্বন্ধে। ফারসী ভাষাতে রাজা বিক্রম কেশরীর কথামত উত্তরও তাঁকেই লিখতে হয়েছিল। তিনি সবকিছু লিখে নিজেও এক কলম নিজের তরফ হতে লিখেছিলেন, যার মর্মার্থ 'অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বন করুন।' কিছু দিনের মধ্যেই রাজার বিরুদ্ধে একদল সৈন্যের আগমন ঘটে। উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয়। রাজা বিক্রম পরাজিত হন এবং দেশ ত্যাগ করেন। এ ব্যাপারে শোক শুভোদয় গ্রন্থ হতে একটি সংস্কৃত শ্লোক সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"পূর্বে বিক্রমাদিত্যস্য সভায়াং আকাশৎ পত্রং প্রতিতান্তে চতুর্বিংশোত্তরে শকে সহস্রক শতাধীকে। বেহার পাটনাৎ পূর্বং তুরস্ক সমুপাগত:" অর্থাৎ এখানে প্রমাণিত হচ্ছে পত্রটি দিল্লী হতে আকাশ থেকে পড়ার মত আকস্মিক পত্র আর তুর্কীদের দ্বারা একশত চব্বিশ শকাব্দে পাটনার পূর্বদিকে মুসলমান বিজয়ের বার্তা। তবে এই বিক্রমকেশরীই রাজা বিক্রমাদিত্য কি না তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু দরবেশ মাহমুদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা যে এ ঐতিহাসিক সত্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এমনিভাবে শত সহস্র ফকির, আওলিয়া, দরবেশের ছোট বড় দল দিকে দিকে ভারত তথা সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়তেন। বহু জায়গায় তাঁদের 'তবলীগ জামাত' বা প্রচারকদলকে হত্যা করে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। একথা শুধু স্বাভাবিক নয়, সত্য ও তথ্যযুক্ত বটে। যেমন রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর বৌদ্ধ স্তূপে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মাটির নিচ হতে বাগদাদের খলিফার নাম লেখা স্বর্ণমুদ্রা উদ্ধার করেছেন, তাতে তারিখ দেওয়া আছে ১৭২ হিজরী সন অর্থাৎ ৭৮৮ খৃষ্টাব্দ। সংবাদে আরও প্রকাশ, কুমিল্লার ময়নামতি খননান্তে আরবী অক্ষরবিশিষ্ট স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। মহাপণ্ডিত ডঃ ইনামুল হক লিখেছেন, "আমাদের বিশ্বাস কোন ইসলাম প্রচারকের দ্বারা পাহাড়পুরের কোন বৌদ্ধ বিহারে এই মুদ্রা নীত হয়। সম্ভবত তিনি স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে নিয়ে তথায় ইসলাম প্রচার করতে গমন করেন। তখন তিনি বৌদ্ধদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং তাঁদের মুদ্রাটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হস্তগত হয়েছিল।"

মোটকথা, প্রত্যেক ফকির আওলিয়াদের চরিত্র আলোচনা করলে আমরা সর্বগুণের সমন্বয়ে এক জীবন্ত আদর্শ ও নিখুঁত চরিত্রের সন্ধান পাই। অবশ্য একথাও ঠিক যে, নিছক বিদ্বেষ আর ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে কিছুসংখ্যক কলমনবীশ তাঁদের চরিত্রের ঐতিহাসিক অবদানকে অস্বীকার করে তাঁদের ওপর 'পঞ্চম বাহিনী', 'গুপ্তচর' প্রভৃতি অভিযোগ ও অপবাদ আরোপ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ঐতিহাসিকগণ তা অস্বীকার করেছেন। আমাদের দেশীয় ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারও তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে বলেছেন, "We have no reason to hold that these warriors in the path of Aleah were so degenerate as to act as fifth columnist of the Muslim State against the other,"-(History of Bengal, vol-2,p-76 দ্রঃ) অর্থাৎ আমরা এ কথার সমর্থনে কোন কারণই খুঁজে পাই না যে, আল্লাহর পথে এই সমস্ত পরিশ্রমী সাধকরা অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রের পঞ্চম বাহিনীর ন্যায় অধঃপতিত। শ্রীযুক্ত বিমান বিহারী মজুমদার মহাশয়ও এই তাপস শ্রেণীর কৃতিত্ব ও চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলেছেন, "হিন্দু ধর্মের পুনঃঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় শত্রু হয়েছিল মুসলমান ধর্ম। এক শ্রেণীর লোক পীর ও তাপসগণের মহান ধর্ম প্রবণতায় আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।" (দ্রঃ বৈষ্ণব সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ নামক প্রবন্ধ)

সমস্ত ফকির দলের সম্মানে আমরা যথাযথ ভক্তি প্রদর্শন করে পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে লিখি যে, ফকির আরবী শব্দ অর্থ ভিখারী কিন্তু উপরোক্ত দরবেশ, পীর, ওলী বা তাপস দল কোন মানুষের দরবারের ভিক্ষুক নন, বরং তাঁরা আল্লাহর দরবারের সায়েল (ভিক্ষুক)। আজকাল প্রকৃত পীর বুজুর্গদের

কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু অনেক গাঁজারে বেনামাজী বেশরিয়তী ধোঁকাবাজ সমাজধ্বংসী ভণ্ড পীর, যারা ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তাদের সঙ্গে এদের কোন মিল নেই এবং বৈপ্যরীত্যের বৈচিত্র্যই পরিলক্ষিত হয় সর্বাংশে। তাই ব্যথিত হৃদয়ে বলব, মুসলিম মহা মনীষীদের জীবন ইতিহাস আজ সমাজের মানস পট হতে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হলেও প্রকৃত বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় তাঁদের স্বর্ণোজ্জ্বল জীবনালেখ্য যুগ যুগান্তর ধরে জীবন্ত আছে ও থাকবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দৌল্লার দুর্লভ ঐতিহাসিক তথ্য

দিল্লীর শেষ সম্রাট যেমন বাহাদুর শাহ তেমনি ভারতের প্রাণ কেন্দ্র বঙ্গদেশের শেষ নবাব ছিলেন সিরাজুদৌলাহ। ১৭৫৭ তে ইংরেজ ও তাঁদের দালালদের চক্রান্তে তাঁকে ধ্বংস করা হয়। সেই সঙ্গে তাঁর জীবনে মহাননেতা, বিচক্ষণতা, বীরত্ব ও মহত্বকে ইচ্ছাকৃতভাবে ইতিহাসে বিকৃত করা হয়েছে। আর ভারতের মাটি রক্ষা করতে নিজের দেহের সমস্ত রক্তবিন্দু দিয়ে যিনি ভারতের মাটিকে রক্তরঞ্জিত করলেন তাঁর ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য সামান্যতম চেষ্টার পরিবর্তে অসামান্য অপচেষ্টা করা হয়েছে। কীভাবে কেন তা করা হয়েছে, তাই আলোচনার প্রয়োজন।

আগেই বলেছি বঙ্গদেশকে ভারতের মস্তিষ্ক বলা যেতে পারে। বাংলার সম্পদ সম্পত্তি ও অর্থ ইংরেজদের হাত শক্ত করেছিল তাই ইংরেজদের পক্ষে ফরাসীদের পরাজিত করা সহজসাধ্য হয়েছিল।

সম্রাটদের রাজ্যে বঙ্গদেশ একটা প্রদেশ বলে গণ্য ছিল। মুর্শিদ কুলী খাঁ ছিলেন বাংলার প্রথম নবাব। পরে ১৭২৭ খৃস্টাব্দে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলা ও বিহারের নবাব হন। তারপর ১৭৩৯ খৃস্টাব্দে তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ সিংহাসনে বসেন। তিনি খুব উপযুক্ত ও শক্তিশালী ছিলেন। তাঁর অধীনস্থ গভর্নর

>Goto List

আলিবর্দী খাঁ মারাঠা ও বর্গীদের লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাতে সরফরাজ খাঁ খুব একটা গুরুত্ব দেননি। ফলে বীর আলিবর্দীর বীরত্ব প্রকাশে বাধা সৃষ্টি হয় দেখে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সরফরাজকে পরাজিত করে নিজে নবাব হন।

আলিবর্দী খাঁ উপযুক্ত শাসক ও বীর ছিলেন। মারাঠা, বর্গী প্রভৃতি জাতির লুণ্ঠন ও অত্যাচারকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। ইংরেজরা আলিবর্দীর হাভভাবে চরম নীতির পরিবর্তে নরমনীতি অবলম্বন করে এবং তাঁর দরবারে জানানো হয়, 'আমরা মহামতি আকবরের সময় হতে আজ পর্যন্ত আপনাদের অর্থাৎ মুসলমানদের অনুগ্রহে ব্যবসা করছি এবং ঘাঁটিও নির্মাণ করে থাকি। অতএব আশাকরি আপনি আমাদের ঐ দুটি সুযোগই পুনর্বহাল রাখবেন।'

আলিবর্দী জানালেন, ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে কিন্তু দুর্গ নির্মাণের কোন সুযোগই নেই। যদি আপনারা পর্তুগীজদের আক্রমণের ভয় আছে বলে অজুহাত দর্শান তাহলে জেনে রাখবেন যে কোন বহিঃশত্রুর জন্য নবাব আলিবর্দীই যথেষ্ট।

আলিবর্দী খাঁয়ের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তাঁর প্রাণপ্রিয় নাতি সিরাজুদ্দৌল্লাই সিংহাসনে বসেছিলেন। সিরাজের পিতার নাম ছিল জয়নুদ্দিন আহমেদ। তিনি ছিলেন বিহারের গভর্নর। আর তাঁর মায়ের নাম ছিল আমিনা। এই সিরাজুদ্দৌলার রাজত্বকাল ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মিথ্যা দুর্নামের আসরে তাঁর ভূমিকা আধুনিক ইতিহাসে অতীব চিত্তাকর্ষক।

সিরাজের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ আছে তাঁর কিছুই যে সত্য নয় তা হয়তো এখানে বলার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু এমন অনেক অভিযোগও ইতিহাসে আছে, যার কোন ভিত্তিই নেই।

যাইহোক, সিরাজের সিংহাসনে বসার পরেই নবাবকে অযোগ্য মনে করে ইংরেজরা দুঃসাহসের সঙ্গে কলকাতার ঘাঁটি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণ করতে আরম্ভ করে। ইংরেজরা জানতো সারা ভারতের মস্তিষ্ক বাংলা, তাই কলকাতাতেই ঘাঁটি তৈরির পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলতে লাগল। সিরাজ সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পাঠালেন যে, দুর্গ তৈরি বন্ধ করা এবং তা ভেঙে ফেলা নবাবের আদেশ। ইংরেজরা নবাবের আদেশ অগ্রাহ্য করে দুর্গ তৈরির কাজ অব্যাহত রাখে। এক কথায় নবাবের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তাঁরা আগে হতেই তৈরি ছিল। সিরাজ পূর্ণ সাহসিকতার সঙ্গে বিদেশী ইংরেজকে আক্রমণ করেন এবং তাদের ভীষণভাবে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের সঙ্গেই সংযুক্ত 'Black Hole' বা অন্ধকূপের কাহিনী।

কলকাতা অধিকারের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছালো। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সেনাপতি ক্লাইভ বিরাট সৈন্য সামন্ত নিয়ে কলকাতা পুনর্দখল করেন। সিরাজ বুঝতে পারলেন আর লড়াই করে পারা যাবে না। কারণ ইংরেজদের চক্রান্তে তাঁর বিশ্বাস ভাজন হিন্দু ও মুসলমান বন্ধু-বান্ধব ও ইংরেজকে জয়ী করার জন্য সর্বস্ব পণ করে লেগেছেন, ফলে বাধ্য হয়েই তাঁকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে সন্ধি করতে হয়। এই সন্ধির নাম হয় 'আলী নগরীর সন্ধি'। সন্ধির শর্তানুযায়ী কলকাতা ইংরেজরা ফিরে পায় এবং শুধু মাত্র ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের মেরামত বা নির্মাণের অধিকারপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে ইংরেজরাই বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় হঠাৎ বঙ্গের চন্দননগর দখল করল এবং সিরাজুদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল।

এ ব্যাপারে ইংরেজরা একটা বড় অস্ত্র হাতে পেয়েছিল। বঙ্গের বিখ্যাত জগৎশেঠ এবং কলকাতার বড় বড় ব্যবসায়ী উমিচাঁদ এবং রাজবল্লভ প্রমুখ দেশের শত্রু ও শোষকবৃন্দ সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দেন। জগৎশেঠের বাড়িতে গোপন সভা হয়। সেই গোপন আলোচনায় স্ত্রী লোকের ছদ্মবেশে ইংরেজদের দূত মি. ওয়াট্‌স সাহেবকে পালকীতে করে আনানো হয়। ঐ সভায় মি. ওয়াটস প্রচুর পরিমাণে লোভ লালসায় মুগ্ধ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করা হবে এবং তার ফলে বঙ্গ তথা সারা ভারতের মুসলমানদের উত্তেজিত হয়ে ওঠার রাস্তা বন্ধ করতে তাঁরই আত্মীয় মীরজাফরকে সিংহাসনে বসানো হবে। মি. ওয়াট্‌স আরও জানালেন, সিরাজের সাথে লড়তে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন এবং তার জন্য যে প্রচুর অর্থের আবশ্যক তা বর্তমানে আমাদের নেই। জগৎশেঠ কর্তব্য পালন করতে সদম্ভে আশ্বাস দিয়েছিলেন, "টাকা যা দিয়েছি আরও যত দরকার আমি আপনাদের দিয়ে যাব, কোনও চিন্তা নেই।"

এবার রাজা রাজবল্লভ সিরাজের বড় খালা (মাসী) ঘসেটি বেগমকে বোঝালেন–আমরা চেয়েছিলাম আপনি সিংহাসনে বসবেন। কিন্তু এখনও উপায় আছে যদি আপনি আমাদের অর্থাৎ ইংরেজদের শুধু একটু সমর্থন করেন মাত্র।

মীরজাফরকে একটু বোঝাতে বেগ পেতে হল। তিনি প্রথমে বলেছিলেন "আমি নবাব আলিবর্দীর শ্যালক' অতএব সিরাজুদ্দৌলা আমার আত্মীয়, কী করে তা সম্ভব?" তখন উমিচাঁদ বুঝিয়েছিলেন, 'আমরাতো আর সিরাজকে মেরে ফেলছি না অথবা আমরা নিজেরাও নবাব হচ্ছি না, শুধু তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে আপনাকে বসাতে চাইছি। কারণ আপনাকে শুধুমাত্র আমি নই; বরং ইংরেজরা এবং মুসলমানদের অনেকেই আর অমুসলমানদের প্রায় প্রত্যেকেই গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখে"।

সুতরাং মীরজাফর উমিচাঁদের বিষ পান করলেন। উমিচাঁদের জয় হলেও তিনিও পুরস্কৃত হবেন আর মীরজাফর হবেন বাংলার নবাব। এদিকে জগৎশেঠের শোষণের পথ নিষ্কণ্টক হবে আর ইংরেজদের লাভ হবে ভারত আসবে তাদের হাতের মুঠোয়। পক্ষান্তরে সিরাজুদ্দৌলার লাভ হলে তা হবে বাংলার তথা সমগ্র ভারতের লাভ।

যাইহোক, ষড়যন্ত্রের জাল বোনা যখন শেষ, ভারতে স্বাধীনতা সূর্যকে পরাধীনতার গ্লানিতে কবর দেওয়ার সমস্ত পরিকল্পনা যখন প্রস্তুত সেই সময় ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে ১৩ জুন ক্লাইভ মাত্র তিন হাজার দুইশত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৯ জুন নবাবের অধীনস্থ কাটোয়া ক্লাইভের দখলে আসে। ২২ জুন গঙ্গা পার হয়ে ক্লাইভ মধ্য রাত্রিতে নদীয়া জেলার সীমান্তে পলাশীর প্রান্তরে পৌছান। নবাবের প্রচুর সুদক্ষ সেনা আগে হতেই তৈরি ছিল। ক্লাইভের তবুও ভয় নেই, কারণ তিনি জানেন এ যুদ্ধ যুদ্ধ নয় পুতুল খেলার শামিল। আগে হতেই পরিকল্পনা পাকাপাকি। উমিচাঁদ, বায়দুর্লভ, জগৎশেঠ প্রমুখের সাজানো সেনাপতি আজ ভেতরে ভেতরে ক্লাইভের পক্ষে!

ক্লাইভের সৈন্য যেখানে মাত্র তিন হাজার দুইশত সেখানে সিরাজের সৈন্য পঞ্চাশ হাজার। কিন্তু মীরজাফর, রায়দুর্লভ ও অন্যান্য সেনাপতি পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলেন আর ইংরেজদের আক্রমণ ও গুলির আঘাতে নবাবের সৈন্য আত্মহত্যার মত মরতে শুরু করল। এ অবস্থায় সেনাপতির বিনা অনুমতিতেই সিরাজের জন্য তথা দেশ ও দশের জন্য মীর মর্দান ভয়াবহ বীর বিক্রমে যুদ্ধে ব্যপৃত হলেন আর পরক্ষণেই বিপক্ষের গুলিতে বীরের মত শহীদ হলেন। নবাব সিরাজ এই সংবাদে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ঐ সময় যুদ্ধের গতি নবাবের অনুকূলে যাচ্ছিল। কারণ মীর মর্দানের বীরত্বে মোহনলাল ও সিনফ্রে তখন ইংরেজদের কায়দা করে ফেলে ছিলেন। এমন শুভ মুহূর্তে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর যুদ্ধ বন্ধ করতে আদেশ দেন। ওদিকে ক্লাইভ এই মুহূর্তটির অপেক্ষাতেই ছিলেন। নীরব মুসলমান ও হিন্দু সৈন্যদের ওপর গোলাবর্ষণ চলতে লাগলো। অবশেষে নিরুপায় নবাবের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। নবাবও রাজমহলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে গিয়ে ধরা পড়লেন এবং তাঁকে বন্দি করা হলো। শেষে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

বাংলার বিশ্বাসঘাতক সন্তানেরা এটা বোঝেনি যে, এ পরাজয় শুধু সিরাজের নয়, শুধু বাংলার নয়–সমগ্র ভারতের। আর ঐ জয় ইংরেজ ও ইংল্যাণ্ডের।

কিন্তু সিরাজ পরাজিত ও নিহত কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে পলাশীর যুদ্ধ কোন যুদ্ধই ছিল না। কারণ এটা ছিল যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা মাত্র। আসলে যাদের তিনি বিশ্বাস করতেন উমিচাঁদ, সেনাপতি রায়দুর্লভ, প্রধান সেনাপতি মীরজাফর

আর বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ধনী জগৎশেঠ এঁরাই ছিলেন সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী। শত্রু প্রকাশ্যে হলে তার দ্বারা যত ক্ষতি হয়, বন্ধুশত্রু হলে ফল হয় আরও মারাত্মক। পলাশীর যুদ্ধে এ সত্যই দারুণভাবে প্রমাণিত। তাই দেশহিতৈষী নিরপেক্ষ বিখ্যাত লেখক শ্রী নিখিনাথ রায় লিখেছেন, 'অষ্টাদশ শতাব্দীর যে ভয়াবহ বিপ্লবে প্লাবিত হয়ে হতভাগা সিরাজ সামান্য তৃণের ন্যায় ভেসে গিয়েছিল এবং মীরজাফর ও মীরকাশিম উর্ধ্বক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত কেউ বা অনন্ত নিদ্রায় কেউ বা ফকিরী অবলম্বনে নিস্কৃতি লাভ করেন। জগৎশেঠগণের ক্রোধ ঝটিকা সেই তুফানের সৃজনের মূল।

দুঃখের বিষয় সেই ভীষণ তুফানে অবশেষে তাদেও অনন্ত গর্ভে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। যে বৃটিশ রাজ রাজেশ্বরীর শান্তি ধারায় আসমুদ্র হিমাচল স্নিগ্ধ হইয়েছে জগৎশেঠগণের সাহায্যই তার প্রতিষ্ঠাতা। একজন ইংরেজ লিখিয়েছেন যে, হিন্দু মহাজনের অর্থ আর ইংরেজ সেনাপতির তরবারী বাংলায় মুসলমান রাজত্বের বিপর্যয়। যে বৃটিশ রাজলক্ষ্মীর কিরিটি প্রভায় সমস্ত ভারতবর্ষ আলোকিত হইতেছে মহাপ্রাণ জগৎশেঠগণের অর্থ বৃষ্টিতে ও প্রাণপাতে তাহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।" (ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীঘোষও তাঁর ইতিহাসের ৫১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'আজকের যে কোন বালকও বুঝতে পারে যে পলাশীর যুদ্ধ শুধু যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার মতো অভিনয় ছাড়া কিছু নহে।"

ইংরেজরা যখন ক্লাইভের বিচার করেছিল তখন ক্লাইভ শাস্তিপ্রাপ্ত চোরের মত কোর্টে দাঁড়িয়ে যা উত্তর দিয়েছিলেন তা গুরুত্বপূর্ণ।

"চল্লিশ লাখ পাউণ্ড স্টার্লিং কর এবং সেই পরিমাণ ব্যবসায়ে লাভ হতে পারে এমন একটা সাম্রাজ্য আপনাদের জন্যই আমি জয় করেছি আর তার পারিশ্রমিক হিসেবে আপনারা আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন, আমি যেন একজন ভেড়া চোর।"

তাহলে ভারতের মানুষের এতবড় সর্বনাশ সাধন করার উদ্দেশ্য কী? এর উত্তরে অনেকে অনেক কথা বলেন। তবে একদল বিচক্ষণ পণ্ডিতের মত সাম্প্রদায়িকতাই প্রধান কারণ। মুর্শিদাবাদের কথা বলতেই মনে পরে যায় মুসলমান মুর্শিদ কুলীর নাম। কিন্তু তিনি মুসলমান ছিলেন বলেই তাঁর অপরাধ ছিল না; বরং তাঁর বড় অপরাধ ছিল তিনি ব্রাহ্মণের সন্তান হয়েও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। (এসিয়াটিক সোসাইটির সংরক্ষিত অক্ষয়কুমার মৈত্রের সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক চিত্র' দ্রষ্টব্য)

সিরাজের ইতিহাসে জগৎশেঠদের ভূমিকা

পৃথিবীর ইতিহাস সমালোচনা করে জানা যায় ইংরেজরা মুসলমান শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ে বারবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছে। তার ফলস্বরূপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সারা বিশ্বে মুসলমান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। ক্রুসেডের যুদ্ধ গুলিতেও মুসলমানদের বীরত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

ভারতে ব্যবসাদার ইংরেজ রাজা হয়ে বসতে পারতো না যদি তাদের হাতে ভারতের বিশ্বাসঘাতকদের সহযোগিতা না থাকতো। যে বা যাদের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজরা ভারতের মাটিতে তুলাদণ্ডের পরিবর্তে রাজদণ্ড ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিল তাঁদের মধ্যে জগৎশেঠদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতের যোদপুরের একটি দরিদ্র পরিবার অভাবের জ্বালায় হীরানন্দ মাতৃভূমি ত্যাগ করে, বঙ্গদেশের এক গ্রামে একটি পর্ণ কুটীরে মৃত্যু শায়িতা বৃদ্ধার সেবা করার সুযোগ পান। সেই বৃদ্ধার মৃত্যুর পর তার গচ্ছিত কিছু টাকা হীরানন্দের মূলধনে পরিণত হয়। এমনিভাবে ঐ বংশের মানিকচাঁদের সঙ্গে মুর্শিদকুলী খাঁর ভালবাসা হয়। মানিকচাঁদ কাজ গুছিয়ে বেশ উঁচু ধাপে উঠতে থাকেন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ ফররুখ শাহের নিকট সুপারিশ করে মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁকে শেঠ উপাধি দান করেন। হিন্দু-মুসলমান ভালবাসাবাসিরই এক ঐতিহাসিক্ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই শেঠ উপাধি দান। (রিয়াজুস সানাতিন, Stewarts History of Bengal)

শেঠ বংশের ফতেহচাঁদই প্রথমে জগৎশেঠ উপাধিপ্রাপ্ত হন। আবার রিয়াজুস সানাতিনে ২৭৪ পাতায় পাওয়া যায় মুহাম্মদ শাহও জগৎশেঠ উপাধি দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে মতির মালা এবং কয়েকটি হাতী। সম্রাট মুহাম্মদ শাহকে শেঠজীরা তোষণ ও সেবায় এত মুগ্ধ করেন যে, মুর্শিদকুলী খাঁর ওপর একবার বিরক্ত হয়ে ফতেহচাঁদকেই নবাব করতে চেয়েছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর সময়ে তাঁর টাকা শেঠদের বাড়িতে যা জমা রাখাছিল তার পরিমাণ সে বাজারের সাত কোটী টাকা যা শেঠজীরা কোনও দিন ফেরত দেননি। (মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ৫৬ পৃঃ, নিখিল চন্দ্র রায়)

ঐ অর্থই যত অনর্থের মূল। সারা ভারতে বহু স্থানে শেঠদের গদি ছিল। ইংরেজরা প্রথম শেঠদের হাত করেন এবং শেঠরা যত টাকা প্রয়োজন দিতে প্রতিশ্রুত হন। তারপর জগৎশেঠের বাড়িতে গোপন বৈঠক বসে। সেই সভাতে সাহেবদের সঙ্গে সারা ভারতকে তথা সিরাজকে ধ্বংস করতে যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন জগৎশেঠ, রাজা মহেন্দ্ররায় (দুর্লভ রায়) রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস ও মীরজাফর।

একজন প্রস্তাব করেন যবনকে নবাব না করে হিন্দু নবাব করার। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মুসলমান মীরজাফরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে লজ্জিত ও থতমত খেয়ে বললেন মীরজাফরকেই নবাব করে আমরা সিরাজকে সরাতে চাই। উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানগণ খেপে উঠবে না, মুসলমান নবাবের পরিবর্তে মুসলমান নবাব মাত্র। অনেক বাদানুবাদের পর জগৎশেঠ বললেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথাই যুক্তিসঙ্গত। ‘আমরা কেউ নবাব হলে অন্য বিপদ আছে।’ সঙ্গে সঙ্গে ঐ মত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেল।

>Goto List

তাই বলা যায়, ভারতে ইংরেজ রাজ্যই শুধু তাদের গোলাগুলি আর মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতাতেই প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং শেঠজীদের বিশ্বাসঘাতকতাই এর পশ্চাতে প্রধানতম সহায়ক। উল্লেখ জাফরের তুলনায় কোন অংশেই কম ছিল না; বরং শেঠজীদের বিপুল অর্থ সাহায্যই ইংরেজদের এমন দুঃসাহসিক অভিযানের গোড়াপত্তন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও এই বিরাট সত্যকে একেবারে হজম করতে পারেননি, তাই বলেছেন—"The rupees of the Hindu banker, equally with the sword of the English colonel contributed to the overthrough of the Mahammedan powerin Bengal:" অর্থাৎ বাংলায় মুসলমান শক্তিকে ধ্বংস করতে (ভারতে পরাধীন করতে) বৃটিশ সেনাপতির তরবারির সাথে হিন্দু ধনপতিদের অর্থ সম্ভারও সমানভাবে সহযোগিতা করেছিল।

শেঠজীরা শুধুমাত্র ইংরেজদের হাতেই অর্থ দেননি, সিরাজের সৈন্যদের পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সরবরাহ করে ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছেন। আরো দুঃখের কথা, সিরাজকে হত্যা করার প্রস্তাব ইংরেজ সরদারকে ঐ জগৎশেঠই দিয়েছিলেন।

মুর্শিদাবাদ কাহিনীর লেখক নিখিল বাবু বড় দরদ দিয়ে লিখেন হতভাগ্য রাজ্যহারা সর্বাবস্থায় হইয়া অবশেষে প্রাণ ভিক্ষার জন্য প্রত্যেকের পদতলে বিলুণ্ঠিত হয়েছিল তারা প্রাণ দানের পরিবর্তে যদি প্রাণ নাশের কেউ সম্মতিও দিয়ে থাকে তাহলে তার ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক যে সর্ববথা নিন্দনীয় এ কথা মুক্ত কণ্ঠে বলা যেতে পারে।"

জগৎশেঠের মৃত্যু হয়েছিল উচ্চ পর্বত হতে নিচে নিক্ষিপ্ত হয়ে। পৃথিবীর প্রখ্যাত ধনী বংশ দরিদ্রতর হতে সৃষ্টি হয়ে দরিদ্রতম গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে তাদের ভগ্নস্তূপের পাশে বিচরণ করছে।

সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলা সম্পর্কিত ইতিহাসকে সাহিত্য, নাটক, গ্রামোফোন রেকর্ড ও সিনেমা প্রভৃতিতে প্রচার দ্বারা যেভাবে কলঙ্কিত করা হয়েছে তা অত্যন্ত পরিতাপের।

নবাব নাকি চরিত্রহীন ও মদ্যপায়ী ছিলেন। তিনি নাকি নিষ্ঠুর ছিলেন—এ অপবাদ প্রমাণিত হয় তাঁর অন্ধকূপ হত্যার দ্বারা। দুইশত জন ইংরেজকে ছোট একটি অন্ধকার কক্ষে খাদ্য, পানীয় ও বাতাসের অভাব ঘটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল বলে নিরীহ সিরাজের নামে কলঙ্ক দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আরও বহু অভিযোগ আছে সিরাজের নামে।

আমাদের দেশে ইংরেজদের দালালির দলে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা আজও সিরাজকে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদের সম্মানে ভূষিত করতে পারেননি। এছাড়া বিশ্বাসঘাতকতা যতটুকু হয়েছিল সিরাজকে ঘিরে তার সবটুকুই যেন চাপানো হয়েছে কুখ্যাত মুসলমান মীরজাফরের ঘাড়ে। কিন্তু আসল ইতিহাস তা বলে না– একথার সত্যতা সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই কিছুটা আভাস দেওয়া হয়েছে ‘সিরাজের ইতিহাসে জগৎশেঠদের ভূমিকা’ পর্যালোচনায় এবং আরও পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠবে পরবর্তী আলোচনায়।

সিরাজুদ্দৌলা অল্প বয়সে একবার মদ্যপানের কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েছিলেন। কিন্তু আলিবর্দীর প্রাণপ্রিয় সিরাজকে ডেকে মদ আর কোনও দিন স্পর্শ না করার জন্য কোরান ছুঁয়ে শপথ করতে বলেন। তাতে সিরাজ বলেছিলেন, ‘নানা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সিরাজ জীবনে কোনদিন আর মদ স্পর্শ করবে না। যদি করি তাহলে আমি আপনাদের নাতি নামের কলঙ্ক। বলা বাহুল্য, সিরাজ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন সারা জীবন।

এতদ্ব্যতীত নারী লোলুপতার যে মিথ্যা অপবাদটি তাঁর ওপর আরোপ করা হয়েছে তাও ভিত্তিহীন বরং ইংরেজ ও তাদের দালালদের কৌশল মাত্র।

গ্রামোফোন রেকর্ডে সিরাজের কণ্ঠে বলা হয়–‘প্রথমে যৌবনের উন্মাদনায় নারী অনেক চেয়েছি, পেয়েছিও... ইত্যাদি। যখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা তথা ভারতের ভাগ্য নিয়ে যুদ্ধ চলছে, মীর মর্দান নিহত–সৈন্যদের বিশ্বাসঘাকতায় সিরাজের চোখে অশ্রু, তখন রেকর্ডে আমরা শুনি তিনি আলেয়াকে নিয়ে প্রেম-লীলায় মত্ত! এতবড় ভুল বাঙালি হয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে মানুষ কি করতে পারে? তা কি সম্ভব? তবুও কাল যা সম্ভব ছিল না, আজ হয়ত তা সম্ভব এবং আগামীতেও কল্পনা করা আকাশকুসুম নয় যে, আজকের সুধী সমাজ গড়ে তুলবে পূর্ব পুরুষদের মিথ্যা ইতিহাসের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ। শ্রী সুধীর কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “সিরাজ অতিরিক্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি প্রায় নদীতে বন্যার সময় নৌকা হতে আরোহী উল্টায়ে দিয়ে বা ডুবিয়ে দিয়ে এক সঙ্গে এক দুই শত যুবক, যুবতী, স্ত্রী, বৃদ্ধ, শিশু সাঁতার না জেনে জলে নিমজ্জিত হওয়ার নিষ্ঠুর দৃশ্যটি উপভোগ করে আনন্দ লাভ করতেন।”

এই প্রমাণহীন মিথ্যা কাহিনী পড়ে হয়ত অনেকে বলতে পারেন সুধীর বাবু তেমন নামীদামি লোকের মধ্যে গণ্য নন সুতরাং গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল। কিন্তু বিখ্যাত কবি, উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালি বাবু নবীনচন্দ্র সেন যদি অনুরূপ বা ততোধিক, মারাত্মক কিছু বলে বা লিখে থাকেন তবে সুধীর বাবুরই লেখা দোষের হবে কেন? নবীনচন্দ্র সেন শুধু নৌকায় নবাবের নর হত্যার কথা লিখেই ক্ষান্ত হননি; বরং আরও নতুন সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে ‘গর্ভিনীর বক্ষ

বিদারণ' এর ঘটনা অর্থাৎ সিরাজ নাকি জীবন্ত গর্ভবতী নারীর পেট কেটে সন্তান দেখতেন। এমনি আরও কত আজগুবী আর অবান্তর কিংবদন্তীর অবতারণা করে সিরাজের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করার জঘন্যতম প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। সিরাজের অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাসটিও এরই প্রতিচ্ছবি। যার সত্যতা সম্পর্কে অমর সাক্ষী নাকি কলকাতার ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত কুখ্যাত মনুমেন্ট।

অন্ধকূপ হত্যার পশ্চাতে নিষ্ঠুর ঐতিহাসিক

সিরাজের অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শাসকদের চরিত্রে মসী লেপনের এক অদ্ভুত ঐতিহাসিক প্রাকটিস।

তাই এই অন্ধকূপ হত্যা (Black Hole) সম্বন্ধে একটু আলোচনা দরকার। সুধীর বাবু তাঁর রচনায় বাংলা তথা ভারতের কল্যাণের জন্য বেশ বুদ্ধিমানের ও মস্তিষ্কের উর্বর পরিচয় দিতে চেষ্টা করে গেছেন। 'অন্ধকূপ হত্যার' স্রষ্টা সুধীর বাবু নন, তিনি হচ্ছেন ইংরেজ অনুচর মিঃ হলওয়েল (Hal Well)। এই হল ওয়েলকে শ্রী সুধীর বাবু সত্যবাদী ও প্রকৃত ঐতিহাসিকের মর্যাদা দিয়েছেন। সুধীর বাবু মোটামুটি চারটি পয়েন্টের ওপর চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। প্রথমত–যেহেতু হলওয়েল এই ঘটনার নায়ক সেহেতু অন্ধকূপ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য ও বক্তব্য অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়ত–মিঃ কুক এবং হলওয়েলের প্রকাশিত তথ্য প্রমাণ করে তাঁরা অন্তত মিথ্যাবাদী নন। অতএব তাঁদের কথা সত্য।

তৃতীয়ত–যদি এই কথা মিথ্যা হতো তবে Dark এবং Councillor গণ এটাকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি কেন?

চতুর্থত–হলওয়েলের স্বজাতির মধ্যে যারা তার শত্রু তারাই বা প্রতিবাদ করেননি কেন? অতএব উপরোক্ত সত্যতার ভিত্তিতে কলিকাতায় Hal well Monument (হলওয়েল মনুমেন্ট) রচিত।

এক্ষণে উপরের প্রমাণ দিতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, যা রটে তা কিছুও বটে' অর্থাৎ সিরাজের অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীটিকে নিছক গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না কিন্তু তবুও বাঁধা বুলিতে মুগ্ধ হওয়ার চেয়ে একটু যুক্তি তর্কের আশ্রয়ে পূর্ণ তথ্যটি আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমানের পরিচয়।

এইবার মিঃ হল ওয়েলের চরিত্রটা যাঁচাই করা কর্তব্য। ঐ হলওয়েল সাহেবই মীরজাফরকে সিংসাহনচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করে মীর কাশিমকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন এবং তিন লক্ষ নয় হাজার তিনশত টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। এর জীবন্ত প্রমাণ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের Report of the Committee of the House of commons দ্রষ্টব্য। ঐ হল ওয়েলই বিলেতের কর্তৃপক্ষকে পত্র লিখেছিলেন যে, "নবাব মীর জাফর আলি

>Goto List

খাঁর জঘন্য চরিত্রের কথা কি আর জানাব? তিনি ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নওয়াজেস মহিষী ঘষেটী বেগম, সিরাজের মা আমিনা বেগম প্রমুখ সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ঢাকার রাজ কারাগারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছেন।"

এই পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে হলওয়েল সাহেব যে মস্তবড় এক বোকা ও মিথ্যাবাদী তা প্রমাণিত। কারণ হলওয়েল যখন ঢাকায় রাজ মহিলাদের মৃত্যু কাহিনী রচনা করেন তার পরেও তাঁরা সশরীরে জীবিতা ছিলেন। (Long's Selection from the record of India, Vol-দ্রঃ)

Letter to court, Ll77630th September পাঠ করে জানা যায় হলওয়েলের ঐ বানানো কাহিনী পরে অনেকে মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়েছেন।

হলওয়েলের হিসাব

মিঃ হলওয়েলের লেখাতেও প্রমাণ হয় সিরাজের কলকাতা আক্রমণের পূর্বে কলকাতা দুর্গে ষাটজন মাত্র ইউরোপীয়ান ছিলেন। ঐ ষাটজনের মধ্যে গভর্নর ড্রেক, সেনাপতি, মিনচিন, চারল্স্ডগলাস্, ওয়েভার ব্যারণ, ক্যাস্টনহেনরী, লেঃ মেপল টফট, রেভারেণ্ড ক্যাস্টন, ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড, মানিংহাম ও গ্রান্ট প্রমুখ দশজন বীরপুরুষ পালিয়ে গিয়েছিলেন।

তাহলে হলওয়েলের মতে ষাট থেকে দশ গেলে বাকি থাকে পঞ্চাশ অর্থাৎ সিরাজের হাতে মাত্র পঞ্চাশজনের প্রাণহানি হয়। কিন্তু ঐ হলয়েল সাহেব আবার কী করে শতাধিক লোকের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করেছেন তা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। এই তথ্যগুলোর প্রমাণ মেলে "Halwell's Letter to the Honble the court of directors, dated Falta, 30th Nov. 1756, para 36" দ্রষ্টব্য।

পূর্বে বলা হয়েছে মিঃ ড্রেকের দুর্গ পরিত্যাগের পর ১৭০ জন দুর্গে জীবিত ছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী মিঃ গ্রে বলেছেন, ১৯ জুন রাত্রে একজন ইংরেজ সৈন্য ৫৭ জন ডাচ সৈন্যসহ শত্রুপক্ষে যোগদান করে। প্রমাণস্বরূপ Gray's Letter, Hill Vol Ip-108 দ্রষ্টব্য।

আবার মিঃ ওয়াটস্ বলেছেন, মিঃ ড্রেকের দুর্গ ত্যাগের পর এবং দুর্গের পতনের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীরের উপরেই নিহত হয় ৫০ জন সৈন্য। Hill: Vol-I, p-88 -তে উক্ত তথ্যের প্রমাণ মেলে।

এদিকে হলওয়েল বলেছেন, গোলন্দাজ বাহিনীর ৩১ জন সৈন্য ২০ জুনের দুপুরের পূর্বেই নিহত হয়। প্রমাণঃ Hill: Vol-I, p-114 দ্রঃ।

মিঃ মিলস্ বলেন, দুর্গের পতনের সময় ১৮ জন সৈন্য পলায়ন করেন। প্রমাণঃ Vol-1P-44

মিসেস ম্যাসির পত্রে পাওয়া যায়, তাঁর ভ্রাতা ও মিঃ পলক ঐ সময় পলায়ন করেন।

প্রমাণ ঃ Hill: Vol-1, P-182 দ্রষ্টব্য। কিন্তু মিঃ পলকের নাম মিঃ মিলসের তালিকার মধ্যে পাওয়া যায় না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ১৭০ জন লোকের মধ্যে ১৫৭ জন দুর্গ পতনের পূর্বে নিহত হয় বা পলায়ন করে। সুতরাং মাত্র ১৩ জন দুর্গের মধ্যে থাকে বা ছিল।

অন্য অনেক কাগজ পত্রে বা রেকর্ডে দেখা যায় দুর্গ সংলগ্ন পরিখা বা খালে সাতার দিয়ে পালাবার সময় অনেকে ডুবে মারা যায়। প্রমাণঃ Hill: Vol-1, P-50, 208, 293, Vol-3, P-169 দ্রষ্টব্য।

ক্যাপটেন কলিনস্ এইভাবেই মারা গিয়েছিলেন। প্রমাণ ঃ Hill Vol-3, P-72, 105 দ্রষ্টব্য। এইসব ঐতিহাসিক হিসাব বা গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাত্র ৮ হতে ১০ জন ইংরেজ দুর্গে বর্তমান ছিল।

তাই ঐ হলওয়েলের কুকীর্তির স্বরূপ দেখে নিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন বাংলার বীর সন্তান শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বলেন, মুসলমানদের কথা ছাড়িয়ে দাও। তাঁরা না হয় স্বজাতির কলঙ্ক বিলুপ্ত করার জন্য স্বরচিত ইতিহাস হতে এই শোচনীয় কাহিনী সযত্নে দূরে রাখতে পারেন। কিন্তু যারা নিদারুণ যন্ত্রণায় মর্মপীড়িত হয়ে অন্ধকূপ কারাগারে জীবন বিসর্জন করলেন তাদের স্বদেশীয় স্বজাতির সমসাময়িক ইংরেজের কাগজপত্রে অন্ধকূপ হত্যার নাম পর্যন্তও দেখতে পাওয়া যায় না কেন?"

শ্রীমতি, হেমলতা দেবী লিখিত "ভারত বর্ষের ইতিহাস" পুস্তকের সমালোচনায় শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখা 'ইতিহাস' পুস্তকের দ্বিতীয় মুদ্রণে ১৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "সিরাজুদ্দৌলার রাজ্য শাসনকালে অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ লেখিকা অসংশয়ে প্রকাশ করেছেন। যদি তিনি শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'সিরাজুদ্দৌলা' পাঠ করতেন তবে এই ঘটনাকে ইতিহাসে স্থান দিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হতেন।"

পলাতক ইংরেজ বীরপুরুষগণের পলায়নের বিবরণে বা সিরাজের প্রতি পিগটের পত্রে অথবা সিরাজকে লিখিত ওয়াটগণের ও ক্লাইভের বীরত্বপূর্ণ পত্রে অন্ধকূপের কোনও উল্লেখ নেই। এমনকি আলিনগরের সন্ধির কাগজেও তার উল্লেখ নেই।

ক্লাইভ কোর্ট অফ ডিরেক্টরকে যে পত্র লিখেছেন তাতে সিরাজকে কেন সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছে তার বিবরণ আছে, কিন্তু অন্ধকূপ হত্যার কোন কথাই সেখানে নেই। অথচ সুধীর কুমার আর নবীন কুমারের নবীন কলম নবীশতায় তাকে জোরশোরে প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তাই তাদের এহেন ধৃষ্টতা বহু দৃঢ়চেতা সৎ মানুষ কথা অক্ষয় কুমার মৈত্র, বিহারীলাল সরকার, গিরিচন্দ্র ঘোষ, নিখিলরায়, কবি রবিন্দ্রনাথ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরনেতা নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসুসহ অনেকের মনকে বেদনা দিয়েছিল।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমারের আন্দোলন এবং কলমের অগ্নিবর্ষণকে নেতাজী দারুণভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ফলে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ২৪ মার্চ কলকাতার হিষ্ট্রীক্যাল সোসাইটির মাধ্যমে এসিয়াটিক সোসাইটির ঘরে এক বিরাট সভায় উপস্থিত বঙ্গবীর অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, জে, এইচ, লিট্‌ল, এফ, জে, মানাহন প্রমুখের সম্মুখে ঐ অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস উপন্যাস, উপকথার মত নিক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ ঘটনাটি মিথ্যা বলে স্বীকৃতি পায়। তার কিছুদিন পরে জে, এইচ, লিট্‌ল Calcutta Historical Socicty-এর ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় তা প্রকাশ করে দেন এবং অন্ধকূপের জন্য বলা হয় Gigantic hoax অর্থাৎ প্রকাণ্ড ধাপ্‌পাবাজি। উপরোক্ত তথ্যাদি

Bengali past and present, vo1-XI, Serial No-1, P,P,-75-10' হতে সংগৃহীত।

সিরাজ বিদ্বেষী ইংরেজদের কল্পিত অন্ধকূপে প্রায় দুশ জন লোকের বন্দির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেই ঘরটির আয়তন হচ্ছে মাত্র ১৮×১৪। সুতরাং স্থান সংকুলান হয় না দেখে থেকে কমিয়ে ১৪৬ জন ধরা হয়েছে, কিন্তু শয়তানের দল যখন দেখল ঐ পরিমাণ স্থানে ১৪৬ জনেরও স্থান সংকুলান হতে পারে না তখন সঙ্গে সঙ্গে সুর পাল্টে ১৪৬ হতে মাত্র ৬০ সংখ্যায় এনে দাঁড় করানো হল। এরই নাম ইতিহাস।

ব্যবসাদার কবি ও সাহিত্যিকদের নীতি হচ্ছে, 'মামার জয়' বলার মত অর্থাৎ যখন যেদিকে বাতাস বইবে সেদিকেই লিখে যাওয়া, স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া। বীর তারাই যারা প্রয়োজনীয় বিষয় সকল বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করেও সমাজের সামনে তুলে ধরতে সাহসী হন। তাই অক্ষয় কুমার, সুভাষ বোস প্রমুখ বীর সন্তানদের প্রতি ধন্যবাদ যে, যখন দেশ স্বাধীন হয়নি সেই সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে কথা বলা বা আন্দোলন করা খুবই বীরত্বের পরিচয় সন্দেহ নেই।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে সুভাষ বোস ঐ অন্ধকূপ হত্যার মনুমেন্টটি ভেঙে ফেলার দাবি করেন। ফরে বিরাট আন্দোলন হয়। শত্রু ইংরেজ এবং মুসলমান বিদ্বেষী অনেক অমুসলমানই সেদিন অবাক অথবা অসন্তুষ্ট হন কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, তবে ধৈর্যের প্রয়োজন। ইংরেজ রাজত্বের রাজধানী কলকাতায় ঐ মনুমেন্ট ইংরেজকে ভেঙে ফেলতে বাধ্য হতে হয়।

এদিকে গিরিশ ঘোষ 'সিরাজউদ্দৌলা' নামে একটি সঠিক সুন্দর বই সাহসের সঙ্গে লিখলেন। তার উপর অক্ষয় বাবুর 'সিরাজউদ্দৌলা ও মীরকাসিম' অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে। পরে সত্য চরণ শাস্ত্রী একখানি বই লিখলেন তার নাম 'জালিয়াত ক্লাইভ'। তারপর সখারাম গণেশ দেউস্কর 'দেশের কথা' নাম দিয়ে এ সম্বন্ধেই আর একখানা বই লিখলেন। এটিই বেশ উপাদেয় বই। এর দু-একটি বাক্য এখানে তুলে ধরছি—"ইংরাজ ইতিহাস লেখকেরা হিন্দু ছাত্রদের হৃদয়ে

মুসলমান বিদ্বেষ প্রজ্বলিত রাখবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছেন, পরিতাপের বিষয় কোন কোন অদূরদর্শী হিন্দু লেখক কাব্য নাটকাদিতে অনর্থক মুসলমান ভ্রাতাদিগের নিন্দাবাদ করে ইংরাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করতেছেন।"

উক্ত মন্তব্যটি গভীরভাবে পাঠক-পাঠিকাবৃন্দকে স্মরণ করে দিচ্ছে যে, সমাজের বর্তমান অবস্থা একেবারে সখারাম মহাশয়ের লেখার সঙ্গে সাংঘাতিকভাবে সঙ্গতি রক্ষা করে। যাইহোক, বিরাট ইতিহাস সমুদ্রের মাত্র এক পাত্র নোনা জলকে সিরাজকেন্দ্রিক কলমে পরিশ্রুত করা হয়েছে কিন্তু বাকি তথ্য আর কতদিন দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুভাষ আর অক্ষয়ের অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করবে জানি না।

আবার এদিকে গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একটি নাটক লিখলেন যা সহজে বিষাক্ত ও চলতি নাটকের একেবারে উল্টো। সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ক একটু নড়ে উঠল-তাহলে ইতিহাস যা শুনি তাতো ঠিক নয়। কবি নবীনচন্দ্র সেন ঐ বইটি পড়ে একটি পত্র লিখলেন গিরীশচন্দ্রের নামে তাও এখানে তুলে ধরা হলো–

ভাই গিরিশ,

বিশ বছর বয়সে আমি 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখেছিলাম, আর তুমি ষাট বছর বয়সে 'সিরাজুদ্দৌলা' লিখেছ। আমি বিদেশী ইতিহাসে যেভাবে পাইয়াছি সেভাবে চিত্রিত করেছি কিন্তু তুমি সিরাজের নিখুঁত চিত্রটি অঙ্কিত করছ। অতএব তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান।"

অত্যন্ত দুঃখের কথা সিরাজের ইতিহাসে শুধু যেন মনে হয় মুসলমান মীর জাফরের কথা, যেন প্রমাণ হয় মুসলমান জাতি মানেই বিশ্বাসঘাতক জাতি। তাই আজ মুর্শিদাবাদ জেলা ও মুসলমান জাতি পর্যন্ত বাংলার বাতাসে যেন কলঙ্কিত। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস এই কথাই বলে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতার আকাশ ছোঁয়া অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়েছিল তা মুসলমানদের হাতেই। 'সিপাহী বিদ্রোহ' তার জ্বলন্ত প্রমাণ, আর এই "সিপাহী বিদ্রোহের" গোড়াপত্তনের দাবিতে যে জেলা গৌরবের অধিকারী, ইতিহাসমণ্ডিত উল্লেখযোগ্য স্থান মুর্শিদাবাদের সদর শহর 'বহরমপুর'। যাঁরা দিলেন খুন, যাঁরা দিলেন জীবন তাঁদের ভাগ্যে পুরস্কারের পরিবর্তে তিরস্কার। হায়! এই নাকি ইতিহাস!

সিরাজ কি সত্যই নিষ্ঠুর ছিলেন?-এই প্রশ্নে অনেকে বিচলিত হন। অথচ ইতিহাস প্রমাণ করে সিরাজ সত্যই নিষ্ঠুর ছিলেন না।

সিরাজ জানতেন মীর জাফরের হাবভাব। তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন হবে এই যে, সিরাজ যদি জানতেন মীর জাফরের দ্বারা স্বাধীন ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ উদয় হবে তবে কেন তাঁকে পূর্বাহ্ণেই সরিয়ে দেননি? স্বাধীন ভারতের প্রতি সিরাজের এটা কি নিষ্ঠুরতা নয়? উত্তরে বলব-না। কারণ মীরজাফর সিরাজের

সম্মুখে পবিত্র কুরআন ছুঁয়ে শপথ করে বলেছিলেন যে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিংহাসন রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন। তাই পবিত্র কুরআনের সম্মানার্থে বিশ্বাসঘাতকতার পূর্বেই তাঁকে শাস্তি দিতে পারেননি। এটা নিষ্ঠুরতা না উদারতা তা অনুমান সাপেক্ষ।

বীর সিরাজ ওয়াট সাহেবকে সপরিবারে বন্দি করে কাশিমবাজার হতে মুর্শিদাবাদে নিয়ে এসেছিলেন। সিরাজ জননী আমিনার কোমলতায় সিরাজের করুণাবতী স্ত্রী লুৎফুন্নেসা তাঁদের মুক্তি দিয়েছিলেন। যখন সিরাজ ঘটনাটা শুনলেন তখন গর্ভধারিণী মা বা সহধর্মিনী স্ত্রী কাউকেই তিরস্কার অথবা কৈফিয়ত চাওয়ার কোন ভূমিকাই তিনি নিতে পারেননি। এটাও সিরাজের সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা ও উদারতা না নিষ্ঠুরতা তাও বিবেচনার ভার পাঠক- পাঠিকাদের ওপর থাকল।

রাজা রাজবল্লভ অলিবর্দীর আমলে প্রজাদের সর্বনাশ সাধন করে যে বিরাট অঙ্কের ধন সঞ্চয় করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র কৃষ্ণরায় মারফত সেই প্রচুর অর্থ যখন ইংরেজদের ঘাঁটিতে পাচার হয়েছিল তখন সিরাজ রাজবল্লভ ও তাঁর পুত্র কৃষ্ণরায়ের ওপর স্বাভাবিকভাবেই অসন্তুষ্টই হয়েছিলেন। ঠিক তার পরেই তিনি কলকাতার দুর্গ নির্মাণের অপরাধে কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন এবং বিশ্বাসঘাতক হলওয়েল সাহেব, কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদকে ইংরেজদের কাছ হতে বন্দি করে নবাবের সম্মুখে আনা হল। বলাবাহুল্য, এই কৃষ্ণদাসের পাচার করা প্রচুর অর্থই কলকাতা দুর্গ নির্মাণে ইংরেজদের হাত শক্ত করেছিল। তাই কৃষ্ণদেবের কাণ্ডকে কেন্দ্র করেই সিরাজের কলকাতা অভিযান। সিরাজ যখন তাঁদের হাতের মুঠোয় পেলেন তখন তাঁরা জানতেন প্রাণদণ্ডই হয়ত আমাদের যোগ্য শাস্তি। কিন্তু তিনজনেই ক্ষমা প্রার্থনা করলেন আর সিরাজ প্রত্যেককে ক্ষমা করে বা মুক্তি দিয়ে ক্ষমাধর্মের অতুলনীয় মাহাত্ম্যকে অক্ষুণ্ন রাখলেন। এরই নাম বোধ হয় নিষ্ঠুরতা?

সিরাজের ঐতিহাসিক নিমজ্জন

সিরাজ আওরঙ্গজেবের ন্যায় ইসলামের পূর্ণ প্রতীকও যেমন ছিলেন না তেমনি আকবরের ন্যায় স্বধর্মের নিপাত সাধনে অগ্রগামী নায়কও ছিলেন না; বরং তাঁকে ধর্মভীরু বলার পথে কোন প্রতিবন্ধক নেই। কেননা যখন তিনি বন্দি ছিলেন তখন তাঁর কক্ষে মুহাম্মদীবেগ উলঙ্গ তরবারী হাতে প্রবেশ করলেই সিরাজ অনুমান করেছিলেন তাঁর মৃত্যু সংবাদ আগত। তখন সিরাজ কাতর কণ্ঠে বললেন–'মুহাম্মদী বেগ তুমি আমায় কতল করতে এসেছ'? মুহাম্মদী বেগ তখন নিশ্চুপ। নবাবের মুখের দিকে তাকাতেও যেন সে অপারগ। আবার কাতর কণ্ঠে নবাব বললেন–'আমাকে কি তোমরা সামান্য একটা অসহায় গরিবের মত বেঁচে থাকতেও দেবে না'? এবার মুহাম্মদী বেগ গলাটা সামান্য পরিষ্কার করে

বললো–'না, তারা তা দেবে না, আমিও বাঁচতে চাই না, হুসেন কুলীর মৃত্যুর প্রতিশোধ হোক।' বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা তথা সারা ভারতের দেদীপ্যমান আলোকবর্তিকা নবাব সিরাজুদ্দৌলা তাঁর দেশবাসীর চোখের আড়ালে অশ্রু মুছে আবার কাতর কণ্ঠে বললেন–'আমাকে একটি বার সুযোগ দাও, আল্লাহর সন্নিধানে যাবার পূর্বে শেষ দুই রাকাত নামায পড়ে নেই'। মুহাম্মদী বেগের চক্ষুদ্বয় তখন বর্ষণোন্মুখ। অশ্রুবর্ষক মেঘে কিছু দেখতে পায় না যে, উত্তরও দিতে পারে না। নবাব বুঝলেন মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। তাই জীবনের অন্তিম প্রার্থনাময় নামাযে আত্মনিয়োগ করলেন। নামায তখনও শেষ হয়নি, দূরে বাঁশির সংকেত শ্রবণে মুহাম্মদী বেগ প্রার্থনারত অবস্থাতেই তরবারী চালনা করলো নবাবের পিঠের উপর। ঐ আঘাতেই লুটিয়ে পড়লেন নবাব। অতঃপর আরও কয়েকটি আঘাত করলো মুহাম্মদী বেগ। সিরাজ শুধু একবার বলেছিলেন, 'আল্লাহ তুমি আমায় ক্ষমা করো'। তারপর রক্তাক্ত সিরাজ শুধু আল্লাহ্ আল্লাহ্ শব্দ করতে করতেই চিরবিদায় নিলেন।

এই ঘটনায় অল্পজ্ঞানী পাঠক মুসলমান ভৃত্য কত বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর হতে পারে তারই শিক্ষা পারে কিন্তু সূক্ষ্ম ও সুস্থ জ্ঞানীর নিকট ধরা পড়বে আসল রহস্য।

ইংরেজরা যখন সিরাজকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত বন্দি করেছিল তখন সিরাজের সমস্ত চাকর-চাকরানী আর সিরাজের ছিল না; বরং ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ক্লাইভ আর ওয়াটসের হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় ইতিহাসে মুসলিম চরিত্রকে কলঙ্কিত করার পরিকল্পিত বুদ্ধিতেই সিরাজের সাহায্যপুষ্ট মুহাম্মদী বেগকেই আদেশ করা হয়েছিল সিরাজকে হত্যা করতে। মুহাম্মদী বেগ তাতে রাজি না হওয়ায় তারও প্রাণদণ্ড হবে বলে তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। তখন অন্যোন্যপায় নিরক্ষর বোকা মুহাম্মদি বেগ অশ্রুসম্বরণ করেও মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। যদি মুহাম্মদী বেগ শিক্ষিত ও জ্ঞানী হতো তাহলে হয়ত ইংরেজদের আদেশ প্রত্যাখ্যান করে নিজের প্রাণদণ্ডকেই অমৃত জ্ঞানে বরণ করে মীর মর্দান আর মোহন লালের মত ধন্য হতে পারতো। সিরাজ যখন একটু অসহায়ের মত বেঁচে থাকার আবেদন করেছিল তখন মুহাম্মদী বেগ এ কথা বলেছি যে, না, আমরা তা দেব না; বরং তাঁর ভাষাতে হৃদয়ের অবারিত প্রেমধারাই প্রবাহিত হয়েছিল, 'না, তারা তা দেবে না।' এই তারা কারা?

যাইহোক, সিরাজকে হত্যা করে তাঁর মৃতদেহকে একটি বস্তায় ভরে হাতীর পিঠে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সিরাজের স্ত্রী, মা এবং অনেক আত্মীয়া তখন বন্দিনী। তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তাঁরা আলিবর্দীর বিখ্যাত বাগানের আম খেতে চান কি না। অশ্রু সজল নয়নে তাঁরা ইঙ্গিতে সম্মতিই দিয়েছিলেন।

তারপর করুণার জীবন্ত ছবি ইংরেজ কর্মচারীর আদেশ অনুযায়ী অর্দ্ধ ভর্তি আমের বস্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। নবাব পরিবারের সমস্ত মহিলাদের পক্ষ হতে একজন বস্তার মুখ কুলতেই দেখতে পেলেন ভেতরে আমও নেই বা অন্য কোন খাদ্য বস্তুও নেই, আছে সিরাজের বীভৎস কাঁচা কাটা মাথা। সিরাজ যেন তাঁর গর্ভধারিণী মাকে শেষ দেখা দেখতে এসেছে। সিরাজের হতভাগিনী মা প্রিয় পুত্রের মুখের দিকে এক পলক তাকাতেই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সম্বিত ফিরে এলে মীর জাফরের অনুচর গোলাম হোসেনের আদেশে তাঁকে পুনরায় কারারুদ্ধ করা হয়।

এদিকে জয়নুল আবেদীন নামক এক দরিদ্র নাগরিকের অনুরোধে সিরাজের খণ্ডিত দেহকে ভাগীরথী নদীর পারে খোসবাগ নামক বাগানে নানাজান, আলিবর্দীর কবরের পূর্ব পাশে সমাধিস্থ করা হলো। আবার মৃত নানা ও নাতীর এক ঐতিহাসিক মিলন হয়েছিল মৃত্যুর পরেও। এ প্রসঙ্গে বর্ধমান জেলার এক কবির কবিতার কিয়দংশ গভীর শ্রদ্ধার সাথে তুলে ধরছি—

“আলীবর্দীর কবরের ছায়া সূর্যাস্তের সনে,
ধীরে ধীরে পরে সিরাজের গোরে! দেখি ভাবি মনে;
আজো বুঝি দাদু ভোলে নাই তারি স্নেহের দুলালটিরে,
আজো বুঝি তারে দুটি বাহু দিয়ে রেখেছে সোহাগে ঘিরে।”

সিরাজের ইতিহাস পৃথক একটা পুস্তকে তুলে ধরাই সম্ভব। তার জন্য বহু ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের হাতে মজুত আছে। কিন্তু এখানে সংক্ষিপ্ত মাত্র জানানো হলো।

>Goto List

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

সিরাজোত্তর সংক্ষিপ্ত বাংলা

ইংরেজরা ক্লাইভকে নিয়ে খুব গর্ব করতো, কি বিরাট বাহাদুরী আর বীরত্বই না তিনি দেখিয়েছিলেন পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে। কিন্তু পলাশীর ওটা যে কোন যুদ্ধই নয় এবং সেনাপতি আর গণ্যমান্য কিছু দেশবাসীর আত্মসমর্পণ ছিল সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিলেতি সাহেবদের বিলেতি বীরত্বের ইতিহাস বিলেতে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য পলাশী আমবাগানের শেষ শুষ্ক আম গাছটির গোড়ায় মাটি খুঁড়ে গাছটির মূল উপড়ে নেয়া হয়েছে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে। তারপর সগর্বে তা বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিলেতের মাটিতে। দেশবাসীর দেখার তৃপ্তি মিটে যাওয়ার পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে শ্বেত মার্বেল পাথরে জয়স্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছে। ক্লাইভ মিথ্যা সম্মানের যে বুদ্বুদ নির্মিত গগনচুম্বী অট্টালিকা তৈরি করেছিলেন কিছুদিন পরে সামান্য সূর্যালোকে তা শেষ হয়ে গেল। প্রকাশ হয়ে গেল ভেতরের তথ্য। নানা গুপ্ত দোষ হয়ে গেল প্রকাশিত। তাই হয়ত তাঁর শেষ পরিণতি হলো রক্তাক্ত মৃত্যু। অর্থাৎ কাপুরুষের মত নিজের কণ্ঠে কলুষিত হস্তে ধারাল ক্ষুর ধরে শ্বাসনালী কর্তন করে আত্মহত্যার কলঙ্ক নিয়ে ইতিহাসের পাতায় আত্মগোপন করার চেষ্টা করলেন।

এদিকে মীরজাফর ইংরেজদের সুপরিকল্পিত সিদ্ধান্তে বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি ইংরেজদের হাতে উপঢৌকনের নামান্তরে মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদানের ফলে তাঁর ধনাগার প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। অবশেষে অর্থ দিতে অপারগ হলে তাঁকেও হলওয়েলের কৌশলে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁরই জামাতা মীর কাশিমকে সিংহাসনে বসানো হয়। মীর কাশিম বেশ বুঝতে পারছিলেন ইংরেজরা তাঁদের গোটা ভারত দখল করতে চায়। তিনি এও বুঝেছিলেন ইংরেজরা তাঁদের শক্তির দ্বারা এখনি তাঁকে পরাজিত করে রাজা হয়ে বসতে সক্ষম। কিন্তু তারা এখনিই তা চায় না, কেননা বাংলার জনতা বিশেষত মুসলমানরা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে আর সেই বহ্নি সারা ভারতের বুকে ছড়িয়ে যেতে পারে। তখন তা সামলানো হবে মুশকিল। অতএব এই নবাবী শুধুমাত্র প্রহসন। তাই মীর কাশিম 'করি অথবা মরি' নীতি অবলম্বন করে ইংরেজদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে বদ্ধপরিকর হলেন।

ইংরেজরা চাষীদের উৎপাদিত শস্য দরিদ্র দেশবাসীর দোকানের মাল যথেষ্টভাবে নিয়ে দাম দিত না। খুব অনুগ্রহ হলে কিছু দিত মাত্র। এছাড়া ইংরেজরা বহুদিন ধরে একটা বাণিজ্যকর দিয়ে আসছিল তাও বন্ধ করে দেয়। এ সমস্ত কারবার দেখে মীর কাশিম তাঁর হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের জানিয়ে দিল যে, তাদেরও আজ থেকে কোন কর দিতে হবে না। কারণ আমার দেশবাসী কর দেবে আর শোশক ইংরেজ কর ফাঁকি দিয়ে ভারতে শিকড় গাড়বে তা হয় না।

এই ঘোষণায় ক্রোধান্ধ হয়ে ইংরেজরা মীর কাশিমকে সিংহাসনচ্যুত করতে মনস্থ করলে তিনি বীরবিক্রমে সসৈন্যে ইংরেজেদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধ আরম্ভ হলো। ইংরেজরা কাটোয়া, গিরিয়া, উদয় নালা, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে মীর কাশিমকে পরাস্ত করে। মীর কাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং দিল্লীর সুলতান বাহাদুর শাহের সাহায্য প্রার্থনা করলে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে যথাসাধ্য সৈন্য নিয়ে মীর কাশিমের দুই পাশে এসে দাঁড়ালেন বকসার নামক যুদ্ধক্ষেত্রে। তথাপি মীর কাশিমের ভাগ্যে পরাজয় নেমে আসে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা ভারতের ইতিহাসে এই যুদ্ধ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। স্যার জি, স্টেপহেনও বলেছেন, "Buxar deserves far more than plossey to be considered as the origin of the British power in India."

১৭৭৪ খৃস্টাব্দে বক্সার যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। মীর কাশিম তখন তাঁর রাজধানী মুঙ্গেরে পলায়ন করেন। ১৭৭৭ খৃস্টাব্দে তিনি বাংলার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের অলক্ষে দিল্লীর বুকে পরলোক গমন করেন।

ইংরেজরা আবার মীরজাফরকে পুতুলের মত নবাবী আসনে অধিষ্ঠিত করে। ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে দিল্লীর শাহ আলম বুঝতে পারলেন বাংলার মুসলমান শক্তি নিভিয়ে গেছে। সেখানে অতঃপর যুদ্ধ করতে যাওয়া আত্মহত্যার নামান্তর। ইংরেজ এখন বহুগুণে বলীয়ান। ঠিক এই সময় ক্লাইভ শাহ আলমের কাছ হতে ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন।

ইংরেজদের বহুদিনের সাধ পূরণ হলো। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখন সামরিক বিভাগ এবং রাজস্ব বিভাগ হাতে পেল। ক্লাইভ শোষণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন বটে কিন্তু তা সাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে যাতে হয় তার জন্য রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন হতভাগ্য দুই বাঙালির ওপর। একজনের নাম মুহাম্মদ রেজা খান অপরজনের নাম শ্রী সিতাব রায়। বিদেশী বণিক ইংরেজ শোষণের ঝাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরল জনসাধারণের অর্থনৈতিক কণ্ঠ। দেশের চারদিকে অসন্তোষ দেখা দিল। ১৭৭০ খৃস্টাব্দে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেল। বাংলা হিসাবে ১১৭৬ সালের এই দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াশ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করল। ১১৭৬ সালের এই দুর্ভিক্ষেই ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে

পরিচিত। এই সময় ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানীর হাত হতে নিজ হাতে দায়িত্ব নিয়ে নবাবকে বৃত্তিভোগী কর্মচারীতে পরিণত করেন।

ভারতের মারাঠা শক্তি মোঘলদের বহুবার বিব্রত করতো। পূর্বেই তাদের লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি অপরদিকে তাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ইতিহাসে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এখন কিন্তু মারাঠা রাজপুতরা এবং দেশের অমুসলমান জনসাধারণের নীরব দর্শক।

মারাঠাদের দ্বারা ভারতের সাংঘাতিক সর্বনাশের আর একধাপ ঐতিহাসিক তথ্য এই যে, ১৭৭২ সালে পেশোয়া মাধব রায়ের মৃত্যুর পর মারাঠারা এত নোংরা ঘরোয়া বিবাদ শুরু করেছিল, যা এক চরম পর্যায়ে পৌছায়। ঐ সময় পূর্ব হতেই রঘুনাথ রাও আর মাধব রাও-এর মধ্যে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। মাধবের মৃত্যুর পর তার ভাই নারায়ণ রাও 'পেশোয়া' পদ অধিকার করলেন। বলা বাহুল্য, ঐ অসভ্য জাতি পেশোয়া পদটির জন্য এত লালায়িত যে, যে কোন নাশকতামূলক কাজ করতে তারা পিছপা হত না। যা হোক, নারায়ণ রাও তাঁর পিতৃব্য রঘুনাথ রাওয়ের চক্রান্তে কয়েক মাসের মধ্যেই নিহত হন। কিন্তু চক্রান্তকারী রঘুনাথ রাওয়ের ভাগ্যেও পেশোয়া হওয়া হয়ে উঠল না; বরং নারায়ণ রাওয়ের শিশুপুত্র দ্বিতীয় মাধব রাও নারায়ণ পেশোয়া পদে বরণ করা হয়। তখন রঘুনাথ রাও ক্রোধের আতিশয্যে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। প্রতিশোধ তাঁকে নিতেই হবে। পেশোয়া তাঁকে হতেই হবে।

সেটি ছিল ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ। রঘুনাথ একেবারে বোম্বাইয়ের গভর্নমেন্টের সঙ্গে চুক্তিতে টিপ সই করেন। ঐ চুক্তির নাম "সুরাটের সন্ধি"। ইংরেজরা ভারতকে আরও শোষণের হাতিয়ারস্বরূপ মারাঠা জাতির প্রত্যক্ষ সাহায্যের রাস্তা পেয়ে গেল।

এইভাবে রঘুনাথ ইংরেজদের সহযোগিতায় পুনরায় মারাঠাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করলেন ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম ভাগে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে ইংরেজরা অপমানজনক "ওয়ার গাওয়ের" সন্ধি করতে বাধ্য হয়। তারপর হেস্টিংস সব চুক্তি ছিন্ন করে মারাঠাদের আক্রমণ করেন। ইংরেজদের পক্ষে ছিল ভোঁসলে ও পায়কোয়াড়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ মারাঠাদের পরাজিত করে বেসিনত্তাকঙ্কন অধিকার করে। এমনিভাবে মারাঠা নেতা নানা ফরনবীশের সমর্থনে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ১৭ মে ইংরেজ-মারাঠা আর একটি সন্ধি হয়। অবশেষে মারাঠা শক্তির অবনতি ঘটে।

১৭২৭ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলী নামক এক বীর সম্ভ্রান্ত কোরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি মহীশূরের হিন্দু রাজার অধীনে সৈনিক হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন। হায়দারের বহু গুণ ছিল, তন্মেধ্যে দুটি গুণ উল্লেখযোগ্য। একটি বীরত্ব আর একটি সততা। ঐ সময়ে রাজার মন্ত্রী ও

সেনাপতিদের মধ্যে মতানৈক্যের ফলস্বরূপ অর্থ দপ্তরের দূরাবস্থাকে রাজা আয়ত্তে আনতে না পেরে অবশেষে হায়দারের হাতে সবকিছু সমর্পণ করেন। হায়দার ঐ ডুবন্ত রাজ্যের হাল সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে শাসন, পোষণ, দান, দয়া, মায়া ও বুদ্ধিপূর্ণ কৌশলে সমস্ত কিছু আয়ত্তে আনেন। তিনি পার্শবর্তী ছোট রাজ্যগুলো দখল করে মহীশূরের সীমানা বৃদ্ধি করে দেশে প্রকৃত শান্তি ফিরিয়ে আনেন। তাঁর অন্তরের আসল ইচ্ছা ছিল ইউরোপীয় আদর্শ ও ভাবধারায় নিজে ও সৈন্যদের সুগঠিত করে ইংরেজদের দেশচ্যুত করা।

এখানে একটা কথা খুব বেশি মনে রাখা দরকার, মুসলমান শাসনের পতন সেখানেই সম্ভব হয়েছে, যেখানে মুসলমান হয়ে ধর্মকে করা হয়েছে উপেক্ষা-অবজ্ঞা। আকবর-জাহাঙ্গীরের ন্যায় সিরাজ হতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ সিরাজ মুসলমান ধর্মের অত্যন্ত জরুরি বা অবশ্য প্রতিপাল্য পঞ্চীয় উপাসনা নামাযকে উপেক্ষা বা অস্বীকার না করলেও অবহেলা করেছেন। আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ের মত আবার সিরাজের সময়েই দেশে মদ্যপান শুরু হয়। অতএব পতন তাঁর অবধারিত হয়ে পড়ে। ভাগ্যে শুধু প্রতিকূল অবস্থার উপস্থিতিই সিরাজের জীবনে লক্ষণীয় আত্মীয়স্বজন বিভ্রান্তি। যুদ্ধে হঠাৎ মীর মর্দানের মৃত্যু পলায়নের সময় নদীতে নৌকা চলার মত জলের অভাব, ক্ষুধার জ্বালায় আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে শত্রুগৃহে কবলিত হওয়া সবই বিশ্ব নিয়ন্তার ইঙ্গিতেরই ফলস্বরূপ।

যাইহোক হায়দারের বীরত্ব বুদ্ধি জ্ঞান প্রতিভার অভাব ছিল না, নামায ইত্যাদি ধর্মনৈতিক আদেশ নিষেধেও তিনি খুব গুরুত্ব দিতেন কিন্তু পুত্র পরিবার বা রাজদরবারে নামায সম্বন্ধে খুব গুরুত্ব দেওয়া হত না। তবে হায়দারের মূলনীতি ছিল ইংরেজ বিতাড়ন। তিনি বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ইংরেজদের দ্বৈত শাসনের ফলে যেমন তারা ছদ্মবেশে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনকর্তা হয়েছে তদনুরূপ সারা ভারতকেও তারা পদানত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এদিকে মারাঠাদের বিশ্বাসঘাকতা তথা ইংরেজদের সাথে হাত মেলানো অপরদিকে অর্থলোলুপ অপদার্থ নিজামের বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কায় তিনি উভয় ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের বোঝান যে, বিদেশী ইংরেজদের পরাজিত করে দেশত্যাগী করতে আমাদের সকলকে একজোট বা সংঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কারণ, তারা শুধু শাসন করতে চায় না, সঙ্গে সঙ্গে শোষণ করতেও চায়। কিন্তু আমরা যে যেখান থেকেই আসি না কেন ভারতকে নিজের মাতৃভূমিরূপে বরণ করে নিয়েছি। অতএব হিন্দু, মুসলমান, শিখ, মারাঠা সবই আমরা ভারতবাসীরূপী ভাই ভাই।

হায়দারের উদার ও যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবে উভয়েই তাঁর হাতে হাত মেলান। এইবার হায়দার ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এটাই

ইতিহাসে প্রথম মহীশূর যুদ্ধ (First Mysore war) নামে খ্যাত। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাঝপথে নৌকা ডুবির মত নিজাম হায়দারের পক্ষ ত্যাগ করেন আর মারাঠারা শুধু পক্ষ ত্যাগ নয় বিপক্ষে ইংরেজদের প্রলোভন প্রলোভিত হয়ে ভীতির কারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু হায়দার বীর বিক্রমে একাই সৎসাহসকে সঙ্গী করে যুদ্ধের অগ্রগতিকে মাদ্রাজের দ্বারে পৌঁছে দেন। ইংরেজগণ হায়দারের অসম্ভব সাহসিকতা আর বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ ব্যবস্থায় ভীত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব দেয়। হায়দার খুব বেশি লেখাপড়া না জানলেও জন্মগতভাবে চতুর ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তাই অনুমান করলেন মারাঠারা অপর দিক থেকে আক্রমণ করলে ঘরের শত্রু বিভীষণে পরিণত হবে, অতএব আপাতত সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করলেও অন্যকোন শক্তি হায়দারকে আক্রমণ করলে ইংরেজরা তাঁকে সাহায্য করবে।

এদিকে হায়দারের অনুমানই বাস্তবে পরিণত হয়। মারাঠারাই ১৭০০ খৃস্টাব্দে মহীশূর আক্রমণ করল। কিন্তু সন্ধির শর্তানুযায়ী ইংরেজরা কোন সাহায্য দানে এগিয়ে এল না। আবার হায়দার পূর্বের ন্যায় জ্ঞানগর্ভ যুক্তিতে মারাঠাদের বোঝালেন। ফলে পুনরায় তারা হায়দারের সঙ্গে সহযোগিতা করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ার সদিচ্ছা জ্ঞাপন করে। নিজামও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একমত বলে জানান। হায়দার আবার সাহসে ভর করে সসৈন্যে মাদ্রাজ পৌঁছান। কিন্তু এবার পরোক্ষভাবে নয় বরং প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজদের পক্ষে যোগদান করে মারাঠারা ও নিজাম সাহেব হায়দারকে প্রতারণা করেন। এবার আর সন্ধির কথাও নয় বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন হায়দার। তাঁর সুযোগ্য ও বীর সন্তান টিপু ইংরেজদের এমনভাবে পরাজিত করলেন যে তারা আর পলায়নেরও সুযোগ না পেয়ে অবশেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। হায়দার তাঁর বীর সন্তানের বীরত্ব দেখার সুযোগ বেশিদিন পাননি। এক কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ১৭৮২ খৃস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

টিপুর জন্ম হয় ১৭৫০ খৃস্টাব্দে। বীর পিতার মৃত্যু হলেও তিনি (হায়দার) 'মহীশূরের বাঘ' নামে খ্যাত ছিলেন। যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্ররূপে টিপুও পিতা অপেক্ষা বীরত্বে কোন অংশেই কম ছিলেন না। পিতার ন্যায় এরও নীতি ছিল ইংরেজদের দেশচ্যুত করা। তিনি মেথিউ সাহেবকে বদনূরে সসৈন্যে বন্দি করেন এবং মাঙ্গালোর অধিকার করেন। ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে ইংরেজরা টিপুর সাথে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে সন্ধি করে বন্দি বিনিময় অঞ্চল নির্ধারিত করে। কিন্তু ইংরেজগণ এবারও সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে মারাঠা ও নিজামের সহাযোগিতায় বিভিন্ন দিক হতে মহীশূর আক্রমণ করে। টিপু এক বছর পর্যন্ত তাদের ঠেকিয়ে রাখেন। কিন্তু ১৭৯২ খৃস্টাব্দে অবশেষে পরাজয়বরণ করে এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়। অর্ধেক রাজ্য, প্রচুর অর্থ এবং দুটি পুত্রকে জামিন রেখে অত্যন্ত

তবুও আবার একবার ভীষণ দূরদর্শিতায় ও তৎপরতায় সৈন্য গঠন করলেন এবং পিতা হায়দারের মত মারাঠাদের ও নিজামের সঙ্গে সন্ধির আবেদন জানালেন। এবার মারাঠারা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করলেন সুলতানের ঐ সাধু প্রস্তাব। নিজামও ইংরেজদের ঐ বাধ্যতামূলক সন্ধি মেনে নিয়েছিলেন।

মিঃ ওয়েলেসলীর তথা ইংরেজদের রাজ্য বিস্তারের পথে বিরাট বিরাট প্রতিবন্ধক ও প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিশ্চিহ্ন করতে মিত্রশক্তিও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭৯৯ খৃ:। টিপু দেশী-বিদেশী ঐ সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব ও যোগ্যতার সাথে লড়েও জয়যুক্ত হতে পারলেন না। টিপুর শ্রী রঙ্গপত্তন শত্রুপক্ষ অধিকার করে। টিপুর সৈন্যগণ যেভাবে ক্রমপর্যায়ে তিনটি শক্তির সাথে লড়াই করেছিলেন এবং সর্বশেষে শহীদের মর্যাদায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাও দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক অলিখিত ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

পরিশেষে সমস্ত সৈন্যের যখন পতন হয় তখন সুলতান টিপুকে ইংরেজরা চিৎকার করে আত্মসমর্পণ করতে বলে। আহত বীরের একহাত অস্ত্রাঘাতে অচল, কিন্তু অপর হাতেই যুদ্ধ করতে করতে ভাগ্যহারা টিপু ভারতের মাটিতে ভারতমাতার সুযোগ্য সন্তানের মত নিজের প্রাণদান করলেন তবুও জীবন্ত বন্দি হতে ঘৃণাবোধ করেছিলেন।

টিপুর চরিত্র বল, মনোবল, দৈহিক বল এবং রাজনীতি জ্ঞান পুরো মাত্রায় থাকলেও স্বধর্মের আইন কানুন অপেক্ষা তিনি বাহ্যিক পার্থিব আয়োজনকেই যথেষ্ট মনে করতেন। তাই বেশভুষায় ও চালচলনে ইউরোপীয় বা অপর প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তিনি ইতিহাসের এই অমোঘ শিক্ষা ভুলে গিয়েছিলেন যে, সমস্ত উন্নতি বা অবনতির শুধু নিজের কর্মদক্ষতা ও বাহ্যিক আয়োজনের ওপরই নির্ভর করে না তার সঙ্গে যোগ থাকে নৈপুণ্যে ভাগ্য নিয়ন্তার অদৃশ্য অঙ্গুলী হেলন।

তবে ইংরেজরা টিপুর মৃত্যুাবধি ভারত গ্রাসের অভিযানকে ইচ্ছানুক্রমিক ত্বরান্বিত করতে পারেনি। কারণ টিপুর অসাধারণ আন্তর্জাতিক রাজনীতিজ্ঞানের দারুণ ভীতিই ছিল এ পথে বাধা। উল্লেখ করা যেতে পারে, টিপুই সর্বপ্রথম ভারতকে রক্ষা করার জন্য তদানীন্তন ইংরেজদের শত্রু ফরাসী শক্তি এবং পারস্যের জামান শাহের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। ফ্রান্স টিপুর পক্ষে যোগও দিয়েছিল।

ঠিক সেই সময় ইউরোপের সঙ্গে ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে অসহায় টিপুকে একাই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয় এবং শেষে স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায় সবংশে শহীদ হতে হয়। নিঃসন্দেহে তিনিও ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে বীর শহীদের মর্যদায় বিভূষিত।

এরপর সিন্ধু প্রদেশে আমীরদের সঙ্গে মিঃ মিন্টো ১৮০৯ খৃস্টাব্দে একটা চুক্তি করে তার নাম দিয়েছিলেন 'চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব'। ইংরেজরা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন মুসলমানরা তাদের কোন মতেই বরদাশত করবে না। অতএব সকলের সাথে মিত্রতা করে নানা অজুহাতে এক এক করে কায়দা করাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। কিন্তু ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে মিঃ অকল্যাণ্ড চিরবন্ধু মীরদের (মুসলমান) ওপর এমন অপমানকর চাপ সৃষ্টি করেন যে, ইংরেজ সৈন্য এবং নানা মালপত্র যাতায়াতের ব্যবস্থা তাদের অধীস্থানের উপর দিয়েই হবে অর্থাৎ আফগানিস্তান অভিযানে মীরদের পরোক্ষ সহযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা। তখন সম্ভ্রান্ত মীরগণ তাঁদের এলাকায় নিজেদের মুদ্রা প্রচলিত রেখেছিলেন। কিন্তু চতুর গভর্নর জেনারেল মিঃ এলেন বোর এবং জেনালের নেপিয়ার মীরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ আনেন এবং তাঁদের প্রচলিত মুদ্রায় রাণী ভিক্টরিয়ার নাম ছাপতে আদেশ দেন। তখন মীরদের রক্তে বিদ্যুৎ ক্রিয়ার ন্যায় ঘৃণা আর বিদ্বেষের স্রোত বইতে থাকে।

তবুও তারা আর কিইবা করবেন। দেশবাসীর কোন সাহায্যের আশা নেই। বিশেষ করে অমুসলমানদের ইংরেজের প্রভুত্ব বিস্তারের ওপর তেমন কোন আপত্তি দেখা যাচ্ছিল না। তখনো চিন্তার অবসান হয়নি হঠাৎ ইংরেজ সৈন্যগণ মীরদের অধিকৃত ইমাম গড় দখল করে বসল। মীরগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন তবুও ১৮৪৩ সালে দেবু, হায়দ্রাবাদ, মিয়নি তথা সিন্ধু ইংরেজদের হাতে এসে যায়। মুসলমানদের পরাজয় ঘটে।

ঐ সময় হিন্দু ও মুসলমানদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে যা দেখা যায় তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

একজন নামকরা ইংরেজ ঐতিহাসিক মিঃ আউটারাম অমুসলমানদের লক্ষ্য করে লিখেছেন, "তারা ইংরেজদের পক্ষে গুপ্তচরের ন্যায় কাজ করেছিল।" আর একজন ঐতিহাসিক লিখছেন, "হিন্দুগণ সুখে থাকলেও মুসলমান শাসনের অবসান কামনা করছিল।"

সপ্তদশ অধ্যায়

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা বিপ্লবী হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দেহলবী (রহ.) ও পরবর্তী মুসলিম মুজাহিদগণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যেসব মহা মনীষী অনন্য সাধারণ প্রতিভা ও অবস্মরণীয় ভূমিকায় চির ভাস্কর হয়ে আছেন, হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (র.) তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ও অন্যতম। তিনি শুধুমাত্র ধর্মীয় গবেষণার ক্ষেত্রেই নয় বরং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগামী দূত হিসেবেও ইতিহাসের পাতায় চির অমর হয়ে রয়েছেন। প্রায় একশত বছর পরাধীনতার নাগপাশে বন্দিত্ব স্বীকার করার পর এই মহা বিপ্লবীর কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল স্বাধীনতার আওয়াজ। ইনিই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্মদাতা প্রথম মৃত্যুহীন প্রাণ।

এই মহা মনীষী হযরত আমলগীরের (র.) দেহাবসানের কয়েক বছর পূর্বে ১৭০৩ খৃস্টাব্দে এক পুণ্যময়ী রজনীতে দিল্লী নগরীর বিখ্যাত সাধক ও খোদাভক্ত শাহ আবদুর রহিমের (র.) সুযোগ্য সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন। আলমগীর (র.) তাঁর জন্মের পূর্বে প্রায়ই একজন তাপস শ্রেষ্ঠ, দুরন্ত প্রতাপ মনীষীর আগমনের প্রত্যাশায় দোয়া করতেন। তাঁর এই দোয়া বিশ্বস্রষ্টার দরবারে গৃহীত হয়েছিল। তাই আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসীর দাসত্ব শৃঙ্খল উন্মোচন করতে, মানুষের সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন স্তরে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করতে তথা দ্বিধাবিভক্ত মতবাদে জর্জরিত ও সংকীর্ণতার অষ্টোপাশে আবদ্ধ মৃতপ্রায় মানুষকে নতুন আলোর সন্ধান দিতেই জন্ম নিয়েছিলেন শাহ ওলীউল্লাহ (র.)। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি আরবী সমস্ত পাঠ তথা দর্শন, ভূগোল, তর্ক ও ইলমে কালাম, তাসাউফ ও সুলফ, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গণিত, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র, হাদীস ও তফসীর প্রভৃতি নানা জাতীয় দুর্বোধ্য শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করেন। হযরত শাহ ওলীউল্লাহ সাহেবই ভারতের মাটিতে প্রথম মনীষী, যিনি কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সারে এগারশত বছর পর তদানীন্তন রাজকীয় ভাষা ফার্সীতে পবিত্র কোরআনের অনুবাদ করে অক্ষয় কীর্তি রেখে যান।

সারা ভারতে পবিত্র কোরআন পঠিত হতো বটে কিন্তু আরবী পারদর্শী পণ্ডিতবৃন্দ ছাড়া সকলেই মহাগ্রন্থের মধ্যে আল্লাহর আদেশ নিষেধ বা অর্থাদি হতে বঞ্চিত ছিল। কুরআনের অন্য ভাষায় অনুবাদ না করাও প্রতিবেশী, পরিবেশের অনুন্নত প্রভাবের ফল। শাহ ওলিউল্লাহ সর্ব ভাষায় মহা গ্রন্থের অনুবাদের রাস্তা নির্মাণ করলেন তাঁর ফারসী অনুবাদের মাধ্যমে। ভারতের শিক্ষিত মুসলমান প্রত্যেকেই ফারসী জানতেন। তাছাড়া তখন আইন আদালতে ফারসী সরকারি ভাষা ছিল, তাই শিক্ষিত মুসলমান সমাজে মহাগ্রন্থের মহানুবাদ বিদ্যুৎ ক্রিয়ার মত সঞ্জীবিত হয়ে উঠল।

হযরত ওলিউল্লাহ সাহেব নিজে একজন পীর বা আল্লাহ ভক্ত ফকির ছিলেন। তিনি তার প্রত্যেক ছেলেকে ইসলামী শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়ে শিষ্যভুক্ত করেছিলেন। তাঁরা যথাক্রমে শাহ মাওলানা আবদুল আজিজ, শাহ মাওলানা আবদুল কাদের, শাহ মাওলানা রফিউদ্দিন ও শাহ মাওলানা আবদুল গণি। আরও তার বাছাই করা ছাত্রদের মধ্যে শাহ মাওলানা ইসমাইল, যিনি তাঁর ভাইপো ছিলেন। আর একজন পরশ পাথরতুল্য বীর ও পণ্ডিত সৈয়দ আহমদ ব্রেলবী। তিনি তাঁর পুত্র আজিজ সাহেবের ছাত্র ছিলেন। শাহ মাওলানা আবদুল হাই যিনি শাহ আবদুল আজিজের আত্মীয় বা প্রিয় জামাতা ছিলেন। এছাড়া তাঁর আরও বাছাই করা ছাত্র যাঁরা দিল্লী হতে মাওলানা মওলুবী বা মোল্লা মুফতি হয়ে এসেছিলেন তাঁদের নিয়ে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের মারাত্মক সংঘ তৈরি করলেন। যে প্রতিষ্ঠান বা মাদরাসা হতে এসব বিপ্লবী বাছাই করে নেওয়া হয়েছিল সেই মাদরাসা দিল্লীর শাহ ওলিউল্লাহ সাহেবের প্রতিষ্ঠা করা। পূর্বেই দেখানো হয়েছে মোল্লাহ মাওলানা মুফতি বা প্রকৃত ফকিরদের প্রধান কাজ সজাতি-বিজাতি যেই হোক তার সঙ্গে লড়াই করা, যাঁরা ইসলাম ধর্মে ক্ষতি করে। এক্ষেত্রেও তাই হলো। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ৩০ লক্ষ মুজাহিদ যোদ্ধা চারদিকে প্রচার কাজে লিপ্ত হলেন, জনমত গঠন করলেন। উদ্দেশ্য ছিল দুটি, প্রথমত. মুসলমান জাতিকে পবিত্র কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী সঠিক পথে পরিচালিত করে ইংরেজকে তাড়িয়ে দেওয়া। ইংরেজরা বড় চতুর, তারা তখনও যদিও সর্ব ভারতের সর্বময় কর্তা কিন্তু সরাসরি যেন লড়তে নারাজ। তাই ভারতের সরল শিখ জাতিকে মিথ্য প্রলোভনে বিশ্বাসঘাতক সাজিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামিয়ে দেয় যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ফলস্বরূপ হাজারে হাজারে মুসলমানকে শহীদ হতে হলো। স্বাধীনতা সংগ্রামী হযরত মাওলনা আসাদ মাদানীর কথায়– "এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে দুই লক্ষের অধিক মুসলিম শহীদ হয়, সাড়ে সাতান্ন হাজার আলিম মৌলবী শাহাদতবরণ করেন।" ঐ সাড়ে সাতান্ন হাজার মওলবীকে শিক্ষায় পণ্ডিত এবং দীক্ষায় যোদ্ধা করে যাঁরা স্বাধীনতা বিপ্লবে প্রাণ দিতে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন আজ তাঁদের নাম নিষ্ঠুর ইতিহাসে 'ওহাবী'। আসলে

আরব দেশে নজদের অধিবাসী আবদুল ওহাব আরবীয়দের অনৈস্লামিক কাজকর্ম ও চিন্তাধারা রোধ করার জন্য এবং মহা গ্রন্থ কোরআন ও হাদীসের নির্দেশিত পথে চালানোর জন্য একটা আন্দোলন গড়ে তোলেন। প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে খুব হাঙ্গামা বা লড়াই হয়। আরবের প্রাণকেন্দ্র মক্কা ও মদীনা শরীফ দখল করেন। ঐ সময় মক্কা-মদীনায় কবর পাকা করার নিয়ম ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং কবর পাকা করে বাঁধানো আভিজাত্যের পরিচয় বহন করত। আবদুল ওহাবের নির্দেশে বেশির ভাগ কবর ভেঙে মাটির কবরে পরিণত করা হয়। হযরত মুহাম্মদের (সা.) এবং তৎসংলগ্ন কবরগুলো সংরক্ষিত থাকে। তাঁর যুক্তি ছিল মক্কা ও মদিনায় নির্দিষ্ট কবরস্থানগুলো মুসলিম জাতির এবং মক্কা ও মদীনাবাসীর নিকট খুব পবিত্র কিন্তু প্রত্যেকেই যদি কবর পাকা করা শুরু করেন তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে সীমিতস্থান পূর্ণ হয়ে যাবে ফলে মক্কা-মদীনাবাসী এবং মৃত হাজীর দল ঐ পবিত্র স্থানে সমাধিস্থ হওয়া হতে বঞ্চিত হবেন।

যাই হোক আমাদের ভারতীয় হাজীরা ফিরে এসে খোভ, দুঃখ ও অভিজ্ঞতা বর্ণনায় প্রকাশ করেন যে, রাসূলের বংশধরদের এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনদের বংশধরদের কবর সব শেষ করে দিয়েছে আরবের নতুন রাজা। এই সংবাদে সাধারণত ভারতীয় মুসলমানদের বেশির ভাগ লোকই দুঃখিত হন। শাহ ওলিউল্লার প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দল প্রথমেই মুসলমানদের কোরআন-হাদীস অনুযায়ী চলতে উৎসাহিত করেন আর অতিভক্তি, বাড়াবাড়ি, শেরক ও বিদআত হতে লোককে নিষেধ করেন। শাহ সাহেবের শিষ্য আহমদ ব্রেলবী হজ হতে প্রত্যাবর্তন করলে ইংরেজরা খুব চতুরতার সঙ্গে প্রচার করলো, 'স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে যারা আপনাদের ধর্মের বাণী শোনাচ্ছে আসলে তারা ইসলামের শত্রু এবং নবী ও সাহাবাদের অপমানকারী দল। এদের নাম ওহাবী, এরাই আপনাদের প্রিয় রসূলের বংশধরদের কবরগুলো ধ্বংস করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে আর হিন্দুস্থানের রায়বেরেলীর মৌলানা সৈয়দ আহমদ হজ করতে গিয়ে মক্কা হতে সেই দলের এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছে এবং এরা সব ওহাবী তাই এরাও আপনাদের শ্রদ্ধেয় পীর-বুজুর্গ ও পূর্ব পুরুষদের কবর ভাঙতে চায়।' এই কথা ইংরেজদের টাকা খাওয়া কিছু দালাল শ্রেণীর লোক প্রচার করতে লাগলো। সাধারণ মানুষ বিশ্বাসও করলেন অনেকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আজও শিক্ষিত মুসলমান, হিন্দু এমনকি যাঁরা লেখক বা ঐতিহসিক তাঁরা সকলেই 'ওহাবী আন্দোলন' কথাটা লিখতে বা বলতে দ্বিধা করেন না। অথচ নাজদের আবদুল ওহাব জন্মগ্রহণ করেন ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে আর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ ও শাহ হজ করতে যান তার অনেক আগেই

১৭৯১ খৃস্টাব্দে তিনি মারা যান। আর তাঁর দলের প্রভাবও ঐ সময় অর্থাৎ ১৮২৩ সালে কম হয়ে যায়। অথচ শত শত নয় সহস্র দলিল পেশ করা যাবে যে ১৮২৩-এর আগেই সারা ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লব শুরু হয়ে যায়। তবে হজ হতে ফিরে এসে আরও নতুন উদ্যমে জিহাদ আরম্ভ নয় বরং পুনঃ আরম্ভ করেন।

প্রকৃত প্রতিভাধর অনেক ঐতিহাসিক লেখক এমন গবেষণামূলক বই লিখেছেন এবং লেখার ওপর ডক্টরেট পেয়েছেন তাঁরা মুসলমানদের এই আন্দোলনকে নানা নামে ভাগ করেছেন যেমন– ওহাবী, তাঐউনি, মুহম্মদী, ফারাজী, পাটনা স্কুল দল এবং আহলই-হাদিস প্রভৃতি এগুলো ঠিক আন্দোলনের নয় নাম। সারা বিশ্বে যেকোন ব্যক্তি যেদিন ইসলাম অনুযায়ী নিজে চলেন এবং অপরকে চালানোর ব্রত গ্রহণ করাবেন আর প্রত্যেক কাজকর্মকে কোরআন আর হাদীসের কষ্টি পাথরে যাচাই করবেন তাঁদের রূপ সারা বিশ্বে প্রায় একই রকম হবে, কিঞ্চিৎ যদি পার্থক্য পাওয়াই যায় তা উল্লেখযোগ্য নয়। সুতরাং নজদের ওহাব প্রতিষ্ঠিত কোন ওহাবী বলে দল নেই আর তাঁদের সঙ্গে ভারতের মুসলিম বিপ্লবের কাজেকর্মে মিল থাকতে পারে কিন্তু কোন যোগাযোগ ছিল না।

১৮২০ খৃস্টাব্দে কলকাতা আসার পথে আহমদ ব্রেলবী পাটনায় পৌছে বহু মুসলমানকে মুরীদ বা শিষ্য করেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে কমিটি গঠন করে দেন এবং পাটনা কেন্দ্রের ভার বিপ্লবী মাওলানা বিলায়েৎ আলীকে ডেপুটি বা খলিফা নিযুক্ত করে একটি নতুন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন আর ভারতের মস্তক বঙ্গদেশের কলিকাতায় এসে পৌছান। কলকাতা কেন্দ্রকে মজবুত করে বিপ্লবের বহ্নিশিখা জ্বালাতে পারলেই সারা ভারতে ইংরেজ মার খাবে এই ছিল তাঁর ধারণা। কলকাতার বড় মসজিদের নাম তখন ছিল কিতাবুদ্দিনের মসজিদ, ওখানেই এসে উঠলেন এবং বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। (দ্রঃ 'শহীদ তীতুমীর', আবদুল গফুর সিদ্দিকীর লেখা ২য় প্রকাশ পৃঃ ৪২)

এখানে পীর বা ফকির আহমাদ সাহেব একটানা তিন মাস থাকেন এবং বহু লোককে মুরীদ করেন তাঁর ঐ শিষ্যগুলোই পরে আল্লাগত প্রাণ ধর্মযোদ্ধায় পরিণত হয়েছিলেন। সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ শহর কলকাতা। ভারতের বিভিন্ন স্থানের লোক আসতো আর ঐ মসজিদে এলেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদের তালিম পেত, নিত বা শুনতো। অতএব বেশ ভালভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, ১৮২০-এ পাটনায়, ১৮২১-এ কলকাতায় এবং ১৮২২ খৃঃ ভারতের মূল মূল স্থানে বিপ্লবের বুনিয়াদ দিয়ে ১৮২৩ সালে আরবে গিয়েছিলেন হজ করতে। হজ হতে ফিরে এসে আবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলনের মধ্যে তিনি শিখদের বিরুদ্ধে (আসলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে) জিহাদের ফতোয়া দেন।

>Goto List

বঙ্গে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের ভূমিকা

পূর্ববঙ্গে মাদারীপুর গ্রামে মাওলানা শরিয়াতুল্লাহর জন্ম হয়। তাঁর বাবা-মা যে খুব ইসলামভক্ত ছিলেন তাঁর নামই তার সাক্ষী। আঞ্চলিক পড়া শেষ করে কলকাতায় এসে মাওলানা বাশারত আলীর কাছে যুবক শরিয়তুল্লাহ উচ্চশিক্ষা নিতে থাকেন। ঐ মাওলানা সাহেবই ছিলেন হযরত আহমদ সাহেবের ভক্ত এবং একজন গুপ্তযোদ্ধা। সুতরাং জেহাদের মন্ত্র দিতে ও নিতে কারও কোন বাধা ছিল না। তারপর গুরু-শিষ্য উভয়ে মক্কা গেলেন এবং গুরু-শিষ্যের আরও উচ্চশিক্ষা ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে হানাফী মজহাবের বিখ্যাত পণ্ডিত তাদের সোম্বালের নিকট সুফিতত্ত্বের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে বঙ্গদেশে ঠিক ১৮১৮ খৃস্টাব্দে এসে উপস্থিত হন। ঠিক এই রকম রত্নই খোঁজ করছিলেন্ হযরত আহমদ ব্রেলবী বঙ্গ দেশের জন্য। ১৮২১ খৃস্টাব্দেই কলিকাতায় যোগাযোগ হয় এবং তাঁকে তাঁর পদ সম্বন্ধে সচেতন করা হয়। মাওলানা শরিয়তুল্লাহ সাহেব ইংরেজ সৃষ্ট জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করা ও ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই মনে করে শোষিত, অত্যাচারিত কৃষক, তাঁতী, কুলি প্রভৃতি অনুন্নত ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে আন্দোলন পরিচালনা করেন। একটা কথা খুব মনে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে এই যে, মুসলমান জমিদারও কিছু ছিল, যারা আন্দোলনের প্রতিকূলে ছিল। তাদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। ঐ সময় হিন্দু জমিদারগণ মুসলমান কৃষকদের নিকট কালীপূজা, দুর্গাপূজা ইত্যাদিতে কর আদায় করতেন, যা ইসলামবিরোধী। অন্যদিকে মুসলমান প্রজাদের জন্য ঈদুল-আজহা পর্বে গরু ব্যবহার বন্ধ করা হয়েছিল। মাওলানা শরিয়তুল্লাহ পূজার চাঁদা দিতে মুসলমানদের নিষেধ করেন এবং পর্বে গরু ব্যবহারের উৎসাহ প্রদান করেন।

মোটকথা তিনি ধর্ম সংস্কারকরূপে সংগ্রাম চালিয়ে সংগ্রামের বুনিয়াদ মজবুত করে ফেললেন। সেই সঙ্গে তাঁর ছেলে আলাউদ্দিন আহমাদকে (ডাকনাম দুদু মিঞা) মক্কা পাঠালেন। সেখানে বিদ্যা শিক্ষা লাভের পর বাড়ি এলেন এবং পিতার নিকট উচ্চশিক্ষা নিয়ে তিনি উপযুক্ত প্রতিনিধিতে পরিণত হলেন। ১৮৪০ খৃস্টাব্দে শরিয়তুল্লাহ দেহ ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর তিন-চার বছর আগেই দুদু মিঞা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। পিতার মৃত্যুর পরেই তিনি সংগ্রামের ধারা একটু বদল করলেন। হিন্দু-মুসলমান দরিদ্র প্রজা শ্রেণীর মানুষের কানে প্রথমে তিনিই সাম্যবাদ প্রচার করেন আর বলেন, জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি হিন্দুর ওপর অত্যাচার হয় তাহলেও ইসলাম অনুযায়ী আমাদের তাদের পাশে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাওয়া ধর্মের বিধান। যদি না যাওয়া হয় তাহলে তা অধর্মের কাজ হবে। তিনি শাসনতন্ত্র কায়েম করলেন। সশস্ত্রবাহিনী তরোয়াল, সরকি, তীর-ধনুক

প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়। সর্বপ্রথম তিনি 'বিপ্লবী খেলাফত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন পুরোপুরিভাবে। এই শাসন পদে সর্বোচ্চ পদে যিনি থাকতেন তাঁকে বলা হতো 'ওস্তাদজি'। তাঁদের পরামর্শদাতারা দুজন ছিলেন 'খলিফা', এমনিভাবে সুপারিনটেনডেন্ট খলিফা, ওয়ার্ড খলিফা, গাঁও খলিফা প্রভৃতি নানা নামে পদের ব্যবস্থা ছিল। তিন-চারশত বিপ্লবী পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম ইউনিট ছিল। সুপাঃ খলিফার একজন পিয়ন ও একজন পেয়াদা থাকতো তাদের দ্বারা নিম্ন হতে উপর মহলে যোগাযোগ ও নির্দেশ পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল। (দ্রঃ M.A. Khan op. cit, PP 104-112)

তাঁরা আদালত পঞ্চায়েত গঠন করেন এবং সমস্ত অঞ্চলের বিচার বিপ্লবীরাই করতে লাগলেন। মুসলমানদের জাকাত, ওশর ইত্যাদি দাতব্য অর্থ এবং সংগঠনের চাঁদা ফসল হতে তোলা, ঠিকমত তা আদায় করা, সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা, মাদরাসা-মক্তব তৈরি করা, মসজিদ তৈরি করা প্রভৃতি কাজ জাদু খেলার মত চলতে লাগল। এমন অবস্থা এল, বিপ্লবীদের সুবিচার যেটা ইংরেজ বিরোধিতার নামান্তর। অর্থাৎ পৃথিবীতে জমি জায়গা যা আছে সব ঈশ্বরের; সেখানে জমিদার বা সরকারের কর নেওয়া জুলুম বা অত্যাচার। মানুষ সব সমান, আমাদের কারো উপর তাদের কর্তৃত্ব করার অধিকার নেই।

তাই অমুসলমানরা অনেকে তাঁদের কাছেই অভিযোগ করতেন। বিচারও সূক্ষ্মভাবেই হতো। কিন্তু বিচারের রায় না মানলে তা মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা দুদু মিঞার সৈন্য বিভাগে ছিল। শেষে দুদু মিঞা তাঁর সমস্ত এলাকায় ঘোষণা করলেন, সমস্ত বিচার আমাদের স্বদেশী আদালতে হবে। যদি কেউ ইংরেজদের আদালতে বিচার প্রার্থী হয় তাহলে তাকে শাস্তি নিতে হবে। ইংরেজ ব্যবসায়ী বা নীলকরের সাহেবরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। কারণ দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণী মুসলমান বিপ্লবীদের হাতে। আর জমিদার শ্রেণীও খুব অসন্তুষ্ট হল। মুসলমানদের সহযোগিতায় তাঁদের মতে 'গরিব ছোটলোকদের' এত মাথায় তোলা অবিচার মাত্র। তাই এইবার ইংরেজদের স্তম্ভ জমিদার শ্রেণী হিন্দু এবং মুসলমান উভয় শ্রেণীর ওপর মুসলিম বিপ্লবীদের আক্রমণ শুরু হয় এবং তা বহুদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। (দ্রঃ P.J.D.C.C. No 25, 29 May 1843, P. 462)

এবার ইংরেজদের ইঙ্গিতে ফরিদপুরের সিকদার ও ঘোষ পরিবার নামে দুজন বড় জমিদার মুসলমান প্রজাদের জন্য ঘোষণা করলেন, মুসলমানরা গরু কুরবানী করতে পারবে না। কালী ও দুর্গা পূজায় কর দিতে বাধ্য হতে হবে এবং দাড়ির উপর কর বসানো হয়, আর নিষেধ করা হয়, মুসলমান বিপ্লবী দলের সঙ্গে কোন সংযোগ রাখতে পারবে না। প্রথমে কিছু মুসলমান প্রজা তা অবহেলা করার ফলে জমিদারদের দ্বারা কঠোর শাস্তি পেতে বাধ্য হয়। (দ্রঃ A. R. Mallic, op. cit, M. A. Khan, op cit PP 27-28)

দুদু মিঞা ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কানাইপুরের সিকদার ও ফরিদপুরের জয়নারায়ণ জমিদারদের বিরুদ্ধে সৈন্যসহ আক্রমণ করলেন এবং তাঁদের উভয়কে পরাজিত করলেন। খুব মনে রাখা দরকার ঐ যুদ্ধ হিন্দু-মুসলমানে নয় বরং কৃষক-জমিদারের যুদ্ধ অথবা ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে মুসলমান বিপ্লবী শোষিতদের যুদ্ধ। কানাইপুরের জমিদার দুদুর দাবি মেনে নেন এবং নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চান। কিন্তু ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুরের জমিদার জয়নারায়ণ প্রবলভাবে বিপ্লবীদের বাধা দেন ফলে যুদ্ধ তুমুলভাবে রূপ নেয়। শেষে বিপ্লবীরা জমিদারের ভাই মদন বাবুকে ধরে নিয়ে চলে যায়। অনেকে বলেন, তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয় এবং পদ্মা নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। (দ্রঃ A. Khan, op. cit. PP. 27-29)

৮০০ জন মুসলমান বিপ্লবী ঐ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। জমিদাররা ইংরেজদের আদালতে মামলা করেন। বিচারে ২২ জনের সাত বছর করে জেল হয়।

দুদু মিঞার কোন শাস্তি হয়নি, তিনি মুক্তি পান। অবশ্য তা অনেকের মতে তাঁর শাস্তি হলে হিতে বিপরীত হতো, কেননা পুলিশি রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ সময় দুদু মিঞার হাতে আশি হাজার লোক প্রাণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত। (দ্রঃ P. J. D, oc, No 99 7 April 1847, P, 146)

১৮৪১ ও ১৮৪২ এর ঘটনার পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু জমিদারগণ লড়াই করতে সাহসী হননি, তবে ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্ত সংবাদ সরবরাহ এবং পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জমিদারের সঙ্গে কৃষকদের লড়াইটিকে হিন্দু-মুসলমানের লড়াই বলে প্রমাণ করার খুব চেষ্টা করা হয়েছিল। যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমলেন্দুদের মতে জমিদারগণ অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিলেন। লড়াইটিকে হিন্দু-মুসলমানদের লড়াই বলেই সাধারণ মানুষকে বোঝানো সম্ভব হয়েছিল।

ঐ সময় ডানলপ সাহেব কাসিমপুরে নীলকুঠির প্রভাবশালী সাহেব। ঐ ইংরেজের বিশ্বস্ত পরিচালক ছিলেন কালিপ্রসাদ কাঞ্জিলাল নামে এক গোমস্তা। ডানলপ সাহেব এবং ব্রাহ্মণ গোমস্তা আট শত সশস্ত্র লোক নিয়ে বাহাদুরপুরে দুদু মিঞার বাড়ি আক্রমণ করে বাড়ির চারজন প্রহরীকে হত্যা করেন এবং বহু ব্যক্তিকে হত্যা করে সেই বাজারে দেড় লক্ষ টাকার অর্থ সম্পদ নিয়ে বিজয়ী হয়ে বাড়ি ফেরেন। (দ্রঃ M.A. Khan op. cit. ৩৩ এবং অধ্যাপক অমলেন্দুর লেখায়)

১৮৪৬ সালে ৫ ডিসেম্বর দুদু মিঞা প্রতিশোধ নিতে ডানলপ সাহেবের কুঠি আক্রমণ করেন এবং গোমস্তাকে বাখরগঞ্জ এলাকায় অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয় আর ২৬ হাজার টাকা ক্ষতি করে দেওয়া হয়। চারজন নিহত আর দেড় লক্ষ টাকার ক্ষতির তুলনায় নিশ্চয়ই এ ক্ষতি অল্প। (দ্রঃ P. J. D. O. C No. 99, 7 April, 1847 PP. 147-148, Jwise, op cit P. 25)

>Goto List

সেই সময় ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট ডানলপের বন্ধু ছিলেন এবং দুজনেই ছিলেন ইংরেজ। ডানলপ কোর্টে কেস করলেন। দুদু মিঞা এবং ৬৩ জন মুসলমান বিপ্লবীকে বন্দি করা হয় বিচারে সকলের শাস্তির রায় হয়। তখন ভারতের রাজধানী কলকাতার সর্বোচ্চা আদালতে আপীল করা হয়। কৌসুলি ইংরেজ সকলেই মুক্তি দেয়। ১৮৪৭ সালে মুক্তি পেয়ে দুদু মিঞা সারা ভারতে প্রত্যেক কেন্দ্রে সংবাদ পাঠান যে চারদিক হতে এক সঙ্গে ইংরেজ ধ্বংস করা অভিযান চালাতে পারলে ইংরেজকে তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করা সম্ভব হবে। ষড়যন্ত্র চলতে লাগলো, শেষে খুবই গোপনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। সারা ভারতে আন্দোলন ও বিপ্লবকে ইংরেজ তার সৈন্যবাহিনী দিয়ে দমন করছে। সুতরাং সৈন্যদের কোন প্রকার ক্ষেপিয়ে তুলতে পারলেই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভয়াবহ রূপ রুদ্র মূর্তি ধরার পূর্বেই সরকার টের পেল যে চতুর নেতা আলাউদ্দীন ওরফে দুদু মিঞাকে জেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাই তাঁকে বন্দি করে জেলে খুব অত্যাচর ও দুর্ব্যবহারের ইন্ধন করা হল। শরীর দুর্বল হয়ে অসুস্থ অবস্থায় তিনি থাকলেও মন আর মস্তিষ্ক দুর্বল হয়নি একটুও। তাঁকে ছাড়া হয়েছিল ১৮৬০ সালে। তাঁকে যে শুধু ভয় করেই সরকার তাদের নিরাপত্তার জন্য বন্দি করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। (দ্রঃ J, Wise, op cit, P, 25; M. A. Khan, op cit, PP 42-43)

দু বছর তিনি জেলের বাইরে থাকলেও জেল অত্যাচারের জের টানতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। ১৮৬২ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী আলাউদ্দিন ওরফে দুদু মিঞা ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকাতে চির নিদ্রিত হলেন। আজকার নিষ্ঠুর ইতিহাস যেন ভুলে গেছে সে কথা।

দুদু মিঞার মৃত্যুর পরেই গিয়াসুদ্দিন হায়দার হাল ধরলেন বিপ্লবী দলের। কিন্তু তিনি কঠিন অসুস্থতার জন্য তাঁর ছোট ভাই আবদুল গফুর (ডাক নাম নোয়া মিঞা)-কে নেতা নির্ধারিত করেন।

আলাউদ্দিন ও দুদু মিঞার আর একজন সমসাময়িক বিপ্লবী বন্ধু ছিলেন, তিনি হচ্ছেন চব্বিশ পরগনা জেলার চাঁদপুর গ্রামের মীর নিসার আলী। ডাক নাম ছিল তেতো মিঞা। ছোটবেলায় খুব জ্বর হতো তাই তাঁকে তাঁর নানী কালমেঘা গাছগাছড়া তিক্ত ঔষধ খাওয়াতে চাইলে শিশুবীর নানীর হাত হতে অম্লান বদনে তা খেয়ে নিতেন। তাই তেঁতো, তীতা হতেই তীতু নামের উৎপত্তি। বিপ্লবী মাওলানা আলাউদ্দিন সাহেব (দুদু) হজে যাবার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অনেক গোপন আলোচনা করেন। মৌলুবী নিসার আলী বা তীতু মিঞা তাঁকে তসবীহ মালা উপহার দেন। পরে ঐ মালা তিনি তাঁর শয্যাকক্ষে সযতনে রেখে দিয়েছিলেন। নিসার আলী ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত সৈয়দ আহমদ ব্রেলবীর দেখা হয় মক্কা শরীফে

হজের সময়। আগে হতেই তিনি তাঁর চিন্তাধারা বিপ্লবী পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এখন তিনি তাঁর কাছে বায়াত বা মুরীদ হলেন আর নিজের আজীবন সবকিছু তাঁর কাছে সঁপে দিলেন। আহমাদ সাহেবও শিষ্যকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক কেন্দ্র কলকাতায় তথা বাংলার বিপ্লবের ভার দিলেন। মীর নিসার আলী পীর বা গুরুর পরামর্শে প্রথমে তবলীগী অভিযান শুরু করেন, যাতে প্রত্যেক মুসলমান প্রথমে প্রকৃত মুসলমান হতে পারে। তাহলে ইংরেজকে তাড়ানোর জন্য তারাই নিজেরা খেপে উঠবে, খেপানোর দরকার হবে না। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের দিকে যখন শিখদের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহমদ জিহাদের ফতোয়া দিয়ে প্রবল যুদ্ধে লিপ্ত তখন মীর নিসার আলী ভারতের কেন্দ্রবঙ্গে শুধু ধর্ম প্রচারই করে যাচ্ছেন। তার প্রধান কারণ ইংরেজ যেন বঙ্গের ঘাঁটি চূর্ণ করার চিন্তা না করে, যেহেতু এখানে এখনো অনেক কাজ বাকি আছে। কিন্তু অত্যন্ত গোপনে চাঁদা তুলে এবং আত্মবলী দিতে প্রস্তুত এমন মুসলমান যুবকদের সুদূর পাঞ্জাবের সিত্তানা অঞ্চলে পাঠাতেন আর প্রায় দলই ঐ সমস্ত সফরে যেতেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, যে লোকগুলোকে পাঠানো হতো তাদের গেরিলা যুদ্ধের সর্বপ্রকার ট্রেনিং নিসার আলী নিজেই দিতেন। যেহেতু তিনি একজন বিখ্যাত কুস্তিগীর বা ব্যায়ামবীর ছিলেন– গফুর সিদ্দিকী লিখিত 'শহীদ তিতুমীর' ৩০-৪১ এবং A. R. Mallick op cit, PP, 76-77 দ্রঃ) তাঁর জ্বালাময়ী বাগ্মিতা শক্তি ছিল, তাই তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য সভায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জমায়েত হতো।

তীতুমীর ইসলাম ধর্মকে যেমন ভালোবাসতেন আবার তেমনি হিন্দুদের দুঃখ-দুর্দশার কথাও চিন্তা করতেন এবং তাদের বিপদে নিজে যথাসাধ্য তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। এতদসত্ত্বেও ইংরেজের পোষ্যপুত্র জমিদারগণ তাঁর উপর রাগ করতেন এবং তাঁর ধ্বংস কামনা করতেন। এ প্রসঙ্গে একজন নিরপেক্ষ লেখকের উদ্ধৃতিস্বরূপ একাংশ তুলে ধারা হলো– "তীতু আপন ধর্মমত প্রচার করেছিল। সে ধর্মমত প্রচারে পীড়ন তাড়ন ছিল না। লোকে তার বাগবিন্যাসে মুগ্ধ হয়ে তার প্রচারে স্তম্ভিত হয়ে তার মতকে সত্য ভেবে, তাকে পবিত্রাতা মনে করে, তার মতাবলম্বী হয়েছিল এবং তার মন্ত্র গ্রহণ করেছিল। তীতু প্রথমে শোনিতের বিনিময়ে প্রচার সিদ্ধ করতে চায়নি। জমিদার কৃষ্ণদেব জরিমানার ব্যবস্থায় তার শান্ত প্রচার হস্তক্ষেপ করলেন।" (দ্রঃ বিহারলাল সরকারের 'তীতুমীর বা নারকেল বেড়িয়ার লড়াই, কলিকাতা ১৩০৪, পৃঃ ৪৭)

ইংরেজের বলে বলীয়ান বিখ্যাত জমিদার রামনারায়ণ বাবু (তারাগুনিয়া), কৃষ্ণদেব রায় (পুঁড়া), গৌড় প্রসাদ চৌধুরী (নগরপুর) প্রমুখ প্রখ্যাত জমিদার মিলিতভাবে নিসার সাহেবের আন্দোলন খতম করার জন্য প্রকাশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেন। প্রত্যেক জমিদার তাঁর এলাকায় ৫টি বিষয়ে নোটিশ জারি করলেন।

যথা “(১) যারা তীতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অহাবী হবে, দাড়ি রাখিবে, গোঁফ ছাঁটবে, তাদের প্রত্যেকে ফি দাড়ির ওপর আড়াই টাকা এবং ফি গোঁফের ওপর পাঁচসিকা খাজনা দিতে হবে। (২) মসজিদ প্রস্তুত করলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচশত টাকা ও প্রত্যেক পাকা মসজিদের জন্য এক সহস্র টাকা জমিদার সরকারে নজর দিতে হবে। (৩) পিতা, পিতামহ বা আত্মীয়স্বজন সন্তানের যে নাম রাখবে সে নাম পরিবর্তন করে অহাবী মতে আরবী নাম রাখলে প্রত্যেক নামের জন্য খারিজানা ফি পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারের জমা দিতে হবে। (৪) গোহত্যা করলে হত্যাকারীর দক্ষিণ হস্ত কেটে দেওয়া হবে, যেন সে ব্যক্তি আর গো হত্যা করিতে না পারে। (৫) যে ব্যক্তি অহাবী তীতুমীরকে নিজ বাড়িতে স্থান দেবে তাকে তার ভিটা উচ্ছেদ করা হবে।” (দ্রঃ A. R. Mallick op. cit, 79-79 এবং সিদ্দিকী প্রণীত ‘শহীদ তীতুমীর, পৃষ্ঠা ৫০-৫১)। সূক্ষ্মদর্শী অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের উপরোক্ত শর্ত পাঁচটি কত মারাত্মক এবং তাৎপর্যপূর্ণ আর সেই যুগে ঐ জরিমানার টাকার পরিমাণ মুসলমানদের জন্য কত সীমাহীন অত্যাচার তাই শুধু বিবেচ্য নয়; বরং ভারত বর্তমান পর্যন্ত ত্রিখণ্ডে খণ্ডিত হওয়ার মূল হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার গোড়াপত্তনকারী ইংরেজ সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী।

সৈয়দ নিসার আলীর যা প্রস্তুতি ছিল তিনি একটা হামলা করতে পারেন কিন্তু উদ্দেশ্য তাঁর হিন্দু-মুসলমানে লড়াই নয়; বরং লড়াই হবে মুসলমান ও হিন্দুদের সঙ্গে ইংরেজদের। তাই তিনি পুঁড়ার জমিদারকে শান্তির জন্য একটি মূল্যবান পত্র দিয়েছিলেন সেই পত্রটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

“বঃ জনাব কৃষ্ণদেব রায় সমীপে- পুঁড়ার জমিদার বাড়ি। মহাশয় আমি আপনার প্রজা না হলেও আপনার স্বদেশবাসী। আমি লোক পরম্পরায় জানতে পারলাম আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আমাকে অহাবী বলে আপনি মুসলমানদের নিকট হেয় করার চেষ্টা করতেছেন। আপনি কেন এরূপ করতেছেন তা বুঝতে পারা মুশকিল। আমি আপনার কোন ক্ষতি করি নাই। যদি কেউ আমার বিরুদ্ধে আপনার নিকট কোন মিথ্যা কথায় আপনাকে উত্তেজিত করে থাকে তাহলে আপনার উচিত ছিল সত্যের সন্ধান করে হুকুম জারী করা। আমি দীন ইসলাম জারী করতেছি। মুসলমানদের ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দিতেছি। এতে আপনার অসন্তোষের কি কারণ থাকতে পারে? যার ধর্ম সেই বুঝে। আপনি ইসলাম ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করবেন না, অহাবী ধর্ম বলে দুনিয়ায় কোন ধর্ম নাই। আল্লাহ মনঃপুত ধর্মই ইসলাম, ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে শান্তি। একমাত্র ইসলাম ধর্ম ব্যতীত আর কোন ধর্মই জগতে শান্তি আনয়ন করতে পারে না। ইসলামী ধরনের নাম রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছোট করা, ঈদুল-আজহার কুরবানী করা ও আকীকা কুরবানী করা মুসলমানদের আল্লার ও আল্লার রসূলের

আদেশ। মসজিদ প্রস্তুত করে আল্লার উপাসনা করাও আল্লাহর হুকুম। আপনি ইসলাম ধর্মের আদেশ, বিধি নিষেধের ওপর হস্তক্ষেপ করবেন না। আশা করি আপনি আপনার হুকুম প্রত্যাহার করবেন। ফক্‌ত– হাকির ও নাচিজ সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তীতুমীর। (দ্রঃ শহীদ তীতুমীর, পৃঃ ৫০-৫১)

সৈয়দ নিসার আলী তাঁর দাড়িওয়ালা সৎ সাহসী এবং নম্র শিষ্য মহঃ আমিনুল্লাহর হাতে পত্র দিয়ে পুঁড়ার জমিদার বাড়ি পাঠান। কৃষ্ণদেব পত্র পড়েই তাঁকে জমিদারি জেলে আবদ্ধ করতে আদেশ দেন এবং সকলের সামনে বন্দি সিংহ মারার মত বন্দি আমিনুল্লাহকে বাঁধা অবস্থায় সীমাহীন প্রহার করা হয় এবং হত্যা করা হয়। এই সংবাদ নিসারের নিকট পৌঁছালে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। তাই ব্যথিত হৃদয়ে বলেছিলেন, আমার আজাদী আন্দোলনের প্রথম শহীদ আমিনুল্লাহ।

ও দিকে ইংরেজেদের চক্রান্তে কলকাতায় বড় জমিদারদের গোপন মিটিং হয় 'লাটুবাবু'র বাসভবনে। তাতে অংশ গ্রহণ করেন গোবরা, গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়, ইদুর আঁটির দুর্গাচার রায়, পুঁড়ার কৃষ্ণদেব রায়, গোবরডাঙ্গার কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, নূরনগরের জমিদারের ম্যানেজার, টাকীর জমিদারের সদর নায়েব, রানাঘাটের জমিদারের ম্যানেজার, বাড়ির মালিক লাটুবাবু এবং বসিরহাট থানার ইংরেজ ভক্ত পুলিশ অফিসার রামরাম চক্রবর্তী। (দ্রঃ শহীদ তীতুমীর পৃঃ ৫২-৫৩) সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ইংরেজ পাদ্রী, ইংরেজ নীলকর ও সমস্ত জমিদার যথাসাধ্য সর্বপ্রকার সাহায্য দিয়ে জমিদার কৃষ্ণদেবকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা হবে। অধ্যাপক অমলেন্দু দে'র মতে তাঁরা প্রচারের মাধ্যমে হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ত্রাসের সৃষ্টি করেন।

জমিদাররা ওপরতলার ঘাঁটি মজবুত করে পুনরায় পূর্ব ঘোষিত নোটিশ অনুযায়ী মুসলমানদের নিকট কর আদায়ের অত্যাচারমূলক অভিযান শুরু করলেন এবং মুসলমানরা জরিমানা অনেকে দিল এবং অনেকে গ্রাম হতে পলায়ন করলো। কিন্তু বিপ্লবী নেতা তখনো মিলন মৈত্রীর পথই খুঁজতে লাগলেন। তিনি মোটেই চাইছেন না লড়াই হিন্দু-মুসসলমান হোক; বরং চাচ্ছিলেন ইংরেজ-মুসলমানে হোক। হিন্দু জনসাধারণ অন্তত নিরপেক্ষ থাকুক। কৃষ্ণদেবের জরিমানা আদায়ের অভিযান যখন সরফরাজপুরে আরম্ভ হল তখন সৈয়দ নিসারের সমর্থকরা বাধা দিল কিন্তু তা টিকল না। হিন্দু জমিদারের লাঠিওয়ালারা মসজিদে এবং গ্রামে পাইকারীভাবে আগুন লাগিয়ে দেওয়া আরম্ভ করে। অনেকে আগুনে ও অস্ত্রে আহত হয়। অমলেন্দুদে'র মতে একটি সৈন্যবাহিনীসহ সরফরাজপুর গ্রাম আক্রমণ করা হয়। নিসার সাহেব বা তীতুমীর এখনো ধৈর্য ধরতে সক্ষম হলেন এবং কোর্টে মোকদ্দমা করলেন। বারাসাত কোর্ট এত বড় নরহত্যা, মসজিদ পোড়ানো আর গ্রামকে শ্মশানে পরিণত করার কেস ডিসমিস করে, তখন কলকাতায় আপিল করা হয়। তাতেও কোন সুবিচার পাওয়া গেল না, তখন

নিসার সাহেব ক্ষুব্ধ হলেন এবং বুঝলেন সুবিচার চাইলে অবিচারই প্রাপ্য। (দ্রঃ A. R. Mallick op, cit P-81)

বীরের ধৈর্যধারণের শেষসীমা হতেই কাপুরুষতার সীমা। তাই 'মরি বা করি' ভেবে নারিকেলবেড়িয়ায় একটি কেল্লা সাধ্যানুসারে তৈরি করা হলো। মৈজদ্দিনের বাড়িতে সৈয়দ নিসারের আরাম করার ও গোপন পরামর্শ করার ব্যবস্থা হলো। তারপর তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ মাসুম আলী ও শেখ মিশকিন সমস্ত সৈন্যকে একত্রিত করে সৈয়দ সাহেব সকলকে প্রশ্ন করলেন এখন পাঁচজন লোকের প্রয়োজন, যাঁরা আজ আজাদী আন্দোলনে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। নারায়ে তাকবীর ধ্বনির মধ্যে সহস্র সহস্র সৈন্য ও সমর্থক অনিয়মিতভাবে হাত নেড়ে জানালো প্রাণ দেবার প্রতিশ্রুতি। এইবার আদেশ হলো কৃষ্ণদেব বাবুর পুঁড়া আক্রমণ করতে। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সৈন্য আমিনুল্লাহ হত্যা মসজিদ ও গ্রাম জ্বালানো আর অন্যায় জরিমানা আদায়ের প্রতিশোধ নিতে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলো। জমিদারদের সেনাবাহিনী নীলকর সাহেবদের কর্মচারী এবং পাদ্রীদের সহকারী সকলে মিলে প্রতিরোধ করেও কিন্তু পরাস্ত করা সম্ভব হয় নাই। মুসলমান সৈন্যরা গরুর মাংস খাওয়ার ব্যবস্থা জমিদার বাড়িতেই করে এবং তাঁর শোনিতাদি মন্দিরের দেওয়ালে নিক্ষেপ করে। অবশ্য এগুলো ভদ্র সমাজে নিন্দনীয় তার চেয়েও নিন্দনীয় যারা প্রথম আক্রমণকারী বা আক্রমণের কারণ হয়। কিন্তু প্রত্যেকেই অবাক হলো মাসুম সাহেবের সামরিক কায়দায় সৈন্য পরিচালনা দেখে, যা ইংরেজকেও স্তম্ভিত করে। (মিঃ হান্টারের লেখা দ্রষ্টব্য)। নদীয়া জেলায়ও একটি দাঙ্গা সংঘঠিত হয়েছিল নিসারের দলের দ্বারা। জমিদারের পক্ষে বসিরহাটের পুলিশ অফিসারের অনেক তদবীর করার জন্য পূর্ব আক্রোশে তাঁকে আক্রমণ করা হয় এবং হত্যাও করা হয়। এছাড়া আরও বড় অভিযোগ ইংরেজদের মাধ্যম ছিলেন তিনিই। অনেক মুসলমান সৈয়দ নিসারের আইন অমান্য করেন ফলে তাদেরও আক্রমণ করা হয় এবং কঠিনভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির মানুষ আক্রমণের শিকার হলেও চারদিকে চক্রান্তমার্কা কথা রটে গেল, হিন্দু-মুসলমানের যুদ্ধ অথচ মোটেও তা নয়। মোট কথা, নারকেলবেড়িয়া অঞ্চলের মানুষ বেশ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে ভবিষ্যতের ভাবনায়। (A.R. Mallick S Hunter-এর লেখায় দ্রষ্টব্য)

এইবার সৈয়দ নিসার ঘোষণা করলেন, 'আজ হতে ইংরেজদের সঙ্গে সর্বপ্রকার বিরোধিতা প্রকাশ্যে করতে হবে। ওদিকে জমিদারবৃন্দ, থানা, ইংরেজ অফিসার, ইংরেজ নীলকরদের সুপারিশ ওপর মহলের পরামর্শের পরে ইংরেজ সরকার একদল অশ্বারোহী সৈন্য পাঠালেন মাসুমের সৈন্যদের শায়েস্তা করতে কিন্তু সৈয়দ নিসার, মাসুম ও মিসকিনের পরিচালনা পদ্ধতি ইংরেজদের চেয়েও

উন্নত ধরনের ছিল, ফলে ইংরেজ সৈন্য পরাজিত হয় এবং অনেকে মৃত্যুলীলাবরণ করে।

সেটা ছিল ১৩৮১ সাল। ওদিকে ভারতের কেন্দ্রীয় নেতা যুদ্ধ করছেন ইংরেজের সঙ্গে শিখদের সম্মুখে। আর ঐ ১৩৮১ সালেই সৈয়দ নিসার সাহেবরা ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করছেন হিন্দুদের সম্মুখে। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হবে হিন্দু ও মুসলমানে এবং শিখ ও মুসলমানে যুদ্ধ, কিন্তু মোটেই না নয়। এটাই ইংরেজদের চালাকি। ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে মে মাসে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক অতর্কিত শিখ আক্রমণে শহীদ হলেন। ইতিহাস আজ নীরব কেন, জানি না। কয়েক মাস পরে সৈয়দ আহমদ ব্রেলবীর স্বার্গারোহণের সংবাদ সৈয়দ নিসারও পেয়েছিলেন কিন্তু ব্যাপকভাবে তা প্রচার করলেন না। তবে প্রিয় নেতার মৃত্যুর জন্য তিনিও উদগ্রীব হয়ে উঠছিলেন।

এদিকে নারিকেলবেড়িয়ার ইংরেজ সৈন্যের পরাজয়ের সংবাদ কলকাতায় পৌঁছবার পরেই একজন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে বাছাই করা সৈন্য আর উচ্চ শ্রেণীর কামান পাঠানো হলো নারিকেলবেড়িয়ার কেল্লা পতনের উদ্দেশ্যে। এবারেও সৈয়দ নিসার ওরফে তীতু মিঞা, মাসুম আলী ও মিসকিন খাঁ সৈন্যদের বললেন, 'আমাদের আগ্নেয় কামান নেই হয়ত মৃত্যু হতে পারে, যাদের ইচ্ছা যুদ্ধে বিরত থাকতে পার।' কিন্তু এমন একটিও দুর্বল হৃদয় পাওয়া গেল না যে প্রাণ দিতে ভয় পায়। যুদ্ধ আরম্ভ হতেই সিংহ নিনাদে হুঙ্কার ছেড়ে ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণ করলো মুসলিম সৈন্য। ইংরেজ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হওয়ার উপক্রম কিন্তু কালবিলম্ব না করে বিরাট আগ্নেয় কামান দাগা হলো। কামান পরিচালককে হত্যা করার জন্য সেনাপতি মাসুম বিদ্যুৎ গতিতে কামানের উপরে দাঁড়লেন কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পূর্বেই কামান দাগা হয়ে গিয়েছিল। অজস্র বিপ্লবী সৈন্য ইংরেজদের কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হয়ে মৃত্যুর কোলে ছিটকে পড়লো। মাসুম তো একবারে ইংরেজদের কোলে গিয়ে উপস্থিত। আর কয়েক সেকেন্ডে আগে লাফ দিতে পারলে হয়ত কামান মাসুমের হাতেই গর্জে উঠতো। মাসুম বন্দি হলেন, কেল্লা ধ্বংস হলো। মাসুমের বিচার হলো, প্রাণদণ্ড, ফাঁসি। অপরাধ তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর। রাঙ্গা রক্ত দিলেন শ্রদ্ধেয় শহীদ মাসুম আর সৈয়দ নিসার আলী বা তীতুমীরও কামানের আগুনের গোলায় শহীদ হলেন। কিন্তু ইতিহাস নীরব, নিঝুম। আর জীবন্ত যাঁদের পাওয়া গেল বিচারে তাঁদের জাহাজ ভর্তি করে ভারত হতে দূরে যাবজ্জীবন দেওয়া হলো আর আহতদের হাসপাতালে দেওয়ার নামে নদীতে নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু হায়! আজ ইতিহাস কি নিষ্ঠুর, যাঁদের রাঙা রক্তে তার প্রতিটি পাতা আজ ধন্য সেই অমর শহীদ মাসুম আর তীতুমীরের নাম অনেক দূরে নিক্ষিপ্ত। কিন্তু কেন? কি অপরাধ তাঁদের? বোধ হয় অপরাধ তাঁদের মুসলমানত্ব।

>Goto List

যাই হোক সৈয়দ আহমদ আর সৈয়দ নিসারের শহীদ হওয়ার পর ইংরেজরা ভেবেছিল স্বাধীনতা আন্দোলন বোধহয় খতম হয়ে গেল। আসলে আন্দোলন কিন্তু খতম হয়নি, খতম হয়েছিল ইংরেজদের হাতে কয়েক সহস্র মৌলুবী মাওলানা আল্লাহর ফকির। আর তাঁদের লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী ভক্ত কামানের ফাঁসিতে, জেলে, দীপান্তরে নানাভাবে নিহত হয়েছিলেন।

এইবার যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে পাটনার মাওলানা এনায়েত আলী, জওনপুরের মাওলানা কেরামত আলী, হায়দ্রাবাদের মাওলানা জৈয়নুদ্দিন, মাওলানা মহর আলী, মাওলানা ফরহাদ হুসেন প্রমুখ প্রখ্যাত আলেম ও তাঁদের অনুগামীগণ। ব্রেলীর একজন পীর সাহেব ইমাতাজিমামি যার পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মুরিদ ছিল। তিনি তাঁদের বলে দিয়েছেলেন এখন বেহেশত পাওয়ার সহজ পথ খ্রীস্টান ঘাঁটি খতম করে দেশকে স্বাধীন করা। বাংলায় যে মাওলানা মোল্লাহ ও ওস্তাদজীরা যুদ্ধের জন্য টাকা ও লোক সংগ্রহ করতেন, তাঁরা নিরক্ষর মানুষদের কাছে সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর কথা উহ্য রাখতেন। ঐ সময় প্রত্যেক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে মুসলমান প্রচারকরা দলে দলে যুবকদের উত্তেজিত করে এবং ইংরেজদের বন্ধু শিখদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য না পাঠাতে পারে। আর মুসলমানদের যেন কোন সভা করতে দেওয়া না হয়। মুর্শিদাবাদের লোক বেশি জেহাদে যোগ দিত, প্রাণের বিনিময়ে তারা চেয়েছিল ইংরেজ শাসনের পতন। তার প্রধান কারণ সিরাজের পতন তাদের বা তাদের পূর্ব পুরুষদের চোখের সামনে ঘটেছে। মুর্শিদাবাদের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে জেলা তদন্ত করতে এবং বিপ্লবীদের সম্বন্ধে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য উপর মহলের আদেশ হয়। তাই জেলার শাসক তাঁর লোকজন দিয়ে জনসাধারণকে বোঝাতে চাইলেন দেশ, মা, বাবা, ছেলেমেয়ে ছেড়ে অজানা-অচেনা জায়গায় গিয়ে লড়াই করে মরা নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি। ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে প্রভিন্সের সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ ডবলিউ, ডেমপিয়ার রিপোর্টে জানান, বিপ্লবীরা খুব ধর্মান্ধ এবং দারুণ একতাবদ্ধ এবং কয়েকজন বিশেষ নেতা দ্বারা পরিচালিত। তারা ব্রিটিশ শাসনেরই বিরোধী। সুতরাং তাদের ওপর খুব সাবধানতার সঙ্গে নজর রাখা দরকার। আর যদি বিদ্রোহের বিস্ফোরণ হয় তাহলে সূত্রপাত হবে এইসব ধর্মীয় গ্রুপগুলো দ্বারাই। "The Muhammedan poputalion in ...... it is from the excited religious fanaticism of this sect."

এনায়েত আলীর নেতৃত্বে ছয় শত লোকের একটি জামাত পদব্রজে রওনা হলো। তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করলে এই উত্তরই পাওয়া যায়– তাঁরা সব হজযাত্রী। ছয় শত লোক ছোট ছোট দলে একেকজন নেতার নেতৃত্বে চলতে থাকে যাতে লোকের চোখে সন্দেহজনক না মনে হয়। মিঃ ডেমপিয়ার সাহেব

>Goto List

জোওনপুরের কেরামত আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কিছু কথা বের করার চেষ্টা করলেও সাহেব বেশ সুবিধা করতে পারেননি।

রিপোর্টে আরও পাওয়া যায়, মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর এলাকায় নারায়ণপুর গ্রামে অনেকগুলো গ্রামের লোক একত্রিত হয়ে একটা সীমান্তে যুদ্ধের সাহায্য ও সহযোগিতা করার ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা নিয়েছে। ফলে সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। কারণ মুর্শিদাবাদ ইংরেজ বিদ্বেষের জন্য বিখ্যাত। মিঃ ডেমপিয়ার নিজে এইসব অঞ্চলে ঘোরেন এবং কোথায়ও বোঝান কোথাও বা ভয় প্রদর্শন, কোথাও বা প্রলোভন দিয়ে তাঁর পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। সবই প্রায় আয়ত্তে আসে শুধু নোয়াখালী, ফরিদপুর জেলা প্রভৃতি ছাড়া। উপরোক্ত তথ্যসমূহ Proceeding of the Judiacal Deprtment C.C. No, 21-25, 29 May, 1843 P. 454-461 দ্রষ্টব্য।

এই মুসলমান বিপ্লবী দল সারা ভারতে কয়েকটি কেন্দ্রীয় অফিস তৈরি করে, যথা- হায়দ্রাবাদ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, পেশোয়ার, আটাক রাওয়ালপিণ্ডি, থানেশ্বর, ঝিলান, অমৃতশহর, আম্বালা, দিল্লী, কানপুর, পাটনা ইত্যাদি। এই বিপ্লবী দলে দলে লোক যোগ দিতে থাকে। এমনকি হায়দ্রাবাদের শাসনকর্তার ভাইও আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর নাম মুবারেজুদ্দৌল্লাহ। তাঁর প্রভাবে বহু বিশিষ্ট লোক আন্দোলনে যোগ দেয়। ইংরেজ সরকার মুবারেজের উপর ষড়যন্ত্রকারীর অভিযোগ চাপিয়ে তাঁর কিছু বিশেষ সঙ্গীসহ বন্দি করে। কারাগারেই মুবারেজের মৃত্যু হয়, সঙ্গীদেরও কঠিন কষ্টের সঙ্গে প্রায় এগারো বছর কারাগারে রাখা হয়। (দ্রঃ R. C. Majumdar, op cit, PP 888-889)

বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি ছিল 'সীতানা' কেন্দ্র, বাংলা থেকে দূরত্ব প্রায় দু হাজার মাইল। বাঙালি মুসলিম বীরেরা ঐ দুই হাজার মাইল পদব্রজে ধর্মের জন্য ইংরেজদের মারবার জন্য অথবা তাদের হাতে মরার জন্য কেমন করে যেতেন তা শুধু পড়ার আর জানার বিষয় নয়; বরং গভীর চিন্তার বিষয়। আর ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে কেমনভাবে যোদ্ধা সংগ্রহ করা হতো, আর কেমনভাবে মা-বাবা উৎসর্গ করতেন মৃত্যুর মুখে প্রিয় সন্তানকে, কেমন করে যুবতী স্ত্রী বিদায় দিত তার প্রিয় স্বামীকে, সেই দৃশ্য একটু কল্পনা করলে মনে ভক্তির তরঙ্গে জোয়ার এনে দেয়। আর ঐ মৌলুবী মোল্লা যাদের বক্তৃতা ও যুক্তিতে মানুষ পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য কিন্তু নিষ্ঠুর ইতিহাস নীরব। পুরুষেরা দান করতো ফসলের অংশ যা তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কঠোর শ্রমে ফলাতো। আর মেয়েরা তাদের অতি সাধের গহনাগুলো খুলে দিত মোল্লাদের হাতে। তাঁরা সেই টাকা কেন্দ্রে পাঠাতেন। পত্র পাঠাতেন কিন্তু সেইসব পত্রের ভাষা ছিল সাংকেতিক। দলের লোক ছাড়া বোঝা অসম্ভব ছিল। আরও কঠিন কাজ করতে হতো বিপ্লবীদের

গুপ্তচর বাহিনীতে যারা সচ্ছল পরিবারের ছেলে হয়েও, শিক্ষিত হয়েও মূর্খের অভিনয় করে সাহেবদের বাড়ির চাকর হয়ে সংবাদ সরবরাহ করেছেন। (দ্রঃ ঐ পুস্তক)

ইংরেজরা শিখ সর্দার রনজিত সিং রায়ের মৃত্যুর পর ১৮৩৯ হতে একেবারে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে নিজেরা পাঞ্জাবের কর্তৃত্ব হাতে নেয় তখন শিখ জাতির অনেকে বুঝলো ইংরেজ জাতি শিখদের আসল বন্ধু নয়।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রখ্যাত পরিচালক মাওলানা বেলায়েত আলী পাটনা হতে সীতানা ঘাঁটি রওনা হলেন এবং বিভিন্ন জেলা ও শহরে অবস্থান করে সংগ্রামের বীজ ছড়াতে ছড়াতে মানুষকে জিহাদের দিকে আকর্ষিত করতে থাকেন। এমনিভাবে দিল্লীতে পৌছান এবং দু মাস সেখানে থেকে দিল্লীর শেষ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের যোগ্যতা, বীরত্ব ও মহত্বের অভাব ছিল না। কিন্তু ডানাভাঙা পাখির মত তিনি শক্তিহীন ছিলেন। সারা ভারতের শিখ ও হিন্দুদের বিরোধিতা অথবা সহযোগিতার অভাবে ইংরেজ যেন ভারতকে হাতের মুঠোর মধ্যে পুরেছে। মাওলানা বেলায়েত আলী ইংরেজদের শুধু শক্তি, পদ ও সিংহাসন থেকে নয়; বরং ভারত হতে চির বিদায় দেয়ার প্রস্তুতির ব্যাপারে বাহাদুর শাহের সাহায্যে প্রার্থনা করেন। সম্রাট বাহাদুর শাহ উত্তর দিয়েছিলেন- আমি আমার প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, এই বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ সরকারকে হটাতে যথাসম্ভব আমার সবকিছু তোমরা আশা করতে পার। তারপর মাওলানা বেলায়েত আলী সীতানায় পৌছালেন, সেখানে তাঁর ভাই এনায়েত আলী কর্মরত কঠিন কর্তব্যে গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। দুই ভাই-ই একই মন্ত্রে দীক্ষিত। এনায়েত আলী প্রস্তাব করলেন ইংরেজদের সঙ্গে সামগ্রিক যুদ্ধ করার। (Total war) কিন্তু মাওলানা বেলায়েত আলী আরও প্রস্তুতির প্রয়োজন মনে করে বললেন, সামগ্রিক যুদ্ধ করার অর্থ পরাজিত হওয়া। (দ্রঃ R, C, Majumdar P, 890) ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বীর মাওলানা বেলায়েত আলী দেহ ত্যাগ করেন।

হযরত মাওলানা শাহ আহমাদ মুজাদ্দেদ সাহেবের বিষয় পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তাঁরই স্বপ্ন সাধনা এবং বাদশাহ আলমগীরের কান্নাপ্লুত অন্তিম মোনাজাত বা প্রার্থনার ফলস্বরূপ ফকির মাওলানা শাহ ওলীউল্লাহর রোপিত বৃক্ষের ফল মহাজের মক্কী হাজী এমদাদুল্লাহ যাঁর সম্বন্ধেও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি যেমন আধ্যাত্মিকতা বা তাশাউফ তত্ত্বের মুকুটমণি ছিলেন তেমনি রাজনৈতিক চেতনাতেও ছিলেন সুদূরদর্শক নেতা। তিনি স্বয়ং বিপ্লবী সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে যেতে লাগলেন। ১৮৫৭ সালে তাঁকে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধের পরিচালক করা হলো। অপরদিকে পীর ফকির মাওলানা রসিদ আহমাদকে (র.) যুদ্ধের প্রধানমন্ত্রী করা হয়। আর মাওলানা পীর মাহমাদুল হাসান (র.)কে পররাষ্ট্র

দফতরের প্রধান হিসেবে বরণ করা হয়। হযরত সৈয়দ আহমাদ শহীদের (র.) রক্ত বিফল হওয়ার নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ আরও রক্ত দিতে প্রস্তুত হলো ইংরেজের বিরুদ্ধে। সামরিক কায়দায় যুদ্ধ ব্যবস্থায় তিনিই মহান নেতা, মহান শহীদ, মহান পরিচালক সন্দেহ নেই। (দ্র ঃ হায়াতে মাদানী)

অনেকের ধারণা মিঃ উইলিয়াম হান্টার একজন মুসলমান দরদি ইংরেজ। অনেক হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমান তাঁর সেই লেখারই উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন যেগুলোতে প্রমাণ হয় তাঁর মুসলমানপ্রীতির কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিঃ হান্টার ইসলাম তথা মুসলমানদের চরম শত্রু এবং হিন্দুদেরও পরম শত্রু। তাঁর 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান' গ্রন্থটি হিন্দু-মুসলমান বিবাদ বা বিভেদ বৃদ্ধিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুস্তক, যা ভারত বিভাগেও সহায়ক। যেমন পবিত্র কোরআনের ওপর আঘাত হানতে মিঃ হান্টার বলেছেন, "কোরআনের বাণীর সকল অর্থ এই যে, ইসলামের অনুসারীরা সারা দুনিয়া নিজেদের অধিকারে আনবে এবং বিজিতদের শুধু ধর্মান্তর গ্রহণের কিম্বা গোলামির অবস্থা বরণের অথবা মৃত্যুবরণ করার সুযোগ দেবে। একটা আধুনিক "নেশানের" অভাব সংকট সমাধানের উপযোগী করে কোরআন লিখিত হয়নি। তা লিখিত হয়েছিল একটা স্থানীয় যুদ্ধপ্রিয় আরব গোত্রের উৎপীড়িত, আক্রমণকারী ও বিজয়ী সম্প্রদায়ের ক্রমিক ভাগ্য পরিবর্তনের ভূমিকার উপযোগী করে।" ইত্যাদি আরও অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর মুসলমান বিদ্বেষীতা প্রমাণ করা যায়। তবু তার পুস্তকে পাণ্ডিত্যের প্রশংসা বা স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক সত্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। মুলমানদের দ্বারা বারবার বিপ্লবে বিব্রত হয়ে সারা ভারতে জনগণের সামগ্রিক অসন্তুষ্টি সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান এবং তার রিপোর্ট লিখতে দিলে তিনি ঐ বিখ্যাত বইটি লিখেছেন। বইটির নামেও বোঝানো যায় ভারতীয় মুসলমানদের মর্যাদা ও গুরুত্ব কতখানি। অথচ ভারতে চিরদিনই হিন্দু জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ তবুও "দি ইণ্ডিয়ান হিন্দু" বলে কোন গ্রন্থ তিনি লিখে যাননি। স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক তথ্য হান্টারের লেখায় পাওয়া যায়।

হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ ব্রেলবী (র.) যিনি এতবড় ফকির সাধক ও দেশের জন্য মৃত্যু বরণকারী, যিনি আজ অলিখিত অপ্রকাশিত ইতিহাসে, স্বাধীনতা আন্দোলনের ধ্রুবতারা, যিনি সারা ভারতে ইংরেজ জাতিকে পশুপালের মত তাড়িয়ে নিয়ে ভারতের বাইরে রেখে আসতে চেয়েছিলেন তার জন্য মিঃ হান্টার লিখেছেন, "একজন বিখ্যাত ডাকাতের অধীনে তিনি একজন ঘোড়সওয়ার সৈন্য ছিলেন। সৈয়দ আহমাদ সময়ের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলেন। তিনি ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে দিল্লীর বিখ্যাত একজন মাওলানার নিকট শরীয়তের শিক্ষা গ্রহণ করেন।" "অনেক বছর ধরে দুঃসাহসী মুসলমানরা যেখানে প্রকাশ্যে

>Goto List

রাজদ্রোহে লিপ্ত রয়েছে” “ভারতীয় মুসলমানরা হচ্ছে এদেশে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে চিরন্তন বিপদ। কোন না কোন কারণে তারা আমাদের শাসন প্রণালী থেকে দূরে সরে আছে। নম্রভাবাপন্ন হিন্দু সম্প্রদায় যেখানে আমাদর প্রবর্তিত পরিবর্তনগুলো আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছে সেখানে মুসলমানরা তাদের জন্য ভীষণ অত্যাচার হিসেবেই ধরে নিয়েছে।” “পাঞ্জাব সীমান্তে বিদ্রোহী বসতি স্থাপন করেন সৈয়দ আহমাদ।” “১৮২০ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমাদ ধীরে ধীরে ভারতের দক্ষিণাঞ্চল ভ্রমণ করলেন। তখন তাঁর শিষ্যরা তাঁর ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য স্মরণ করে সাধারণ চাকরের মত গোলামি করত।” এবং বহু দেশ বিখ্যাত মাওলানা গোলামের মত খালি পায়ে তাঁর পাল্কির দুধার দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে যেতেন।” উপরোক্ত তত্ত্বগুলো মুসলমানবিদ্বেষী হান্টারের লেখা হতে নিলেও আমাদের ইতিহাস তথ্যের সত্যতার পরিপূরক। তিনি আরও লিখেছেন, “১৮২২ সালে তিনি হজ করতে যান এবং পূর্বেকার ডাকাতিকে হাজী সাহেবের আল-খেল্লায় একেবারে ঢেকে দিয়ে তিনি অক্টোবর মাসে বোম্বাই শহরে উপস্থিত হন।” “কলকাতার দিকে রওনা হলেন। কলকাতার সাধারণ মুসলমানরা তাঁর কাছে এমনভাবে দলে দলে মুরীদ বা শিষ্য হতে লাগলো যে, প্রত্যেকের হাতে হাত রেখে শিষ্য করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ল। তখন মাথার পাগড়ি খুলে জনতার দিকে ছুড়ে দিয়ে বললো, যে কেউ তাঁর পাগড়ি ছুঁতে পারবে সেই তার মুরিদ বা শিষ্য হবে।” “ব্রেলী জেলার জন্মভূমিতে এক বিরাট হাঙ্গামাবাজ অনুচরের দল তার সহযোগী হলো। ১৮২৪ সালে সে পেশোয়ার সীমান্তের জঙ্গলী পার্বত্যদের মধ্যে গিয়ে পাঞ্জাবের সম্পদশালী শিখ শহরগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন।” “১৮২৬ সালে ২১ ডিসেম্বর বিধর্মী শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ আরম্ভ হয়েছে। ইতিমধ্যে ইমাম সাহেবের (সৈয়দ আহমাদ) প্রতিনিধিরা উত্তর প্রদেশে জিহাদের বাণী তাঁর শিষ্যদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল।” “১৮৩০ সালের জুন মাসে একবার পরাজিত হয়েও বিপ্লবী সৈন্যরা দুর্দান্ত বিক্রমে সমতলভূমি ছিনিয়ে নেয়। আর সেই বছর শেষ হওয়ার আগেই পাঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ার তারা ছিনিয়ে নেয়।” (দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান অধ্যায়)

সৈয়দ আহমাদ যে ইংরেজ শাসনের অবসান করতে চেয়েছিলেন তার জন্য মিঃ হান্টার লিখেছিলেন, “..... এই বাণী দিয়ে নিজের নামে মুদ্রার প্রচলন করেন। হিন্দু-মুসলমান জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবণতা বা পরিমাণ অনুমান করা যায় হান্টারের লেখায়– এক ইংরেজের উত্তর ভারতে অনেক বড় বড় নীলকুঠি আছে। তিনি আমায় বলেছেন তাঁর নিযুক্ত ধর্মভীরু মুসলমান জাতির নিয়মই হচ্ছে তাদের বেতনের একটা নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিতভাবে সিত্তানার

বসতির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া। আর যারা দুঃসাহসিক প্রকৃতির তারা বিপ্লবী নেতাদের অধীনে কমবেশি সময়ের জন্য কাজ করতেও যায়। তাঁরা হিন্দু ওভারসিয়াররা যেমন সময়ে সময়ে ছুটির দরখাস্ত করে বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ পালন করতে যায়, সেই রকম ১৮৩০ সাল হতে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত তাঁর মূল্যবান পেয়াদারা কয়েক মাসের ছুটি নিয়েছে এই অজুহাতে যে, তাদের জিহাদে যোগদান করতে হবে।” “আমাদের কর্তব্যচ্যুতিতে আমাদের প্রজারা জিহাদী বাহিনীতে যোগ দিয়েছে আমাদের শিখ প্রতিবেশীদের ওপর।” আগেও একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে ইংরেজ ও শিখ পরস্পর একে অপরের উত্তরাধিকারীর মত ছিল বলা যায়। “আমাদের পাঞ্জাব অধিকারের পর যে ধর্মান্ধতা পূর্বে প্রচণ্ডভাবে শিখদের ওপর ফেটে পড়তো, তাই শিখদের উত্তরাধিকারীরূপে আমাদের ওপর বর্ষিত হতে লাগলো।”

সারা ভারত এমনকি বাংলা হতেও স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলমান বিপ্লবীরা কেমনভাবে টাকা এবং যোদ্ধা সরবরাহ করতো তারও প্রমাণ ঐ মিঃ হান্টারের লেখা হতেই পাওয়া যায়, “বাংলাদেশ থেকে বিদ্রোহী বসতিতে নিয়মিতভাবে মানুষ ও টাকা পয়সা চালান করার জন্য তারা একটা পাকা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। ঠিক সেই সময় পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট পাঠান, পাটনা শহরে বিদ্রোহীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।” সৈয়দ আহমাদ সাহেবের ১৮৩১ খৃস্টাব্দে শহীদ হওয়ার পর অনেকে আন্দাজ করেন, মুসলমানরা বোধহয় চুপচাপ ছিল পরে একবার ১৮৩১ সালে ধুমকেতুর মত আবার বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। কিন্তু আসল সত্য হচ্ছে এই যে, মুসলমান বিপ্লবীরা বারবার ইংরেজদের আক্রমণ করেছে। মিঃ হান্টার বলেছেন, “সব সময়ই জিহাদীরা সীমান্তের আদি জাতিগুলোতে ব্যস্ত রেখেছিল বৃটিশ শক্তির সঙ্গে বিরামহীন সংগ্রাম সংঘর্ষে .... ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৬৩ সালের মধ্যে আমরা ষোলবার যুদ্ধ চালাতে বাধ্য হয়েছি। আর তার জন্য তেত্রিশ হাজার সৈন্যের দরকার হয়েছে।” “আর ১৮৫০ থেকে ১৮৬৩ সালের মধ্যে এই যুদ্ধের সংখ্যা হলো কুড়িবার। তার জন্য দরকার হয়েছে ষাট হাজার স্থায়ী সৈন্যের। তাছাড়া অস্থায়ী এবং পুলিশ তো আছেই।” “হিংসার বশবর্তী হয়ে কেমন করে (বিপ্লবীরা) যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ জানাতে সাহসী হতে পারে এটা বোঝা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়, কিন্তু এটা বোঝা খুবই শক্ত যে একটা সুসভ্য দেশের (ইংল্যান্ডের) সেনাবাহিনীর সুকৌশল ও সমরনীতির বিরুদ্ধে কীভাবে তারা বহু যুগ ধরে টিকে থাকতে পারে।” (দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস)

তখনকার মাওলানা ও পীরদের কাজই ছিল দলবলকে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার এবং এই জিহাদ তাদের কাছে নামাজ, রোজার মত ধর্মীয় ফরজ বা

অবশ্য কর্তব্য ছিল। তার প্রমাণেও হান্টার বলেছেন, “সোয়াত রাজ্যে অবস্থিত ধর্মনেতা আখন্দ সাহেবের প্রায় ছিয়ানব্বই হাজার মুরিদ বা শিষ্য ছিল আর তাদের প্রত্যেকটি লোক ইংরেজ আক্রমণের সম্ভাবনায় সজাগ ছিল। আর এই জন্যই তাদের খাঁটি বিশ্বাস ছিল এই বিধর্মীদের (ইংরেজেদের) সঙ্গে যখন যুদ্ধ করতেই হবে তখন একজন ইমাম সাহেবের অধীনেই থাকা যুক্তিযুক্ত। কারণ বিপ্লবী ইমাম সাহেবের পতাকার নিচে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ গেলেও ধর্ম শহীদদের মর্যাদা লাভ করা যাবে। ১৮৬৩ সালের অভিযানের সময় আমরা তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, বিপ্লবীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে আমাদেরকে পৃথিবীর বীরত্ব সমন্বিত বনেদি মুসলমান জাতিদের তিপ্পান্ন হাজার সম্মিলিত সৈন্যের শক্তি বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। (ঐ পুস্তকে)

মিঃ হান্টারের উপরোক্ত লিখিত মন্তব্যগুলোতে পূর্ণভাবে প্রমাণ হয় স্বাধীনতা যুদ্ধে বিপ্লবীদের শক্তি সামর্থ্য, সাহস ও সৈন্য সংখ্যার কথা। আসলে হান্টার ইংরেজ সরকারে বেতনভোগী বিশ্বাসী কর্মচারী সিভিলিয়ান, অন্তরে ভারতবিদ্বেষে ভরপুর। তাই তিনি ঐ তিপ্পান্ন হাজার সৈন্যের কথা বলেছেন। আসলে সংখ্যাটি হবে ষাট হাজার (Foreign office Records, A Maudud)

>Goto List

সিপাহী বিদ্রোহ না স্বাধীনতা বিপ্লব?

১৮৫৭ খৃস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের অনেক কথা সহজলভ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ নামটি ইংরেজদের দেওয়া। স্বাধীনতার সম্মানীয় বিপ্লবীদের ছোট এবং হেয় করার জন্যই এই বিলেতী বুদ্ধির ব্যবহার। ঠিক তেমনিভাবেই 'ওহাবী যুদ্ধ' কথাটিও বিলেতী বুদ্ধির বিস্ফোরণ। যাতে সাধারণ মুসলমানরা মনে করে ওহাবীরা হযরত রসূলুল্লাহর (সা.) অভক্ত অথবা শত্রু। তাঁরা নাকি নবী ও সাহাবাদের কবর ভাঙার দল। যাই হোক কার্ল মার্কস কিন্তু প্রমাণ করেছেন, 'বৃটিশ শাসক শ্রেণীরা অভ্যুত্থানকে কেবল সশস্ত্র সিপাহী বিদ্রোহরূপে দেখতে চায়, তার সঙ্গে যে ভারতীয় জনগণের ব্যাপক অংশ জড়িত তা লুকাতে চায় তারা। (দ্রঃ প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ কার্ল মার্কস ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ পৃঃ –১০)

"বিদ্রোহের ইতিহাস যাঁরা প্রথমে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের সকলেই ছিলেন ইংরেজ। বেশির ভাগ লেখক আবার ইংরেজ রাজপুরুষ।" ইংরেজ ঐতিহাসিকরা একে বলেছে সিপাহী বিদ্রোহ। আর ভারতীয়রা একে বলতে চান ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" (দ্রঃ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, মনিবাগচি, প্রথম প্রকাশ, ১ম পাতা)

প্রথমে কলকাতা হতে কিছু দূরে ব্যারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয় বলেই আমাদের মোটামুটি জানা ছিল। কিন্তু তা নয়, সৈন্যদের ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাইরে থেকেই। বিশেষ করে এটা ছিল মৌলবী মাওলানা ও পীর ফকিরদের কাজ আর তার কারণ ছিল ইংরেজের সুকৌশলে ধর্মে হস্তক্ষেপ। আগেই বলা হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার ইংরেজ বিদ্বেষের কথা। মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৮৫৭ সালে ২৬ ফেব্রুয়ারি বহরমপুরেই প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ হয়। আর তার পরের মাসে মার্চ-এ আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটে ব্যারাকপুরে (দ্রঃ কার্ল মার্কস ফ্রেডরিক এঙ্গেলস পৃঃ ১৯৮) "ব্যারাকপুর হতে একশ মাইল দূরে ভাগীরথীর তীরে এ সেনানিবাস। বিদ্রোহের ডঙ্কা এখানেই প্রথম বেজেছিল।" (সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস পৃঃ ৩২)

কার্ল মার্কস ও এঙ্গেল্স মুসলমান মাওলানা পীর ওলীদের সংক্ষেপে নাম 'ফকীর' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কোন জায়গায় মৌলুবী শব্দও ব্যবহার করেছেন। পূর্বে যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে তাতে যেন প্রমাণ হয় যত বিপ্লব সবই যেন শুধু মুসলমানরাই করেছে আর কেউ কিছু করেনি তা নয়। মুসলমানদের সঙ্গে অমুসলমানদেরও ভূমিকা কিছু কিছু পরলক্ষিত হয়। যেমন কৃষক বিদ্রোহে অনুন্নত হিন্দুদের সন্ধান মেলে। তাছাড়া ১৮৫৬তে সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে অনুন্নত অমুসলমানদেরই অবদান বলা যায়। (দ্রঃ মনি বাগচি সিঃ যুঃ ইঃ)। তবে ফকীর বিদ্রোহের নেতা মজনু শাহ-ই-সন্ন্যাসী নেতা ভবানী পাঠককে

বিদ্রোহে অবতীর্ণ করেন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। জনাব মজনু ভবানী পাঠকের মধ্যে যে বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তার প্রমাণের অভাব নেই (ক) "ফকীর নেতা মজনুর সঙ্গে সন্ন্যাসী নেতা ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। (খ) সাঁওতাল বিদ্রোহেও (১৮৫৫-৫৭) স্থানীয় মুসলমান তাঁতীরা 'সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে। (ক ও খ উদ্ধৃতি দুটি ডক্টর মনিরুজ্জামান সাহেবের লেখা হতে নেওয়া হয়েছে; আর তিনি নিয়েছেন নরহরি কবিরাজের লেখা 'স্বাধীনতা সংগ্রাম বাংলা' পুস্তকের ৫৩ ও ৮২ পৃষ্ঠা হতে।)

সৈয়দ আহমেদ ব্রেলবীর শহীদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত শত মোজাহেদ শহীদ হন। তার মধ্যে বিখ্যাত নেতাদের মধ্যে মাওলানা ইসমাইল শহীদ ও মাওলানা আবদুল হাই প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য রনজিৎ শিং যেমন ইংরেজদের প্রকাশ্য পক্ষালম্বনকারী তার ওপর ইংরেজদের চক্রান্তের শিকার হয়েছিল ইয়ার আলী নামক এক বিশ্বাসঘাত। তাই ১৮০৩ খৃঃ বালাকোটের ঐ মর্মান্তিক বিপর্যয়। বিপর্যয়ের পরেই মাওলানা সৈয়দ ওমর আলি সিত্তানায় উপস্থিত হন এবং সর্বসম্মত নির্বাচনক্রমে মাওলানা নাসিরুদ্দীনের বিপ্লবীদের সেনাপতি করা হয়। তারপর মাওলানা এনায়েত আলী, মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা জয়নাল আবেদীন প্রমুখ আলেম সারা ভারতে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে জনতাকে ইংরেজদ্রোহী করে তুলতে লাগলেন। জৌনপুরের কেরামত আলী এবং হায়দরাবাদের জয়নুল আবেদীন এমন জ্বালাময়ী ধর্মীয় বক্তৃতা করতেন যে মহিলারা তাদের গয়না খুলে দান করতে চিন্তা করার অবকাশ পেতেন না। আরও সহস্র সহস্র আলেম প্রত্যেকে জিহাদকেই প্রধানতম গুরুতম দায়িত্ব মনে করে দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। তার মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল গফুর, ফারহাদ আলী, মহরম আলী, সৈয়দ আকবর শাহ, সৈয়দ মোবারক শাহ, শাহ মুহাম্মদ হসেন, মুহাম্মদ বাকের আলী, মৌঃ আঃ রহমান, মালদহের আমিরুদ্দীন, মকসুদ আলি, থানেশ্বরের জাফর খান, পাঠনার মৌঃ ইয়াহইয়া আলি, আবদুল গাফফার ১নং, আব্দুল গাফফার ২নং, মঃ শফী, ইলাহী বখশ, পাটনার হসেনি, আবদুর রহিম, আঃ করিম, কাজী মিঞাজান, টংকের নবাব আমির খান, জাহানাবাদের আবদুল মজিদ খাঁ, আল্লাহ বখশ খাঁ, আকবর খাঁ, মঃ বরকাতুল্লাহ প্রমুখ বিপ্লবীদের প্রত্যেকের জীবনী ঐতিহাসিক তথ্য বিজরিত। লিখলে নিসার আলীর মত, শরীয়তুল্লার মত পড়ার ও বোঝার মত সম্পদ সম্ভার হবে। এদের মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় এমন কিছু বিপ্লবী আলেম নেতা আছেন, যাঁদের ভূমিকা শুধু ভারতের ছিল না বরং তাঁরা বহির্ভারত তথা সারা বিশ্ব সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন। যেমন হাজী ইমদাদুল্লাহ, মাওলানা আহমাদুল্লাহ. মাওলানা ফজলে রহমান খাইরাবাদী, মাঃ আঃ রশীদ গাঙ্গুহী, মাওলানা কাসেম নানুতুবী ও মাওলানা আব্বাস আলী (র. আজ.) প্রমুখ প্রত্যেক

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁদের বুদ্ধিমত্তা রাজনীতি ও কূটনীতির ইতিহাস আজ নিষ্ঠুরভাবে অজ্ঞাত ও উপেক্ষিত। নীল চাষ ব্যাপারে ইংরেজরা চাষীদের ওপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছিল ফলে খণ্ড খণ্ডভাবে একাধিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তারও মূলে ছিল ঐ মুসলমান দাড়িওয়ালা ফকীর ও মওলুবীর দল আর তাঁদের ধর্মগত গণও প্রাণভক্ত ও সমর্থক শ্রেণী। শ্রী যুক্ত দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীলদর্পণ' পুস্তকে তার প্রমাণ দিয়ে মুসলিম চাষীবীর তোরাব আলীর নাম উল্লেখ করে প্রমাণ রেখেছেন নীল চাষের ব্যাপারে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রধানত মুসলমান চাষীরাই সংগ্রাম করেছেন।

বাইরের বিপ্লবীরা ইংরেজ সৈন্য শ্রেণীতে ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহী করার ব্যাপারে মুসলমান সৈন্য আগে হতেই ইংরেজ বিদ্রোহী ছিল কিন্তু হিন্দু সৈন্যদের কোনক্রমেই ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা সম্ভব হচ্ছিল না। সে আলোচনা পরে আসছে। তাই গরু শূকরের চর্বি মিশ্রিত টোটা দাঁতে কাটার ঘটনা একটা কূটনৈতিক অজুহাত মাত্র। আসলে চতুর ইংরেজ এত বোকা ছিল না যে একই টোটায় উভয় জাতির ঘৃণীত চর্বি মিশিয়ে উভয় জাতিকেই বিদ্রোহী করে তুলবে। মুসলমান মওলুবী পীর ফকিরের মাঝে এমনিভাবে নানা কিছু রটিয়ে বিদ্রোহের চেষ্টা করতেন যেমন লবণের মধ্যে হাড়ের গুঁড়ো আছে' ইত্যাদি অনেক কিছু। ব্যস, অমনি চিন্তা হত মানুষের না কোন জন্তুর হাড়। টোটার ঘটনাও তাই। টোটার মসৃণ কাগজ যার জন্য বলা হয়েছিল চর্বিই মসৃণতার কারণ কিন্তু তা নয়। কাগজ তৈরি হত শ্রী রামপুরে সেখানে হিন্দু কর্মচারী গোড়া হতেই ছিল। যদি গরুর চর্বির কোন ব্যাপার থাকতো তাহলে ওখানেই অশান্তি শুরু হয়ে যেত। ১৭ মার্চ ব্যারাকপুরের সৈন্য ছাউনিতে মিঃ হিয়ার্স যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন বা হাতে-কলমে যা প্রমাণ করেছেন তাতে গরু ও শূকরের চর্বির কথা অলীক বলা যেতে পারে। তাই কার্ল মার্কসের মূল্যবান উদ্ধৃতি এখানে স্মরণীয়—"১৮৫৭র গোড়ার দিকে সে মাত্র প্রচলিত শূকর ও গরুর চর্বি মাখানো টোটার প্রবর্তন, ফকীরেরা বলতে লাগল-ইচ্ছা করে করা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক সিপাহীজাত খোয়ায়।" (কার্ল মার্কস ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, পৃঃ ১৯৮) ঐতিহাসিক দার্শনিক কার্ল মার্ক্সের লেখায় আরও দেখা যায়, "১৮৫৭তে মার্চ ও এপ্রিলে আম্বালা ও মিরাটের সিপাহীরা বারবার গোপনে নিজেদের ব্যারাতে নিজেরা আগুন লাগাতো। অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলোতে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে লোকদের উসকাতে লাগল ঐ ফকিররা।" (দ্রঃ ঐ পুস্তক ১৯৮ পৃঃ)

ঐ ফকীর কারা? ঐ পীর মওলুবীর দল যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে মোটাসোটা কাপড় আর তালি দেওয়া ঢিলাঢালা জামা পরতেন আর কাঁধের উপর লাঠিতে ঝোলানো কাপড়ের পুঁটলী যার ভেতর থাকত লক্ষ লক্ষ টাকা, সোনার টুকরো আর দামি দামি সাঙ্কেতিক চিঠি পত্র! আরও কত কী।

>Goto List

ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে মুসলমানেরাই আগে বিদ্রোহী হয়েছিল তারও কিছু কারণ থাকা দরকার। তা হচ্ছে এই, ১৮৫৮ খৃ: ৭ আগস্ট সর্দার শেখ হেদায়েত আলী ইংরেজ সরকারকে বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে সিপাহীদের ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণগুলো বেশ বোঝার ব্যাপার। যথা–(ক) পাঞ্জাব অধিকার করার পর ইংরেজ সরকার সৈন্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে দাড়ি কাটা বাধ্যতামূলক থাকবে না কিন্তু পরে দাড়িওয়ালা সৈন্যদের দাড়ি কাটতে বাধ্য করা হয় এবং অসম্মত সৈন্যদের বরখাস্ত করা হয়। (খ) ইংরেজ পাদ্রীদের মারাত্মক খ্রিস্টধর্ম প্রচারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তার উপর সাহরানপুরে নতুন হাসপাতালে মহিলাদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয় এবং সব জায়গাতে পর্দা সুন্নাতের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয় এবং বিবাহের বিষয়ে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। (গ) সৈন্যদের সরকারের প্রয়োজনে যেখানে যত দূরেই হোক যেতে বাধ্য থাকার অঙ্গীকারের সহি হয়। ওশফত গ্রহণ করানো হয়। (ঘ) সর্বশেষে চর্বি মিশ্রিত টোটার আমদানি প্রভৃতিতে ধারণা হয় সরকারের উদ্দেশ্য সকলকে খৃস্টান করা।

মুসলমানদের রাঙ্গা রক্ত যেমন আযাদী আন্দোলনে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল তেমনি বিখ্যাত কলমনবীসদের কালির জ্বালাময়ী লেখনীও মুসলমানদের উগ্র চেতনাকে, স্বাধীনতার বাসনাকে বৃদ্ধি করেছিল। মিঃ হান্টার তাঁর লেখায় ইংরেজবিরোধী কিছু বই-এর নাম লিপিবদ্ধ করে গেছেন। যেমন (১) সিরাতুল মুসতাকীম, অর্থাৎ সোজা পথ, তাতে জেহাদকে সোজাপথের মূলবস্তু বলা আছে (২) কাসিদা বা জিহাদমূলক কবিতা গুচ্ছ (৩) সির-ই-ওয়াকেয়া তাতে যোদ্ধাদের বীরত্ব বর্ণনা আর বিধর্মীদের অত্যাচার পরিমাণমত পৌঁছালেই জিহাদ ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য বলে বর্ণনা করা আছে (৪) ভবিষ্যৎ জিহাদের ফলাফল আন্দাজ দেওয়া আছে, যা বিপ্লবীদের উৎসাহ বৃদ্ধির সহায়ক (৫) তওয়ারীখ কায়সারুম কিম্বা মিসবাহুস সারী। আবদুল ওহাবের সত্যতথ্য, হাতে লেখা প্রচারিত পুস্তক। (৬) তাবকিয়াতুল ঈমান বা ধর্মের শক্তি বৃদ্ধিকরণ (৭) তাজকেরুল আখওয়াই বা ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার (৮) নসিহাতুল মুসলেমিন বা মুসলমানদের প্রতি উপদেশ (৯) হেদায়াতুল মুসলেমিন বা মুসলমানদের পথ প্রদর্শনা (১০) চেহেল হাদিস, জিহাদ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদের (সা.) চল্লিশটি বাণী (১১) তানবিরুল আইনাইন বা চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি প্রসারিতকরণ (১২) আমবিউল গাফেলিন অর্থাৎ অমনোযোগীদের প্রতি তিরস্কার। (দ্রঃ দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস)

মুসলমান মৌলভী. মোল্লা, খতিবরা প্রত্যেক গ্রামে বিত্তবান প্রত্যেকের কাছে শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে যাকাত কর, এককালীন দান তো গ্রহণ করতেনই সেই সঙ্গে প্রত্যেক বাড়িতে প্রতি বেলায় এক মুঠি করে চাল একটা পাত্রে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে মাসে সহস্র সহস্র মণ চাল উঠত এবং আদায়কারী

আসতে বিলম্ব হলে মেয়েরা তা বিক্রয় করে তাঁর পয়সা পৃথক করে রেখে দিত। শত প্রয়োজনেও তা খরচ করা হত না। কারণ তারাও বিশ্বাস করতো এই কাজটুকু করলেও তাদের জিহাদে অংশগ্রহণ করার মত পূণ্য পাওয়া সম্ভব হবে। মিঃ হাণ্টার এই তথ্যকে বিকৃত করে লিখেছেন, “আগে এজন্য মসজিদে যে সদকা ও ফেতরা আবশ্যিক হিসেবে আদায় হত পূর্বে তা কেবল গরিবদের জন্যই বণ্টন করা হত সেসব অর্থ জিহাদের জন্য গ্রহণ করতে লাগলেন।” “তিনি নির্দেশ দেন প্রতিটি গৃহে প্রত্যেক লোককে প্রতিবেলায় একমুঠি করে চাল পৃথক করে রেখে দিতে হবে”। (মিঃ হাণ্টারের ঐ পুস্তক দ্রষ্টব্য) মিঃ হাণ্টার খুব সুদক্ষ চতুর লোক ছিলেন। তাই তিনি অতি কৌশলে তাঁর পুস্তকে জানিয়েছেন ‘পবিত্র জন্তু গরু’ সম্বন্ধে তাঁর দরদ অথচ সাহেব নিজে একজন ভাল গোমাংসাশী ছিলেন। শুধু মাওলানা শ্রেণীই নয় ধনী ও মধ্যবিত্তরাও বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ রাখতেন। চামড়া ব্যবসায়ী প্রায় সকলেই ধনী মুসলমান ছিলেন, মিঃ হাণ্টার তাই মুচী সম্প্রদায় ও মুসলমান চামড়া ব্যবসায়ীদের একই পর্যায়ে ফেলেছেন। আর ব্যারিস্টারি চাল খাটিয়ে লিখেছেন, “তারা (অর্থাৎ মুসলমান চর্ম ব্যবসায়ীরা) বেশ জানে যদি ব্রাহ্মণরা কখনো ক্ষমতা হাতে পায় তাহলে তারাই হবে তাদের হাতের প্রথম বলী। এই চামড়া ব্যবসায়ীরাই হল ওহাবী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে অর্থশালী ও ধর্মশালী সমর্থক, যে ওহাবীদের মূলমন্ত্র হচ্ছে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।” (দ্রঃ মিঃ হাণ্টারের ঐ পুস্তক)

মুসলমান মৌলবী মোল্লাদের সুনিপুণ কৌশলে প্রচারিত হয়েছিল “ময়দাতে হাড়ের গুঁড়ো মেশানো আছে।” এই জনরব কেবল মিরাটেই নয় সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। জনরব উঠল মিরাটের খালবারের কলগুলোতে। ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে ময়দা তৈরি হচ্ছে এবং সেই সব ময়দার সঙ্গে গরুর হাড়ের গুঁড়ো মেশানো হচ্ছে।” (দ্রঃ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস) ইংরেজ সরকার মনে করলো ময়দার দাম চড়েছে বলেই এই সব ফাসাদ। তাই ময়দার দর সস্তা করে দেওয়া হল। অমনি ফকীর মৌলবীর দল নতুন কথা রটাতে লাগলো ফলে লোকের মনে দৃঢ় ধারণা হল হাড়ের গুঁড়ো মেশানো ময়দা তাই এত সস্তা। কানপুরের বাজারে কেউই ময়দা কিনল না। সেখানকার সিপাহীরা পর্যন্ত ঐ ময়দা স্পর্শ করল না।” (দ্রঃ ঐ)। যে মাদ্রাজে ভেলোর বিদ্রোহ হয়েছিল ঐ ময়দার ঘটনাও তাতে বিজড়িত ছিল। প্রতিটি বিদ্রোহে এমনি আজগুবী কথা রটানো হয়েছিল, “ইংলণ্ডের রানী ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুমতিক্রমে বৃটিশ কর্মচারীরা ময়দাতে চিনিতে ও নুনে হাড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে দিচ্ছে, ঘি-এর সঙ্গে মেশানো হচ্ছে জন্তুর চর্বি। কুয়োর জলে গরুর মাংস ও শুয়োরের মাংস ফেলে দিয়ে ঐসব অপবিত্র করা হয়েছে। তখন

গুজব আরও রটেছিল যে, কোম্পানীর হুকুমে সকল ভারতবাসীকে বিলিতি রুটি খেতে হবে। পাউরুটিকে তখন লোকে বলত বিলিতি রুটি আর তাদের ধারণা ছিল এই বিলিতি রুটি খেলে জাত যাবে।" (দ্রঃ ঐ)

এসব আলোচনায় বিপ্লবীদের ওপর শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে আর উলামা মোল্লা ফকীরদের রাজনৈতিক দুরদর্শিতা দেখে অবাক লাগে। তখনকার দিনে জাত যাওয়া রোগটা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব বেশি ছিল। আর সেই সময় হিন্দু নেতা বলতে জমিদার তালুকদার সরকারি কর্মচারী সাহিত্যিক কবিরা বেশির ভাগই ইংরেজদের বিরোধিতা করতে পছন্দ করেননি। তাই ঐ সমস্ত কাল্পনিক রটনার সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে, ধর্মভীরু মাওলানা ফকীর পীর, আওলিয়া হযরত মুহাম্মদের (দ.) আদর্শে চলতেন যদি মেনে নেওয়া যায় তবে ঐ মিথ্যার প্রশ্রয় নেওয়া কী করে সম্ভব হয়েছিল? তার উত্তরে স্মরণ করা যেতে পারে, হযরত মিথ্যাকে ঘৃণা করতেন আর মিথ্যাতে বিশ্ব বাঁচাতে তিনি ছিলেন দৃঢ়হস্ত। শুধু কয়েকটি স্থানে তা বৈধ করা হয়েছে তার মধ্যে "ফিল হারব" অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র একটি স্থান।

মুসলিম বিপ্লবীরা ভারত জুড়ে সংবাদ সরবরাহ করতে একটি নতুন বৈজ্ঞানিক কৌশল অবলম্বন করেছিল তার নাম ছিল 'চাপাতি তকসিম'। পাতলা চাপাতি রুটি বাড়িতে বাড়িতে বিপ্লবীদের বাড়িতে সাহায্যকারী ও সহযোগীদের বাড়িতে সেই চাপাতি চলতো, ইংরেজ গুপ্তচর ঠিক করতে পারতো না বিপ্লবীদের মধ্যে এত চাপাতি রুটির আদান প্রদানের প্রাবল্য কেন? কিন্তু প্রত্যেক চাপাতির মধ্যে থাকতো একটা কাগজের পত্র তাতে লেখা থাকতো বিপ্লবীদের শহীদ হওয়ার সংবাদ এবং আগামী সঙ্কেত।

ভারতের হিন্দুজাতি এবং শিখ জাতি এই দুই বৃহত্তম ও বৃহৎ জাতি দুইটির যদি সাহায্য ও সহযোগিতা, সমর্থন আশানুরূপভাবে ইংরেজ না পেত তাহলে হযরত সৈয়দ আহমেদ ব্রেলবীর প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধই শেষ স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিণত হত আর সহজেই স্বাধীনতা পাওয়া যেত। পাঞ্জাবের মহারাজা ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে দীলিপ সিংজাতি ত্যাগ করে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। (দ্র: কার্ল মার্কস ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ পৃ: ১৯৭)। মিঃ হান্টার শিখদের জন্য তাঁর পুস্তকে ইংরেজদের উত্তরাধিকারী বলেছেন, যা পূর্বেও উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। বৃটিশ বা ইংরেজ তাই ১৮৫৭র বিপ্লবে মুসলমানদের তো বিশ্বাসঘাতক ওহাবীও বিদ্রোহী বলতোই সেই সঙ্গে হিন্দুদেরও বিশ্বাসঘাতক উপাধি দিতে কার্পণ্য করেনি। কারণ সারা ভারতের হিন্দু সৈন্যরাও টোটার চর্বি ময়দায় হাড় গুঁড়ো প্রভৃতির কারণে খেপে উঠেছিল। যেমন ব্যারাকপুরে মঙ্গলপাঁড়ে রেগে ইংরেজ অফিসারকে তরবারীর চোট দিয়ে আহত করতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু পরে তিনি এত ভীত হন যে নিজের বুকে বন্দুক লাগিয়ে পায়ে করে ফায়ার করেন। অবশ্য মরার চেষ্টা

করেও তাক ঠিক ঠিক না হওয়ায় প্রাণ যায়নি তাই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে সুস্থ করা হয়েছিল পরে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়েছিল। ইতিহাসে মঙ্গলপাঁড়ের অবদান অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইতিহাসের ইতিহাসে আমরা দেখবো প্রকৃত বীর আত্মহত্যা করেন না আত্মহত্যার পেছনে লুকিয়ে থাকে কাপুরুষতা, ভীরুতা অথবা দুর্বলতা। ইতিহাসে আরও দেখা যায় মুসলমান রাজা বাদশাহ্ থেকে নিয়ে সামান্য সৈনিক পর্যন্ত আত্মহত্যা করার কলঙ্ক হতে মুক্ত। এর পরে আমরা এমন আরও অনেক শহীদ বীর হিন্দুর কথা বলবো, যাঁদের তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়ে শেষ হত্যা করা হয়েছে তবু তাঁরা স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেননি। অথচ মিথ্যা প্রশংসার মুকুট পরিহিত বীর লর্ড ক্লাইভ কাপুরুষের মত নিজের প্রাণ নিজেই শেষ করেছেন।

যা হোক, শিখ সম্বন্ধে কমিউনিষ্ট নেতা বলেছেন, "বৃটিশ সার্ভিসে প্রায় ১,০০,০০০ শিখ আছে এবং তারা কিরকম উদ্ধত তাও শুনেছি; তারা বলে আজ তারা বৃটিশদের পক্ষে লড়ছে, কিন্তু ভগবান যদি করেন তবে কাল তাদের বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়তে হতেও পারে।" (দ্রঃ কার্লস ফ্রে: পৃঃ ১৯৫) তারপরে আরও লেখা রয়েছে–"ব্রাহ্মণ তন্ত্রের একটি বিশেষ সম্প্রদায় তারা হিন্দু এবং মুসলমানকেই ঘৃণা করে।" (দ্র ঐ পুস্তক ঐ পৃঃ) ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ। ... প্রকাশ্য বিদ্রোহ প্রায় ঘটতো, কোনক্রমে তার দমন চলতো, রেঙ্গুন আক্রমণে সমুদ্র পাড়ি দিতে সরাসরি অস্বীকার করল বেঙ্গল আর্মি, ফলে তাদের জায়গায় আনতে হয় শিখ রেজিমেন্টগুলোকে।" (কার্ল মার্কস) কার্ল মার্কস আরও লিখেছেন, "কাগলিয়ারি ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখের একটি বৃটিশ ডিস্প্যাচ আমাদের বলছে যে, "দিল্লীর শেষ খবর ১২ আগস্টের। তখনও শহরটা বিদ্রোহীদের দখলে, কিন্তু শিগগিরিই একটা আক্রমণ চালানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কেননা প্রভূত অতিরিক্ত শক্তি নিয়ে জেনারেল নিকলসনের পৌঁছতে আর এক দিনের মার্চ লাগবে।" উইলসন ও নিকলসন তাঁদের বর্তমান শক্তি নিয়ে আক্রমণ না করা পর্যন্ত যদি দিল্লী দখল না করা হয় তাহলে তার দেয়ালগুলো আপনা থেকেই পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়েই থাকবে নিকলসনের প্রভূত শক্তির পরিমাণ হল প্রায় ৪,০০০ শিখ–" (কার্ল মার্কস পৃ: ১০৩-১০৪) ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ ৫৭ সালের সৃষ্ট নয়, বহু আগে হতেই তা শুরু হয়েছে। তা আজ আমরা সকলে না জানলেও বা না মানলেও ইংরেজ জানতো ও মানতো তাই আমাদের কল্যাণে নয় তাদের বাঁচার তাগিদে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম রেল পথের প্রচলন ও ইলেকট্রিক টেলিগ্রাম নির্মাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাজ করতে তারা বাধ্য হয়েছিল। যদি এটুকু না করতো তাহলে যদিও শিখ সৈন্য ও ইংরেজ সৈন্য বিদ্রোহ দমনে প্রাণপণে লড়েছিল তবুও তাদের অবশ্য অবশ্যই পরাজয় বরণ করতে হত আর দেশ সর্বোতভাবে ইংরেজমুক্ত হত ১৯৪৭ -এর পরিবর্তে ১৮৫৭

-ই হত স্বাধীনতা দিবস। সত্য কথা যা সচারাচর সহজপ্রাপ্য সংবাদ নয় তা বিশ্বাস করা কঠিন। তাই শিখ জাতির সঙ্গে মারাঠাদের কথাও একটু বলা প্রয়োজন। মারাঠারা ভারতে ইংরেজদের রাজত্ব কায়েম করার পেছনে কত সাংঘাতিকভাবে দায়ী তা এর আগে বলা হয়েছে; এখানে ১৮৫৭-এর মহা বিপ্লবে সেই সত্য তথ্য প্রমাণের দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়। তদানীন্তন মারাঠাদের দুই বিখ্যাত রাজা যাদের হাতে বিরাট জনতার জনবল বিরাট সুসজ্জিত সৈন্য শ্রেণী তারা এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেননি। তা না করেও যদি নিরপেক্ষ থাকতেন তাহলেও তাদের চরিত্রে বিশ্বাসঘাতকতার অথবা অদূরদর্শিতার অথবা প্রাচীন ছুতমর্গীয় সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ না দিলেই চলতো। কিন্তু তাঁরা ইংরেজের পক্ষে প্রাণপ্রিয় আত্মীয়ের মত হয়ে ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দুদের বুকে বন্দুক মারতে বীরত্ববোধ করেছেন। এখানেও একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। "দুই মারাঠা রাজা হোলকার ও সিন্ধিয়া কী পথ নেয় তার ওপরেই এ সিদ্ধান্ত। যে ডিসপ্যাচে মহাও, তোস্টুয়ার্টের আগমনের কথা জানানো হয়, তাতেই বলা হয়েছে যে, হোলকার এখনো অটল থাকলেও তাঁর সৈন্যরা বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। আর সিন্ধিয়ার কর্মনীতি সম্বন্ধে একটি কথা বলা হয়নি। ইনি যুবক, জনপ্রিয়, তেজী, সমস্ত মারাঠা জাতির স্বাভাবিক নেতা ও সমাবেশ কেন্দ্র বলে তাঁকে ধরা হবে। তাঁর নিজের ১০,০০০ সুশৃঙ্খল সৈন্য আছে। তিনি বৃটিশদের পক্ষ ত্যাগ করলে শুধু মধ্য ভারত তাদের হাতছাড়া হবে তাই নয়, বিপ্লবী সংঘটা পাবে বিপুল শক্তি ও সঙ্গতি।" (দ্রঃ কার্ল মার্ক্স ফ্রেডারিক এঙ্গেলর্স পৃ: ১০২)

অতএব পরিষ্কারভাবে পরিচ্ছন্ন ভাষায় প্রমাণ হচ্ছে শিবাজী বংশের মহামান্য বংশধরগণ মারাঠাদের বিখ্যাত রাজা হোলকার ও সিন্ধিয়া ইংরেজদের পক্ষে ভারতীয়দের বিপক্ষে প্রাণপণে লড়াই করেছেন।

নেপালের গুর্খারা ভারতবাসীকে হত্যা করেছে ইংরেজের পক্ষে। এই বিরাট বিষয়ের ছোট্ট কথাটি প্রমাণের জন্য নাম করা সমাজ বিজ্ঞানীর লেখা হতেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি–১৮৫৭ খৃস্টাব্দের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে– "সেখানকার বৃটিশ বক্ষী সৈন্যদের এখন একমাত্র আশা ৩০০ গুর্খার একটা সৈন্যদল তা তাদের সাহায্যের জন্য জঙ্গবাহাদুর পাঠিয়েছেন নেপাল থেকে।" "জঙ্গবাহাদুর (১৮১৬-১৮৭৭), ১৮৪৬ সাল থেকে নেপালের রাজা ১৮৫৭, ৫৯ সালের ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সময় ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন।" (কার্ল মার্ক্স ফ্রে: এঙ্গেলস্)

১৫৮৭ খৃস্টাব্দে সৈন্য বিক্ষোভের ধারাবাহিকতা

আগেই বলা হয়েছে কয়েক বছর আগে নানা জায়গায় নানাভাবে বারবার বিদ্রোহ করেছিল ভারতের মুসলমান ধর্মীয় নেতা ও তাদের সমর্থকরা।

বঙ্গের পরিবেশ এমনভাবে বিষিয়ে উঠেছিল যে, জানুয়ারি মাসে হঠাৎ আগুন লেগে যায় ব্যারাকপুরে। অবশ্য অনেকের মতে সেখানেও মুসলমান ছিন্ন পরিচ্ছদ পরিহিত ফকির ও গুপ্তচরদের হাত ছিল। তাঁরা ভিক্ষুক সেজে ক্যান্টনমেন্টে লোহার তার বাঁধা গোল টিন নিয়ে খাবার সময় উচ্ছিষ্ট ভাত, তরকারি ও রুটির টুকরো সংগ্রহের জন্য লালায়িত হয়ে লাইন দিয়ে বসে থাকতেন আর বাড়ি জিজ্ঞাসা করলে কেউ বলতেন মিরাট, কেউ বলতেন লাক্ষ্ণৌ ইত্যাদি। তারপরেই টুকটুক করে সেখানকার সৈন্যদের বিদ্রোহ আর ইংরেজদের কুকীর্তির কথা শোনাতেন। আর বলতেন ইংরেজদের তাদের রাজ্য হারাতে আর দেরি নাই ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বাণীও করতেন। মুসলমান ফকিররা হিন্দু সন্ন্যাসীর পোশাক পরে ইংরেজের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলতেন আর হিন্দু সৈন্যরাও সাধুদের কথা খুব মন দিয়ে শুনতেন।

প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহ বলতে যা বোঝা যায় বা দেখা যায়, তা হয়েছিল ২৬ ফেব্রুয়ারি বহরমপুরে। কলকাতা হতে কাল নতুন টোটা এসেছে তাতে নাকি শূকর ও গরুর চর্বি আছে আগে হতেই শোনা ছিল। অযোধ্যা নবাবের রাজ্য গ্রাস করার সময় ইংরেজ সরকার বাছাই করা বাঙালি সৈন্য নিয়ে গিয়েছিল সেখানে। আর ওখানে ছিল বিপ্লবী দলের প্রচারকদের প্রাধান্য আর গুজবের ঘাঁটি। ইংরেজের অযোধ্যা দখল করা হলো বটে কিন্তু বাংলার প্রায় প্রত্যেক ক্যান্টনমেন্ট হতে যে সমস্ত সৈন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে অনেক অযোধ্যার পদচ্যুত বেকার সৈন্যদের সঙ্গে আলাপ হয় আর ফকিরদের অর্থাৎ মৌলবীদের অভিযানও চলতে থাকে। ফলে যখন বাঙালি সৈন্যরা বাংলার ডেরায় ফিরে আসেন সেই সঙ্গে নিয়ে আসেন বিদ্রোহের বীজ। তাই বহরমপুর মুসলমান ও হিন্দু সৈন্যরা টোটা দাঁতে নিতে অস্বীকার করেন। এ্যাডজুট্যান্টের মুখে এই সংবাদ পেয়ে মিঃ মিচেল দেশীয় অফিসারদের নিয়ে জামাদার, হাবিলদার ও সুবেদারদের আদেশ দিলেন কোয়ার্টার গার্ডের সামনে সমস্ত সৈন্যকে হাজির হবার জন্য। তারপর তিনি কঠিন কণ্ঠে বললেন, "শিখ সুবেদার মোহন সিংকে বলে দাও টোটা ব্যবহার না করলে মারাত্মক শাস্তি দেওয়া হবে এবং চীন কিংবা ব্রহ্মদেশে চালান দেওয়া হবে, যেখানে গেলেই মানুষ মরে।" মিঃ মিচেলের হুঙ্কার সৈন্যদের সন্ত্রস্ত বা বিগলিত করতে পারল না। ১৯ ফেব্রুয়ারি হঠাৎ রাত্রে সৈন্যরা বিকট চিৎকার ও কলরবে বিদ্রোহের পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। মিঃ মিচেল গোলন্দাজ নেতাদের জানালেন যেন তাঁরা যুদ্ধ কামান সৈন্যদের সামনে সাজিয়ে প্রস্তুত রাখে। কোন প্রকারে বিপ্লবীরা একটু শান্ত হলেন। কলকাতা হতে সংবাদ এল যেন ১৯ নং রেজিমেন্টদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়। চারদিকে ছড়িয়ে গেল এই সংবাদ। ব্যারাকপুরেও সংবাদ এল। এখানেও সমস্ত সৈন্যদের এক সঙ্গে দাঁড় করিয়ে মিঃ হিয়ার্স কঠিন কণ্ঠে নয় কোমল ও মধুর সুরে সৈন্যদের বোঝালেন– যার সারমর্ম

হচ্ছে চর্বি, হাড়ের গুঁড়ো প্রভৃতির কথা কল্পনামাত্র। কোন সৈন্য যেন ইংরেজ সরকারকে ভুল না বোঝে। সৈন্যরা একটু শান্ত হয়েছেন মাত্র এমন সময় তাঁরা সংবাদ পেলেন রেঙ্গুন হতে জাহাজ ভর্তি ইংরেজ সৈন্য কলকাতায় পৌঁছেছে। আর একটা খবর এল বহরমপুর বিদ্রোহীদের ব্যারাকপুরে এনে তোপের সামনে দাঁড় করিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে। এই সংবাদে আবার সৈন্যগণ খেপে উঠলেন। হট্টগোল হল। একজন অফিসারকে তাঁরা ভীষণভাবে আহত করলেন। এদিকে বহরমপুরে বাছাই করা বিপ্লবীদের বন্দি করে বারাসাতে আনা হল। তারপর কলকাতা কিংবা ব্যারাকপুরে নিয়ে যাওয়া হবে অফিসাররা ঠিক করে নিল। ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের গোড়া পত্তন বলে যাঁরা দাবি করেন তা যে ঠিক নয় এবং গোড়া পত্তন যে অনেক আগেই হয়েছিল তার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পূর্বে হয়েছে। তবুও আমরা জানি ৮ এপ্রিল মঙ্গলপাঁড়ের ফাঁসি হয় আর ২৯ মার্চ ইংরেজ অফিসার আহত হন। মধ্যে এই ৮-৯ দিনের ব্যবধানে একটা ফাঁসির কেস্ শেষ হওয়া সন্দেহজনক। তবে বাঙালি সৈন্য ইংরেজ মিঃ বগকে আক্রমণ করেছেন মাত্র। মিঃ বগ মারাও যাননি। তবুও ফাঁসি হয়েছে যেহেতু সাহেবের আহত হওয়া ভারতীয়দের নিহত হওয়ার চেয়েও বড় কথা।

এদিকে বহরমপুর হতে আনীত হিন্দু-মুসলমান সৈন্যদের সামনে মিঃ হিয়ার্স একটা বক্তৃতা করলেন, যার সারমর্ম হচ্ছে এই—তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পরিহিত পোশাক খুলে নেওয়া হল না এবং প্রত্যেকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা খরচা এবং বকেয়া বেতন শোধ করে দেওয়া হল যেহেতু তাঁরা পথে আসতে কোন প্রকার উত্তেজনা বা বিদ্রোহমূলক অসভ্যতা প্রদর্শন করেনি।

আসলে ওপর মহল হতে আগেই পরামর্শ হয়েছিল, যদি রাস্তা খরচা দিয়ে আর বেতন না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে কলকাতায় বিক্ষোভ ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু হতে পারে। কারণ অসংখ্য বিপ্লব সমর্থক সাধারণ মানুষ ও বিত্তবান মানুষ সেই সুযোগের প্রতিক্ষায় আছে। মিঃ ক্যানিং সৈন্যদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার সংবাদে খুশি হলেন। আবার বলতে হচ্ছে মঙ্গলপাঁড়ে হিন্দু ছিলেন, তাই তাঁর নাম দিয়ে মুসলমান ফকীররা হিন্দু মহল্লায় প্রচার করতে লাগলেন, পৈতেওয়ালা সাধু গোছের সৈন্যকে নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচারী সাহেবদের ফাঁসি দেওয়ার কথা। ইংরেজ পক্ষের দেশীয় বুদ্ধিমান দালালরা প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, মঙ্গলের সঙ্গে একই সাথে জামাদারের তাহলে ফাঁসি হলো কেন? আসলে তাদের অন্য অপরাধ ছিল। তার উত্তরে প্রচারক দল প্রচার করল, মঙ্গল পাড়ে যখন মিঃ বগকে অস্ত্র চালান তখন তিনি বাধা দেননি তাই তাঁকেও বিদ্রোহী হিসেবে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। পল্টনের জমাদার মুসলমান ছিলেন বলে কিছু লোকের মত। অথচ তাঁর নাম মঙ্গলের নামের সঙ্গে সমভাবে মর্যাদা পায়নি। তিনি যে জাতিরই হন ভারতীয় সৈন্য নিঃসন্দেহে। পাঞ্জাবের কাছেই আম্বালা আর ঐ আম্বালাতেই কাগজ তৈরির

প্রধান ঘাঁটি। অথচ ঐ এলাকাতেই মুসলমানের সেই বিখ্যাত ঘাঁটি সিত্তানা। তাই ওখান হতেও রটাতে সুবিধা হয়েছে শূকর ও গরুর চর্বির কথা। সুতরাং মিঃ আনসন গভর্নর জেনারেলকে জানালেন, গোলযোগ দেখে মনে হয়, আম্বালার রাইফেল ডিপো তুলে দেওয়া ভালো, কেননা টোটা অপেক্ষা টোটার কাগজেই সিপাহীদের বেশি আপত্তি।"...পত্রের উত্তরে গভর্নর জেনারেল জানালেন, "রাইফেল চালানো স্থগিত রাখার আমি বিরোধী।... প্রকৃত কথা টোটা নহে, জনরব।"...

মিরাটের বিরাট বিদ্রোহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের সবচেয়ে বৃহত্তম সেনানিবাস। ওখানে মুসলমানরা সংখ্যাতে খুব বেশি। পাঁচ হাজার সৈন্য সব সময় সরগরম করে রেখেছে গোটা ক্যান্টনমেন্ট। এর ভেতরেই কারখানা। আর এই কারখানাতেই তৈরি হয় ঐ চর্বি টোটা। অতএব সর্ব প্রথম চর্বির কথা এখানে ওঠে তাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ চর্বিযুক্ত টোটার ঘটনার জন্মদাতা মিরাট ক্যান্টনমেন্ট অথবা সেই শহরে সুকৌশলী বিখ্যাত প্রচারকবৃন্দ। তবে সেখানেও মৌলবী-মুবাল্লিগ ও ফকিরদের অবদান নিষ্ঠুর ইতিহাসে একেবারে হজম করে নাই। যেমন একটি অত্যন্ত মূল্যবান উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে, "মিরাটে এক সময় একটা ঘটনা ঘটে। একদিন সকালে দেখা গেল কোথা থেকে এক মুসলমান ফকির এসে হাজির হয়েছে মিরাটে, তার সঙ্গে অনেক চেলা। কি একটা হাতির উপর চড়ে ঐ ফকিরকে পরপর কদিনই ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল। ফকির সেখানে কী করতে গিয়েছিল, তা কেউ-ই জানে না। পুলিশের হুকুম এল তার ওপর দলবল নিয়ে মিরাট থেকে এখনি চলে যাবার জন্য। ফকির হুকুম পালন করলো বটে, কিন্তু অনেকের বিশ্বাস ফকির মিরাট ছেড়ে যায়নি। সে ২০ নং রেজিমেন্টের সিপাহী দলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল।" (সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস পৃ: ৪৫০ দ্র:)

হাতির উপর চড়ে থাকা ফকিরটি কে ছিলেন এবং দলবলেও কারা ছিলেন জানতে খুব গভীর চিন্তার প্রয়োজন নেই। মিরাটের বাজারের প্রত্যেক মুসলমান ও হিন্দুর শুধু জাত গেল রব। ২৩ এপ্রিল সৈন্যদের রুদ্র মূর্তি দেখে ২৪ এপ্রিল প্যারেড হবে ঘোষণা করলেন। সৈন্যদের দাঁড় করিয়ে পেছনে গুলি ভরা কামান সাজিয়ে কর্নেল টোটা নেয়ার আদেশ করলেন। কিন্তু সকলেই আদেশ অমান্য করলেন। কিন্তু সৈন্যগণ বল প্রয়োগ করলেন না তাহলে কামানের গোলার আত্মহত্যার নামান্তর হবে। ভারতীয় সৈন্যদের বন্দি করা হল। মিঃ হিউয়েট ও মিঃ স্মিথ সামরিক আদালতে বিচার করিয়ে বিপ্লবী সৈন্যদের হাতে পায়ে লোহার কড়ি পরিয়ে সর্বসাধারণের সম্মুখে দু-মাইল হাঁটিয়ে একটি জেলে পাঠানো হল। তাতে বিদ্রোহী সৈন্যরা ভয় পেলো না বরং আরও মরিয়া হয়ে উঠলো।

>Goto List

৬ মে ব্যারাকপুরে ৩৪ নং সৈন্য দলকে দাঁড় করানো হল। পেছনে ইংরেজ সৈন্য কামান নিয়ে প্রস্তুত। লেঃ মিঃ পামার শাস্তির সংবাদ পড়ে শোনালেন। প্রত্যেকের বন্দুক ও ইউনিফর্ম কেড়ে নিয়ে চাকরি হতে পদচ্যুত করা হল। এখানে মনে রাখা দরকার যে, এই যে এখানে ৩৪ নং সৈন্যদল আর বহরমপুরের ১০ নং সৈন্য দলকে পদচ্যুত করা হল, এই দল দুটিও ডালহৌসির অযোধ্যা আক্রমণের সময়ে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত ছিল আর ওখান হতেই বিদ্রোহের তালিম শুরু হয়। আরও জেনে রাখার কথা যে, ঐ ১৯ নং সৈন্য দলে সাত শত সৈন্য ছিলেন যাঁদের বাড়ি অযোধ্যা আর তাঁদের বেশির ভাগই জাতিতে মুসলমান, ফকির সাহেবদের অনুগত।

পদচ্যুত হওয়া ঐ সাত শত অযোধ্যার সৈন্য সারা ভারতে কাগজের পত্রে বা 'চাপাতি রুটির পত্রে' চাকরিতে নিয়োজিত সৈন্যদের ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার জন্য অনুরোধ করেন। এই তথ্য লর্ড ক্যানিংকে লেখা মিঃ হেনরি লরেন্স-এর পত্রে পাওয়া যায়। হেনরি লরেন্স অযোধ্যার সৈন্য শিবিরেও পঞ্চাশজন বিদ্রোহী দলপতিকে হঠাৎ রাত্রি বেলায় বন্দি করে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত করে গুরুতর দণ্ড দিলেন। তাঁর একজন হিন্দু গুপ্তচরকে বহু সৈন্য শিবিরে পাঠিয়ে সংবাদ আনালেন। মুসলমানদের অবস্থা তো আমরা জানি কিন্তু হিন্দু সৈন্যদের অবস্থা কেমন? সংবাদ যা এল তা নৈরাশ্যজনক। এ প্রসঙ্গে একটা উদ্ধৃতি খুবই যথোপযুক্ত– 'জামাদারটি ব্রাহ্মণ বয়স চল্লিশের ওপর। ভারতে বহু সেনানিবাসে ঘুরে সে এখন অযোধ্যায় এসেছে। বহু অভিজ্ঞ জমাদারটির সঙ্গে আলাপ করে হেনরি লরেন্স বুঝলেন যে, নানা কারণে দেশীয় সৈন্যদের মনে অসন্তোষ এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বর্তমানে একমাত্র তাদের আনুগত্যের উপর নির্ভর করে রাজ্য শাসন আর সম্ভব নয়।" (দ্রঃ সিঃ যু, ইঃ, শ্রী মনি বাগচি, পৃঃ ৫৫)

মিঃ জন লরেন্স, মিঃ হেনরি, জেঃ হিয়ার্স, মিঃ ক্যানিং প্রমুখ বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বুঝলেন বিলেত বা ভারতের বাইরের সৈন্য না আনলে আর ভারতে টিকে থাকা সম্ভব নয়। চীন অভিযান বন্ধ করে সমস্ত সৈন্য ভারতে আনা এবং যেখানে যত ইংরেজ সৈন্য আছে সেখানে কাজ চলাগোছের রেখে সব ভারতে পাঠানোর চূড়ান্ত কথাটি মিলিটারীর সেক্রেটারীও অনুমোদন করলেন এবং পাহাড়ি, নেপালি, গুর্খা প্রভৃতি সৈন্য আমদানির কথা পাকাপাকি হয়। লর্ড ক্যানিং বেশ বুঝতে পারলেন এতদিন হিন্দু সৈন্য তাঁদের বাধ্য ছিল এখন তাও হাত ছাড়া হচ্ছে। তাই তিনি তাড়াতাড়ি মিঃ লরেন্সকে পত্র পাঠালেন শিখ সৈন্য বৃদ্ধির কথা জানিয়ে, কারণ শিখদের বরাবর বিশ্বাস করে ফল পাওয়া গেছে। তারা বরাবরই ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করে এসেছে। ক্যানিং তাঁর পত্রে বিশেষভাবে লিখলেন হিন্দু সৈন্যরা বিদ্রোহ করলেও হিন্দু জাতি তো মুসলমানদের মত বিশ্বাসঘাতক নয় সুতরাং পাতিয়ালার মহা রাজা ও ঝিন্দের মহারাজার কাছে সৈন্য সাহায্য পাঠাতে যেন ইতস্তত না করেন। (দ্রঃ ঐ. পৃ: ৫৯)

মোটকথা শোষক ইংরেজের কিছু ভয় হলো। তাই দুখানি ঘোষণাপত্র প্রচার করা হলো (ক) ভারতে কারো জাতি ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হবে না বা ধর্ম সংস্কারে আঘাত দেওয়া হবে না। (খ) কোম্পানীর অধীনস্থ সৈন্যগণ তাদের শপথ অনুযায়ী কাজ করলে কোম্পানী হতে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করা হবে। যারা প্রতিজ্ঞা ও বিশ্বাস ভুলে বিপরীত পথে চলবে, অবাধ্য হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তাদের জন্য কঠিন সাজার (শাস্তির) ব্যবস্থা বিদ্যমান।

১৮৫৭ সালের ৩১ মে রবিবার ভারতে একসঙ্গে চারদিকে বিপ্লবের আগুন জ্বালানো হবে বলে দিন ঠিক করা হয়েছিল। আর সংবাদ চাপাতি রুটির মারফত গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। গ্রামের নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত সভ্যকে চাপাতি পৌঁছে দিলেই বাকি কোথায় পৌঁছাতে হবে তা তিনি নিজেই ঠিক করে নিতেন। "বিদ্রোহের বাণী সেদিন সারা ভারতে প্রচারিত হয়েছিল এক আশ্চর্য উপায়ে–চাপাতির মারফত। এছাড়া মুসলমান সিপাহীদের প্ররোচিত করার জন্য বহু মুসলমান ফকিরের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল।" (সি: যু: ই:, মনি বাগচি, পৃ: ৭৩)

দিল্লীর দরবারে তখন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। বাহাদুর শাহের স্ত্রীর নাম ছিল জান্নাত মহল। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বীর ও বীরাঙ্গনার খ্যাতির দাবিদার। সেই সময় মিঃ ডালহৌসি ছিলেন বাংলার গভর্নর। ঐ সময় তাঁর পদে এলেন লর্ড ক্যানিং। ১৭৫৭ সালে পলাশীর পুতুল খেলার যুদ্ধে ইংরেজ ভারতের সর্বময় কর্তা হয়ে পড়লেও গোপন কাপুরুষতা ও ভীরুতা অথবা দুরদর্শিতা প্রভৃতি যেকোন কারণে ইংরেজ নিজেদের নামে পূর্ণভাবে মুদ্রা তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। আকবর শাহের মৃত্যুর দুবছর আগে অর্থাৎ ১৮৩৫ সালে ইংরেজ হিম্মত করে নিজেদের নামে টাকা বা মুদ্রায় মুসলমানদের বাদশাহদের প্রাচীন ঐতিহ্য যুক্ত স্মৃতি মুছে ফেলে। ৭৮ বছর পর ইংরেজদের প্রচলিত মুদ্রায় মুসলমানদের মনে আরও ক্রোধের সঞ্চয় হয়। ৩১ মে বড় রকমের একটা কিছু হবার আগেই মিরাটে পঁচাশিজন ভারতীয় সৈন্যকে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়। প্রথমত নিষ্ঠুর ও প্রকাশ্য অত্যাচার অবশেষে কারাগারে দীর্ঘ মেয়াদি জেল। ফলে ৩১ তারিখ আসার আগেই ১০ মে সহস্র সহস্র সৈন্যের ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্বেষ বিস্ফোরিত হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়লো। কর্নেল স্মিথ শুধু সৈন্য বিভাগেরই লোক ছিলেন না সেই সঙ্গে সুদক্ষ সাংবাদিকও। তাঁদের সাংবাদিকতায় শুধু বিপ্লবীদের বিপ্লবকে ছোট করে দেখানো আর 'সব শান্ত' 'সব আয়ত্তাধীন' লেখাই অভ্যাস তবু কিছু কিঞ্চিৎ প্রকাশ যে হয়নি তা নয়।

কর্নেল স্মিথ লিখেছেন, 'দিল্লী গেজেট' পত্রিকার জন্য– "দিল্লী শান্ত। বিদ্রোহীদের শাস্তি দেয়ার পর মনে হচ্ছে এখানে আর কোন বিবাদ ঘটবার সম্ভাবনা নাই।" রবিবার সূর্যাস্তের পর বিখ্যাত পাদ্রী মিঃ নর্টন গার্জার ঘণ্টার শব্দ

শুনে সপরিবারে গীর্জায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন অমনি একজন গুপ্তচর সংবাদ দেয় আজ ভারতীয় সৈন্যরা প্রতিশোধ নেবে। পাদ্রী বিশ্বাস করলেন না বটে কিন্তু স্ত্রী-পুত্র পরিজন নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিজেই গেলেন গীর্জায়। গীর্জার কাছে দেখলেন বন্দুক-তলোয়ার আরও নানা অস্ত্র হাতে সৈন্যরা মারকাট রবে গুলি করতে করতে হুঙ্কার ধ্বনি দিতে দিতে জেলখানায় পৌঁছলেন। তারপর জেলের বদ্ধ কয়েদিদের সব মুক্ত করে বিপুল হর্ষ নিনাদে চারদিক আলোড়িত করে তুললেন। ঐ সময় উদ্ধত বিপ্লবীদের বাধা দেয়ার সাহস কারো ছিল না। সেখানে ছিল ২০ নং পল্টনের কয়েকজন সৈন্য মাত্র। তবুও জেলখানার লোহার দরজা-জানালা ভেঙে প্রত্যেকের পায়ের-হাতের বেড়ি খুলে দিয়ে জেলের কয়েদিদের সঙ্গে নিয়ে মিরাট শহরকে লাল কাল আগুন আর ধোঁয়ার আগ্নেয়গিরিরূপে রাঙিয়ে তুললেন ভারতীয় বীর সৈন্যরা। ক্যান্টনমেন্টে সংবাদ যাওয়া মাত্র ইংরেজ কর্ণেল মিঃ ফিনিস বাছাই করা কয়েকজন সৈন্য নিয়ে সকলের সামনে সামনে ঘোড়া ছুটিয়ে একবারে বিপ্লবীদের কাছে এসে ঘোড়া লাগাম টেনে ধরলেন। বিপ্লবীরা যাঁকে এতদিন দেখলে সম্মান জানাতেন, ভয়ে জড়সড় হয়ে পুতুলের মত তাঁর আদেশ ও উপদেশ শুনতেন। সেই মিঃ মিনিস আজও তিরস্কার করলেন আর উপদেশের সঙ্গে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা করা ঠিক হয়নি বোঝাতে চাইলেন। অমনি একটি বন্দুক গর্জে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটি আহত হয়ে বসে গেল। কর্নেল ফিনিস রেগে উঠে দাঁড়ালেন অমনি আর একটি বন্দুক গর্জে উঠলে গুলি বক্ষ ভেদ করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। মিঃ ফিনিসের জীবনও ওখানে ফিনিস হয়ে গেল। তখন ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি হতে লাগলো। বিপ্লবীদল সাহেব, মেম, বৃদ্ধ, শিশু কাউকে ছাড়লেন না। সব বন্দুক বেয়নেট তরবারির তলে তলিয়ে যেতে লাগলো। শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের প্রাতিশোধের ধারা ইতিহাসের স্তরে স্তরে এমনিভাবে সাজানো আছে। (দ্রঃ ঐতিহাসিক মিঃ ম্যালিসনের লেখায়) মিঃ কেয়ী লিখেছেন, "শিকারের গন্ধ পেয়ে হিংস্র বাঘের দল যেমন গর্ত হতে বের হয়ে পড়ে, প্রত্যেকে প্রকাশ্যে রাস্তা, গলিপথ, আবর্জনাপূর্ণ শহরতলী হতে সেইরূপে তারা বের হতে লাগলো।"

ক্যাপটেন সেজে ইংরেজদের পাইকারীভাবে শেষ করা হয় আবার সেনানিবাসের বাইরে ইংরেজ অফিসারদের সালামও দেয়া হয়, যেন ভেতরে কিছুই ঘটেনি। রাত্রে চাঁদনী উঠল তখন দেখা গেল ইংরেজদের বাসভবনগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে। বহুদিনের সঞ্চিত অত্যাচারের ফল যেন অগ্নিশিখা আর তাণ্ডবলীলায় পরিবর্তিত হয়েছে। ১১ মে সকালবেলায় সহস্র সহস্র মৃতদেহ জীবন্ত সাহেবরা দেখে ভাবতে লাগলো অনেক কিছু। দেখা গেল না শুধু বিদ্রোহী বিপ্লবীদের। তাঁরা কোথায় গেলেন? চাঁদের আলোয় তাঁরা দ্রুত মৌন মার্চ করে সারারাত ধরে দুই হাজার সৈন্য সারিবেঁধে চলেছেন দিল্লীর পথে। মাঝে মাঝে

>Goto List

'আল্লাহু আকবর' 'দ্বীন্ ইসলাম জিন্দাবাদ' ধ্বনি দেওয়া হচ্ছিল। যমুনার ধারে প্রথমেই পৌঁছালেন অশ্বারোহী সৈন্য তার পরেই পদাতিক। বুকে বিপ্লবের বিপুল বাসনা। ভয়-ভীতি যদিও নেই, তবে মিরাট হতে সম্মিলিত বিলেতি সৈন্য গোলন্দাজ বাহিনী যদি পেছনেই এসে পড়ে তাহলে মোকাবিলার জন্য বিপ্লবীদের কামান বা গোলন্দাজ বাহিনীর ব্যবস্থাই নেই। আগে হতেই চাপাতির রুটির সংবাদে যমুনার প্রচুর নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাই নৌকার সৈতু তৈরি করে তার উপর দিয়ে নির্জন নদী অতিক্রম করলেন বিপ্লবী দল। ভিড়ের মধ্যে একজন ইংরেজ গুপ্তচর বিপ্লবী সৈন্যদের সঙ্গে সেতু অতিক্রম করছিল। জাতিতেও ছিল ইংরেজ কিন্তু ভারতীয় সৈন্যের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব হলো না। সেতুর উপর হতে মাথাটা গড়িয়ে পড়ল যমুনার জলে। শুধু একটি তরবারীর আঘাত মাত্র।

দিল্লীতে প্রবেশ করেই প্রভাত সূর্যালোকে চকমকিয়ে উঠলো শাণিত ক্ষুধার্ত অস্ত্র গুলি। বিদ্রোহীরা আকাশ- বাতাস কম্পিত করে "হামারে দ্বীন- জিন্দাবাদ" "হামারী বাদশাহী জিন্দাবাদ" প্রভৃতি স্লোগানে দিগন্ত মুখরিত করে তুললো। বাংলায় দিন মানে দিবস আর দীন মানে দরিদ্র আর আরবীতে ধর্মকে বলা হয় দ্বীন। বাংলায় তাই দ,ব,ঈ,ন নিয়ে দ্বীনকে 'দিন' ও 'দীন' থেকে পৃথক করা হয়েছে। যাইহোক মিঃ বাগচী মহাশয় এই উক্তির সমর্থনে লিখেছেন, "তারপর দিল্লীর রাজপথ মুখরিত হয়ে উঠলো বিদ্রোহীদের অশ্ব খুরের শব্দে। প্রভাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে "দীন দীন" রবে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বিদ্রোহীদের একদল এসে দাঁড়াল লালকেল্লার বাদশাহী প্রাসাদের বাতায়ন তলে।" (সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, পৃঃ ৯৯, মনি বাগচি) বাগচি মহাশয় তাঁর পুস্তকে দ্বীন না লিখে দীন্ লিখেছেন। মুসলমানরা যে বিপ্লব করেছেন ধর্মভিত্তিক তা ঐ "দীন্ দীন" শব্দে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত।

তারপর সৈন্য দলের একটা অংশ ক্যান্টনমেন্টের দিকে ছুটলো। দিল্লীর কেল্লায় বা সেনানিবাসে মিরাটের কোন সংবাদ আসেনি কারণ তার আগেই টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হয়েছিল। এবার আরামরত ইংরেজ সৈন্যরা সংবাদ পেল মিরাটের হাজার দুই বিদ্রোহী সৈন্য নাকি দিল্লী আক্রমণ করেছে কিন্তু তাহলে নিশ্চয়ই মিরাটের ইংরেজ সৈন্য পেছনে পেছনে ধাওয়া করত। তবে হয়ত গুজবও হতে পারে বলে মনে করল ইংরেজ বড় কর্তারা। ৫৪ নং পল্টনের কমাণ্ডিং অফিসার মিঃ কর্নেল রিপ্লে শহরে গোলমাল শুনে সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের সাজতে বললেন এবং আদেশ দিলেন 'মার্চ টু টাউন' শহরের দিকে চল।

এদিকে দিল্লীর সৈন্যরা আগে হতেই প্রতীক্ষায় ছিলেন তাঁরা বজ্র কঠিন কণ্ঠে 'আল্লাহু আকবর' 'দ্বীন ইসলাম জিন্দাবাদ' ফিরিঙ্গি লোগুঁকো খতম করো' বলতে বলতে মিরাটের সৈন্যদের সঙ্গে দেখা করলেন আর কর্নেল রিপ্লে দুদল সৈন্যকে গোলন্দাজ সৈন্যের সঙ্গে পাঠালেন এবং নিজে দিল্লী শহরে কাশ্মীরি গেটের দিকে পৌঁছালেন।

শহরের মেন গার্ড ছিলেন উত্তর দিকে ৩৮নং পল্টনের সৈন্যরাই প্রধান প্রহরী। তারা আগে থেকেই বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, যেহেতু তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রেঙ্গুন পাঠানো হয়েছিল। রাস্তার মধ্যে উভয় বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও অভিবাদন হলো। সম্মিলিত কণ্ঠে গর্জে উঠলো– ইংরেজ শাসন ধ্বংস হোক। বাহাদুর শাহ জিন্দাবাদ। দিল্লির লোক আবার তুমুল কণ্ঠনিনাদে হাঁকলো ফিরিঙ্গি রোগুকো মারো।

হতভম্ব মিঃ রিপ্লে সৈন্যদের বললেন, "এসব কী হচ্ছে? গুলি ভর। এদিকে মেন গার্ডের কমান্ডার ক্যাপটেন ওয়ালেস বিদ্রোহীদের গুলি করার জন্য ৩৮ নং সৈন্যদের আদেশ করলেন, কিন্তু সৈন্যরা কেউ বন্দু তুললো না। সব চুপচাপ। দুজন ইংরেজভক্ত গর্দ্ধভ মার্কা সৈন্য উপর দিকে নল উঁচিয়ে ফাঁকা গুলি করল। মিঃ রিপ্লে অত্যন্ত রেগে আগুন হয়ে দুজন বিদ্রোহীকে গুলি করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মিঃ রিপ্লের দেহের উপর মুহূর্তের মধ্যে বন্দুজ গর্জে উঠল। মিঃ রিপ্লে আহত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হলেন সেই সঙ্গে আরও চারজন অফিসারকেও বন্দুক দিয়ে শেষ করা হল।

মিরাটের বীর বিপ্লবীরা শাসক ও শোষক ইংরেজদের বহু হতাহত করে ভারতকে স্বাধীন করার পথে আর এক ধাপ এগিয়ে ছিলেন। শ্রীমনি বাগচি তাঁর পুস্তকে অনেক সত্য তথ্য প্রকাশ করলেও তাঁর জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতে এমন অনেক কথা লেখা হয়েছে, যাতে মুসলমান বিপ্লবীদের অনেককে হেয়প্রতিপন্ন হতে হয়েছে। এমনকি বাহাদুর শাহ যিনি সবংশে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়ে গেলেন তাঁকেও অত্যন্ত ছোট করে দেখা হয়েছে। যাক তবুও তাঁর লেখার উদ্ধৃতি দিতে আমরা আনন্দ ও গর্ববোধ করি। তিনি মিরাটের বিপ্লবী সৈন্যদের মিলনের শেষাংশ বর্ণনা করে লিখেছেন, "দেশপ্রেমের চেতনাকে এভাবে ইংরেজের রক্তে রঞ্জিত করে নিয়ে মিরাটের বিদ্রোহী অশ্বারোহী সৈন্যরা ঘোড়া থেকে নামল এবং দিল্লির সিপাহিদের প্রাণভরে আলিঙ্গন করল। ঠিক সেই সময় কাশ্মীর গেট উন্মুক্ত হয়েছে। উন্মুক্ত সেই তোরণ পথে প্রবেশ করল বিদ্রোহী সৈন্যরা "দীন দীন রবে।" 'বাদশাহ খোবন্দ', 'সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন'। এই পদ্ধতিতে মুসলমানদের মুখ্য ভূমিকার পরিচয় উপরোক্ত স্লোগানেই প্রমাণ হয়। বাদশাহ খোদাবন্দ অর্থাৎ বাদশা ঈশ্বর একথা নিশ্চয়ই হিন্দু বিপ্লবী সৈন্যদের কথা। কারণ মানুষকে দিল্লিশ্বর, জগদ্বীশ্বর উপাধি দেওয়ার ইতিহাস ইতিহাসের আছে, কিন্তু মুসলমানদের আল্লাহ, ঈশ্বর, খোদা মাত্র একজনই, যিনি স্রষ্টা।

যাইহোক, দিল্লির রাজ প্রাসাদে অজস্র বিদ্রোহী সৈন্য সশস্ত্র উপস্থিত ছিলেন। বাহাদুর শাহ নামে মাত্র বাদশাহ হয়েও আসলে অভাবী, বন্দি, ইংরেজের পেনশনভোগী খাঁচার সিংহের মতো নরসিংহ। রাজপ্রাসাদে ইংরেজেদেরই নিযুক্ত ইংরেজ সৈন্যরা প্রহরী হয়ে পাহারা দেয়। তাদেরই নেতা ক্যাপটেন ডাগলাস।

ডাগলাস বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহীদের ধমক দেয়ার চেষ্টা করলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে জানালেন, বাদশাহ আপনাদের সাক্ষাৎ চান না। সদরগেট খোলা না পেলে বিদ্রোহী সৈন্য ও গণবিপ্লবীরা রাজঘাটের ফটকে গিয়ে হাজির হলেন। বাহাদুর শাহ আর ইংরেজদের অনুমতি নেওয়ার কথা চিন্তা না করে গেট খুলে দিলেন, সৈন্যদল জলস্রোতের মত ভেতরে প্রবেশ করলেন। এবার আরম্ভ হলো ইংরেজ নিধনের পালা। সম্রাট সামান্য ভিক্ষুকের মত মিটমিটে আলোয় জীর্ণ তক্তপোষে সামান্য ছেঁড়া তোষকে শয়ন করেন আর ভাবেন, ভাগ্যের পরিহাস কত বিচিত্র। মুদ্রাতে এতদিন প্রহসন হলেও সম্রাটের নাম থাকত তাও আজ নেই। আত্মীয়স্বজনের খরচা ইংরেজ সরকার দিত, তাও বন্ধ করেছে। ভাবর হতে বাহাদুর পর্যন্ত ইংরেজী দেশী বিলেতী দর্শনার্থী সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে অনুমতি নেওয়া হতো এবং হাদিয়া সম্মানজকভাবে নজরানা দেওয়া হতো। এখন এই বাহাদুর শাহের সময়ে তাও বন্ধ করা হয়েছে এবং বছরে মাত্র এক লক্ষ টাকা খরচা দেওয়া হতো তাও কমিয়ে শেষ করে আনা হয়েছে। অথচ আজও সম্রাটদের দয়া দাক্ষিণ্য অব্যাহত রাখতে বাধ্য হতে হয়েছে। সাধারণ মানুষ সম্রাটের কাছে হাত পাতে সম্রাট মনে করেই। কিন্তু তিনি যে নিঃস্ব তা কয়জনই বা জানে? আবার ইংরেজ ঘোষণা করেছে, এরপর থেকে সম্রাটের আর কোন ছেলেকে বাদশাহ বা রাজা উপাধি নিতে দেওয়া হবে না। শাহজাদা বা রাজার ছেলে বলা হবে। তারপরেই মুছে যাবে সম্রাট বংশের শেষ চিহ্নটুকু।

যাদের কোটি কোটি টাকার স্বর্ণ মুদ্রা, হীরা, পান্না, জহরত, মতি, ইয়াকুত ও মূল্যবান ধনের ধনাগার ছিল সে ধনাগার আজ গড়ে উঠেছে ইংল্যান্ডে। যাদের পূর্ব পুরুষদের তাজমহল, লালকেল্লা, দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস, মতি মসজিদ প্রভৃতি প্রাসাদ তৈরি করা তাদের বংশধর বাহাদুর শাহকে এখন বিহারে মুঙ্গির জেলায় একটি নতুন ঘরে রেখে আসা হবে, এখানে তার ঠাঁই নেই। শুধু এখানেই শেষ নয়, যেখানে হতো কুরআন পাঠ, পবিত্র নামাজ সম্পাদনা সেই মতি মসজিদে সাহেবরা মেমদের নিয়ে গাল ভরা হাসি কেক, মাংস ও মদ পান করে শুধু বিজয়ীর স্বাদ গ্রহণের জন্য আর ভারতবাসীকে হত্যা কেমনভাবে করা হয়েছে তা গুছিয়ে লিখলে এক বিরাট গ্রন্থ হবে।

ঐতিহাসিক মিঃ কেয়ী বলেছেন, তারা (বিদ্রোহীরা) শুনেছিল কমিশনার ফ্রেজার সাহেব প্রাসাদরক্ষী দলের ক্যাপটেন ডাগলাস এবং আরো বড় বড় ইংরেজকে সেখানে দেখতে পাবে। উৎসাহে "দীন দীন" ধ্বনি করতে করতে তারা সেই ফটকের দিকে দ্রুত বেগে অশ্ব চালালো। .... ঘন ঘন চিৎকার করতে লাগলো– জয় বাহাদুর শাহের জয়। ফিরিঙ্গি লোগুকো খতম করো। ফ্রেজার ও ডাগলাস বাঁচার চেষ্টা করলেন। থানায় আশ্রয় নিতে গেলেন, সেখানেও সুবিধা হল না। একজন প্রহরীর হাত হতে বন্দুক নিয়ে ফ্রেজার দেশীয় আক্রমণকারী

>Goto List

অগ্রবর্তীকে হত্যা করলেন। পরক্ষণেই বিদ্রোহীদল তাদের টুকরো টুকরো করে শেষ করে। ঐ রাজপ্রাসাদে সারা ভারতে খৃষ্টান ধর্ম প্রচার ও প্রসারে প্রচারক পাদ্রীদের প্রায় আসতে হতো আজও পাদ্রী মিঃ জিনিং তার কন্যা মিস জিনিং আর একজন সুন্দরী যুবতী মেম বান্ধবী হাচিনসন ও মিঃ ক্লিফোর্ড প্রাসাদ হতে দূরবীক্ষণ দিয়ে দৃশ্য দেখছিলেন। পরস্পরে প্রত্যেককেই বিপ্লবী দল খতম করলেন। তাছাড়া ডাগলাস মৃত্যুর আগে পড়ে গিয়ে আহত অবস্থায় সম্রাটকে তাঁদের মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে যে মেম সাহেবদের রাখা হয়। বাহাদুর শাহ নারীদের রক্ষা করার আদেশ ও অনুরোধ করলেন কিন্তু দুঃখের বিষয়, উন্মত্ত জনতা তার আগেই তাদের শেষ করে দিয়েছিল।

বিশাল জনতা বাহাদুর শাহকে অনুরোধ জানাল, যদিও আপনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিপ্লবে পক্ষপাতিত্ব করেছেন, সাহায্য-সহযোগিতা সম্ভাব্য সব কিছু দিয়েছেন। তবু চাই, আপনি আমাদের প্রকাশ্য ঘোষিত ভারত সম্রাট হবেন। আমরা মিরাটে ইংরেজদের পরাজিত করেছি, দিল্লিও আয়ত্তে আনতে চলেছি, এখন সারা ভারতে ভারাল ও ধারাল নেতা জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে আপনি ছাড়া আমাদের নজরে দ্বিতীয় কেউ নেই। সুতরাং নিজে হাতে ইসলামের সেরা সুন্দর রঙ সবুজের রঙে পতাকা নিজ হাতে তুলে দিন।

সম্রাট বাহাদুর বললেন, "আমার প্রিয় সন্তানেরা, আমি তো তোমাদের সম্পদশূন্য সুলতান। অতএব কিসে থেকে তোমাদের বেতন দেব?" বিপ্লবীরা জানালেন, ধনাগার লুট করব, আপনাদের নিয়ে যেখানে যা জমিয়েছে অত্যাচারী ইংরেজ, আবার আপনার কাছে তা আনবো।" বাদশাহ বাহাদুর শাহ পাঞ্জা গ্রহণ করলেন এবং বললেন, আজ হতে আমি বিপ্লব চালনার জিম্মাদারী (দায়িত্ব) নিলাম। বাদশা নিজে হাতে সবুজ পতাকা উড়িয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল সহস্র সহস্র বীরের সমগ্র কণ্ঠের চিৎকার আর উল্লাস।

ওখান হতে দিল্লির কেন্দ্রীয় ব্যাংকে হানা দিলেন। সমস্ত ইংরেজ কর্মচারীকে শেষ করে সমস্ত টাকা ও সোনা নিয়ে নেওয় হলো। ম্যানেজার ভয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ছাদের উপর আশ্রয় নিলেন কিন্তু তিনি সপরিবারে খতম হলেন। তারপর ইংরেজদের দিল্লি গেজেটের ছাপাখানা, গীর্জা ও বাসগৃহ বিপ্লবীরা গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেললেন। চারদিকে মার মার রব। রাজপ্রাসাদের কাছেই কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার। এটার দিকে সবার লক্ষ। অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন কেলটন্যান্ট জর্জ উইলোবি। আর তার সঙ্গে তেমনি মোগা বিশজন সৈন্য সহকারী হিসেবে।

বাহাদুর শার পরামর্শ, আগে অস্ত্রাগার হাত কর। তাই তিনি অফিসারকে পত্র পাঠালেন অস্ত্রাগারে আমার সৈন্যদের ঢুকতে দেওয়া হোক এবং আপনারা আত্মসমর্পণ করুন। কোন উত্তর এলো না। বিপ্লবীরা প্রাচীর টপকে প্রবেশের চেষ্টা

করতেই ইংরেজ সৈন্য গুলি করল। প্রাচীর থেকে মৃতদেহ পর পর পড়তে লাগল প্রাচীরের গায়ে। শেষে দলে দলে উঠতে লাগল বিদ্রোহী দল। তখন নিরুপায় হয়ে মিঃ উইলোবী বারুদের স্তূপে আগুন দিতে আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফাটানো শব্দ আর আগুনের বিরাট লেলিহান শিখা বারে বারে গগন চুম্বন করতে লাগলো আর কালো ধোঁয়া চারদিক অন্ধকার করে ফেললো। বারুদের বিস্ফোরণে রাজপথের নিরীহ পথিক ও কুটিরবাসী পাঁচ-ছয় শতজনকে প্রাণ ত্যাগ করতে হয়েছিল।

বিদ্রোহীরা যাকে যেখানে পান শেষ করেন, তাই শহরের শেতাঙ্গ তাদের ছেলেমেয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অপথে বন জঙ্গলের উপর দিয়ে পলায়নের পন্থাই ভাল মনে করল। পথে অনেক ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, ক্লান্তিতে মারা গেল। বহু ব্যবসায়ী ইংরেজ দিল্লির একটা বড় বাড়িতে শেষ আশ্রয় নিয়েছিল। ১৬ মে তাদের ভাল বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে বলে বের করে সবাইকে হত্যা করার কাজ চলতে থাকে। শুধু "ফিরিঙ্গি লোগুকো খতম কর" শব্দ। যেন মনে হল মুসলমান শাসন বুঝি এসেই গেল। শুধু একজন মহিলাকে মারা হলো না। তিনি বললেন, আমি আমার তিনটি সন্তানসহ মুসলমান হতে চাইছি, কোন বিপ্লবী কাউকে বলেননি যে মুসলমান হও। শুধু মারা আর মরা ছাড়া বিপ্লবীরা কিছু বোঝেন না। কিন্তু এই খ্রিস্টান মহিলাটি যা বলছেন তাঁকে তথায় মারা যায় না। কারণ দেশ ও ধর্ম রক্ষা করাই তো সংগ্রামের উদ্দেশ্য। তাই তিনি রেহাই পেলেন। তাঁর নাম মিসেস আলডোয়েল। হত্যাকাণ্ডের পর মুর্দাফরাসেরা গরুর গাড়িতে মৃতদেহ বোঝাই করে যমুনার জলে নিক্ষেপ করে।

(দ্রঃ History of the Indian Mutiny, Mallason)

দিল্লির সংবাদ সারা ভারতে পৌছে গেল। সমস্ত দুর্গ ও সেনানিবাসে ইংরেজ জানিয়ে দিল সতর্ক থাক, সজ্জিত হও।

এখনো কলকাতা ভারতের রাজধানী। এখানে মাত্র গভর্নর জেনারেলের অধীনে দুই দল ইংরেজ সৈন্য। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে ৫৩নং আর রেঙ্গুন হতে প্রত্যাগত এই দুটি দল। এই দুই দল বঙ্গদেশ রক্ষার জন্য খুবই দরকার কিন্তু চারদিক হতে খবর আসছে দিল্লি বাঁচাতে ইংরেজ সৈন্য পাঠাও, মীরাট বাঁচাতে ইংরেজ সৈন্য পাঠাও। কলকাতা তখন সারা ভারতের হৃৎপিণ্ড। ইছাপুরে বারুদ কারখানা, কাশীপুরে বন্দুক কারখানা, দমদমে বন্দুক শিক্ষাগার ও অস্ত্র নির্মাণের কারখানা, কলকাতায় মুদ্রা তৈরির টাকশাল, ধনাগার, ব্যাংক, আলিপুরে বিখ্যাত জেল, যেখানে ভারতের বিখ্যাত বাঘারে বাঘারে বন্দি আছেন। ২৪ মে ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিন, কলকাতায় রটে গেছে "হিন্দুরা যে পুকুরে স্নান সেরে গভর্নর জেনারেল সেই সব পুকুরে নাকি গরুর মাংস ফেলার হুকুম দিয়েছেন আর রানীর জন্মদিনে বাজারে সমস্ত চাল ও আটার দোকান বন্ধ রাখা হবে হিন্দুরা অপবিত্র নিষিদ্ধ খাদ্য ভোজনে বাধ্য হবে।" (দ্রঃ সিঃ যুঃ ইঃ পৃঃ ১২০)

রানীর জন্মদিন মুসলমানের ঈদের দিনেই হয়েছিল। মিঃ ক্যানিং প্রতি বছরের মত এবারও রাতে নাচ-গানের অনুষ্ঠান করলেন কিন্তু আমন্ত্রিত অতিথি অত্যন্ত অল্প এসেছিলেন । কারণ তাঁদের ভয়, এত খৃষ্টান এক জায়গায় জড় হওয়া মানে ঈদের আনন্দে হয়তো খৃষ্টানদের সর্বনাশ হবে।

মোট কথা, কলকাতায় অবস্থা অপেক্ষাকৃত থমথমে। কারণ ইংরেজের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতৃস্থানীয় অনেক মানুষ সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন না, অথচ তারা তদানীন্তন যুগে নামীদামি লোক ছিলেন। ঐ দামি লোকদের মধ্যে কিন্তু কিছু মুসলমান মনীষীও ছিলেন। সেই আলোচনা পরে করা যাবে।

সারা ভারতে ব্যাপক বিদ্রোহে ইংল্যান্ডে খুব ভাবনা চিন্তা। শোষণের ভাল রসাল স্পঞ্জে ভারতবর্ষ হাতছাড়া হলে বিলেতের রসে ভাটা পড়বে। তাই মিঃ ক্যানিং সংবাদ পাঠালেন, মাদ্রাজ ও রেঙ্গুন হতে মোট দু-দল সৈন্য আনাচ্ছি। পারস্য হতে একটা দল বোম্বেতে এলেই কলকাতার জন্য আনিয়ে নিচ্ছি। স্যার জন লরেন্সের জন্য করাচী হতে একদল সৈন্য ফিরোজাপুরে রাখার ব্যবস্থা করেছি, সিংহলে স্যার হেনরী ওয়ার্ডকে কিছু সৈন্য পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেছি। চীনের জন্য প্রেরিত সৈন্যদের আগে ভারতে পাঠানোর জন্য মিঃ এলথিনকে লিখেছেন।

২৫ মে হাতছাড়া দিল্লি দখল করার জন্য জেনারেল আনসন আম্বালা থেকে কর্নাল যাত্রা করলেন। প্রস্তুতির অসুবিধা, তবুও বহু কষ্টে পাঁচশত গরুর গাড়ি, দুই হাজার উট ও দুই হাজার কুলী সংগৃহীত হলো আর ৩০ হাজার মণ রসদও মজুদ হয়ে গেল। আর পথে দেখা হবে মিরাট আম্বালা সৈন্যদের সঙ্গে। তারপর একসঙ্গে হবে দিল্লি উদ্ধার।

ওদিকে রুড়কী টাউন হতে দেশীয় সৈন্যসহ মিরাটের দিকে রওয়ানা হলেন মিঃ ফ্রেজার। মিরাটে পৌঁছে ফ্রেজার ভারতীয় সৈন্য দলকে আদেশ করলেন, "সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বোমপ্রুফ ঘরে রাখা হবে তোমরা এ অস্ত্র ত্যাগ করো।" সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদল আপত্তি করলেন– কেন? কেন? তারপর তারা মাল বোঝাই গাড়ি আটকালেন। ইংরেজ অফিসার ফ্রেজার খুব ডাঁট দেখিয়ে শাসালেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঠান সৈন্য আবদুল কাহার চিৎকার করে বলে উঠলেন, "বেঈমান ফ্রেজার লে-লো" সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক হতে গুলি একেবারে ফ্রেজারের বুকের মাঝে বিদ্ধ হল, সঙ্গে সঙ্গে বিনা শব্দে ফ্রেজার লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। তারপর আরও গুলি চালালেন বিপ্লবী বিদ্রোহী সৈন্যরা। অনেক হতাহত হয়। বিদ্রোহীগণ যেদিকে সেদিকে গা ঢাকা দিলেন। তার মধ্যে পঞ্চাশজন বিদ্রোহী বীর ধরা পড়লেন, তাদের হাত বেঁধে তোপের সামনে পিঠে পিঠে এক লাইনে দাঁড় করা হলো, কামানদাগা হল, ৫০ জন অলিখিত ভারতীয় বীর শহীদ হলেন। বলাবাহুল্য ভারত আজ তাদেরই তাজা রক্তে স্নাত হয়ে স্বাধীনতার গর্বে সমুন্নত।

অনেক আগেও বলা হয়েছে, একটু পূর্বেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ভারতের জমিদার বড় হিন্দু রাজা মহারাজা প্রায় সকলেই ইংরেজদের বান্ধব ছিলেন। তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যে পরপর কয়েকটি স্বাধীনতা সংগ্রাম পণ্ড হয়েছে। অবশ্য খুবই অল্প মুসলমান নবাব যদিও স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেননি, তবে সরাসরি সৈন্য দিয়ে ইংরেজের পক্ষে লড়াই করার ইতিহাস দুর্লভ। যেমন কর্নালের নবাব ঐ সময় ইংরেজের পক্ষের লোক বলে জানিয়ে ছিলেন কিন্তু তা নেহায়েত মৌখিক। কিন্তু মিঃ জনলয়েন্সের অনুরোধে হিন্দু মহারাজাগণ প্রত্যক্ষভাবে ঢালাও সাহায্য করলেন। যেমন পাতিয়ালা, নাভা ও জিন্দের মহারাজা। জিন্দের রাজা ইংরেজ সৈন্যদের গাড়ির ব্যবস্থা করলেন; শুধু তাই নয়, তাদের খাদ্যাদি ও রসদের সুব্যবস্থা করতেও তার বিবেকে বাধেনি। আর পাতিয়ালার মহারাজা ঢালাওভাবে বাছাই সৈন্যদল দান করে উদারচিত্তের পরিচয় দিয়েছেন। মিঃ জনলরেন্স সেই সৈন্যদের থানেশ্বর ও লুধিয়ানায় পাঠালেন। ফরিদপুরের রাজাও তাঁর সৈন্য দিয়ে ইংরেজের প্রশংসা পাবার যোগ্যতা অর্জন করলেন। আর ইংরেজ কোম্পানির পুরাতন সুহৃদ শিখ সর্দাররা ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন তো করলেনই, সেই সঙ্গে জীবন ও রক্ত দেওয়ার গ্যারান্টি দিয়েও ইংরেজকে চাঙ্গা করে তুললেন। দিল্লি হাতছাড়া হওয়ার অন্যতম অঙ্কুর রোপিত হয়ে গেল। এটাই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ করতে ভারতীয় বিশ্বাসঘাতকদের বিষাক্ত পদক্ষেপ।

২৬ মে জেনারেল আনসনের কলেরা হয়, তাতে তিনি জেনারেল বারনাডকে তাঁর সৈন্যদের দায়িত্ব দিয়ে মারা গেলেন। ৩০ মে সামনাসামনি লড়াই। একপক্ষে শুধু ভারতীয় মুসলমান আর ভারতপ্রিয় হিন্দু বিদ্রোহী অপর পক্ষে ইংরেজের অল্প সৈন্য আর তার সঙ্গে যুক্ত ইংরেজের ভারতীয় দালাল ও তাদের গোলামরা। উভয়পক্ষে হতাহত হল অনেক। কিন্তু বিপ্লবীরা বুঝতে পারলেন, পরাজয়ের কালো মেঘ হয়তো সামনেই আসছে, কারণ ভারতবাসী আজও বেঈমান ইংরেজকে চিনতে ভুল করছে। ইংরেজরা আশান্বিত আর আনন্দিত হলো কিন্তু মিঃ উইলসন ভাবলেন, যদি আগামীকাল বিদ্রোহীদের সাথে সৈন্য আরও যোগ দেয়, তাহলে ইংরেজ সৈন্যের পরাজয় হবে। কারণ ইংরেজ সৈন্য এতে কমতেই পারে, বাড়বে কোত্থেকে। পরের দিন সৌভাগ্যক্রমে ক্যাপটেন রীড প্রেরিত পাঁচশত গুর্খা সৈন্য পৌঁছলো। তবুও বিদ্রোহীরা নির্ভয়ে চালিয়ে যেতে চান অব্যর্থ অভিযান। সমস্ত বিদ্রোহী সরাই-এ জমা হলেন। ৮ জুন বিদ্রোহীরা প্রথম পুরস্কার দিল কামানের গোলা। ইংরেজ ও ভারত ঘাতক সৈন্যরাও উত্তর দেয়। ইংরেজ সৈন্য বহু হতাহত হয়। ওপক্ষেও আহত-হিত হয় অনেক, কিন্তু তা অপেক্ষাকৃতভাবে কম। যুদ্ধে ইংরেজেরই জয় হলো কিন্তু অনেক নামজাদা নেতার মধ্যে প্রধান সেনাপতির পুত্র ক্যাপটেন বারনাডও খতম হন। ইংরেজ সৈন্য

>Goto List

একসঙ্গে চারদিক হতে আক্রমণ করলো। রাজশক্তি তাদের হাতে অতএব প্রকাশ্য প্রস্তুতিতে বাধা নেই। কিন্তু বিপ্লবীরা যা করেন অত্যন্ত গোপনে তাও আবার দেশীয় বিশ্বাসঘাতকরা অর্থের লোভে ইংরেজকে অনেক সংবাদ জানিয়ে দেয়। তাই তেইশটি কামান ইংরেজরা পেয়ে যায়। বিদ্রোহীদের সামান্য মূলধন হতে।

তখনকার বারানসীতেও হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে বেশি ছিল। ওখানে একদল ফকির মৌলবী গিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে বেশ সুবিধা করতে পারেননি। তাই বাহাদুর শাহের বংশীয় রাজপুত্রগণ ও নিকটাত্মীয়গণ বেনারসে পৌঁছালেন। তখন তাদের দেখার জন্য ভিড় হয় এবং তাদের কথা জনসাধারণ আগ্রহ সহকারে শুনতে থাকেন এবং তাদের দেওয়া জমি, যা বেনারসের মন্দিরে দেওয়া ছিল, দলিলপত্রে এখনো হাতের পাঞ্জার ছাপ মারা বাদশাহী চিহ্ন সংরক্ষিত। জনসাধারণের মন গলে যায় এবং সেখানে বিদ্রোহের বীজ রোপিত হয় এবং পরক্ষণে অঙ্কুরিত হয় ১৮৫৭ সালে মার্চ মাসে। ঐ মিছিলে ইংরেজবিরোধী কিছু মহারাষ্ট্রীয় এবং পাঞ্জাবীও ছিল। টোটার চর্বির চটকদার কথাতে ধর্মভীরু কাশীবাসী উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। বেনারসের উত্তর-পশ্চিম কোণে সিকলোল সেখানে সেন্যাগার আদাল, জেলখানা, গীর্জা, গোরস্থান, মিশনারি স্কুল সবই মজুত আছে। তাছাড়া বড় বড় ইংরেজ নেতা সেখানে আছেন যেখানে বিগ্রেডিয়ার পনসনবি, বিচারপতি ফ্রেডারিক গ্যাবিন, ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ লিণ্ড ও কমিশনার মিঃ হেনরি ট্যকা প্রভৃতি। তবু সকলে ভয়ে শঙ্কিত, শুধু মনে হয় মিরাটের মত যদি সব নিহত হতে হয়। ইংরেজ অফিসারদের মত নারী ও শিশুদের চুনার দুর্গে রেখে আসা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মিঃ লিণ্ড প্রস্তাব বাতিল করলেন। কারণ তাহলে ইংরেজ নেতাদের ওপর সকলে আস্থাহীন হয়ে পড়বে ফলে বিপদকে আরও ডেকে আনা হবে।

কমিশনার কলকাতায় কমিশনারকে লিখলেন, “কলকাতা ও দানাপুর হতে এখানে কি সৈন্য পৌঁছাবে না? ইংরেজ সৈন্য চায়।” কানপুর হতে ঘন ঘন সংবাদ আসছে কত করুণ! কত উৎকণ্ঠপ্রদ! “ঈশ্বরের দোহাই কিছু ইংরেজ সৈন্য পাঠিয়ে দিন।” আবার কানপুর হতে বেনারসে খবর আসছে, “কিছু ইউরোপীয় সৈন্য পাঠান” বিপ্লবীরা গোপনের গোপনে কাশী, কানপুর ও আজিমগড় ক্যান্টমেন্টের সঙ্গে সংযোগ যথাযথভাবে অব্যাহত রেখে চলেছেন।

৩ জুন আজমগরে বিদ্রোহী বিপ্লবীরা কোম্পানির সাত লক্ষ টাকা হস্তগত করতে সক্ষম হলেন। ঐ টাকা ইংরেজ অশ্বারোহী সৈন্যরা আনছিল গোরক্ষপুর হতে পাচ লাখ আর আজমগড়ের দুলাখ। বিপ্লবী ও বিদ্রোহী সৈন্যদের মিলিত শক্তিতে অভিযান চলছিল। ইংরেজ কাউকে যেন পাওয়া গেল না সব আগে হতেই সরে পড়েছে। যাদের পাওয়া গেল জীবন্ত পরক্ষণেই তারা মৃত্যুর কোলে লুকিয়ে গেল।

মিঃ কর্নেল নীল একদল মাদ্রাজী সৈন্য নিয়ে কাশী বা বেনারসে এলেন। ওদিকে দানাপুর হতে একদল ইংরেজ সৈন্য এসে পৌঁছেছে। তাই নীলের খুব সাহস বেড়ে গেল স্বাভাবিকভাবেই। মিঃ নীল সমস্ত ভারতীয় সৈন্য দাঁড় করালেন অহঙ্কারপূর্ণ আস্ফালন করতে লাগলেন। পেছনে কামান প্রস্তুত আর ইংরেজ সৈন্যরা এমন অবস্থায় আছে, শুধু একটু হুকুম দিলে আর রক্ষা নেই। ভারতীয় সৈন্যদের বুকের রক্ত রাগে টগবগ করতে লাগলো, তাই অসহ্য হয়ে গুরুম গুরুম করে গুলি ছুড়লেন তারা। সঙ্গে দশ-বারজন ইংরেজ সৈন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে মাটির উপর ছটফট করতে লাগলো। ইংরেজ কামানও পেছন হতে গর্জে উঠল। এক লাইনে অনেক বিদ্রোহী শহীদ হলেন। মৃত্যু যন্ত্রণায় রক্তমাখা মুখে শেষ কথা শোনা গেল' বেইমান ইংরেজ দূর হটো "আল্লা! আল্লাহ!"

যাইহোক হৈ হট্টগোলে বিদ্রোহীগণ অস্ত্র ফেরত না দিয়ে যেদিকে সেদিকে পলায়নের চেষ্টা করলেন কিন্তু গেটে প্রহরীদের সঙ্গে সংগ্রাম ছাড়া উপায় নেই। তার আগেই মুসলমান ছেঁড়া কম্বল কাঁধে ফকিরের দল কম্বল ভিজিয়ে দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন আর প্রচুর দড়িতে ইটের টুকরো বেঁধে ওদিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। ওদিক হতে বিদ্রোহী বিপ্লবী ফকিরদের শক্ত কব্জির টানে ক্যানটনমেন্ট হতে বিদ্রোহী বিপ্লবী আসতে সক্ষম হলেন। আর বাকি সৈন্য গেটে লড়াই করে অনেকে শহীদ হয়েছেন এবং বেশির ভাগই বাইরে আসতে সক্ষম হয়েছেন। বিপ্লবীরা নম্বর মারা নেতা ইংরেজদের না পেয়ে ফৈজাবাদের দিকে ছুটলেন।

আজকের দিনে যেখানে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলনের চরম মুহূর্ত, সেখানে ইংরেজের বড় প্রিয় বিশ্বাসী শিখ প্রহরীরা প্রহরা দিচ্ছে শাসক প্রভুর মাল-সম্পত্তি, অফিস, গুদাম ইত্যাদি।

তারচেয়েও দুঃখ ও বেদনার কথা, কাশীর যিনি শক্তিশালী সম্মানীয় রাজা তিনি ইংরেজের সমর্থক। আরও আশ্চর্যের কথা, রাজা মশাই আজ ৪ জুন ইংরেজের পক্ষে সরাসরি নেমে পড়লেন লড়াইয়ের ময়দানে অর্থাৎ সৈন্য সাহায্য, অর্থ সাহায্য সবই চলতে লাগল। এছাড়া ইংরেজপ্রেমিক রাজা ইংরেজ পাদ্রিদের ও সর্দার নেতাদের নিয়ে গিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। তার কারণ বোধহয় এই যে, মুসলমান বিপ্লবে যেখানে আল্লাহু আকবার স্লোগান দীন ইসলাম জিন্দাবাদ ধ্বনি সেখানে গোখাদক মুসলমানকে সাহায্য করার চেয়ে তাদের চিরশত্রু ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করাই শ্রেয়।

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে একটি মূল্যবান উদ্ধৃতি পেশ করা গেল—"৪ঠা জুন রাত্রে কাশীর রাজা ইংরেজ মিশনারীদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দান করেছিলেন। এমনকি অর্থ ও সৈন্য সাহায্য করতেও তিনি কৃপণতা করেননি। শহরে জনতা, আতঙ্ক ও গোলমাল মুসলমানরা উড়িয়েছে সবুজ

পতাকা।" এই মূল্যবান উদ্ধৃতিটি কোন মুসলমান লেখকের নয়; বরং শ্রী মণিবাগচির পূর্ব উল্লিখিত বইয়েরই বাক্য, প্রঃ ১৪৯)

এই ফয়জাবাদের কথা মনে করলেই স্মরণ হয় বিখ্যাত বিপ্লবী মাওলানা লিয়াকত আলীর কথা, যার সংগঠন ক্ষমতা ছিল সারা ভারতে বৈদ্যুতিক তারের মত। যেখানেই সংগঠন শৈথিল্য দেখা দিয়েছে সেখানেই হাজির হয়েছেন মাওলানা লিয়াকত আলী। কিন্তু তাঁর জীবনের ত্যাগ, বীরত্ব, শ্রমশীলতা ও চাতুর্যের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও ইতিহাসে তাঁকে স্থান দেওয়া হয়নি। দোষ ইতিহাসের না ঐতিহাসিকের তা সুস্থবুদ্ধি পাঠক-পাঠিকার বিবেচনাধীন। এমনিভাবে জৈনপুর, ফিরোজপুর, আলীগড়, মৈপুরী, এটোয়া প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহীরা বিপ্লব বাধিয়েছিলেন। কলকাতায় যেমনি ইংরেজ সৈন্য এসে পৌঁছেছিল অমনি ক্যানিং সেগুলো উত্তর প্রদেশে পাঠাচ্ছিলেন গরুর গাড়ি করে। পাঠানো আরম্ভ হয়েছিল ব্যাপকভাবে ৩ জুন হতে।

৬ জুন এলাহাবাদ এলাকায় বিদ্রোহের বহ্নি ভীষণভাবে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। এখানে বেশির ভাগই মুসলমান। হিন্দু বা অপর জাতির সংখ্যা খুবই কম। আগে হতেই কর্নেল সিম্পসন এখানে দুদল সৈন্য আনিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু শুধু বিদ্রোহী সৈন্যরাই সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে সমস্ত মুসলমান জনসাধারণ। আর সমস্ত নষ্টামির মূলে হচ্ছে একটি মৌলবি। তিনিই হচ্ছেন মাওলানা লিয়াকত আলী। মাওলানা লিয়াকত আলী শিখ নেতাদের বোঝালেন ইংরেজদের পক্ষে সারাজীবন শিখজাতি যুদ্ধ করে এসেছে কিন্তু বুতো ইংরেজরা পাঞ্জাব দখল করেছে। শুধু তাই নয়, বেনারসে মিঃ নীল সাহেব প্রকাশ্য রাস্তায় গাছে গাছে অজস্র সাধারণ মানুষকে ফাঁসি দিয়েছে। সে কথা আজ ভুললে চলবে না। একদল শিখ সৈন্যকে শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে গুলি করে মারা হয়েছে। মাওলানা লিয়াকত আলী আরও বললেন, এ কথা ভোলা ঠিক নয় যে, নির্বাসিতা রানী ঝিন্দনের মুকুটের বহু মূল্যবান মণিরত্ন ছিনিয়ে এনে ঐ ইংরেজরাই তাদের ধনাগার পূর্ণ করেছে। দেশ আজ বিদ্রোহী আর আপনারা তাদের একান্ত বিশ্বাসী গোলামের মত ধনাগারে পাহারা দেবেন, এ অসম্ভব। মুসলমানদের সঙ্গে আপনাদের যে যুদ্ধ হয়েছিল হযরত আহমাদ ব্রেলবীর সময় আসলে সেটাও ইংরেজের চাল। আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই লাগিয়ে আমাদেরও শহীদ করেছে আর তাঁদের কাজ মিটে যাওয়ার পর আপনাদের স্বাধীনতাও ছিনিয়ে নিয়েছে।

মাওলানার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শিকদের বুকে যেন ডিনামাইটের মত আঘাত হানলো। শিখরা এখন উত্তপ্ত, উগ্র, হিংস্র, বিদ্রোহী, তাই জৌনপুরের কমাণ্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট ম্যারা শিখ সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বারান্দায় মুক্ত হাওয়া খাচ্ছিলেন আর ভাবছিলেন, আসলে এরা বেশি নিরক্ষর তাই এখনো এদের আমাদের গোলামি করানো সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু তিনি জানেন না যে, শিখরা

চারদিকে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্তপ্রাপ্ত। শিখদের বন্দুক হুঙ্কার ছাড়লো। মিঃ ব্যারা মারা গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। জয়েন্ট মেজিস্ট্রেট চ্যাপেজ সাহেব জেল পরিদর্শন করতে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় বুলেটের আঘাতে তাঁকেও ধরাশায়ী করলেন বিদ্রোহীরা। শিখরা ট্রেজারি লুট করতেও ভুললেন না। শহরবাসী বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় বিদ্রোহীই বড়ই মারাত্মক রূপ পরিগ্রহ করলো। তিন লাখ টাকা হাতে এলো। মাওলান লিয়াকত জানতেন একতার মূল্য কত। অযোধ্যায় যতবার মুসলমান বিপ্লবীরা মাথা তুলেছেন ততবারই হিন্দুদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত তো হয়েছিলেনই; বরং বিরোধিতাও করতেন তাঁরা। মাওলানা লিয়াকত হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত জনতার সামনে বক্তৃতা করলেন আর সমস্ত মানুষকে বিপ্লবের বহ্নিতে ক্ষেপিয়ে তুললেন। শ্রী বাগচী মহাশয়ের লেখাতেও এ কথার প্রমাণ মেলে–"ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাই ভেবেছিলেন যে, এখানে হিন্দু-মুসলমান একত্র হয়ে কখনই তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না। কিন্তু এলাহাবাদের বিদ্রোহ নির্মমভাবেই তাঁদের সে ধারণা ভঙ্গ করে দিল। চারদিকে অগ্নি সংযোগ, গুলি, কামানের গোলা আর তরবারির চাকচিক্য যেন বিভীষিকা সৃষ্টি করলো। টেলিগ্রাফের তার কাটা হল, জেলখানা ভাঙা হল, হাজার কয়েদি রণ-মূর্তিতে রাক্ষস পালের মত শহরে তাণ্ডবলীলা শুরু করলো। ইংরেজ আবালবৃদ্ধবনিতা মারা পড়তে লাগলো। ইংরেজ বেশ বুঝতে পারলো ভারতে রাজত্ব করা আর সম্ভব নয়। অবশ্য আমাদের দেশের বিশ্বাসঘাতকদের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারলে বোধহয় ইংরেজের মনে এ ধরনের চিন্তা স্থান পেত না।

যাইহোক, মধ্যে মধ্যে দীন ইসলাম জিন্দাবাদ। আঙ্গরেজি হুকুমাত খতম ক্যারো স্লোগান আর সামনে উড়ছে মুসলমানদের পছন্দমত সবুজ পতাকা। শ্রী বাগচী মশায়ও লিখেছেন, 'দুর্গের বাইরে যেখানে যত ইংরেজ ছিল তাদের প্রায় সবই নিহত হলো। কোতোয়ালির মাথায় উড়ল মুসলমানদের সবুজা পতাকা। বিদ্রোহীদের তোপে তোপে রেল ইয়ার্ডের ইঞ্জিন চূর্ণ হয়ে যেতে লাগলো।" (দ্রঃ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, পৃঃ ১৫৮)

পরের দিন ট্রেজারী আক্রমণ ও ত্রিশ লক্ষ টাকা করায়ত্ত করা হয়। ইংরেজরা ভয়ানক বিপদে পড়ে। কেন্দ্র কলকাতা হতে মিঃ ক্যানিং কাশীর মিঃ নীলকে টেলিগ্রাম করলেন সসৈন্যে এলাহাবাদ রওনা হওয়ার জন্য। ১৮ জুন তিনি সসৈন্যে এলাহাবাদ পৌছান কিন্তু ইংরেজ সৈন্যদের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন সব ফাঁসির আসামি। আকাশে শকুন উড়ছে, নর মাংসের গন্ধে তারাও সুযোগ পেয়েছে। মিঃ নীলের মুখও নীল হয়ে গেল সেখানকার কাণ্ড কারখানা দেখে। কিন্তু ইংরেজদের মত এত কামান তো আর নেই বিদ্রোহীদের হাতে। তাই কামান দেগে শহরটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার উপক্রম হলে বিদ্রোহীরা টিকতে পারলো না, সরে পড়ল। মিঃ নীল দুর্গ হতে শিশু মহিলাদের কামান

সজ্জিত স্টিমারে কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন। স্টিমার চলতে লাগলো আর পথের দুপাশের গ্রামগুলিতে গোলাবর্ষণ করে সহস্র সহস্র ভারতবাসীকে হত্যা করে গর্ববোধ করতে লাগলো ইংরেজরা।

১৬ মে কানপুরের অন্তর্গত বিঠুরে একটি গোপন বৈঠক হয়। মারাঠা বংশের 'নানা', 'বাজীরাও' এর পালিত পুত্র। পরামর্শ করার জন্য ডেকেছেন তার দুই ভাইকে 'বাবা' ও 'বালা' কে আর ভাগিনেয় 'রাও সাহেব' আর আছেন ঝাঁসীর রানী 'লক্ষীবাঈ' এবং সাহসী তাতিয়াটোপী প্রমুখ।

রানী লক্ষীবাঈ জানালেন যে, ইংরেজকে বারে বারে আমরা সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়েছি বা এখনো অনেকে দিয়ে যাচ্ছি তাতে লাভ কিছু হয়নি বরং ভারত স্বাধীন হতে চলেছে পরে আমাদের বংশ কলঙ্কিত হবে। আমাদের প্রত্যেকের বংশ মর্যাদায় এবং ধন সম্পত্তিতে পর্যন্ত আঘাত দিয়েছে। এক্ষেত্রে কিসের জন্য আমরা এখনো তাদের তাবেদারি করবো? তাতিয়াটোপী বললেন, নানা সাহেবের মতই আমার মত। কিন্তু আমার মনে হয় মুসলমানরা ঠিকই বুঝেছে, ইংরেজ এক এক করে সকলকে গ্রাস করবে। বাবা ও বালা মত দিলেন, দাদা যা করবেন তাতেই মত। নানা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমার পিতা যেভাবে ইংরেজকে প্রাণপণ সাহায্য করেছেন ইংরেজ তাঁর বিনিময়ে তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁকে লাঞ্ছিত করেছে এবং নিঃস্ব করার ব্যবস্থা করেছে। তাঁর করুণ আবেদন অগ্রাহ্য করেছে। আমিও নিজে ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত মারাঠা শক্তিকে ইংরেজের পক্ষে লাগিয়েছি, কত গোপন পরামর্শ আমার যে হয় তা তোমাদের কাউকে জানাইনি কোন দিন। কত গোপন উপকার করেছি, যা তোমাদের সামনে প্রকাশ করলে তোমরা আমাকে বিশ্বাসঘাতক বা দালাল মনে করবে। কিন্তু আমার সঙ্গে তারা খুবই খারাপ ব্যবহার করলো। এখানে অনেক আবেদন-নিবেদন করে যখন কোন ফল হল না, তখন এমন কোন ইংরেজ বন্ধু পেলাম না যে আমারই খরচে একবার আমার তরফ হতে প্রতিনিধি হয়ে ইংলণ্ড গিয়ে আবেদন পেশ করে। ভারতের হিন্দু, মারাঠা, শিখ কাউকে পেলাম না; অবশ্য এমন লোকের দরকার ছিল, যে ভাল ইংরেজি জানে। শেষে তাদের চিরশত্রু মনে করি সেই মুসলমান জাতের আজিমুল্লা খানকে অনুরোধ করি। তিনি আগ্রহের সঙ্গে বিলেতে গেলেন এবং বহু আবেদন করলেন। তাতেও কিছু ফল হল না। এখন ইংরেজদের ওপর আমার খুব ভক্তি বা বিশ্বাসের কোন কথা নেই। তবে একটা কথা ভাবছি, ইংরেজ সত্যিই যদি ভারত হতে চলে যায় তাহলে তো আবার সেই মুসলমান রাজত্বই স্থাপন করা হবে। কারণ শুনছি এখন বাহাদুর শাহ-ই নাকি সারা ভারতের সুলতান। সকলেই চিন্তিত হলেন, পরামর্শে সিদ্ধান্ত হল, নানা সাহেবের একবার ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে দেখা দরকার, যুদ্ধের অবস্থা কেমন। যদি দেখা যায় ইংরেজকে ভারত ছাড়তেই হবে, তাহলে

বীরবিক্রমে শেষ প্রতিশোধ নেওয়া হবে। আর যদি দেখা যায়, সামান্য কিছু হিন্দুস্থানী সৈন্যের উত্তেজনা মাত্র, তাহলে পরক্ষণেই প্রতিশোধের শিকার হতে হবে আমাদের।

বিপ্লবী আজিমুল্লা খান ছোটবেলা হতেই ইংরেজবিরোধী ছিলেন। তাই অল্প বয়স থেকেই বিপ্লব করতে গিয়ে তার লেখাপড়ার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। তাঁর ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহ ছিল। চেহারা ছিল অতি সুন্দর। এক ইংরেজের বাবুর্চি বিভাগে চাকরি করতে থাকেন। ইংরেজটি, ফারসি ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন আর তো তাঁর মাতৃভাষা ছিলই। কিছু দিনের মধ্যেই ইংরেজটির সাহচর্যে তিনি ইংরেজি ও ফারসি ভাষা আয়ত্ত করলেন। এইবার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কানপুরে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হলেন। এত মেধাবী ছিলেন, প্রতি বছর তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে পড়া শেষ করেন। পরে তাঁকে ইংরেজ সরকার ঐ স্কুলেরই শিক্ষকরূপে বরণ করে নেয়। পরে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। অতঃপর নানার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়, নানাও ছিলেন একজন ভারতীয় রাজা। আর ভারতের প্রায় সব রাজাই ইংরেজভক্ত ছিলেন তা ভক্তিতেই হোক আর ভয়েই হোক। তাই আজিমুল্লা বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ রেখে নানার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। এই আজিমুল্লাহ খানই রাজা নানা সাহেবের পক্ষ হতে ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ড যান এবং নানার আবেদন পেশ করেন, কিন্তু সফলকাম হননি। তখন তিনি ফিরে এলেন। ইংলণ্ডে আর একজন ভারতীয় রঙ্গ বাপুজী সেতারা রাজার আবেদন নিয়ে এসেছিলেন। তাঁকেও বিমুখ হতে হয়। আজিমুল্লা সাহেব তাঁর দ্বারা নানাকে জানালেন, তাঁর ফিরতে দু-তিন বছর বিলম্ব হতে পারে। আমার কথায় যেমন কাজ হল না এখন ইংরেজকে শক্তি প্রয়োগ করে ভারত থেকে তাড়ানোর রাস্তা করে তবে ফিরব।

এদিকে বিলেতে বিদ্রোহী দলের অনেক মুসলমান ইংরেজ ধ্বংসের কাজে আসা যাওয়া ও ঘাঁটি করার কাজ আগেই শুরু করেছিলেন। সকলে আজিমুল্লাকে এই পরামর্শই দিলেন যে, নানার দ্বারা প্রত্যেক ইংরেজ প্রেমিক হিন্দু রাজাকে বিদ্রোহী দলে টানার কথা। আজিমুল্লার মনেও ঐ একই কথাই ছিল।

আজিমুল্লা খুব ভাল প্রচারক ও মিশুকে লোক ছিলেন, আর স্বাস্থ্য ও চেহারা ছিল খুব সুন্দর। তাই অনেক রাজনৈতিক নেতার বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে তাঁর আলাপ করতে অসুবিধা হয়নি। অনেকে তাঁকে ভালবেসেও ফেলেছিলেন, কিন্তু বিপ্লবীর লক্ষ্য বিপ্লবই। যখন তিনি দেশে ফেরেন তখন প্রচুর পত্র আসতো ডারলিং আজিমুল্লা বলে। কিন্তু আজিমুল্লা খান ঐ ফাঁকে অনেক গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন, যা কেউ টের করতে পারেনি।

১৮৫৭-এর বিপ্লবে ইংলণ্ড হতে তিনি তুরস্ক যান এবং সেই সময়ে তুরস্কের বাদশাহ মুসলিম দুনিয়ার খলিফা বলে খ্যাত ছিলেন। ইংরেজ বিশ্বে বহু জায়গায়

পরাজিত হচ্ছে সে খবর পেলেন আজিমুল্লা খান। যেমন সিবাস্তপোলের যুদ্ধ। ওখান হতে তিনি গেলেন রাশিয়া। ওখানে লন্ডনের 'টাইমস' পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা মিঃ র‍্যাসেল রাশিয়াতে থাকতেন, তাঁর আত্মীয়-আত্মীয়াদের পরিচয় ও পত্র দেখিয়ে তিনি তাঁর তাঁবুতেই থাকলেন। তখন তুমুল যুদ্ধ চলছে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে। আজিমুল্লা সংবাদ পেলেন রাশিয়ার সৈন্যরা ইংরেজ ও ফরাসি সৈন্যের মিলিত শক্তিকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এইবার তিনি মিঃ র‍্যাসেলকে বন্ধু বলে তাঁকেও বন্ধু বলিয়ে নিলেন। তাঁর যুক্তি ও সহায়তায় তিনি রাশিয়া হতে মিসরে যান, ওখানে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচার ও অপপ্রচারের রাজনৈতিক পর্ব শেষ করে ভারতে ফিরলেন।

কানপুরের ক্যান্টনমেন্ট খুবই বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজরা চিন্তিত, এখানেও যে বিদ্রোহের আগ্নেয়গিরি উদগীরিত হবে না, তা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে বিঠুরে নানা সাহেব যুগ যুগ ধরে ইংরেজের হাতের লোক। এখনও যদি তাকে একটু প্রলোভন দিয়ে কাজ বাগানো যায়, তাহলে বিদ্রোহের বিপদ হতে বাঁচা যেতে পারে। ১৮৫৭'র ১৮ মার্চ জেনারেল হুইলার নানার নিকট পুরাতন বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে সহযোগিতা ও সাহায্য তথা তার সৈন্য বাহিনী চেয়ে পাঠালেন। কারণ নানার সৈন্য, ইংরেজ সৈন্য ও শিখ সৈন্য ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করা যায় না তবে শিখ যদিও পুনরায় আমাদের কথামত চলছে কিন্তু কিছুদিন আগে তাদের কয়েকটি বিশ্বাসঘাতকতার হুইলার কথা চিন্তা করলেন।

নানা চির বন্ধু ইংরেজের পত্র পেয়ে বাছাই করা পদাতিক ও অশ্বারোহী তিনশত সৈন্য এবং কয়েকটি কামানও পাঠালেন। মিঃ হুইলার একটি সাময়িক দুর্গ মাটির দেওয়াল আর চারদিকে কামান বসানো ঘাঁটি তৈরি করালেন তাতে প্রায় এক মাসের মত খাদ্য পানীয় নিয়ে নিলেন আর ইংরেজ মহিলা ও শিশুদের সেখানে স্থানান্তরিত করলেন।

৪ জুন মাতাল অবস্থায় এক ইংরেজ অফিসার একজন ভারতীয় অশ্বারোহীকে গুলি করে হত্যা করে। ভারতীয় সৈন্যরা সুযোগ খুঁজছিলেন। তাঁরা বিচার চাইলেন। বিচারে এই রায় হয়, সে নির্দোষ কারণ ইচ্ছাকৃত নয় অনিচ্ছাকৃতভাবেই এই গুলি। ভারতীয়রা আগে হতেই জানতেন কেমন রায় হতে পারে। সৈন্যরা ঘোষণা করলেন, আমাদের হাত হতেও মনের ভুলে গুলি বেরিয়ে গেলে আমরাও নিশ্চয় নির্দোষী হব। সেই রাতেই ভারতীয় সৈন্য ফটাফট গুলি করল কয়েকজন ইংরেজ অফিসারকে। কিছু হতাহত হল। কিন্তু মরতে ও মারতে ভয় নেই তাঁরা যে বিপ্লবী। কানপুরের অশ্বারোহী বাহিনীটি এক রকম মুসলমান সৈন্য নিয়েই গঠিত হয়েছিল। তাঁরাই প্রথম নারায়ে তকবীর ধ্বনি দিয়ে আল্লাহু আকবর বলে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তখন সৈন্যদের সুবেদার মোটা পুরস্কারের আশায় সৈন্যদের বোঝালেন, তোমরা ক্ষান্ত হও। আমিও হিন্দুস্থানী তোমরাও

হিন্দুস্থানী. সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।” বিদ্রোহী দল তাঁকে ভারতীয় বলে হত্যা করতে মায়া করেন, কিন্তু তরবারির উল্টো দিকের আঘাতে আহত করে ব্যারাক থেকে বের করেছেন। ধনাগার, অস্ত্রাগারের দিকে ছুটতে লাগলো, মুখে শ্লোগান—হ্যামারে দীন জিন্দাবাদ! আঙ্গরেজি হুকুমাত খতম ক্যারো।

নবাবগঞ্জে নানা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন একদল ভারতীয় বিপ্লবী। দলের নেতা শামসুদ্দিন আর সরকারি মুদ্দত আলী। নানা সাহেব স্বাস্থ্যে খুবই সুদর্শন ছিলেন কিন্তু শামসুদ্দিন আর মুদ্দত আলীর চেহারা যেন নানার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান। শামসুদ্দিন নানাকে বললেন, “সারা ভারত আজ ইংরেজকে তাড়াতে চায় আর আপনি এখনো আপনার সৈন্য নিয়ে শয়তান শোষক ইংরেজদের ধনাগারের পাহারা দিচ্ছেন? মনে রাখবেন, ইংরেজের হাতে যদিও এখনো রাজক্ষমতা, তবুও তাদের সারা ভারতে মেরে শেষ করে ফেলছি আর তারা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু আপনাদের মত বিশ্বাসঘাতকদের জন্য তারা আজও টিকে আছে। যে আঘাত হানা শুরু হয়েছে তাতে আজ না হলেও কাল তাদের মার খাওয়া কুকুরের মত পালাতেই হবে। আমরা আপনাদের মত রাজার বিরুদ্ধে যদি অস্ত্র ধরি, এক সপ্তাহের মধ্যে কোন বিশ্বাসঘাতক রাজার অস্তিত্ব থাকবে না। আপনার সঙ্গে আমাদের লড়াই-এর ইচ্ছাই ছিল, কিন্তু আপনি নাকি আমাদের বিখ্যাত বিপ্লবী বিলেত হতে প্রত্যাগত আজিমুল্লার বন্ধু। তাই তাঁর অনুরোধে আপনি শেষ সুযোগ নিন। হয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন অথবা ভারতের জন্য যুদ্ধ করুন আপনার দুশমনের সাথে।” নানা সাহেব একটু হাসলেন এবং বললেন, আপনাদের চেয়ে আমার ক্ষতি বেশি করেছে ইংরেজ। আমি ইংরেজদের সাথে যে দহরম মহরম করি তা আমার ছলনা মাত্র। জেনে রাখবেন, আজিমুল্লার আদেশও নিষেধের বাইরে আমি যাব না। তিনি আমার পরিচালক মনে করতে পারেন। শামসুদ্দিন এবং মুদ্দত আলী ছুটে এসে তাঁর সাথে করমর্দন করলেন। তার পরের দিনই আজিমুল্লা খান দেখা করলেন নানার সঙ্গে। নানা বললেন, আমি আপনার মতের বাইরে চলতে চাইনি। আজিমুল্লা নানাকে এখন দুটি পরামর্শ দিলেন। একটি হচ্ছে, আজ হতে পূর্ণভাবে বিদ্রোহী দলে যোগদান। আর হিন্দু রাজাদের কাছে আপনার পক্ষ হতে বিদ্রোহী দলে সাহায্যের জন্য পত্র প্রেরণ। নানার কপালে অনেক গুলি রেখার সঞ্চালন হলো, পরক্ষণেই বললেন, তবে তাই হোক। কিন্তু আমাদের বংশের সম্মানীয় পেশোয়া পদ বজায় রাখা হবে তো? আজিমুল্লা জানালেন, নিশ্চয়ই। আপনি আজ হতেই পেশোয়া পদ পেয়েছেন, বলে মনে করুন। পদ দেবে কে? ইংরেজ? তাকেই তো হটাতে চাই আমি, আপনি সকলে।

নানা সাহেব তাঁর সৈন্যদের জানিয়ে দিলেন, তিনি এখন বিদ্রোহীদের দলে অর্থাৎ আজিমুল্লার সঙ্গী। বিদ্রোহী সৈন্যরা নানার সৈন্যের নিকটবর্তী হলেন। নানার সৈন্য ধনাগারে প্রবেশ করতে দিলেন বিদ্রোহীদের, নানা সৈন্য জেলেরও ফটক খুলে দিলেন এবং সকলেই বিজয় উল্লাসে অর্থ আয়ত্তে মন দিলেন। সারা কানপুরে তোলপাড়। ইংরেজ অবাক! ভারতবাসী কত যেন বিশ্বাসঘাতক। তারা ইংরেজকে শোষণ, পীড়ন ও প্রভুত্ব প্রদর্শন করতে দেবে না। এটাই তাদের কাছে বিরাট অপরাধ।

পরের দিন দিল্লি যাওয়ার পালা। সমস্ত বিদ্রোহী দল, নানার সৈন্য ও অর্থসহ বাহাদুর শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আরও সাহায্য ও শক্তি নিয়ে আবার যোদ্ধাভিযান চালাবেন। নানা দিল্লি যেতে রাজি হলেন বটে, কিন্তু মন মোটেই মানে না। পরের দিন ক্লান্ত দেহে কানপুরে রাত কাটিয়ে সকালে নানা দিল্লি গেলেন না। অনেকে বোঝালেন কিন্তু তিনি অনেক কিছু চিন্তা করলেন। তাঁর জীবনে বহু যুদ্ধ, আক্রমণ চক্রান্ত, যত কিছু হয়েছে তা ভারতবাসীর বিপক্ষে আর বেশির ভাগই ইংরেজের পক্ষে। সুতরাং বাহাদুর শাহ যদি ক্ষমা না করে শাস্তি দেন বা অবজ্ঞা করেন। যাইহোক, আজি মুল্লা খান ও নানা সাহেবের সাথে ঘুরে এলেন কারণ নানাকে চালনা করতেই তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল।

নানা ও আজিমুল্লা দুজনে এসেই বিপুল বিক্রমে আক্রমণের আয়োজন করলেন। ২৩ জুন মিঃ হুইলারের পুত্র লেফটেন্যান্ট হুইলার আহত হলেন। তারপর তাঁকে যেখানে রাখা হয়েছিল সেখানে গোলা ছোড়া হল। পুত্রের মাথাটা বিচূর্ণ হয়ে গেল। হিলাস্‌ডনকেও শেষ করা হল। তার স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গিনী হলেন। কর্নেল ষ্টুয়ার্ড আহত হয়ে তিনদিন পর মারা গেলেন। ক্যাপটেন হ্যালিডে তাঁর স্ত্রীর জন্য একটু খাবারের সন্ধানে যাচ্ছিলেন। একটি নিখুঁত গুলি হ্যালিডের মাথা জড়িয়ে দেয়। নামী ও দামি লোকদের তো এমনি অবস্থা; তাছাড়া সাধারণ ইংরেজ সৈন্য যে কত মরছিল তার সঠিক হিসাব নেই। হুইলার মনের দুঃখ চিন্তায় একটা কূপ তৈরি করালেন তাতেই প্রত্যেকটি মৃত দেহকে ফেলে কূপটিকে একটা মহা কবরে পরিণত করা হয়েছিল। কানপুরের এমন অবস্থার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। খাবার শেষ তাই পথের কুকুর-বিড়াল ধরে তারই মাংস সুখাদ্যের মত গ্রহণযোগ্য হল ইংরেজদের। সবচেয়ে সমস্যা হল জলের। জল আনতে বাইরে গেলেই মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে লাগলো। যে যায় আর ফেরে না।

আজিমুল্লা হুইলারকে আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব দিয়ে পত্র পাঠালেন। পত্রে জানানো হল, যদি তাঁরা কামান গোলা ও অর্থাদি ছেড়ে দিতে রাজি হন তাহলে তাদের নিরাপদ স্থানে এলাহাবাদে পৌঁছে দেওয়া হবে। পত্রের শেষে আজিমুল্লার স্বাক্ষর। জেঃ হুইলার রেগে বললেন: নো, আই স্যাল নেভার সারেণ্ডার। কিন্তু

ক্যাপটেন মুর অত্মসমর্পণ সমর্থন করে বললেন. উই কান্ট হোল্ড এনি লংগার, বেটার উই স্যারেণ্ডার। আত্মসমর্পণ করাই সাব্যস্ত হল। ২৭ জুন সতীচৌরা ঘাটে নানা সাহেব অনেক নৌকা প্রস্তুত রেখেছিলেন। প্রত্যেকের ওপর খড়ের চাল যাতে সাহেব মেমদের সূর্যের তাপ না লাগে। দলে দলে উঠতে লাগলো নৌকায় সাহেব মেমের দল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকা ছাড়বে কিন্তু নদীর দুই ধার হতে কামানের গোলা ছোড়া হতে লাগলো। খড়ের চাল আগে হতেই ছিল উপরে আগুন পাশে কামান বন্দুক আর নিচে নদীর জল উনচল্লিশটি নৌকা চূর্ণ হয়ে গেল আর শুধু একটি নৌকা বেঁচেছিল, যাতে আগুন লাগানো হয়নি তাতে ছিলেন মেজর ভাইরাট, ক্যাপটেন টম্‌সন ও মিঃ মুর আর তাঁদের সঙ্গীরা। ভাঙা নৌকাগুলো ভাসতে ভাসতে গিয়ে এক জায়গায় আটকে যায়। কয়েকজন আহত হয়ে বেঁচে ছিল তখনো। তারা একটি মন্দিরে আশ্রয় নেয়। নানা সংবাদ পেয়ে নির্দেশ দিলেন তাদের মেরে ফেরতে। তাদের তাড়া করা হয় এবং পেছন হতে গুলি করা হয়। প্রায় সবই প্রাণ হারায় কিন্তু দু-একজন যারা তার মধ্যেও বেঁচে ছিল।

তারা অযোধ্যার রাজা দিগিজয়ীর বাড়িতে আশ্রয় পায়।

কলকাতায় মিঃ ক্যানিং খুব চিন্তিত হয়ে বিখ্যাত বীর শ্রীরাম-লুরের পাক্কা পাদ্রী মাসমানেব জামাতা হেনরী হ্যাভলককে কানপুর লদ্ধারের জন্য নির্দেশ দেন। আজিমুল্লা খাঁন ও নানা হ্যাভলক আসার সংবাদ পেলেন এবং ঠিক করলেন 'বিবি ঘরে' বন্দি ইংরেজদের সব শেষ করা হবে তাদের আসার আগেই। তাই করা হল, তরবারি দিয়ে প্রত্যেককে হত্যা করা হয় এবং তাদের মৃতদেহ গর্তের মধ্যে দিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়।

হ্যাডলকের সঙ্গে আছে ইংরেজ সৈন্য আর শিখ সৈন্য। শিখরা একবার মাত্র বিদ্রোহ করে পরে বুঝে দেখেছে সারা জীবন তারা ইংরেজের তাবেদারি করে এসেছে শেষ সময়ে বিদ্রোহ করে বিশ্বাসঘাতক নাম না নিয়ে বরং ইংরেজকে সন্তুষ্ট রেখে বিপ্লবের শেষে বড় পুরস্কারকে হাত ছাড়া করে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই আবার শিখ সৈন্য আর ইংরেজ সৈন্য যেন মার পেটের ভায়ের মত মিলে গেল।

হ্যাডলক বিপুল আয়োজনে ইংরেজ ও শিখ সৈন্য পাঠালেন ফতেপুরে। সেখানে নানা ও অকুতোসাহসে বিপ্লবীদের নিয়ে এগিয়ে চললেন। নানার সঙ্গে আছে দেড় হাজার সৈন্য ও দেড় হাজার বিপ্লবী জনসাধারণ। মারাত্মক যুদ্ধ হল। নানার মরণের ভয় নেই। যুদ্ধে নানা জয় লাভ করলেন। শেষে অজস্র কামান আমদানি করলো ইংরেজরা। এইবার নানার সৈন্য ও বিপ্লবীরা গোলার আঘাতে টিকতে পারলেন না। অবশেষে নানা ও আজিমুল্লাকে পরাজয়ই স্বীকার করতে হয়। কিন্তু বীরত্বের বিচারে নানা যা করেছেন তাতে ইংরেজরা নিজেরাই উপলব্ধি করেছে যদি বিপক্ষগণ সমান সৈন্য সামান অস্ত্র নিয়ে লড়তে পেত তাহলে এক

সপ্তাহেই সারা ভারত হতে ইংরেজকে বিতাড়িত হতে হত। নানা সাহেবের বীরত্ব প্রদর্শনে ফতেপুর পঁয়ত্রিশ দিন নানাও আজিমুল্লার হাতে ছিল।

কানপুরের দুদল মুসলমান বিপ্লবী কিছুদিন আগেই ফতেপুর পৌঁছেছিলেন। তাদের সঙ্গে দেশীয় বিদ্রোহী ও সৈন্য মিলে ইংরেজ নিধন যেভাবে চালানো হয়েছিল এবং ধনাগার, কোর্ট কাছারি, জেলখানা যেভাবে দখল করা হয়েছিল তার প্রতিশোধে তোপের মুখে ঘরবাড়ি পর্যন্ত ধ্বংস করতে ইংরেজের বিলম্ব হয়নি। আর শিখ সৈন্য ইংরেজের আদেশে প্রতি বাড়িতে ঢুকে যেভাবে লুণ্ঠন ও পৈশাচিক কর্ম করেছে তাতে তেমন কেউ অবাক হয়নি। কারণ সারা জীবনে তারা শিখদের যা দেখেছে এটা তার পুনরাবৃত্তিই মাত্র।

হ্যাভলক কানপুরে বিপুলসংখ্যক শিখ সৈন্য ও ইংরেজ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। নানাও নির্ভয়ে ১৬ জুলাই সৈন্য ও বিপ্লবী প্রায় পাঁচ হাজার আর সাতটি কামান নিয়ে রওনা হলেন। নানা, আজিমুল্লা ও মাওলানা লিয়াকত আলীকে বললেন, যদি শিখ সৈন্য আর ভারতীয় হিন্দু রাজাদের সৈন্য সাহেবরা না পেত তাহলে দেখিয়ে দিতাম যুদ্ধ কাকে বলে। নানা আড়াই ঘণ্টা ধরে সম্মুখসমরে লড়লেন। অবশেষে নিজের সৈন্যদের জানিয়ে দিলেন যদি পরাজিত হও তাহলে পলায়ণের পূর্বে আমাদের বারুদে আগুন লাগিয়ে দিও, যেন আমাদেরই বারুদে আমার দেশবাসীকে মারতে না পারে। শেষে তাই হল সৈন্যরা বারুদে আগুন দিয়ে সরে পড়লেন। নানাও সরে গেলেন।

নানাকে জীবন্ত ও মৃত অবস্থায় ইংরেজরা পেলে পৈশাচিক আনন্দ পেত বেশি কিন্তু নানা চিরদিনের মত নিখোঁজ হলেন। ভারতের জন্য তাঁর উৎসর্গ ভারতবাসীর জীবনে নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক গর্ব। কিন্তু ইতিহাসে তাঁর নাম যদিও আছে কিন্তু অজিমুল্লা, লিয়াকত আলী, সামসুদ্দিন, মুদ্দত আলীর নাম নানার সমপর্যায়েও স্থানে পায়নি। তার কারণ অবশ্য উহ্য।

তিনজন বড় কর্তা মিঃ নীল, হ্যাভলক ও আউট্রাম একসঙ্গে লাক্ষ্ণৌ দখলের জন্য গেলেন, সঙ্গে সেই শিখ সৈন্যের সাবী আর ইংরেজ সৈন্য। একজন বিদ্রোহী বহুদূর হতে তাদের লক্ষ্য করে গুলি করলেন। নাম তাঁর আবদুল জাব্বার। অব্যর্থ লক্ষ্য গুলি মিঃ নীলের মাথা ভেদ করল। ঘোড়া হতে সেই যে গড়িয়ে পড়লেন আর কোন কথা তিনি বলতে পারেননি। অবশ্য ইংরেজরা নিষ্ঠুরভাবে প্রতিশোধ নিল। বিপ্লবীরা পতাকা নামিয়ে দিয়ে নিজেদের পতাকা তুললো। বিঠুরের রাজার তৎপরতায় নানার রাজবাড়ি আক্রমণ করা হল। কিন্তু বন্ধু আজিমুল্লার সুনিপুণ সম্পাদনায় কোন ছেলেমেয়ে, অলঙ্কার বা টাকাকড়ি ঘরে ছিল না। ঘর খালি। কিছু বই আর সামান্য বিছানা ইত্যাদী মাত্র। হ্যাভলক নানার প্রসাদ ধ্বংস করলেন (দ্রঃকার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস পৃঃ ২০১)

এমনিভাবে লাহোরে বিদ্রোহের পূর্বাভাস ইংরেজ জানতে পারে। হিন্দু-মুসলমানের গোপন ষড়যন্ত্র যিনি ফাঁস করেছিলেন তিনি হচ্ছেন ইংরেজের বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ গুপ্তচর নাম দৌবে। শ্রীমনি বাগচির লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে এ উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করা যায়।

-"দৌবে জাতিতে ব্রাহ্মণ। অযোধ্যার লোক.......তাকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করলো। প্রভুভক্তির বশম্বদ অযোধ্যাবাসী সেই ব্রাহ্মণ সুচারুরূপে তার কর্তব্য সাধন করলো। ....তাদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব কতখানি বুঝলে? জিজ্ঞাসা করলেন ক্যাপটেন লরেন্স। ব্রাহ্মণ তার গলা পর্যন্ত হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে এতখানি।"

৪ জুলাই হেনরী লরেন্সের মৃত্যু হয়। কলকাতায় মিঃ ক্যানিং তাঁর ও হুইলারের মৃত্যু সংবাদের সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন। শুধু পুরুষরাই পৌরুষ দেখিয়েছেন বিপ্লব করে তাই নয়, নারীদেরও ভূমিকা ছিল। অযোধ্যায় নবাব ওয়াজেদ আলী যখন কলকাতায় বন্দি তখন তাঁর বেগম হজরত মহল নিজেই বিদ্রোহের বা বিপ্লবের সাথে যুক্ত ছিলেন। জুলাই মাসে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং দিল্লির বাহাদুর শাহকে এই সংবাদ দিয়ে পাঠান। সম্রাটের স্ত্রী জিন্নত মহল তাঁকে পত্র মারফত ধন্যবাদ জানিয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। কিন্তু চারদিকেই ইংরেজরা ভারতীয় শিখ সৈন্য মারাঠা, রাজপুত ও হিন্দু রাজামহারাজাদের সাহায্যে আবার যেন মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে সক্ষম হচ্ছিল। ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ পুরুষের পোশাকে বিপ্লবীদের সাথে যোগ দিয়ে ঝাঁসি রক্ষার চেষ্টা করলেন। বীর তাতীয়াতোপীও তাঁর সৈন্য সমর্থকদের নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। বিপুল বিক্রমে তাঁরা যুদ্ধ করলেন কিন্তু স্যার হিউরোজ কাপুরুষের মত পেছন হতে আক্রমণ করে তাঁদের অগ্রগতির রোধ করেন। তাঁতিয়াতোপী ও রানী গোয়ালিয়ার পলায়ন করেন। ওখানকার রাজা সিন্ধিয়া বিশ্বাসঘাতক ইংরেজদের পক্ষের দালালিতে ওস্তাদ ছিলেন। রানী এবং তাঁতীয়াতোপী সিন্ধিয়াকে আক্রমণ করেন। তার পূর্বেই ফকিরদল বা মৌলবিদের জনমত তৈরি করার কাজ সমাধা করে রেখেছিলেন। তাই রাজার সমস্ত লোকজন সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে বিপ্লবীদের সমর্থন করে। রাজাকে তাড়া করে হত্যা করতে চাইলে তিনি প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন। এখানে কার্ল মার্কসের আর একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি-"২ জুন নবীন সিন্ধিয়া (ইংরেজদের পোষা কুকুর) কঠিন লড়াইয়ের পর নিজের সৈন্যদল কর্তৃক গোয়ালিয়র থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রাণভয়ে পালালেন আগ্রায়; গোয়ালিয়র যাত্রা করলেন রোজ; বিদ্রোহীদের পরিচালনা করে ঝাঁসির রানী এবং তাঁতীয়াতোপী তাঁর সঙ্গে-" (দ্রঃ কার্ল মার্কস্ ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ পৃঃ ২০৫)

তাঁতীয়াতোপী ছিলেন রাজা নানার খুল্লতাত ভ্রাতা। তিনি কল্পি হতে এসে ১ এপ্রিল যুদ্ধ করলেন বটে কিন্তু পরাজিত হন। কার্লমাক্সের মতে, "১৮৫৯-এর গোড়ার দিকে তাঁস লুকিয়ে থাকার স্থান (এক ভারতীয় বিশ্বাঘাতক মান সিংহের সংবাদ জানিয়ে দেওয়ার কালে) ধরা পড়ে গেল তাঁর বিচার এবং প্রাণদণ্ড হয়।" বিচারের নামে অবিচার করা হয় মাত্র। আসল তথ্য এই যে ১৮৫৯ সালের ৭ এপ্রিল তাঁতিয়া ধরা পড়েন। ৮ তার সামরিক আদালতে বিচার হয়। তিনটি অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়-(ক) ইংরেজের ওপর আনুগত্যের অভাব (খ) বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা (গ) নিরপরাধ ইংরেজ নারী ও শিশুদের হত্যা করা। তাঁতিয়া প্রতিবাদমূলক উত্তর দিয়েছিলেন তাই শেষের অভিযোগ বাতিল হয়। আর দুটি অভিযোগের কারণে ইংরেজের আইনে তাঁর ফাঁসি হয়েছিল। তাঁতিয়া উত্তর দিয়েছিলেন, "যারা আমার বিচার করছেন তাঁদেরও প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত তাঁদের বিরুদ্ধেও ভারতবাসী অভিযোগ করতে পারে; পর রাজ্য গ্রাসের অভিযোগ, কুশাসনের অভিযোগ, প্রজার সম্পত্তি লুণ্ঠনের অভিযোগ ও ভারতবাসীকে হত্যা করার অভিযোগ। আমি যা কিছু করেছি আমার নেতা নানার আদেশে করেছি। নরহত্যা আমি করি, তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। মৃত্যুদণ্ড নিতেও আমি প্রস্তুত আছি, তবে তোপের মুখে আমাকে মারতে অনুরোধ করি। সত্যিই অমুসলমানদের মধ্যে দেশের জন্য নানা,

তাঁতীয়া ও ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর প্রাণ বলিদানকে অস্বীকার করলে সত্যকে অস্বীকার করা হয়।

ঝাঁসির রানীর কথাও ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। কিন্তু যিনি রানীকে সাহস দিয়েছিলেন এবং নিজে প্রাণ দেয়ার ভরসা দিয়েছেলেন, যিনি বিপ্লবী পার্টিতে যোগাযোগ করে মৌলবী বা ফকির বাহিনীকে ঝাঁসিতে আনিয়ে ছিলেন, যিনি রানীর গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান ছিলেন সেই বিখ্যাত লৌহ মানব পাঠান বীর গউস খাঁর নাম আমরা ভুলে গেছি। ঐতিহাসিক মেলিসনের মতে, রানীর সৈন্য ছিল ১১ হাজার। কিন্তু এ কথা যথার্থ নয় যে সৈন্য অল্প ছিল। যাঁরা সৈন্যের মত যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছিলেন তাঁরা আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক বিপ্লবী ফকিরদের দল এবং হিন্দু- মুসলমান জনসাধারণ তাঁদের হৃদয়ে ছিল দেশপ্রেম ও বাহুতে ছিল ইস্পাতকঠিন শক্তি। কিন্তু উপযুক্ত অস্ত্র তাঁদের ছিল না। যুদ্ধের আবহাওয়া যখন রানীর প্রতিকূলে বইছিল তখন গউস খাঁ একটা কামান নিয়ে যেভাবে ইংরেজ সৈন্যকে ঘায়েল করেছিলেন, তাতে যুদ্ধের গতি আবার উল্টাদিকে ফিরে যায় এবং গউস খাঁর বীরত্বময় বাহাদুরিতে ১৩ দিন পর্যন্ত যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তিনি আজ অজ্ঞাত, অপ্রকাশিত ও উপেক্ষিত কেন জানি না। শ্রী বাগচী মহাশয় ও তাঁর ইতিহাসে এই গউস খাঁর মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন, অন্য দিকে সশস্ত্র ফকির নিশান হাতে নিয়ে রানীর জয়ধ্বনি করতে লাগলো। হর্ষধ্বনি

>Goto List

ও তোপের শব্দে ঝাঁসির দুর্গ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। ঘাউশ খাঁ ছিসেন রানীর প্রধান গোলন্দাজ। এই দিন ঘাউশ খাঁ দক্ষিণ দিকের বুরুজ থেকে এমন তীব্রভাবে গোলা বৃষ্টি করলেন যে, তাতে ইংরেজ পক্ষে তোপ বন্ধ হয়ে গেল।" ঐ ঘাউশ খাঁ-ই আসলে গউস খাঁ।

('সিপাহী যুদ্ধে ইতিহাস ' দ্রঃ)

বিহারেও বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের মধ্যে অগ্রগণ্য ভূমিকায় মুসলমান ও মাওলানা বা ফকিরদের প্রাধান্য ছিল। অযোধ্যা ইংরেজ অধিকৃত হওয়ায় বিপ্লবীরা ঘর-সংসার নিয়ে পাটনায় পালিয়ে যান। ওখান হতে দানাপুর, পাটনা, গয়া, ছাপরা, সারণ, আরা, মজফরপুর ও মতিহারী সব জায়গায় মুসলমান ফকির ও মৌলবির দল বিদ্রোহের দাবানল জ্বালিয়ে তুললেন। বিশেষ করে ঐ সময় তিনজন আলেম ইংরেজ সরকারকে তথা মিঃ টেলর সাহেবকে ভাবিয়ে তুললেন। তাঁরা হচ্ছেন মাওলানা আহমাদুল্লা, মাওলানা ওয়াজউল হক আর একজন শাহ মহম্মদ হুসেন। এঁদের প্রত্যেকের হাজার হাজার শিষ্যও সমর্থক ছিল। তাঁরা প্রকাশ্যে বক্তৃতা করতেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। ফলে মিঃ টেলর জনতার মাঝে এ্যারেষ্ট করতে সাহস করতে পেলেন না। শেষে তাঁদের আমন্ত্রণ জানালেন নিজের বাসায়। উদ্দেশ্য বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করা। অসম্ভব সাহসী তিনজন আলেমই টেলরের বাসায় এলেন। টেলর পূর্ব প্রস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে সৈন্য দিয়ে বন্দি করে তাঁদের সার্কিট হাউসে পাঠালেন।

এই বিশ্বাসঘাতক শাসক ইংরেজের সহজসুলভ স্বভাব হলেও ইংরেজ ঐতিহাসিক ফরবেস-মিচেল পর্যন্ত নিন্দা করে লিখেছেন, "সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বন্ধু ভাবে আমন্ত্রণ করে যে ঐ রকম ব্যবহার করতে পারে তাকে বিশ্বাসঘাতকের মত না বলে পূর্ণ বিশ্বাসঘাতক বলাই ভাল।

(দ্রঃ সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস, ২৮৩ পৃঃ)

মাওলানাদের বন্দি করার পর বিদ্রোহের আগুন আরও তীব্রতর হয়ে উঠলো। বিদ্রোহীরা প্রায় শতকরা সারে নিরানব্বই ভাগ মুসলমান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ইংরেজরা 'ওহাবীরা আসলে মুসলমান নয়' বলে অপপ্রচারের চেষ্টা করল কিন্তু বিফল হল তাদের কুৎসিত মতলব। এই সম্বন্ধে শ্রীবাগচী মহাশয়ের একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে-"মৌলবিদের গ্রেফতারে শহরে শান্তি স্থাপিত হলো না। পাটনায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। বিদ্রোহীদের বেশির ভাগই ওহাবী মুসলমান। মৌলবিদের আটকের পর পাটনা অধীবাসীদের নিরস্ত করার চেষ্টা করা হয়। এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অনেকেই অস্ত্রশস্ত্র গোপন করে ফেললো। ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতকতা ধর্মোন্মত্ত মুসলমানদের মনে তুমুল উত্তেজনার সঞ্চার করলো। ৩ জুলাই সন্ধ্যাবেলায় মুসলমান বিদ্রোহীরা দীন ইসলাম জিন্দাবাদ, আল্লাহু আকবার আওয়াজে আকাশ-বাতাস কম্পিত করে

পতাকা উড়িয়ে যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিয়ে জনসাধরণকে জিহাদের দিকে আহ্বান করতে লাগলেন। তখন মিঃ টেলর তাঁদের অত্যন্ত বিশস্ত একদল শিখ সৈন্য নিয়ে বিপ্লবীদের আক্রমণ করলেন। বহু বিপ্লবী শহীদ হলেন। ইংরেজদেরও অনেক আহত-নিহত হলো, বিদ্রোহীদের গুলিতে একজন ইংরেজ ডাক্তারেও মৃত্যু হয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম। (সি.যু. ই)

পাটনায় বিপ্লবীদের নেতা ছিলেন পীর আলী। তিনি পীর ছিলেন না তবে তাঁর নামই ছিল ঐ। ইংরেজদের ধারণা হয়েছিল ঐ লোকটির দ্বারাই পাটনা শহর শুধু নয় গোটা বিহারে বিপ্লবের দাবানল জ্বলে উঠেছে। তাই তাঁকে প্রকাশ্যে ২৩ জুলাই ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোল। জনতার মধ্যে বীর বিপ্লবী ধীরস্থিরভাবে ইংরেজ কর্তাদের বললেন -"ওহে বেইমান ইংরেজ শোষকেরা, তোমরা আমার ফাঁসী দিতে পার কিন্তু আমার মত হাজার হাজার পীর আলী আরও তৈরি আছে যারা আমার পরে আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে তোমাদের শায়েস্তা করবে।" পীর আলী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন হয়তো। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়। হাসিমুখে ফাঁসি কাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করে অমর বিপ্লবী হাজার হাজার ভারতবাসীর সামনে এক অক্ষয় আদর্শ স্থাপন করে গেলেন। এই দৃশ্যে বিপ্লবীদের বা বিদ্রোহীদের ভয় হওয়ার পরিবর্তে দ্বিগুণ শক্তিতে সাহসী হয়ে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চললো।

দানাপুরে ২৪ জুলাই শহীদ পীর আলীর মৃত্যুদণ্ডের কথা এসে পৌঁছাতেই দানাপুরের সেনা নিবাসের ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দু সৈন্য উত্তেজিত হয়ে ইংরেজদের ওপর তীব্র আক্রমণ করার জন্য রাতেই শাহাবাদ জেলার আরাতে গিয়ে পৌঁছালেন। সেখানে কুমার সিংহ নামে এক বৃদ্ধ বিপ্লবীদের দলে যোগ দিলেন। তিনিও একজন রাজা বা জমিদার ছিলেন। সারা জীবন তিনি ইংরেজের তোষণ পোষণ করেই আসছিলেন। ইংরেজদের তিনি বন্ধুই মনে করতেন। সুতরাং ইংরেজের শত্রুদের তিনি শত্রুই মনে করতেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার কুমার সিংহকে ছলে বলে কলে কৌশলে তাঁকে এমন ফাঁদে ফেলেছেন, যাতে তাঁদের কাছে বিশ লাখ টাকা ঋণ করতে হয়। হঠাৎ তাঁর ওপর আদেশ হয়, এক মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করতে পারলে তাঁকে জমিদারি হতে বঞ্চিত করা হবে। সেই বাজারে কুড়ি লাখ টাকা সংগ্রহ তিনি করতে পারলেন না। তবে মাত্র আর কয়েকদিন সময় দিলেই তিনি তা পরিশোধ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে সে সময় না দিয়ে বরং জমিদারি হতে বঞ্চিত করা হয়। তখন শোকে-দুঃখে ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতকতার তিনি সীমাতিরিক্ত বিদ্রোহী হতে চাইলেন। সেই সময়ে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়। তাই তিনিও মরার জন্য প্রস্তুত হলেন। ঠিক সেই সময়েই চলছিল সাতান্নর বিপ্লব। তাই তিনি বীরের মত মরার জন্য বিদ্রোহী দলে মিশে পড়লেন। এখানে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে,

ঠিক এই সময়ে রাজা নানা সাহেবের পত্র এসে তাঁর উৎসাহকে আরও বৃদ্ধি করে। তাই এখানে নানার পত্র আর আজিমুল্লার সংগঠন ক্ষমতা স্মরণ রাখার মত ঐতিহাসিক সম্ভার। কুমার সিংহ ছিলেন রাণাপ্রতাপ সিংহের বংশধর।

৩০ জুলাই মিঃ ভিন্‌সেন্ট আয়ার একদল ইংরেজ ও শিখ সৈন্য নিয়ে দানাপুরে আসেন। বিদ্রোহীদের হাতে বন্দুক, বর্শা বা তরবারী, শাসকদের হাতে বড় বড় কামান। তাই ২ আগষ্ট তুমুল যুদ্ধে কুমার সিংহ ও বিপ্লবীদের দল ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়। ইংরেজরা মুসলমানদের আগে হতেই জানে যে, মুসলমান জাতি সারা ভারতে তাদের শক্রতা করেছে। অতএব তারা তাদের চিরশক্র কিন্তু যে কুমার সিং চিরদিন তাদের সঙ্গে এত দহরম মহরম রেখে এল সে এত বড় বেইমান বা বিশ্বাসঘাতক হয়ে বিদ্রোহী দলে কেন যোগ দিয়েছে। অতএব তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার।

জগদীশপুরে কুমার সিংহের বাড়ি ও তাঁর ভাই দয়াল সিংহ এবং অমর সিংহের বাড়ি আক্রমণ করা হয়। তাঁরা নানা সাহেবের মত আগে হতেই মেয়েছেলে সরিয়ে ফেলেছিলেন। ইংরেজরা রাজপুতদের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত ধ্বংস করেছিল। এ প্রসঙ্গে একটা উদ্ধৃতি খুবই প্রণিধানযোগ্য-“পবিত্র দেবালয় ইংরেজদের আক্রমণ থেকে রক্ষ পেল না। কুমার সিংহ বহু অর্থ ব্যয়ে একটি দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইংরেজ সেনাপতি তা বিনষ্ট করে ফেললেন। প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তির সঙ্গে মন্দিরটি ধ্বংস হওয়াতে বৃদ্ধ রাজপুতের প্রাণে মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিল।” (দ্রঃ সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস, পৃঃ ২৯১)। যুদ্ধ করতে গিয়ে কুমার সিংহের একটি হাত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জগদীশপুরের যুদ্ধে মিঃ লেগ্রাণ্ড রাজপুত ও বিপ্লবীদের প্রচণ্ড আক্রমণে নিহত হলেন। উভয় পক্ষের অনেক হতাহত হয়। কুমার সিংহ আহত হয়ে আর সেরে উঠলেন না। চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। তাঁর মৃত্যু ভারতের নরনারীর কাছে এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

অবশ্য ইতিহাসে কুমার সিংহের নাম স্থান পেয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরও যাঁদের অনেক বেশি ঐতিহাসিক অবদান যেমন মাওলানা শাহ মুহাম্মদ হসেন, মাওলানা আহমাদুল্লাহ, ওয়াজহুল হক এবং পীর আলীর কথা সহজ সাধারণ ইতিহাসে ঠাঁই পায়নি। তার বড় কারণ কী জানি না, তবে অনেকে অনুমান করেন ভারতের জন্য ঐ সমস্ত প্রাণদাতা শহীদদের বড় অপরাধ ছিল তাঁরা মুসলমান।

একটি নম্র মেজাজের মৌলবি সাহেব পলাতক বিদ্রোহীদের মধ্যে অন্যতম। তিনিও অনেকেরমত বেগম কুটিতে বাস করছিলেন। তিনি নামাজ পড়তেন তার প্রার্থনায় প্রায় কাঁদতেন। লোকে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী কিন্তু এখন আল্লাহর কাছে চাই দিল্লির বুকে সম্রাটের বাচ্চাদের হত্যাকারী হডসনকে যেন আমি আমার বন্দুকে গুলি করতে পারি।

১০ মার্চ যেদিন পিশাচ মিঃ হডসন বেগমকুঠি আক্রমণ করেন তখন ঐ মাওলানা সাহেব হডসনের মস্তক লক্ষ করে গুলি করলেন। হডসন মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ঐ মৌলবি সাহেবের নাম সঠিকভাবে রিপোর্টে না পাওয়ার জন্য এখানে জানানো সম্ভব হলো না। কার্লমার্কস,মিঃ হান্টার প্রমুখ খ্রীষ্টানের পুস্তকেও অনেক মাওলানার নামের ইঙ্গিতও উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের পেছনে পেছনে এতবড় স্বর্ণোজ্জ্বল ঐতিহাসিক উপাদনে আছে, যার দ্বারা পৃথক পৃথক পুস্তক হওয়া সম্ভব। সে বিষয়ে আজকের এবং আগামী কালের অনুসন্ধিৎসু লেখক-লেখিকার প্রতি দ্বায়ীত্ব নেওয়ার প্রতি আশা রাখি। যেমন মাওলানা আহমাদুল্লাহ। সাতান্নর বিপ্লবে তাঁর নেতৃত্ব এক প্রাণবন্ত ভূমিকা, যাঁর কাটা মাথার জন্য সহস্র সহস্র টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল। মুসলমানদের এক প্রতিদ্বন্দ্বী এক ইংরেজের লেখার দু-একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। "ইংরেজদের প্রতি মৌলবি আহমাদুল্লার যেমন বিদ্বেষ ভাব ছিল; ইংরেজের ক্ষমতা নাশে তিনি তেমনি বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। ধর্মের নামে তিনি উত্তেজিত সিপাহিদের আরও উত্তেজিত করে তুলে ছিলেন। মুসলমানগণ তাঁর উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শুনে স্বধর্ম রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গে কাতর হননাই। কথিত আছে তাঁহার হাতে একটি কোড়ামাম থাকিত। তিনি যুদ্ধস্থলে এই কোড়া হস্তের রিয়া সিপাহিদের উত্তেজিত করে তুলিতেন।"

(দ্রঃ My Diary in India, by russell)

ঐ মৌলবির সাথে মিলে ছিলেন লস্কর শাহ নামে এক ফকির। এই দুজনের বিদ্রোহীরা সাহস ও বল দুইই পেয়েছিল। ইংরেজ সৈন্য ২১ মার্চ মৌলবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে।

তিনি তখন সাদতগঞ্জে প্রতিপক্ষের সামনে মৌলবি সাহেব এমন দৃঢ়তা ও সাহস প্রদর্শন করেন যে, সেনানায়ক লুগার্ড তাতে অতিমাত্রায় বিস্মিত হন। ইংরেজের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে তার দলের অনেক সৈন্য নিহত ও অনেকে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে মৌলবির দল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইংরেজ সৈন্য এদের পিছু তাড়া করে। মৌলবি স্বয়ং অক্ষত শরীরে প্রস্থান করেন। বহু সৈন্য নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন প্রধান সেনাপতি (ইংরেজ)। মোহমদীর দুর্গ ধ্বংস করে মৌলবি আবার এলেন শাহজাহানপুরে। সমগ্র নগর মৌলবির পদানত হলো। তারপর ১৮টি কামান যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে ৩ থেকে ১১ মে তিনি প্রতিপক্ষের দিকে তীব্রভাবে গোলা বৃষ্টি করতে থাকেন। শাহজাহানপুরের ইংবেজ সৈন্যের অধিনায়ক তখন জেলখানায় আত্মরক্ষা করছেন। সংবাদ পেয়ে অবরুদ্ধ সেনানায়কের সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠালেন প্রধান সেনাপতি। তবু মৌলবির পরাজয় সুসাধ্য হলো না। অশ্বারোহী সৈন্যে তিনি অধিক বলসম্পন্ন ছিলেন।....... পানাহাটের রণক্ষেত্রে কোন পক্ষেরই জয়-পরাজয় স্থির হলো না। অবশেষে জুন

মাসের প্রথম ভাগে পোয়াইনের রাজা জগন্নাথ সিংহের ভায়ের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ইংরেজের মহাত্রাস এই মৌলবির মৃত্যু হয়। গভর্ণমেন্ট সেই সময়ে এই বিদ্রোহীর মাথার দাম ধার্য করে ছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। বিশ্বাসঘাতক রাজা মৌলবির ছিন্ন মস্তকের বিনিময়ে শাহজাহানপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে এই পুরস্কার লাভ করেছিলেন। ফৈজাবাদের মৌলবী আহমদ উল্লার মৃত্যু হলো।" তাঁর বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমের প্রশংসা ইতিহাসে পূর্ণ মাত্রায় অথবা অর্ধ মাত্রায় তো দূরের কথা একেবারে নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না।

ভারতের উত্তর প্রদেশে রোহিলাখণ্ড বলে এক জায়গা আছে, যার মধ্যে একটি বড় শহরের নাম হচ্ছে বেরেলী। ইংরেজরা যখন রোহিলাখণ্ড দখল করে তখন মুসলমান পাঠানদের পুরুষদের ওপরই শুধু অত্যাচার করেনি, নারীদের ওপরও হস্তক্ষেপ করেছিল। তাই কোনদিন সে কথা পাঠানরা ভোলেনি। হাফেজ রহমত সাহেবের নেতৃত্বে একবার রোহিলাখণ্ড মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেয়েছিল কিন্তু ইংরেজদের শোষণ আর পোষণের যাঁড়াশিতে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের কাত্রার যুদ্ধে বিপ্লবী হাফেজ রহমতকে শহীদ হতে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে আর একবার রোহিলারা বিদ্রোহী হয়ে বিপ্লব সৃষ্টি করে। কিন্তু ইংরেজদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ঐ অভ্যুত্থানকে দমন করতে সক্ষম হয়।

আবার ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩১ মে রবিবার সেই শহীদ হাফেজ রহমতের বংশধর খাঁ বাহাদুর খাঁ নামক নেতার নেতৃত্বে সারা দেশকে কঠিন একতার বন্ধনে বেঁধে শুধু বিদ্রোহই করা হয়নি বরং ইংরেজ রাজত্বকে অস্বীকার করে নিজেদের শাসনতন্ত্র চালু করা হয়। রোহিলায় যদিও সব মুসলমান, তবুও সেখানের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মোটামুটি হিন্দু। তাই তাঁরা সংখ্যায় অল্প হলেও প্রভাবশালী ছিলেন। ঐ রহিলার মুসলমান ও হিন্দু সকলের নির্বাচিত ও সমর্থিত নতুন শাসনকর্তা ঘোষিত হলেন খাঁ বাহাদুর খাঁ। খাঁ সাহেবের নির্দেশে ইংরেজদের বাংলোগুলোতে আগুন ধরানো হলো। কোন ইংরেজকে দেখামাত্র গুলি করে হত্যা করার পর্ব রীতিমত শুরু হয়ে গেল। সরকার অবাক হয়ে যায় রোহিলাদের পূর্ব পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা দেখে। খাঁ সাহেব প্রচুরসংখ্যক বন্দি ইংরেজের বিচার করে ফাঁসি দেন। মনে হলো ছয় ঘন্টার মধ্যেই ইংরেজ শাসন বিলুপ্ত হয়ে ভারতীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। 'মুসলমানী পতাকা উড়িয়ে' আল্লাহু আকবার শব্দে প্রকাশ্যে বখ্‌ত খাঁকে বিদ্রোহীরা সমস্ত সৈন্যের নায়ক নির্ধারণ করেন। এইবার দিল্লির বাহাদুর শাহকে পত্র লিখে জানালেন তিনি স্বাধীন হয়েছেন।

রোহিলাখণ্ডের সহিত মোরাদাবাদ, শাহজানপুর, বাদায়ুন প্রভৃতি স্থানেও বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল। মোরাদাবাদ শহরের জর্জ ছিলেন মিঃ উইলসন। তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সিভিলিয়ান মিঃ উইলসন জনসাধারণকে

বিদ্রোহের বিপক্ষে খুব বোঝাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু একজন মুসলমান প্রাক্তন মুনসেফ সারা মোরাদাবাদে প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর ভাব ভাষাও জনসাধারণকে ভীষণ উত্তেজিত করে তোলে। মুসলমান ও ইংরেজ প্রভাবের লড়ায়ে উইলসন পরাজিত হলেন। বাইরে হতে একটি গুপ্ত বিদ্রোহী দল আনিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি স্থানীয়দের ডাকলেন। তখন বাইরের ও ভেতরের দুই দল এক হয়ে ইংরেজের শক্ত শক্তিকে প্রকম্পিত করে তোলে। ঐ বিখ্যাত নেতার নাম নিজামাত উল্লাহ সাহেব। তিনিও বিখ্যাত বীর ও বক্তা ছিলেন। জেলখানার সমস্ত কয়েদিকে মুক্ত করে দিয়ে তাদেরও ইংরেজবিরোধী কাজে লাগিয়ে ছিলেন। তখন মৌলবি বা ফকির দলের যে পরিমাণ ত্যাগ বা অবদান ছিল তা আজ ইতিহাসের পাতায় উপেক্ষিত। তাই শহীদ হাফেজ রহমত খাঁ, বাহাদুর খাঁ, নিজামাত উল্লাহ প্রমুখ প্রতিভা যাঁরা আজ যুগে যুগে জীবন্ত হয়ে থাকার কথা তাঁদের আজ ইতিহাসের মানুষ বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন কিংবদন্তী বা কল্পনা মাত্র। এমনি ভাবে রাশিয়ার ঐতিহাসিকদের ইতিহাসে বিশেষত মিঃ কার্ল মার্কসের লেখাতেও যাদের নাম বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি তাঁদের সম্বন্ধেও আমরা আমাদের স্বদেশের ইতিহাসের কোন সন্ধান পাইনি। উদাহরণস্বরূপ মিঃ মার্কসের লেখা হতে কিঞ্চিৎ মাত্র উদ্ধৃতি দেওয়া হোল-"মা মুখাঁ ১৮৫৭-৫৯ সালের জাতীয় মুক্তি অভুত্থানের সময় লক্ষ্ণৌ এলাকায় অযোধ্যা বিদ্রোহীদের দলপতি।" "মৌলভী আহমদ শাহ (১৮৫৮) ভারতীয় ১৮৫৭-৫৯ সালের জাতীয় মুক্তি অভ্যুত্থানের একজন বিশিষ্ট নেতা, জনস্বার্থের প্রবক্তা, অযোধ্যা বিদ্রোহে নেতৃত্ব করেন; লক্ষ্ণৌ রক্ষায় একনিষ্ঠ বীরের মত দাঁড়ান, বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নিহত হন ১৮৫৮ সালের জুনে।" (দ্রঃ কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৮৫৭-১৮৫৯, পৃঃ ২৫৬)

বেরিলীর ত্রিশ মাইল দূরে বদায়ূনের ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এডওয়ার্ড'স সাহেব সংবাদ পেলেন "২৫ মে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে মুসলমানরা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হবে।

(সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, পৃ ৩০৩, দ্রঃ)। সংবাদ জানাজানি সত্ত্বেও ইংরেজরা রোধ করতে পারেনি সেই বিপ্লবের আকস্মিক আগ্নেয়গিরিকে। ইংরেজরা যেমন শিখ জাতিকে কলা-কৌশল ও লোভ দেখিয়ে স্বপক্ষে টেনে নিতে সক্ষম হয়েছিল তেমনি হিন্দু জনসাধারণকেও বহু লোক মারফত এবং নিজেরা তাদের বাড়িতে গিয়ে বা কাউকে ডেকে এনে বুঝিয়ে প্রলোভন প্রদর্শন করে নিজ পক্ষে টানতে চাইলেন। ফলে হিন্দুরা দোটানা চিন্তায় পড়লেন। ঠিক সেই সময় খাঁ বাহাদুর খাঁ ইংরেজ ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে একটি লিখিত বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। সেটা ছিল এই রকম-"ফিরিঙ্গিরা যদি তোমাদের পুরস্কার দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তাহাদের মতের পোষকতা করতে অনুরোধ করে, তাতে তোমরা বিশ্বাস

করিও না। ফিরিঙ্গিরা অঙ্গীকার পালন করতে জানে না। তারা বিদেশী, তারা প্রতারক, তারা বিশ্বাসঘাতক। তাদের পরামর্শ শুনলে তোমাদের নিজেরই অনিষ্ট হবে।" (দ্রঃ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, পৃঃ ৩০৫)। এই ইস্তেহার প্রচারিত হওয়ার পরই হিন্দু জনতা ইংরেজ পক্ষ অবলম্বন করা হতে বিরত হয়। এবার বিপ্লবীরা মারাত্মকভাবে ইংরেজদের আক্রমণ করেন এবং জেলখানা ভেঙে বন্দিদের মুক্তি দেন, ট্রেজারি দখল করেন।

বিদ্রোহীরা এবং ইংরেজ ও শিখ সৈন্যের গুলিতে অনেকে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

এমনিভাবে ফরাক্কা বাদেও ভারতের বিপ্লবীদের শহীদ হওয়ায় সংবাদ এসে পৌছালো। একজন বিখ্যাত নেতার নেতৃত্বে সারা অঞ্চল উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তাদের কিছু করার আগেই ইংরেজরা রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতেই বহু ভারতীয় মানুষকে নিহত করে নৌকাযোগে দুজন কর্নেল ও একজন মেজরের তত্ত্বাবধানে পলায়নের ব্যবস্থা করে। তখন ভাগিরথী নদীতে বান ছিল। হঠাৎ একটি নৌকা বিকল হয়ে যায়। ইংরেজরা তখন বুঝল তাদের ভাগ্যই এখন বক্র। তাই ঐ নৌকার আরোহীরা অন্য নৌকায় চড়ে ক্ষিপ্রগতিতে নৌকা চালনা করা হলো। কিন্তু বিপ্লবী নদীর নেতার নেতৃত্বে ভুল হয়নি। একদল বন্দুকধারী বিপ্লবী নদীর ধারে নৌকার পাশে এসে হাজির। সাহেবরা তাড়াতাড়ি নৌকা নদীর মাঝে দিয়ে চালানোর চেষ্টা করলো কিন্তু বিপ্লবীদের তিনশত বন্দুক বারুদের আঘাত হানল বজ্রাঘাতের মত। দলে দলে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে কেউবা নৌকার উপরই প্রাণ ত্যাগ করে এবং কিছু বন্দি হতে বাধ্য হয়। বন্দিদেরও পরে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

এই বিদ্রোহের নায়ক আজ আমাদের কাছে এক অজানা মানুষ হলেও প্রকৃত ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে ও থাকবে চিরকালধরে। তিনি হচ্ছেন অধিনায়ক সুলতান খাঁ। সুলতান খাঁ ফরক্কাবাদের আর একজন বিচক্ষণ বিপ্লবী ব্যক্তি তাহফুজুল হোসেনকে ফরক্কার নবাব নির্দ্ধারণ করেন।

(দ্রঃ A History of the Sepoy war, by Kaye)

প্রধান, প্রধানতর আর প্রধানতম গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি সম্বন্ধে এখনো তথ্য প্রকাশ করতে বাকি রয়েছে। স্থানগুলো যথাক্রমে আগ্রা, দিল্লি আর ভারতের রাজধানী কলকাতা। ১৫ মে সকালবেলায় মিঃ কলভিন সমস্ত সৈন্যকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে বক্তৃতা দিলেন আর ইংরেজ সৈন্যদের এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে বক্তৃতা দিলেন আর ইংরেজ সৈন্যদের বললেন, যেখানে যাইহোক আগ্রায় তা হবে না, কারণ আমরা ভারতীয় মুসলমান হিন্দু ও শিখ সৈন্যদের ভালবাসি আর সমস্ত সৈন্যও আমাদের ওপর ভরসা রাখে। কলভিনের বক্তৃতায় ভারতীয় সৈন্যরা কলভিনের দিকে এমনভাবে অগ্নিবর্ষক ভঙ্গিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, যাতে

কলভিনের আর বুঝতে বাকি রইল না যে, বিস্ফোরণে বিলম্ব নেই। পরক্ষণেই কলভিনের ইঙ্গিতে ইংরেজ নর-নারী দলে দলে দিল্লির দিকে ছুটল।

২ জুলাই নিমচ হতে বিদ্রোহী দল ফতেপুর সিক্রীতে উপস্থিত হলো। তাদের বাধা দেওয়ার জন্য কয়েকজন ইংরেজ অফিসারের সঙ্গে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো হলো। সৈন্যরা হঠাৎ অফিসারদের গুলি করে বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়ে নিজের আসল রূপ ধারণ করেন। এই সংবাদে মিঃ কলভিন স্বয়ং দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ইংরেজরা ভয়ে ভীত হয়ে ভাবতে লাগলো সারা দেশ বুঝি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তখন ইংরেজদের পরম বন্ধু ভারতপুরের হিন্দু রাজা তিনশত অশ্বারোহী, কয়েকটি কামান এবং আরও কিছু সমরোপকরণ নিয়ে ইংরেজের পক্ষে যোগ দিলেন। শাহাগঞ্জে যুদ্ধ হল। সামনাসামনিভাবে এক দিকে আজাদী আন্দোলনের বিপ্লবী দল আর এক দিকে ইংরেজ শিখ, আর হিন্দু রাজার সশস্ত্র সৈন্য। যুদ্ধে বিদ্রোহী দল অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করে অনেক আহত-নিহত হওয়ার পর জয়লাভ করলেন। ইংরেজরাও বহু আহত-নিহত হয়ে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর বিদ্রোহীরা দিল্লির দিকে প্রস্থান করে। "এই সময় মতি মসজিদকে ইংরেজরা সেদিন হাসপাতালে পরিণত করেছিল।"(দ্রঃ সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস, মনিবাগচি, পৃঃ ৩১১)

বিপ্লবীরা আগ্রায় চলে গেলেও ইংরেজদের আতঙ্ক কমেনি। মুসলমান অনেকের সেই সময় কাল পোশাক পরার প্রচলন ছিল। আর ঐ কাল পোশাক দেখলেই ইংরেজের হৃদয় ভয়ে শুকিয়ে যেত। উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, "মুসলমানদের কাল রঙের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলেই ইংরেজদের ভয় করত। বিদ্রোহের সময় কাল রঙের পরিচ্ছদ ইংরেজদের মনে বিভীষণ জাগিয়ে তুলেছিল" (দ্রঃ ঐ পুস্তক, পৃঃ ৩১১)

কলকাতার মিঃ ক্যানিং এই পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে ব্রিগেডিয়ার পলজোয়েলকে পদচ্যুত করে তাঁর জায়গায় কর্ণেল কটনকে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করলেন।

মোঘল আমল থেকে দিল্লি ভারতের রাজধানী ছিল। যদিও এখন কলকাতার গুরুত্ব বেশি তবুও দিল্লির পুরাতন ঐতিহ্য ঐতিহাসিক আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই। তাই সেনাপতি উইলসন দিল্লি উদ্ধারে উদগ্রীব হলেন। কিন্তু বিপ্লবীদের সঙ্গে সরকারি সৈন্যদের অবিরাম যুদ্ধের ফলে ইংরেজ সৈন্য ও শিখ সৈন্য সংখ্যায় খুবই কম হয়ে গেছে আর গোলা গুলি রসদ প্রায় শেষ হতে চলেছে। তারচেয়েও বড় জিনিস মনোবল ভেঙে গেছে। শুধু ক্ষীণ আশা হিন্দু রাজা মহারাজা, রাজপুত,মারাঠা প্রভৃতি ভারতবাসীরা যদি সকলেই শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী না হয়ে ইংরেজের পক্ষে যোগ দেন তাহলে হয়তো আবার শোষক সরকারের মনের কোণের ক্ষীণ কল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে। দিল্লিতে পাঁচজন সেনানায়ক

>Goto List

উপস্থিত আছে মিঃ চেম্বারলেন, লিঃ নিকল্সন, উইলসন, আলেকজাণ্ডার, টেলর, ও মিঃ রেয়ার্ড স্মিথ।

চল্লিশটি বলদে টানতে পারে এরকম দারুণ ভারী ভারী কামান, গোলা, বারুদ, সৈন্য নিয়ে রাতের অন্ধকারে দিল্লিকে সজ্জিত করা হল। ১৩ সেপ্টেম্বর ইংরেজরা শুরু করল কামান হতে মুষলধারে গোলা বর্ষণ। চারদিকে আগুনের হাল্কা সাদা কারো ধূয়া বক্রশিখা আর বজ্র বর্ষণের মত শব্দেও বিপ্লবীরা সব যেন চুপচাপ। ১৪ সেপ্টম্বর ইংরেজেরা প্রস্তুত হয়ে নিল। সকালবেলায় ইংরেজ সৈন্যের বিপুল সমাবেশ দেখা গেল। তিন জাতীয় সৈন্য ইংরেজ আর শাসকপ্রিয় শিখ আর গুর্খা সৈন্য। নিকলসন একদল সৈন্য নিয়ে কাশ্মীর গেট দখল করলেন তারপর আর একদল সৈন্য দিল্লির কাবুল গেট দখল করলেন।

বিদ্রোহী সৈন্য ও বিপ্লবীদের নেতা ক্যাপটেন বখ্ত খান ঠিক প্রতিক্ষীত সময়ে গোলাবর্ষণ করালেন তাঁর পূর্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থায়। বিপ্লবীদের স্ত্রীরা ছাদে তুলে রাখা ইট ও পাথর বর্ষণ শুরু করালেন। ইংরেজ শিখ ও গুর্খা সৈন্যরা আকস্মিক আক্রমণে আহত আর নিহত হয়েছিল হাজারে হাজার। পাঁচজন নেতার দুইজন বেয়ার্ড স্মিথ ও চেম্বারলেন আহত হলেন। আর সত্তরজন বড় অফিসারকে প্রাণ হারাতে হলো সেই আক্রমণে। ছ'দিন ধরে যুদ্ধ চললো। ইংরেজরা হটাতে পারলো না ভারতীয় বীরদের। মাঝে মাঝে দীন ইসলাম জিন্দাবাদ, আল্লহু আকবর শব্দে দিল্লি থরথর করে কাঁপতে লাগল।

মুসলমান নেতাদের অনেকের নামাজ পড়ার অবসর নেই শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ। তাই ঐ রকম কর্মব্যস্ত নেতাদের মাথায় একটা মতলব এল, যদি প্রত্যেক দোকানে দামি দামি কড়া মদের সুদৃশ বোতল রাখা যায় তাহলে সৈন্যরা লুটপাট করার সময় ঐ মদ পান করবে আর নেশা অবস্থায় তাদের শিশু ঠেঙ্গানোর মত শায়েস্তা করা যেতে পারে। অনেকে আপত্তি করলেও তখন কিছুটা শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানে বড় রকমের আরও দুটি ভুল হয়েছিল, প্রথমত – নিজেদের মধ্যে একতাবদ্ধ না হওয়া; দ্বিতীয়ত- মুসলমানদের মদ খাওয়াও যেমন অপরাধ অপরকে মদ খাওয়ানোও তেমনি অপরাধ। অথচ মদ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা। যাইহোক, ১৫ সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে ইংরেজ যথাযথভাবে দোকান লুট করতে গিয়ে মদের মনোলোভা বোতল গ্রহণ করে এবং পান করে ফলে নেশাগ্রস্ত হয়ে সেনাপতিদের আদেশ যথাযথভাবে পালন করতে অবহেলা করে। অনেকে আরও অপঘটন ঘটায়। ফলে ১৬ তারিখে ইংরেজ সৈন্যদের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একেবারে মদ্য পান নিষিদ্ধ করা হয় এবং ছোট বড় সমস্ত সৈন্যের সংরক্ষিত মদ রাজপথে ঢেলে দেওয়া হয়। এটা যেন অনেকটা ইসলামী পদক্ষেপের মত।

এবার ইংরেজ সৈন্য ঠাণ্ডা মাথায় সুচিন্তিত পদক্ষেপে ১৮ তারিখে প্রবলভাবে আক্রমণ চালালো লাহোর গেট দখল করার অভিপ্রায়ে, কিন্তু পারল না। অবশেষে

>Goto List

২০ তারিখে ইংরেজ, শিখ, গুরখা ও রাজা মহারাজাদের প্রেরিত সাহায্যে লাহোর গেট,আজমির গেট, জুমআ মসজিদ ইংরেজরা দখল করে। ক্রমে ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের রাজ প্রাসাদেও ইংরেজদের পতাকা উঠানো সম্ভব হয়। যদিও ইংরেজদের হাতে রাজশক্তি তবুও চার মাস ধরে বহু লোক ক্ষয় আর অর্থ ব্যয়ে দিল্লির রাজপ্রাসাদ ভারতের ইংরেজপ্রিয় বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতায় দখলে আসে। আজ তারা আনন্দে আত্মহারা। এখনো তাদের আশা যতদিন ভারতে রাজা মহারাজা, শিখ, গুর্খা রাজপুতরা তাদের দলে থাকবে ততদিন তারা শোষণ চালাতে পারবে। তাই দেওয়ানি খাসে চলল মদ্যপানের আনন্দোচ্ছ্বাস। তখনো খাঁটিঈমানদার মুসলমান বিপ্লবী অনেক প্রহরী বন্দুক নিয়ে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে প্রহরায় নিযুক্ত।

দিল্লির বিপ্লবীদের বীর নেতা বখত খাঁ বুঝতে পাললেন পলায়নই এখন একমাত্র পথ। অবশ্য সর্বভারতীয় সর্বজননির্ধারিত সম্রাট বাহাদুর শাহ্কে দিল্লি হতে সরিয়ে নিয়ে কোন গোপন ঘাঁটি হতে তিনি পূর্ণোদ্যমে বিপ্লব পরিচালনা করবেন। তাই গভীর রাতে তিনি বাহাদুরশাহ্কে তাঁর প্রস্তাব পেশ করতেই তিনি বললেন, "আমার প্রাণ প্রিয় বিপ্লবীরা লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে মারা গেল আর আমাকে এখন বেঁচে থাকা কি শোভা পায়? তাছাড়া বাইরে গিয়ে পরিশ্রম করার দৈহিক শক্তি আমার নেই, আমি বার্ধক্যের জন্য অত্যন্ত দুর্বলতাবোধ করছি। অতএব তোমরা কেউ আমার দায়িত্ব পালন করতে সম্মত হলে আমার বাইরে যেতে আপত্তি নেই। বখত খাঁ বললেন, "আপনার বেঁচে থাকাতে ভারতের মাটিতে আপনার পরিবর্তে কারো পক্ষে সম্ভব নয় যে সম্রাট হয়ে নেতৃত্ব দেওয়া।" সম্রাট আর উত্তর না দিয়ে চোখের অশ্রু মুছে বললেন, "নিজে নিজের মৃত্যু ঘটানো তো মুসলমানদের কল্পনাতেই আসে না, তবুও আমার মনে হয় আমার চলে যাওয়া মানে প্রাণের দায়ে পলায়ন। সেটা মনে চাইছে না বরং শহীদ হওয়াই ভাল। শোন বখত খাঁ, আমাদের পরাজয় হতে চলেছে কেন জানো, তোমাদের বীরত্বের অভাব নেই শুধু ভারতবাসীর বিশ্বাসঘাতকতা। এই শেষ সময়ে যদি অন্তত আমার প্রিয় দেশবাসী হিন্দু রাজা মহারাজারা বিপক্ষদের সাহায্য না করত তাহলে............। আমি মরে গেলে আমার বড় দুঃখ থাকবে কি জান? সেটা হচ্ছে মাত্র কয়েক দিন আগেও আমি হিসাব করে দেখেছিলাম ওদের সৈন্য মরতে মরতে অনেক কমে গেছে কিন্তু উদয়পুরের রাজপুত রাজা, জয়পুরের রাজা, যোধপুরের রাজা যেভাবে সৈন্য অস্ত্র আর অর্থ দিয়ে সাহায্য করল তার শোক আমায় আহত করেছে। দেখ বখ্ত খাঁ, আজমীর হতে সৈন্য আনার জন্য যখন রাজপুতানায় সংবাদ যায় সে খবর পেয়ে আমি নির্দেশ দিলাম সেখানে হতে সৈন্য আনা মানেই রাজপুতানা বা আজমীর ইংরেজশূন্য হওয়া। ঠিক ঐ সময়ে আজমীর তোমার আক্রমণ করলেই আমাদের হাতে এসে যেত। ইংরেজদের

ভারত হতে তাড়ানোর জন্য অস্ত্র কামান অর্থ ও সামান। কিন্তু সৈন্য দিল্লিতে পাঠানো হল বটে সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিশ্বাসঘাতক বিরাটসংখ্যক সৈন্য তাদের জায়গায় প্রহরীর মত দাঁড়ালো। এ দুঃখ ভোলার নয়। ঐ মনে কর গোয়ালিয়রের রাজপুত রাজাকে কত সানুরোধে পত্র পাঠালাম। আট হাজার সৈন্য আর ছাব্বিশটি বড় বড় কামানের মালিক তিনি। আমার মত বৃদ্ধ নন, ২৩ বছরের যুবক। অথচ ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে সেই সুসজ্জিত সৈন্য আর কামান গুলি আমার ভারতীয় হিন্দু মুসলমান প্রজাদের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে প্রয়োগ করল। এই দুঃখ ভোলার নয়। ইন্দোরের রাজায় সমস্ত সৈন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাইলে তিনি তা নিষেধ করলেন। বোম্বাই-এর গভর্ণর এলিফিন ষ্টোনের কাছ হতে সাহায্য চাইলেন তাঁর ভারতীয় ভাইদের হত্যা করার জন্য। তিনি সাহায্য পেলেন এক হাজার বন্দুক, তিনশত পিস্তল আর লাখ লাখ টোটা তাই নিয়ে তিনি বিদ্রোহীদের মারা করালেন। এসব রিপোর্ট আমার কাছে রয়েছে। অথচ মহারাজা তুকাজীরাও যে সাহায্য পেলেন তা আসলে ইংরেজের সাহায্য নয়, আমারই প্রিয় ভারতের রাজা হোরকারের পক্ষ হতেই ঐ সব সরঞ্জাম। আর মূর্খ শিখরা যদি নিরপেক্ষও থাকতো তাহলেও চলতো কিন্তু নিজেরাও মরল বিপ্লবীদেরও মারল। তুমি যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ রাখ আর আমি সারা ভারতের নানা সংবাদ পাই এবং অবাক হই। রাজা জঙ্গবাহাদুর কি বিপুল পরিমাণে সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে আর অর্থ দিয়ে সাহায্য করলেন যে দুঃখ বার বার আমায় আঘাত দেয়। আবার মাত্র সেদিন (১০ মার্চ) তিন হাজার সৈন্য দিয়ে ইংরেজের হাতকে শক্ত করলো।" বলতে বলতে বাহাদুর শাহ, দেশ প্রেমিক ভারত সম্রাট বাহাদুর শাহ অবোধ শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন। তারপর কোন রকমে চোখ মুছে বললেন, "বখ্ত খাঁ, তুমি চলে যাও, তোমার মত লোকের বাঁচার প্রয়োজন আছে। আর আমার মৃত্যু হোক ইংরেজদের হাতে, যেমন করে আমার প্রিয় প্রজা'মুসলিম গাইর মুসলিম' শহীদ হয়েছে।" বাহাদুর শাহ মদ, মাংস, গীত,বাদ্য উম্মত্ত নৃত্যে কলুষিত পরাধীন পরিবেশ হতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন হুমায়ুনের সমাধি বাগানে।

এদিকে মিঃ হডসন রাজ প্রাসাদে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সম্রাটের সাক্ষাৎ পেলেন না। সারা ভারতের বিপ্লবীদের নেতা বাহাদুর শাহ তখন এলাহি বখ্শের পরামর্শেই সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরেজরা গুপ্তচর মারফত এ সংবাদ জানতে পেরে তাঁর বাড়িতে পৌঁছালো এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "আমি বলতে পারবো না সম্রাট কোথায়; অবশ্য আমি জানি।" ইংরেজরা ভয় দেখালো তবুও তিনি উত্তরে বললেন, "আমার শেষ শাস্তি যদি মৃত্যুদণ্ড হয় তাও নিতে রাজি কিন্তু সম্রাটকে হত্যা করার জন্য তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারবো না। শেষে বিরাট আর্থিক প্রলোভন প্রদর্শন করা হল।

>Goto List

তাতেও তিনি বললেন, শুধু অর্থ নয় বরং পৃথিবীর বাদশাহীর পরিবর্তেও আমি এতে প্রস্তুত নই। মিঃ হডসনের কাছে সংবাদ পৌছালে তিনি বললেন, যদি তোমাদের পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে শপথ করে বলি যে, বাদশার ক্ষতি করবো না তাহলে বিশ্বাস করা চলবে কি না। তাতে এলাহি বখশ বললেন, শুধু কোরআন নয় বাইবেল ছুঁয়েও শপথ করতে হবে। তাই হোল। হডসন কোরআন ছুঁয়ে শপথ করলেন তারপর একটি বাজে বই বাইবেল বলে ছলনা করে শপথ করার পর ইলাহী বখশ হডসনকে সম্রাটের সন্ধান বলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। ভাবলেন সম্রাটের বোধহয় আর কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই। এলাহি বখশ যে সম্রাটের সংবাদ জানতেন এই খবর যিনি জানতেন তিনি বাহাদুর শাহের একজন কেরানী বা মুন্সী শ্রী রাম জীবন।

হডসন একটা পালকী নিয়ে তাতে সম্রাট আর সম্রাজ্ঞী জিন্নত মহলকে চড়তে বললেন। সম্রাট আর সম্রাজ্ঞী পালকীতে উঠলেন। সামনে পেছনে ইংরেজ সৈন্য বুক ফুলিয়ে চলেছে সকলের সামনে আছেন মিঃ হডসন। এর পেছনে গরুর গাড়িতে দীনহীন দরিদ্রের মত সম্রাটের সন্তানদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তার আগে ইংরেজ সৈন্য সারা দিল্লিতে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল তার উল্লেখ ইতিহাসে নেই। তবুও দিল্লির জন সাধারণ রাস্তার দুই ধারে সশস্ত্র দাঁড়িয়ে, চোখে অশ্রু। দিল্লির সহস্র সহস্র নারী বোরকা পরে রাস্তায় সন্তানের বা পিতার মৃতদেহকে শেষ বিদায় দেওয়ার মত কান্নার রোলে ভরিয়ে তুলল।

মিঃ হডসন বাহাদুর শাহ আর বেগমকে সৈন্যদের মাঝে রওনা করে দিয়ে একটু পিছিয়ে এলেন। তারপর শাহজাদা মির্জা খিজির, সুলতান মির্জা মোগল ও মির্জা আবু বকরকে গোগাড়ি হতে নামতে বললেন। শাহজাদারা নামতেই প্রকাশ্য রাজপথে তাঁদের দাঁড় করানো হলো তারপর হাতগুলি পেছন দিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। অতঃপর হডসন নিজের তাদের বুকের সামনে বন্দুক উঠিয়ে ধরে বললেন, বিদ্রোহের মূলে তোমাদের বাবা আর তোমরা। সারা ভারতে আমাদের শেষ করবার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছ তোমরাই। তাই এই তোমাদের স্বাধীনতার পুরস্কার! তার পরেই শব্দ। পর পর প্রত্যেকের বুকে গুলি করে হডসন যে শব্দ সৃষ্টি করলেন তার চেয়েও এক মারাত্মক শব্দ শুরু হল মিলিত হিন্দু-মুসলমান নর-নারীর কান্নার রোল। তারপর নিষ্ঠুর নর পিশাচ হডসন স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্রাট বংশের শেষ প্রদীপগুলি নিভিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি তাঁদের মৃত দেহগুলি প্রকাশ্যে টাঙ্গিয়ে দিলেন যাতে দিল্লির লোক ভবিষ্যতে আর কখনও বিপ্লব না করে।

বাহাদুর শাহের জন্য একটি কাঠের পায়ের শয়ন খাট, একটি পুরাতন ময়লা মখমলের বিছানা, একটি ছিন্ন ময়লা বালিশ আর অসময়ে অর্ধাহারে রেখে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ২৭ জানুয়ারি বিচারের নামে প্রহসন পর্ব সমাধা হলো। বিচারে জজদের

রায় প্রকাশ হল চিরজীবন নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হল সেই অস্বাস্থ্যকর রেঙ্গুনে। কারণ তিনি ছিলেন ভারতে বিপ্লবী ও বিদ্রোহীদের প্রধানতম নেতা। তাঁর স্ত্রীকেও সেখানে পাঠানো হয়। কিন্তু পরে তাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। খাঁ বাহাদুর খাঁও বন্দি ছিলেন। তাঁরও বিচার হলো। বিচার হল ফাঁসি। সবই যেন মনে হচ্ছে নতুন কথা। কল্পলোকের গল্পের মত।

৮৪ বছরের বৃদ্ধ বাহাদুর শাহের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসকে গোপন করে রাখা হয়েছে আর তাঁর মৃত্যুর জন্য বিশ্বাসঘাতক বলে বর্ণনা করা হয়েছে ইলাহি বখশ সহ কয়েকজন মুসলমানকে। এও ইংরেজের এক সুকঠিন ষড়যন্ত্র। সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাবে, ইলাহী বখশের বিরুদ্ধে পাঠকের কোনও অভিযোগ থাকবে না যদি মনে রাখা হয় যে ইলাহী বখশ ছিলেন জিন্নত মহলের পিতা অর্থাৎ সম্রাট বাহাদুর শাহের শ্বশুর।

অষ্টদশ অধ্যায়

ঐতিহাসিক নেতাদের গুপ্ত ঐহিহাসিক রহস্য।

তাহলে ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবের মোটামুটি তথ্য জানা গেল কিন্তু ভারতের রাজধানী, প্রাণকেন্দ্র কলকাতা তথা বঙ্গদেশের বিপ্লবের কথা জানার জন্য পাঠকমাত্রই উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতীক্ষায় আছেন। বঙ্গের বিষয়ে বরতে গিয়ে বলতে হয় যে চতুর ইংরেজ নিজের রুচীমাফিক নাগরিক তৈরি করতে কিছু স্কুল, কলেজ ও ইউনিভারসিটির জন্ম দেয় আর সুদক্ষ বিচক্ষণ ইংরেজ সৃষ্ট ভারত প্রেমিককে, ভারতবাসীকে শিকার করার জন্য লেলিয়ে দেওয়া হয়। অনেকের মতে মিঃ ডেভিড হেয়ার হিন্দু প্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন আর মিঃ লং মুসলমান প্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

মিঃ ডেভিড হেয়ার ১৭৭ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন আর ১৮৪২ খৃঃ মারা যান। তিনি প্রথমে সূক্ষ্ম ছুঁচের মত কলকাতায় মাত্র একজন ঘড়ি ওয়ালা হয়ে দোকান করেন। আর তখন ঘড়ি পরতো সাধারণ মানুষের পরিবর্তে হোমরা চোমরা নামী ও দামি লোকেরা। ঐ খবিদদারগুলিই তাঁর প্রথম শিকারে পরিণত হয়। প্রত্যেক চলতি ইতিহাসে কতকগুলি সর্বজন স্বীকৃত তথ্য পাওয়া যায় যেমন তিনি নাস্তিক ছিলেন সুতরাং খ্রীষ্টান ধর্ম ও খ্রীষ্টান রাজত্ব তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এবং ভারতবাসীর শিক্ষার উন্নতির জন্য আর ভারতের মানুষের ধর্ম ও সমাজের গোঁড়ামি যুক্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা নাকি অতুলনীয়।

১৮০০ হতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঘড়ির কাজে প্রায় লাখ খানেক টাকা রোগার করলেন এবং তা ভারতবাসীর শিক্ষা দীক্ষার জন্য দান করলেন। ১৮২০ খ্রীঃ তিনি ঘড়ির ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে তার গোটা দেহ, মন, সময় সবই ব্যয় করলেন ভারতের জনসাধারণের জন্য। তাই কলকাতা কলেজ স্কোয়ারে কিছু জমি কেনেন এবং ১৮১৫ খ্রীঃ হিন্দুদের নিয়ে হিন্দু কলেজের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। কিছু দিনের মধ্যেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যিনি নাস্তিক, কোন ধর্ম মানেন না তিনি এমন কলেজ কেন করবেন যা মুসলমান ও অন্য জাতিকে বঞ্চিত করবে?

তারপর হিন্দু মহিলাদের জন্য ১৮২৪ খ্রীঃ লেডিজ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন' স্থাপন করলেন। রাধাকান্ত দেব একজন বিখ্যাত গোঁড়া হিন্দু, যিনি সতীদাহ প্রথার পক্ষপাতী। একবার মুসলমান ছাত্র ভর্তি করা চলতে পারে কিনা কথা উঠলে রাধাকান্তদেব তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং জয়ী হন। সেই রাধাকান্তের সঙ্গে ডেভিড হেয়ারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। গোঁড়া রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে যখন হিন্দু মেয়েদের বাৎসরিক পরীক্ষা হতো তখন নিয়মিতভাবে হেয়ার উপস্থিত থাকতেন। রাধাকান্ত মুসলমানদের বরণ করতে পারলো না কিন্তু কেমন করে নাস্তিক গোভক্ষক ডেভিডকে গ্রহণ করতে পারলেন তা চিন্তা করলে ইংরেজদের বাহাদুরীর প্রশংসা করতে হয়। (দ্রঃ যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থালয়, Amit sen, Notes on the Bengal Renaissance, PP. 14-15)

সর্ব ভারতীয় অফিস আদালতে ফারসী ভাষা তুলে দেয়ার গোড়া পত্তন তিনিই করেন এবং সরকার হতে তা মুঞ্জুর করিয়ে হিন্দুদের জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ভারতীয় কুলীদের বাইরে চালান দেওয়ার ব্যাপারে হেয়ার হিন্দুদের সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুললেন এবং ঐ কু-প্রথা ইংরেজ সরকারকে বন্ধ করতে বাধ্য করেন। আর ইংরেজ জজদের সাথে ভারতীয় জুরী প্রথার প্রবর্তন করেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তাই আমরা বেশির ভাগ মানুষ তাঁকে ভারত দরদি বলে মনে করি কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারশীল মানুষ আজ অন্য রকম বুঝতে দ্বিধাবোধ করছে না যে ঐ নেতাকে কই কারাগারে তো পচতে হয়নি, কই ফাঁসি দেওয়ার ভয় তো দেখানো হয়নি। কই তাঁর কোন দাবীই তো প্রত্যাখ্যাত হয়নি? তাহলে চোরে চোরে মাসতুত ভাই বললে বাধা দেওয়া যাবে কী করে? আর একজন তাঁর বিখ্যাত সহকর্মী ও সহমর্মী তিনি হচ্ছেন মিঃ ডিরোজিয়ো। তিনিও দাবি করতেন তিনি নাকি নাস্তিক, তাই ইংরেজবিরোধী।

১৮৪২ খৃঃ হেয়ার মারা গেলেও তাঁর চক্রান্ত চালানোর দায়িত্ব দিয়ে যান ডিরোজিয়ো সাহেবের হাতে। অবশ্য কায়দা এইটিই ছিল হেয়ার যা কিছু করেছিলেন তিনি কাগজে-কলমে বা মার্বেল পাথরে নিজেকে লাগিয়ে রাখেননি,

করেছিলেন অত্যন্ত গোপনে। যখন মারা যান তখন খৃষ্টানদের কবর স্থানের পরিবর্তে তিনি তাঁর নিজের কেনা জায়গার ওপর কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কিন্তু যিনি নাস্তিক তাঁর দেহ তাঁর প্রাণপ্রিয় হিন্দু জাতির মত দাহ করলেই তো উদারতা প্রকাশ পেত অথবা নদীতে মৃতদেহ ভাসানোর কথাও তো বলে যেতে পারতেন অথবা মৃতদেহ কবরস্থ করার নিয়মকানুন খৃষ্টান মতে নাও তো করতে পারতেন? তার সেই সস্তার বাজারে মাত্র কয়েক বছর ঘড়ির কাজ করে দুহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা যা তিনি দিয়েছেন তা যদি হিসাব করা হয় তাহলে দেখা যাবে তাঁর রোজগারের বহু গুণ বেশি। ঐ বেশি টাকা কে দিয়েছিল তাঁকে কাল মানুষ চিন্তা করেনি আজ করতে শিখেছে।

এই হেয়ার ও ডিরোজিয়োর স্বপ্ন ও ডিউটি ছিল হিন্দু জাতিকে শিক্ষিত করা এবং শিক্ষার সঙ্গে তাদের হাতের পুতুল তৈরি করে মুসলমানদের বিরুদ্ধবাদী করে তোলা এবং স্বধর্মের পরিবর্তে খৃষ্টান ধর্ম, দর্শন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর শ্রদ্ধাশীল করে তোলা। এখন কথা হচ্ছে ইংরেজরা কতটা সাফল্য অর্জন করেছিল তা পরবর্তী আলোচনায় স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।

আমাদের ভোলা উচিত হবে না যে বিপ্লব আন্দোলন, বিদ্রোহ, প্রভৃতি গণ্ডগোল বা হট্টগোলগুলি অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গেই সীমিত নয় বরং তার উৎস বা গোড়া হচ্ছে কলম আর কালি আর কালি কলম এবং কাগজের পেছনে থাকে মগজ। তাই ইংরেজ নিজেদের তৈরি কলেজ বা মাদরাসাগুলি করেছিলো নিজেদের স্বার্থে মগজ ধোলাইয়ের জন্যই।

ইংরেজরা মুসলমানদের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধের যত রকমের অত্যাচার আছে সবই প্রয়োগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। মুসলমানদের জাতে মারতে না পেরে ভাতে মারতে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে সারা ভারতের মুসলমান দরিদ্র শ্রেণীতে পরিণত হতে নিশ্চিতভাবে বাধ্য হয়। তবুও এত অভাব অনটন আর প্রতিকূলতার ভেতরেও বন্দুক তলোয়ার চালু রাখার জন্য পত্রপত্রিকা প্রচার করে যে ভূমিকা পালন করেছে তা খুবই প্রণিধান যোগ্য। হাতে লেখা প্রচুর পত্রপত্রিকা বা বুলেটিনগুলির নাম দিলে বইটি খুব বেড়ে উঠবে তাই কয়েকটি ছাপা পত্রিকার কথা জানানো হচ্ছে এবং সেগুলিই জানানো হচ্ছে, যেগুলি প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর বের করা হয়েছিল। তার কারণ আন্দোলনকে জিইয়ে রাখবার জন্য এবং ইংরেজের স্বপক্ষে পত্রিকাগুলির প্রতিবাদ ও তাদের বিপক্ষ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য।

পারিল বার্ত্তাবহ সম্পাদক মঃ আনিসুদ্দিন, ১৮৭৪ খ্রীঃ ঢাকা

আখবারে ইসলামিয়া ১৮৮৪ খৃঃ ময়মনসিংহ। **হিন্দু মুসলিম সম্মিলনী** ১৮৮৭ খৃঃ,যশোর। **সুধাকর** ১৮৮৯ খৃঃ কলকাতা। **হিতকরী** ১৮৯০ খৃঃ, কুষ্ঠিয়া, সম্পাদক মোশাররাফ হসেন। **ইসলাম প্রচারক** ১৮৯১ খৃঃ, সম্পাদক রেয়াজুদ্দিন

আহমাদ ও সেখ আঃ রহিম। **মিহির** ১৮৯২ খৃঃ সম্পাদক আঃ রহিম। **কোহিনুর** ১৮৯৮ খৃঃ পূর্ববঙ্গ, সম্পাদক মওলুবী রওশন আলী। **প্রচারক** ১৮৯৯ খৃঃ কলকাতা। **নূরুল ঈমান** ১৯০১ কলকাতা। **নূরুল ইসলাম** এটিও ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যষোর হতে প্রচারিত হতো। **ভারত সুহৃদঃ** ১৯০১ খৃঃ কলকাতা হতে বের হতো। **সুলতানঃ** কলকাতা হতে প্রকাশিত হতো (১৯০২)। **হানিফ** ঃ ঢাকার ময়মন জেলা হতে আত্মবিকাশ করেছিল (১৯০৩)। **নবনূরঃ** এটিও ১৯০৩ সালেই কলকাতা হতে বের হয়েছিল। **মোসলেম হিতৌষীঃ** বঙ্গীয় চৌদ্দ শতাব্দীর প্রথম দশকে, সম্পাদক মুন্সী আঃ রহিম সাহেব। ইনি 'মোসলেম সুহৃদ নামক এক পত্রিকার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে জানা যায়। **মুসলমানঃ** কলকাতা হতে প্রকাশিত হতো (১৯০৬)। **ইসলাম সুহৃদঃ** ১৯০৬, মৌলানা আবুল সোবহান, ঢাকা। **বাসনাঃ** ১৯০৮, রংপুর। **ইসলামঃ** বিংশ শতকের প্রথম দশকে কলকাতা 'ল' কলেজে আইন অধ্যয়নরত মৌলানা তসলীমুদ্দীন আহমাদ ও মৌঃ একিনুদ্দিন আহমাদ এবং কয়েকজন তরুণের ছাত্র জীবনের প্রচেষ্টায় বাংলার প্রথম মুসলিম পরিচালিত সাহিত্য মাসিক। **মোসলেম হিতৌষীঃ** ১৯১১, কলকাতায়।

আল এসলামঃ ১৩২১ সালে, সম্পাদক মৌলানা আকরাম খাঁ, সহকারী সম্পাদক, সাংবাদিক মৌঃ মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী। তেজস্বী লেখক মাওলানা ফজলুল হক্ সেলবসীও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। **ইসলামঃ** ১৯১৫, সম্পাদক আবদুর রশীদ। **আহলে হাদীসঃ** এটিও ১৯১৫ সালে জন্মলাভ করেছে। প্রথম দুই এক সংখ্যার প্রধান সম্পাদক ছিলেন মৌলানা আবদুল হাকীম সাহেব। যুগ্ম সম্পাদক মৌঃ মো বাবর আলী। পরে বাবর আলীই ছিলেন স্থায়ী সম্পাদক **মসজিদ** ১৯১৭, সম্পাদক মুন্সী গোলাম রহমান সাহেব, কলকাতা। **ইসলাম দর্শনঃ** ১৯২০ প্রকাশনায় জনাব মুনসী আবদুর রহিম সাহেব। **ধুমকেতু** এই প্রখ্যাত অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ১৯২২ খৃঃ ১২ আগষ্ট বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কতৃক পরিচালিত ও সম্পাদিত। এর কর্মসচীব ছিলেন শ্রী শান্তিপদ সিংহ, আর মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন মুসলিম পাবলিশিং হাউসের কর্মকর্তা মৌলানা আফজালুল হক সাহেব। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলের 'ধুমকেতু' সম্বন্ধে যে বাণী পাঠিয়ে ছিলেন তা নিম্নরূপ ঃ-

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু-
আয়, চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,
দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।

অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ফালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্দ্ধচেতন।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৪ শে শ্রাবণ
১৩২৯

ধুমকেতু কেবল মাত্র একটি পত্রিকাই নয়, ইতিহাসও। এতে স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান মেলে। 'মোসলেম জগৎ' ১৯২২ খৃষ্টাব্দেই কলিকাতায় প্রকাশ। এর সম্পাদক ছিলেন মৌলানা আঃ রশিদ স্যাহেব। সম্পাদকীয় বিভাগে সংশ্লিষ্ট কবি শাহাদত হোসেন এবং কবি খানমহম্মদ মঈনুদ্দিন প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সরকারবিরোধী রচনার জন্য কারাবরণ করতে হয়েছিল। 'সাম্যবাদী' প্রথম দিকে বিখ্যাত সাংবাদিক মৌঃ মহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এবং পরে সুসাহিত্যিক, সুসাংবাদিক ও সুকবিরূপে বিশিষ্ট জনাব মঈনুদ্দিন খান সাহেবের সম্পাদনায় এটিও ১৯২২ খৃঃ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। 'সোনার ভারত' ১৯২৩ খৃঃ আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদক ছিলেন সাংবাদিক জনাব মৌঃ জবেদ আলি। ইনি সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছিলেন। 'সৌরভ' মুর্শিদাবাদের বহরমপুর হতে ১৯২৫ খৃঃ এর প্রকাশ। সম্পাদক ছিলেন সুখ্যাত অধ্যাপক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ মোহাঃ রেজাউল করিম সাহেব। 'তরুণ পত্র' সাহিত্যিক আবুল হোসেন সাহেবের প্রকাশনায় ও জনাব ফজলুল করিম মল্লিকের সম্পাদনায় ১৯২৫ অব্দে ঢাকা হতে বের হয়। 'জিয়া-উল-ইসলাম' মৌঃ আবদুশ শুকুর সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত ও জনাব মৌঃ আঃ ওয়াহিদ কর্তৃক সম্পাদিত ১৯২৫-এর জানুয়ারিতে প্রকাশ। 'অভিযান' ১৯২৬ খৃঃ ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর মুখপাত্ররূপে বের হয়েছিল। সুসাহিত্যিক মৌলানা আবুল হোসেন ছিলেন এর অগ্রনায়ক। 'সাহিত্যিক' সুবিখ্যাত সাহিত্যিক মহঃ ইয়াকুব আলি চৌধুরী ও স্বনামধন্য কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবদ্বয়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির'র মুখপাত্ররূপে ১৯২৬ খৃঃ প্রকাশিত হয়েছিল। হেলাল মৌলানা শামসুর রহমান সাহেবের সম্পাদনায় সাহিত্য গগনে এরও প্রথম উদয় ১৯২৬ সালে কলকাতায়। ইসলাম মৌলানা মোহাঃ আঃ মোনয়েম সাহেবের প্রকাশনায় বর্মা মুলকের রেঙ্গুন হতে এটি ১৯২৭ খৃঃ সেপ্টেম্বরে প্রকাশ হয়েছিল। 'তবলীগ' ১৯২৭ সালে প্রকাশ লাভ করেছিল। সম্পাদক ছিলেন মৌলানা শামসুর রহমান ও মাওলানা দেলওয়ার হোসেন সাহেবান। 'নওরোজ'-এর প্রথম প্রকাশ ঐ ১৯২৭ সালেই। সম্পাদক ছিলেন মৌলানা আফজালুল হক। পত্রিকাটি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ও

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা সম্ভারে পরিপুষ্ট ও চিত্তাকর্ষক ছিল। 'জাগরণ' এটিও মুনসী আহমাদ সাহেবের সম্পাদনায় ঢাকার সাত রওজা হতে ১৯২৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। 'তরুণ', জনাব এম মেসের আলী সাহেবের সম্পাদনায় ১৯২৮ সালে বগুড়া হতে প্রকাশিত হয়েছিল। 'তাইদে ইসলাম' এটিও ১৯২৮ সালে রংপুর হতে প্রকাশিক। সম্পাদক ছিলেন জনাব শাহ সৈয়দ আবুল কাশের আল কাদেরী সাহেব। 'তরক্কী', নব মুসলিম মিঃ সিরাজুল হকের অধিনায়কত্বে ১৯২৮ সালেই পত্রিকাটি উন্নতির সোপানে আরোহন করে। 'সহচর' এই সহচরের সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল ১৯২৮ সালে। এর প্রথম দিকের সম্পাদক ছিলেন মৌলানা সৈয়দ নওশের আলি সাহেব। পরে সুখ্যাত সাহিত্যিক মৌলানা এমদাদ আলী সাহেব ছিলেন এর স্থায়ী সম্পাদক। 'জয়তী', কবি আবদুল কাদের সাহেবের সুসম্পাদনায় ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে ১৯৩১ সালে কলকাতা হতে বের হয়েছিল। 'সুন্নাত-আল-জামাত' ১৯৩২ খৃঃ এর জন্ম। সম্পাদক ছিলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক মাওলানা মোঃ রুহুল আমিন সাহেব। 'গুলিস্তা', কলকাতার বিখ্যাত সাহিত্যিক ও তৃতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট এস, ওয়াজেদ আলী (বি-এ-ক্যান্টব, বার-এট-ল) সাহেবের প্রচেষ্টা ও অর্থে এটিও ১৯৩২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত। জনাব এস শামসের আলী ও জনাব আবদুল রউফ উকীল সাহেবদ্বয়ের নামের পত্রিকাটি চললেও এর সম্পাদক ছিলেন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক জনাব ঈদ্রিশ আলী সাহেব। 'আল ইসলাহ' এটিও ১৯৩২ খৃঃ সিলেট হতে প্রকাশিত। এর সম্পাদক ছিলেন "সিলেট কেন্দ্রীয় সাহিত্য সংসদের মুখপাত্র সুরল হক সাহেব, যিনি স্বদেশ সমাজ ও সাহিত্য সেবায় স্বীকৃতি স্বরূপ পাক সরকারের কাছে টি, কে, উপাধিসহ প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁর সংসদের জন্য। তিনি তাঁর পাঠাগারে আঠারো হাজার পুস্তক সংগ্রহ করেছিলেন। 'মার্কস পন্থী', কমরেড আবদুল হালীম কর্ত্তৃক পরিচালিত। এর আত্মপ্রকাশের কাল ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ। 'আলফারুক', সম্ভবত এটিও ঐ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দেই জন্ম লাভ করেছিল। 'সিরাজ', আনুমানিক ১৯৩৩ সালে পূর্ববঙ্গের পুড়রা নামক স্থান হতে প্রকাশিত হোত। এতে কবি নজরুল, কবি গোলাম মোস্তফা ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর প্রমুখ কীর্তিমানদের রচনা পরিবেশিত হতো। 'ছায়া বীথি', কথা শিল্পী জনাব নাজিরুল ইসলাম সাহেবের সম্পাদনায় কলকাতা হতে ১৯৩৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেছিলো। 'হেদায়েত' ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে খুলনা হতে প্রকাশিত। এর প্রচারকর্মী ছিলেন মৌলানা মোয়েজুদ্দিন হামিদী। 'আজাদ' ১৯৩৬ সালে মুসলিম পরিচালিত বাংলার দৈনিক পত্রিকার অন্যতমরূপে এটি ৯১ নং আপার সার্কুলার রোড ঐ কলকাতা হতে প্রকাশিত হয়েছিল। এর সম্পাদক ছিলেন খ্যাতনামা সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মৌলানা মোহাঃ আকরাম খাঁ সাহেব। মৌলবী নাজির আহমাদ চৌধুরী সাহেবের

প্রকাশনায় এবং মৌলানা মহম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ নাদভী সাহেবের কর্মাধ্যক্ষে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'সন্ধানী' মৌলানা মোহাম্মদ আবু বকর (বি,এ) সাহেবের সম্পাদনায় এটি অবিভক্ত বঙ্গের কুষ্টিয়ায় ১৯৩৬ সালে জন্ম নিয়েছিল। 'পাকিস্তান', এটি ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত। সম্পাদক ছিলেন জনাব মৌলানা মোহাম্মদ মোদাব্বের সাহেব। গুল বাগিচা, সুসাহিত্যিক মৌলানা আবদুল ওহাব সিদ্দিকী কর্তৃক এটিও ১৯৩৭ সালে কলকাতা হতে বিকাশ লাভ করেছিল। 'কৃষক', ১৯৩৮ সালে সম্পাদক মিঃ আবুল মনসুর আহমাদ সাহেবের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই কৃষকের অভিযান শুরু। 'আঙ্গুর', ১৯৩১ সালে জন্মকাল। গবেষক, অগ্রগণ্য সাহিত্যিক ও বহু ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী মৌলানা ডাক্তার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এন এ, বি-এল, ডি-লিট সম্পাদিত এটিই ঢাকার মুসলিম পরিচালিত প্রথম শিশু মাসিক। 'চতুরঙ্গ', কলকাতা হতে এটিও ১৯৩৯ সালে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সম্পাদক ছিলেন ভারত রাষ্ট্রের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পণ্ডিত, কবি ও সুসাহিত্যিক মিঃ হুমায়ুন কবীর। পত্রিকাটির বিশেষ বৈশিষ্ট শিক্ষিত ব্যতিরেকে এর গ্রাহক করা হতো না। 'মীনার' জনাব সাহিত্যিক মওলবী ময়নুদ্দিন হোসায়েন সাহেব সম্পাদিত কলকাতার বুকে ঐ ১৯৩৯ সালেই এই মীনারটি নির্মিত হয়। 'মোসলেম', ১৯৪১ সালে কলকাতার ৪৭ নং রিপন ষ্ট্রিটে এর জন্ম। সম্পাদক ছিলেন জনাব হাশেম সাহেব ও খ্যাতনামা নেতা এবং দেশ ও জাতির সেবক, বাংলা মায়ের সুসন্তান ও সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক জনাব মৌঃ এ কে ফজলুল হক। 'নওরোজ', পাকিস্তান সরকার কর্তৃক টি কে উপাধিপ্রাপ্ত সাহিত্য সেবায় হাজী মোহাম্মদ হেমায়েত আলী সাহেবের সম্পাদনায় এটি ১৯৪১ সালে দিনাজপুর হতে প্রকাশিত। 'আজান', ১৯৪২ সালে এর জন্ম। মৌঃ এ কে এম নূর মহম্মদ ও সহকারী মৌঃ মোহাঃ আবদুল কাদের সাহেব ছিলেন এর সম্পাদক। 'আল আমান' এর প্রথম দিকের সম্পাদক মৌলানা আঃ রহিম চৌধুরী ও শেষের দিকের মৌলানা আবদুস সাত্তার। পৃথিম পাশার সিলেট নামক স্থান হতে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত। 'মীনার' এটি বেগম ফাত্তাজয়া সাহেবার প্রচেষ্টায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত সর্ববপ্রথম মহিলা সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্য। 'মিল্লাত', চৌদ্দ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এর জন্ম (আনুমানিক ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে)। সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত নেতা মৌলানা আবুল হাশেম সাহেব। যাঁর নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'ইত্তেহাদ', ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে অন্যতম বাংলা দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশ। সম্পাদক ছিলেন মৌলানা আবুল আহমাদ সাহেব। 'সাপ্তাহিক তকবীর', মৌলানা আজিজুর রহমান সাহেবের সম্পাদনায় ১৯৪৭ সালে প্রথম প্রকাশ। 'জিন্দেগী' জনাব এস এম বজলুল হক সম্পাদিত ১৯৪৭ সালের সাপ্তাহিক পত্রিকা। আবার অনেকে মনে করেন এটা ছিল দৈনিক পত্রিকা।

সাপ্তাহিক দৈনিক ঃ- সম্পাদক মোঃ আবদুল গফুর সাহেবের সুসম্পাদনায় ১৯৪৮ সালে ঢাকা হতে বের হতো।

>Goto List

কোরআন প্রচার ঃ- জন্ম ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে সম্পাদক ছিলেন আলেম, সাহিত্যিক জনাব মৌঃ মোহাঃ রফিকুল হাসান সাহেব কলকাতা হতে প্রকাশিত।

আজানঃ- এই আজানের ধ্বনি প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান হতে। এর পরিচালক ছিলেন খ্যাতনামা সম্ভ্রান্ত রাজনীতিবিদ বাগ্মী ও সাহিত্যিক জনাব মৌ আবুল হাসেম সাহেব যিনি "ইসলাম ও অর্থনৈতিক সমস্যা" Islam and Economic problem, creed & Islam প্রভৃতি অনেক গ্রন্থের প্রণেতা।

তবলীগ ঃ- জন্ম ১৯৫১ -এর ২০ সেপ্টেম্বরে সম্পাদক মৌঃ ফজলুল হক সাহেব।

ওয়াতন ঃ- ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তাইয়েবুল হক সাহেবের সম্পাদনায় এই পত্রিকাটি প্রকাশ হতো। কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতা এতে প্রকাশ পেয়েছিল। জনাব তৈয়েবুল হক সাহেব ছিলেন স্বাধীনতা বিপ্লবে বিশেষ অংশগ্রহণকারী নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের সৌহার্দ্যতা ছিল। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রী প্রফুল্ল সেন প্রমুখ জননেতার তিনি অত্যন্ত প্রিয়ছিলেন। সিরাজ-মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান হতে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে কবি মোদাস্বর হোসেন এবং মৌঃ জসিমুদ্দিন ও সোহরাব আলীর প্রচেষ্টায় বের হয়েছিল। ত্রিলেখাঃ- ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে মালদহ হতে প্রকাশিত। সম্পাদক ছিলেন দিলওয়ার হোসেন। ইনসাফ ঃ জন্ম ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে। পরিচালক মৌঃ শেখ শামসের আলী এবং সম্পাদক মোঃ মোসলেম আলী।

আওয়াজ ঃ- অনুমানিক ১৯৫৪-৫৫ অব্দে জন্ম। জনাব মাওঃ আবুল হান্নান আবকারী সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সাহিত্যিক আঃ আজিজ-আল-আমানের সম্পাদনায় কলকাতা হতে প্রকাশিত।

হিন্দোল ঃ- জনাব আবুল হোসেন সাহেবের সম্পাদকীয়তে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। আহ্বান-মহম্মদ হাবিবর রহমানের সম্পাদকীয়তে ১৯৫৫ সালে মালদহ দক্ষিণ বালুচর হতে প্রকাশিত। **মশালঃ**- জন্মগ্রহণ করেছিল ১৯৫৫ সালে সম্পাদক ছিলেন ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গা নামক স্থানের তরুণ সাহিত্যিকদ্বয় জনাব মনিরুজ্জামান ও আখতারুল জামাত। **মাসিক আজাদঃ**- এর জন্মও ১৯৫৫ সালে কলকাতায়। সম্পাদক ছিলেন সুসাহিত্যিক খোন্দকার নুরুল ইসলাম ও জনাব গোলাম আহমাদ সাহেবান। **উন্মেষঃ**- ১৯৫৬ তে কাটোয়া হতে প্রকাশ। প্রথম দিকে সম্পাদক ছিলেন দিলীপকুমার দাস ও নুরুল হুদা। শেষে মহাম্মদ হুদাই এককভাবে ছিলেন। **আজঃ**- মোহম্মদ মোস্তাফা হোসেনের সম্পাদনায় সাপ্তাহিকরূপে ১৯৫৭তে প্রকাশ হয়েছিল। **দিশারীঃ**- **সম্পাদক মণ্ডলী** জনাব অধ্যক্ষ মিঃ এব্রাহিম খাঁন জনাব মিঃ আবুল হাসেম, জনাব ডাঃ মোঃ সিরাজুল হক ও মৌঃ মোহিউদ্দিন খাঁ সাহেদের প্রচেষ্টায় দারুল

ইসলামিক একাডেমীর মুখপাত্ররূপ ১৯৬০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। **আভাবঃ-** আসামের শিলচর নামক স্থান হতে ১৯৬০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন তরুণ সাহিত্যিক এম, জি, কিবরিয়া সাহেব। **ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা,** পত্রিকাটির সম্পাদক মৌলানা আবুল হাশেম ও সহ সম্পাদক মৌঃ ফারুক আহমাদ সাহেবানের অক্লান্ত পরিশ্রমে ঢাকা ইসলামিক একাডেমীর মুখপাত্ররূপে ১৯৬১ সালে জন্ম লাভ করেছিল। মিঃ আবদুল মওদুদ সাহেব কর্তৃক অনূদিত "The Indian Mussalmans" নাকম মিঃ হান্টারের লেখা ইংরেজি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ পত্রিকাটির বিশেষ আকর্ষণ। **আকাশ,** এর আবির্ভাব ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে। প্রধান পৃষ্টপোষক এস এস আবদুল্লাহ। যুগ্ম সম্পাদক এম রওশন হালদার ও কোরবানী সিরাজ ওয়াই। কলকাতা হতে প্রকাশিত। **তওহিদ,** আবু তাহের কর্তৃক সম্পাদিত ও কলকাতা থেকে ১৯৬৩ সালে প্রথম প্রচারিত। **জাগরণঃ** সাহিত্যিক আঃ আজিজ আল আমান সম্পাদিত মুসলিম পরিচালিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় জন্ম। **সন্ধানঃ** "ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান" এর মুখপাত্ররূপে পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি হতে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন ডাক্তার ফজলুর রহমান এবং ডাঃ এম, সগীর হাসান মামূমী। **খেদমতগার,** সর্বসাধারণের খেদমতে এটি প্রথম আবির্ভূত হয় ১৯৬৪ সালেই। সম্পাদক ছিলেন জনাব কাজী মোহাম্মদ আলি আর আবদুল গণি সাহেব ছিলেন এর তত্ত্বাবধায়ক। **তরুণ পত্রঃ** ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে। সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব। **"সংকল্প"** নামেও আর একখানি পত্রিকা তিনি ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেছিলেন। মাসিক নবারুণ, জনাব মিঃ এ এম সফিক জনাব মি হামিদুল হক এবং জনাব হাসিনূর রহমান সাহেবদের প্রচেষ্টায় সুপ্রতিষ্ঠিত এই নবারুণের প্রথম উদয়কাল ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ। **আমানঃ** তরুণ সাহিত্যিক মৌলানা আঃ হোসেন মজুমদারের সম্পাদনায় এটিও ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে আসামের হাইলাকান্দি হতে প্রকাশিত। সাপ্তাহিক জনবার্তা, সাহিত্য সেবক জনাব সোহরাব আলী সাহেবের সুদক্ষ সম্পাদনায় ১৯৬৬ তেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। **দামামাঃ** জনাব এস এ মোত্তালিব ও এন এ হান্নান সাহেবানের সম্পাাদনায় কলকাতা হতে এই দামামার প্রথম আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। **মোসলেম প্রতিভাঃ** সুসাহিত্যিক মুনসী আবদুর রহিম সাহেবের সুসম্পাদনায় ১৯৬৭ সালে কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছিল। **সাহিত্য কাণ্ডারীঃ** নবীন সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম মল্লিক সাহেবের উদ্যমে ও প্রচেষ্টায় এটিও ১৯৬৭ তে প্রকাশ লাভ করেছিল। পত্রিকাটি নিঃসন্দেহে সর্বসাধারণের প্রশংসার দাবি রাখে।

এছাড়া আরও অসংখ্য পত্র-পত্রিকা স্বাধীনতার পূর্বেও পরে প্রকাশিত **হয়েছিল**। যেমন -দর্পণ লণ্ডন থেকে প্রকাশিত। যেটি পাঠরত ভারতীয় ছাত্রদের **দ্বারা** প্রযোজিত। সংবাদপত্র থেকে জানা যায় দর্পণ একটি অসাধারণ সাহিত্য সংবাদপত্র, যার সব কিছু মূল্যবান। **পাক হিতৌষীঃ** জনাব এ কে এম আজিজুল হক সাহেবের সম্পাদনায় পাবনা হতে প্রকাশিত। **আরাফাতঃ** এটি ঢাকা হতে প্রকাশিত এবং মাওলানা মোঃ আঃ রাহমান সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত। **তরুণ নকীবঃ** জনাব মীম ওবায়দুল্লাহ সাহেবের সম্পাদনায় এবং হাজী শাহ মোহাম্মদের প্রকাশনায় এটি মালদার বাটনা জামেয়া মাদরাসা হতে বের হয়। **অগ্নিশিখা**, ২৪ পরগনা জেলার বজাজ অঞ্চল থেকে এর প্রকাশ। সম্পাদক শেখ রওশন আলী। **মুর্শিদাবাদ সাহিত্য সংকলন**, জনাব ফজলুল হক সাহেবের সম্পাদনায় মুর্শিদাবাদের লালবাগ হতে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। **জাগরণ** দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমসময়ে ৃর্টধমভটফ ষটর তরমর্ভ-এর **মুখপাত্ররূপে** যশোর বনগাঁ হতে প্রকাশিত। সম্পাদক মিঃ মিজানুর রহমান। **বাঙালা একাডেমী পত্রিকা**, গবেষণা মূলক উচ্চাঙ্গের পত্রিকা 'বাংলা একাডেমী'র মুখপাত্ররূপে ঢাকা, বর্ধমান হাউস হতে প্রকাশ হতো। **দীলরুবা** এটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বনামধন্য কবি গোলাম মোস্তফা। **আমাদের দেশ**, এটি বাংলা ভাষায় পূর্ব পাকিস্তানের পাবনা হতে, উর্দুতে পশ্চিম পাকিস্তানের লায়ালপুর হতে এবং ইংরেজিতে লণ্ডল হতে প্রকাশিত হতো। বাংলার সম্পাদক ছিলেন মিঃ এম এ হামিদ-টি কে এম এস সি। **আজিজুন নাহার**, বিখ্যাত সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন সাহেব পরিচালিত এটি এক অনবদ্য সৃষ্টি। **মোজাহেদ**, স্বাধীনতা পূর্ব যুগে মৌলানা আবদুল লতিফ সাহেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের মুখপাত্র। **মোসলেম পতাকা**, এর ধারক ও বাহক ছিলেন পুঁথি লেখায় ও সংগ্রহে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব। ফরিয়াদ, জনাব চৌধুরী আবদুর রহিম সাহেবের সম্পাদনায় কলকাতা হতে প্রকাশিত। **আল হাকিম**, এটি ঢাকা হতে বের হতো। সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত হেকিমী চিকিৎসক হাফেজ আজিজুল ইসলাম সাহেব। **জমজম**, সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষের দিকে কলকাতায় জন্ম। প্রকাশক ছিলেন নূর লাইব্রেরী স্বত্বাধিকারী মোহাঃ মঈনুদ্দিন হোসায়েন সাহেব। সম্পাদক ছিলেন সুসাংবাদিক মৌঃ শামসুর রহমান সাহেব। **হেদায়াত**, কলারোয়া **খুলনা** হতে প্রকাশ হতো। এর প্রচার কর্মী ছিলেন মৌলানা মোয়েজুদ্দিন হামিদী **সাহেব**। **মাহেনও** কবি আবদুল কাদের সাহেবের সুসম্পাদনায় ঢাকা হতে **প্রকাশিত**। এটি খুবই উচ্চস্তরের পত্রিকা হিসেবে প্রশংসনীয়। **সমকাল**, সুখ্যাত **সাহিত্যিক** সেকেন্দার আবু জাফর সাহেবের সম্পাদনায় নাম করা কাগজ। **সংবাদ**, **জনাব জহুর** হোসেন সম্পাদিত ঢাকা হতে প্রকাশিত নামী দৈনিক। **স্বাধিকার**, **এটি জনাব** জোয়াদ আলী সাহেবের সম্পাদনায় কলকাতা হতে

প্রকাশিত হয়েছিল। **বৈভব**, জনাব আবদুল মালিক সাহেবের সম্পাদনায় এর প্রাথমিক উদয় ঢাকায় খৈকরা গ্রামে। **আস্তানা**, জনৈক মুসলমান সম্পাদকের পরিচালনায় আজমীর থেকে প্রকাশ হতো। **পৃথিবী**, এটি ঢাকা হতে প্রকাশ হতো। সম্পাদক ছিলেন জনাব মোহাম্মদ নূর উদ্দিন আহমাদ সাহেব। **দরদী**, স্বাধীনতার পূর্ব যুগে জনাব সৈয়দ জাহিদুল হক সাহেবের সম্পাদনায় ঢাকা হতে বের হতো। **সংহতি**, এটি বর্ধমান হতে প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী মৌলানা নজীরউদ্দিন আহমাদ সাহেবের পরিচালনায় বের হতো। ইনি **'বর্ধমান বাণী'** নামক একখানি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। শিক্ষক সুহৃদ পূর্ব পাকিস্থানের প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুখপাত্ররূপে ময়মনসিংহ হতে প্রকাশিত হতো। সম্পাদক ছিলেন হাজী শেখ আলফুদ্দিন সাহেব। **প্রচেষ্টা**, তরুণ সম্পাদক সমাজ ও সাহিত্য সেবায় উদ্যোগী জনাব আইউব আলী খানের প্রযত্নে প্রকাশিত দামি পত্রিকা। প্রথমে এর নাম ছিল **'প্রান্তিক'** পরে নাম বদল করে রাখা হয় প্রচেষ্টা। **আলো কর**, আনুমানিক বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে ঢাকা হতে মৌলানা এস এম আলী সাহেবের সম্পাদনায় প্রকাশ হতো। **আলোক**, বর্ধমান হতে বের হয়েছিল। এর সম্পাদক ছিলেন মৌলানা আবদুল হায়াত সাহেব। ইনি ইংরেজি Neda-i-Islam নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি সরকারের অধীনে চাকরি করতেন পরে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। কংগ্রেসের এলাহাবাদ অফিসের একটা বিভাগের তিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন। ঐ সময়ে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর সাথে তাঁর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। উর্দু-ইংরেজির ওপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৯৬৬ সালে তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ "Mussalmans of Bengal" ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

এমনিভাবে আরও বহু পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা স্বাধীনতার প্রাপ্তির পূর্বে প্রকাশ করে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিতে মুসলমান মনীষীগণ যেমন আত্মপ্রকাশ করেছিলেন আর স্বাধীনতা বিপ্লবে রক্তাক্ত পরিস্থিতি আর শাসকের আগ্নেয় অস্ত্র ও অত্যাচারের মাঝখানেও এগিয়ে এসেছিলেন পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও মুসলিম লেখক-লেখিকার দল। আর স্বাধীনতার পরেও ভারতের প্রায় প্রতিটি ভাষায় পত্রিকা ও পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশে মুসলিম সমাজ কোনো সময়েই পিছিয়ে নেই। তবে বর্তমানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা 'প্লাসটিকের শাঁখের' মত।

যারা নিজেদের ইতর, অনুন্নত অথবা উপজাতি বংশীয় বলে মনে করে, যারা নিজেরাই জানে না নিজেদের ইতিহাসের ঐতিহ্যপূর্ণ জীবনধারা, যারা ধর্ম গ্রন্থাদি বা আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুত পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদের (দঃ) বিশ্বজনীন বাণীর পূর্ণ সংবাদ রাখে না তারাই তাদের কলমে জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার নামে

>Goto List

শোধনবাদীর সঙ সেজে সহজ-সরল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে উঠেপড়ে লেগেছে। তাদের ধারণা, ধর্ম আলাদা আর সমাজ আলাদা, ধর্ম আলাদা আর রাজনীতি আলাদা, ধর্ম এক বস্তু আর আধুনিক উন্নতির অন্যবস্তু। এটা একটা মারাত্মক মূর্খামি। ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণভাবে পালন করে প্রত্যেকের পক্ষে যেকোন স্তরে নেতা বা আদর্শবান পূর্ণাঙ্গ পূর্ণ নাগরিক হয়ে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব। তাই প্রত্যেকের মনে রাখা দরকার বহুল প্রচলিত প্লাসটিকের শাঁখ শাঁখ নয় বরং শঙ্খ বা শাঁখ খাঁটি জিনিস।

আমাদের দেশের কলমধারী ও অস্ত্রধারী বলে যাঁরা আমাদের কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ও পিতা-মাতা হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম করা যাচ্ছে মাত্র। মহাত্মা গান্ধী জন্ম ১৮৬৯, মৃত্যু ১৯৪৮ খৃঃ। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু জন্ম ১৮৬১, মৃত্যু ১৯৩১। পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু জন্ম ১৮৮৯, মৃত্যু ১৯৬৪। আবুল কালাম আজাদ ১৮৮৮-১৯৫৮। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ১৮৭০-১৯২৫। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ১৮৭৫-১৯৫০। স্যার সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৪৮-১৯২৫। মহাম্মদ আনসারী ১৮৮০-১৯৬৩ রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৮৮৫-১৯৬৩। রাজা গোপালাচারী ১৮৭৯-১৯৭২। লালালাজ পৎ রায় ১৮৬৫-১৯২৮।। সরোজিনী নাইডু ১৮৭৯-১৯৪৯। রাধা কৃষ্ণান ১৮৮৮-১৯৭৫। সৈয়দ আমীর আলী ১৮৪৯-১৯২৯ প্রমুখ। বিচক্ষণ পাঠকদের উপরে জন্ম-মৃত্যুর সালগুলো লক্ষ করলেই প্রমাণ পেতে বাকি থাকবে না যে সকলেই প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন যা বহু পূর্ব হতে যুগ যুগ ধরে চলতে চলতে ১৮৫৭ সালে চরমতম রূপ গ্রহণ করে যেটাকে চক্রান্তকারীরা সিপাহী বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছে। সেই সময় ভারতের জাতির বা স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্মদাতাদের পৃথিবীতে জন্মই হয়নি অথচ কোটি কোটি মানুষকে ভ্রান্তির সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়ানো হয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

এবার আর কিছু কলমনবীস বা বুদ্ধিজীবীদের নাম লিখছি– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম ১৮৬১, মৃত্যু ১৯৪১। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০-১৮৯১। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৪-১৯০৬। রঙ্গলাল ১৮২৭-১৮৮৭। নবীনচন্দ্র সেন ১৮৪৭-১৯০১। যোগীন্দ্রনাথ বসু ১৮৫৭-১৯২৭।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত -নামটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জন্মেছিলেন বাংলা সনের ১২১৮ সালের ২৫ ফাগুন খৃষ্টাব্দ হিসেবে উনিশ শতকেই তাঁর জন্ম। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি বাংলার প্রাচীন কবি, বিশেষত দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের গুরু পথপ্রদর্শক। বাড়ি কাচড়াপাড়া। কেউ কেউ বলেন প্রথমে লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছিলেন এবং চরিত্র দোষেদুষ্ট ছিলেন তাই তাঁর আত্মীয়গণ তাঁর মাত্র পনের বছর বয়সেই বিয়ে দেন কিন্তু স্ত্রীকে তিনি কোনদিন অর্ধাঙ্গিনী হওয়ার সুযোগ দেননি।

আশুতোষ দেব লিখেছেন, 'বাল্যকালে তিনি লেখাপড়ায় আদৌ মনোযোগী ছিলেন না.....১৫ বছর বয়সে তার বিবাহ হয়। পত্নী দুর্গামণি দেবীর সঙ্গে তিনি আজীবন সংসার করেননি.......১২৩৭ বঙ্গাব্দে সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর' বের করেন। ১২৪৬ হইতে দৈনিকরূপে বের হয়। সংবাদ প্রভাকর ছাড়াও 'সংবাদ রত্নাবলী' 'পাষাণ্ড পীড়ন' প্রভৃতি তাঁর পরিচালিত সাময়িক পত্রাদি ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর গুরু।" (দ্রঃ নতুন বাংলা অভিধান, পৃঃ ১১১৫)। বঙ্কিম যে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারী তার প্রমাণে বঙ্কিমের লেখাগুলোই দ্রষ্টব্য "মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালির কবি-ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার কবি, এখন আর খাঁটি বাঙালির কবি জন্মে না জন্মিবার যো নাই-জন্মিয়া কাজ নেই।" (দ্রঃ বঙ্কিমচন্দ্রের ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব)। গুপ্তের আরও দুইজন বিশেষ শিষ্য ছিল যেমন রঙ্গলাল, দ্বারকানাথ অধিকারী। উপরোক্ত চারজন শিষ্যের মধ্যে বঙ্কিম ভারত সম্মানের উচ্চতম শৃঙ্গে উপবিষ্ট আর সাহিত্য সম্রাট উপাধিপ্রাপ্ত এবং তিনি নাকি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজরোপক। তাই তাঁর রচিত বন্দেমাতরম গীত যেন সারা ভারতের মূলমন্ত্র। তাই আমরা ভারতবাসী তাঁর লেখা ইউনিভারসিটির সর্বোচ্চ শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীদের কত কায়দায় কত ব্যাখ্যায় পড়ি পড়াই যা হয়ত বঙ্কিম নিজেও জানতেন না।

এখন গুরুদেব পথপ্রদর্শক ঈশ্বর গুপ্তের কিছু লেখার নমুনা দেওয়া দরকার অবশ্য এই গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠায় দীনবন্ধু ও গুপ্তের লেখায় দুটি উদাহরণ দেওয়া আছে।

একেবারে মারা যায় যত চাপ দেড়ে।
হাঁস ফাঁস করে যত প্যাঁজ খোর নেড়ে।।
বিশেষতঃ পাকা দাড়ি পেট মোটা ভুড়ে।
রোদ্র গিয়া পেটে ঢোকে নেড়া মাথা ফুঁড়ে।।
হ্যাদু বাড়ী খেনু ব্যাল, প্যাটেতে মাখিনু ত্যাল
নাতি তবু নিদ নাহি হয়।
এঁদে দেয় ফুফু নানী, কলুই ডেলের পানি,
ক্যাঁচা ক্যালা কেচুর ছালন।।
আসমানে পানি নাই প্যোঁজিতে কি ন্যোখে ভাই
বরাম্মনে পুছকর গিয়া।........

মুসলমান বিদ্বেষের উদাহরণ মুসলমানদের জন্য আর প্রয়োজন নেই এইটুকুই যথেষ্ট। দেশপ্রেমিক অমুসলমান শিক্ষিত পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি মুসলমানরা যখন সারা ভারতে মরা ও মারার ভূমিকায় উন্মত্ত যখন সারা ভারতে সৈন্যদের মধ্যেও বিদ্রোহের দাবানল হুহু করে জ্বলছে তখন তিনি লিখলেন, 'কয়েকদল অধার্মিক অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হিতাহিত বিবেচনাবিহীন এতদ্দেশীয় সেনা

অধার্মিকতা প্রকাশপূর্বক রাজবিদ্রোহী হওয়াতে রাজ্যবাসী শান্ত স্বভার অধন সধন প্রজা মাত্রেই দুঃখিত" ইত্যাদি।

তিনি আরও লিখেছেন, 'যবনাধিকারে আমরা সর্বদাই স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হই নাই. সর্বদাই অত্যাচার ঘটানো হইত। ...এক্ষণে ইংরাজাধিকারে সেই মনস্তাপ একে কালেই নিবারিত হইয়াছে। আমরা অনায়াসেই 'চার্চ' নামক খৃষ্টীয় ভজনা মন্দিরের সম্মুখেই গভীর স্বরে ঢাক, ঢোল, কাড়া, তাসা, নহবৎ, সানাই, তুরী, ভেরী, বাদ্য করিতেছে, ছ্যাডাং শব্দে বলিদান করিতেছি, নৃত্য করিতেছি, গান করিতেছি, প্রজা পালক রাজা তাহাতে বিরক্ত মাত্র না হইয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। মুসলমান জাতি যখন যুদ্ধরত এবং হিন্দুদের দরজায় দরজায় যুদ্ধের করুণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তখন ঐ লেখক, কবি ও কয়েকটি পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক হিন্দু জাতির উদ্দেশে লিখলেন,"জগদীশ্বর আপন ইচ্ছায় বিদ্রোহী দিগে শাসন করুন। যাহারা বিদ্রোহী হন নাই তাহাদিগের মঙ্গল করুন, কোন কালে যেন তাহাদের রাজভক্তির ব্যক্তিক্রম না হয়। হে ভাই! আমাদের শরীরে বল নাই, মনে সাহস নাই, যুদ্ধ করিতে জানি না। অতএব প্রার্থনাই আমাদের দুর্গ, ভক্তি আমাদের অস্ত্র এবং নাম জপ আমাদিগের বল এত দ্বারাই আমরা রাজ সাহায্য করিয়া কৃতকার্য হইব।" ঐ সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫৭ সালে যখন হাজারে হাজারে মানুষ আয দির জন্য মরছেন ও মারছেন মে মাসের বিশ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে লিখলেন একটি মনমাতানো কবিতা, "চিরকাল হয় যেন বৃটিশদের জয়, বৃটিশের রাজলক্ষ্মী, স্থির যেন রয়।" আরও লেখা হয়েছে "উত্তর পশ্চিম প্রদেশের যে সকল স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তাবত স্থানেই যবনেরা অস্ত্র ধারণ পূর্বক নিরাশ্রয় সাহেব বিবি, বালক বালিকা এবং প্রজাদিগের প্রতি হৃদয় বিদীর্ণ কর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছে.....যবনদিগের অন্তঃকরণে কী কারণে গভর্নমেন্টের প্রতি বিরূপ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা আমরা কিছুই নিরূপণ করিতে পারিলাম না।" (দ্রঃ সংবাদ প্রভাকর ২৯-৬-১৮৫৭)। মুসলমানদের ওপর যখন যথেষ্টভাবে ইংরেজ গুলি করে পাইকারিভাবে হত্যা করতে লাগল তখন সমবেদনা বা মৌনতার বদলে লেখা হয়েছিল "বন্য পশু শিকার নিমিত্ত শিকারিগণ পরমানন্দে দলবদ্ধ হইয়া গমন করে শেতাঙ্গ সৈন্যগণ সেই রূপ পুলকিতচিত্তে সিপাহি শিকারে গমন করিতেছে, নরাধম অকৃষ্ণদের আর রক্ষা নেই। (দ্রঃ ২২-৬-১৮৫৭, সংবাদ প্রভাকর) তাতীয়াতোপী নানা সাহেব ও ঝাঁসীর রাণী তিনজনই অন্তত মুসলমান নন তবু সে যুগের ঐ রকম সম্পাদক আর অধীন কবি সাহিত্যকের দল তাঁদেরও বিরাট অপরাধ আবিষ্কার করেছিলেন তা হচ্ছে জগদ্বীশ্বর ইংরেজ সরকারের সঙ্গে লড়াই করা আর ইংরেজদের ছেলেমেয়েদের হত্যা করা। তাই লেখা হয়েছিল-নানা পাপে পটু 'নানা' নাহি শুনে না, না।

>Goto List

অধর্মের অন্ধারে হইয়াছে কানা।।
ভাল দোষে ভাল তুমি ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু শেষে দেখ ফাঁদ।।

এমনিভাবে ঝাঁসীর রাণীর রক্তাক্ত মৃত্যুর উপর যে কৌতুকময় কলঙ্ক সীমাহীনভাবে আরোপ করা হয়েছে তা কোন শিক্ষিত মানুষ ক্ষমা করতে পারে না। যথা-

"হ্যাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসীর রাণী
ঠোঁট কাটা কাকী।
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি।
নানা তার ঘরের ঢেকি।
হয়ে শেষে নানার নানী মরে রাণী
দেখে বুক ফাটে
কোম্পানীর মূলকে কি বাবুগিরি খাটে!"

আগেই বলা হয়েছে মুসলমানদের সঙ্গে কতক হিন্দুও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাই সেই সময় প্রচারিত হল "নানা পাপে নানা দণ্ডতার লবে। এ বলে কি হিন্দু মাত্রে দোষী হয়ে রবে? বিশেষ বাঙ্গালী ভেতো আমরা সবাই কোন কালে কোনরূপ দোষমাত্র নাই। জয় হোক বৃটিশের, বৃটিশের জয়, রাজ অনুগত যারা তাদের কি ভয়!"

১৮৫৭ সালে ঐ ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে সংবাদ প্রভাকরে রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি জানানো হল "এই ভারত কিসে রক্ষা হবে ভেবনা মা সে ভাবনা। সেই "তাতীয়াতোপীর" মাথা কেটে আমরা ধরে দেব "নানা"।। এইবার শেষ করছি সাংঘাতিক সংবাদ দিয়ে- স্বাধীনতা বিপ্লবী বন্দিদের যখন ফাঁসি হতে লাগল তখন "সংবাদ প্রভাকর" ইংরেজ সরকারকে সন্তুষ্ট হয়ে সাবাস দান করতেও এতটুকু লজ্জাবোধ করেননি (দ্রঃ ২২-৬-১৮৫৭ ঘোষ, পৃঃ ২৪৩ সংবাদ প্রভাকর)।

উপরের এত কাণ্ড পড়ার পর ঈশ্বর চন্দ্র সম্বন্ধে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমের একটি বিশুদ্ধ মন্তব্য।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু যেসব কথা লিখেছেন তার তিন টুকরো কথা এখানে উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে। (১) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খাঁটি জিনিস বড় ভাল বাসিতেন, মেকির বড় শত্রু; (২) অনেক সময়েই (কবির) ইয়ারকি বিশুদ্ধ........পরের প্রতি বিদ্বেষ শূন্য এবং..................। (৩) এতটা প্রতিভা ইয়ারকিতেই ফুরাইল।" (দ্রঃ আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পৃঃ ২৩০)।

সুধী সমাজই বিচার করবে গুপ্ত কতটুকু বিদ্বেষ শূন্য? আর বঙ্কিম বাবু কতটুকু সত্যবাদী?

বঙ্কিমচন্দ্র ঃ- বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন আর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মারা যান। ৩৮ অব্দে জন্ম হিসেবে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তরুণ বা পূর্ণ যুবক ছিলেন। আর সেই সময় সহস্র সহস্র যুবক স্বাধীনতা আন্দালনে ঝাঁপ দিয়ে গর্বের ইতিহাস সৃষ্টি করতে চাইছিলেন কিন্তু সেখানে বঙ্কিমের ভূমিকা নেগেটিভ না পজেটিভ তা আজ বিচার করতে বাকি নেই তবুও যতদিন সরকারি সাহায্যে বঙ্কিম একজন ঋষি, তিনি একজন সাহিত্য সম্রাট, তিনি একজন ভারতের স্বাধীনতার প্রথম শ্রেণীর জন্মদাতা বলে খ্যাতি লাভ করেছেন তাইতো তাঁর লেখা 'বন্দেমাতরম' আওয়াজ ভারতের আকাশে-বাতাসে হুঙ্কার ছাড়ে।

কিন্তু ঋষি বঙ্কিম ইংরেজি শিক্ষায় এবং তাদের অন্ধ অনুকরণে উন্নতি করে একেবারে ভগবান ইশ্বর ঠাকুর দেবতা সব কিছু অস্বীকার করে নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলেন ('শ্রীম শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথা মৃত খণ্ড ৫,১৩৭১ বঙ্গাব্দ। ২১৪ পৃঃ। রামকৃষ্ণ ও বঙ্কিমের কথোপকথনে বিবরণ দ্রঃ)। অবশ্য পরে তিনি আস্তিক হয়ে এবং আরও উন্নতি করে মুসলমানবিদ্বেষী হয়ে ইংরেজের অত্যন্ত অনুগত হয়ে পড়েন। ঈশ্বর গুপ্তকে লেখার দিক দিয়ে গুরু বলে মেনে নিন এবং গুরু ভাইদের মত নবীন চন্দ্র সেন, চন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি রক্ষণশীল হিন্দুর 'নব জীবন' পত্রিকায় নিজেকে যুক্ত করেন। বঙ্কিম স্বীকার না করলেও আসলে তিনিও রামমোহনের অনুসরণকারী ছিলেন। কিন্তু কাউকে নিজের গুরু বলে মেনে নেওয়ার মত উদারতা তাঁর ছিল না। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও যেমন তাঁর বাধেনি, তেমনিভাবে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর ঠাণ্ডা লড়াই হয়েছিল। বঙ্কিম বুঝেছিলেন তাঁর নাস্তিকতার পড়তা ভাল নয়। কারণ রামমোহন আস্তিক হয়ে ইংরেজ দরদি হওয়া দেশের লোকের কাছে ততটা খারাপ লাগতো না যতটা খারাপ লাগতো নাস্তিক অবস্থায় বঙ্কিমের ইংরেজপ্রেমিক হওয়া। তিনি আরও লক্ষ্য করেছিলেন, রামমোহন মরেও অমর থাকবেন নতুন ধর্ম মত ব্রক্ষ ধর্মের স্রষ্টা হিসেবে। অথচ ইংরেজ সৃষ্ট ইংরেজি শ্রেণী সকলেই তখন ব্রাহ্ম ধর্মে আকর্ষণ কিন্তু প্রাচীনপন্থীগণ ঠাকুর দেবতাদের পরিত্যাগ করতে খুব দ্বিধাবোধ করছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি হিন্দু ধর্ম আর ব্রাহ্ম ধর্ম মিলিয়ে নতুন ধর্ম সৃষ্টি করলেন, যেটার নাম "অনুশীলন ধর্ম"। কিন্তু সত্য কথা বলতে হলে বলতে হয়, ওটা ব্রাহ্ম ধর্মের বাচ্চা ছাড়া কিছু নয়। (বিপিনচন্দ্র পালের "নব যুগের বাংলা" ১৩৬৪,. পৃঃ ১৯০)।

অনেকে বলেন বঙ্কিম আসলে অত্যন্ত সুবিধাবাদী আত্ম প্রচারক ও পরশ্রীকাতর ব্যক্তি। তাই তিনি ব্রাহ্ম ধর্মকে কাঠামো করে প্রাচীন হিন্দুদের ব্রাহ্ম ধর্মে যেসব আপত্তিকর সুর ছিল যথা-বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ রোধ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, মূর্তি পূজার বিলোপ সাধন ইত্যাদি। এইসবের সপক্ষে ওকালতি আরম্ভ করলেন ফলে সেকেলে লোকগুলো সহজেই তাঁর করতলগত হয় আর আধুনিক

লোকরাও চিন্তায় পড়ে গেলেন কী করা যায়। অত্যন্ত দুঃখের কথা ব্রাহ্ম ধর্মে 'ছোট লোক' 'ভদ্র লোকের' ব্যবধান দূর করে যে মিলনের পথ রচিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর আবার ছোট লোককে ছোট লোক করে বাকিদের ভদ্রলোকের পাক্কা সার্টিফিকেট ধর্ম হতেই বিতরণ করলেন (দ্রঃ সৌরেন্দ্র মোহনের বাঙ্গালীর রাষ্ট্র চিন্তা পৃঃ ১০৮) রবীন্দ্রনাথ যে বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করে বলেছিলেন, "তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা" তিনি আরও বলেন "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন, তৎপূর্বে বাংলা ভাষার প্রথম সূচনা হইয়াছিল কিন্তু তিনিই সর্ব প্রথমে বাংলা গদ্যে কলা নৈপুণ্যের অবতারণা করেন.....গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে ভদ্র সমাজের সবার উপযোগী আর্য ভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়েছেন।"

বঙ্কিমও তাই সুরে সুর মিলিয়ে বলেছিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর .....বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই আর পরেও পারে নাই। (দ্রঃ বাংলা সাহিত্যে প্যারী চাঁদ মিত্রের স্থান-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) যে হাতে বঙ্কিম লিখলেন "আগে ও পরে পারেন নাই' সেই হাতেই সুস্থ মস্তিষ্কে লিখলেন, 'বিদ্যাসাগর কঠিন সব সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করে বাংলা ভাষার ধাপটা খারাপ করে গেছেন।" বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত বই 'সীতার বনবাস'-এর জন্য তিনি "কান্নার জোলাপ ব্যতীত" কিছুই নয় বলেছেন।

বিদ্যাসাগরের মত লোককেও তিনি মূর্খ বলতে লজ্জাবোধ করেননি। (দ্রঃ বঙ্কিম'চন্দ্র বিষবৃক্ষ। বঙ্কিম রচনাবলী সাহিত্য সংসদ। প্রথম খণ্ড পৃঃ ২৭৯) বঙ্কিমের সাধারণ ভদ্রতা কতটুকু ছিল বিচারের জন্য আর একটি লেখা দেওয়া হচ্ছে-"ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবার বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহ দেয় সে যদি পণ্ডিত হবে তবে মূর্খ কে?" (দ্রঃ অধ্যাপক বদরুদ্দিনের ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ দ্রষ্টব্য)।

মুসলমান জাতির ক্ষতি করেও হিন্দু জাতিকে উন্নতি করতে হবে এই কথাটি কারো মগজে থাকলেও অন্তত কাগজে প্রকাশ করতে ন্যূনতম সভ্যতাতেও বাধা পড়ে। কিন্তু বঙ্কিম লিখলেন, "হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গল মাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয় আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতি পীড়ন করিতে হয় করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে। হয় হউক, আমরা সেজন্য আত্ম জাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না। পর জাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়; তাহাও করিব।" (দ্রঃ বঙ্কিম রচনাবলী, পৃঃ ২৩৯,২ খণ্ড)।

>Goto List

ইংরেজ সারা ভারতের জন ও গণশক্তিতে শক্ত কঠিন হাতে ভারতীয় সাঁড়াশি দিয়ে চেপে চেপে তিলে তিলে শোষণ করতো। ভারতীয় সাঁড়াশি ছিল আমাদের দেশের অধিকাংশ দালাল জমিদার। কিন্তু সেই জমিদারের তথা ইংরেজদের পরম প্রিয় ঋষী মহাশয় লিখলেন, সকল জমিদার অত্যাচারী নহেন, দিন দিন অত্যাচারী জমিদারের সংখ্যা কমিতেছে। কলিকাতার সুশিক্ষিত ভূস্বামীদিগের কোন অত্যাচার নাই, যাহা আছে তা তাহাদের অজ্ঞাতে এবং অভিমত বিরুদ্ধে নায়েব গোমস্তা দ্বারা হয়।..........

"আমরা জমিদারের দ্বেষক নহি। কোন জমিদার দ্বারা কখনও আমাদের অনিষ্ট হয় নাই বরং অনেক জমিদারকে আমরা প্রশংসাভাজন বিবেচক মনে করি।" (দ্রঃ বঙ্কিম রচনাবলী, ২ খণ্ড পৃঃ ২৯২) জমিদার মহারাজাদের ভূমিকা প্রথম আযাদী আন্দোলনের আলোচনায় এক এবং সিরাজউদ্দৌলাকে অপসারণের বিষয়ে বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বঙ্কিম নিজেই একজন কলিকাতার সুশিক্ষিত ভূস্বামী" বা জমিদার ছিলেন (দ্রঃ অধ্যাপক বদরুদ্দিন উমরের লেখা)।

সারা ভারতের প্রকৃত গরিব দরদিরা এমনকি জমিদার বংশের সৎ সন্তানরাও প্রকৃত শিক্ষিত হওয়ার পর জমিদারি প্রথার বিরোধী হয়েছেন তার অনেক নজির আছে।

কিন্তু শিক্ষিত বঙ্কিম বললেন, "যাহারা জমিদারদিগকে কেবল মিথ্যা নিন্দা করেন আমরা তাঁহাদের বিরোধী। জমিদারদের দ্বারা অনেক সৎকার্য হইতেছে। (বঙ্কিম রচনাবলী পৃঃ ২৯৭)। জমিদারদের হাতে যতক্ষণ শক্তি থাকত ততক্ষণ খাজনা আদায়ের নামে তাদের বিলাসিতা ও ভোগবিলাসের খরচাও আদায় করা হতো। ঐ জমিদারি ইংরেজ সরকার চিরস্থায়ীভাবে জমিদারদের দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ঐ ঐতিহাসিক কুখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে বৃহত্তম দরিদ্র শ্রেণী, শোষিত শ্রেণী বা প্রজাশ্রেণী সরকারের বিরুদ্ধে মৃদুমন্দ গুঞ্জন আরম্ভ করতেই বঙ্কিম বাণী অবতীর্ণ হতে বিলম্ব হলো না। "..........চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গ সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি।"

বিশেষ যে ব্যবস্থা ইংরেজরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারত মণ্ডলে মিথ্যা বাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাস ভাজন হয়েন এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরেজদের দিই না। যেদিন ইংরেজদের অমঙ্গলোকাঙ্ক্ষী হইব সেই দিন সেই পরামর্শ দিব।" (দ্রঃ ঐ পৃঃ ৩১০)। ইংরেজদের ইঙ্গিতে জমিদারদের প্রজা পীড়নের বিরুদ্ধেও তিনি কিছু বলতে পারতেন কিন্তু তিনি লিখেছেন উল্টো– "অনেক জমিদারের প্রজারাও ভাল নহে। পীড়ন না করিলে খাজনা দেয় না। সকলের ওপর নালিশ করিয়া খাজনা আদায় করিতে গেলে জমিদারের সর্বনাশ হয়।" (দ্রঃঐ পৃঃ ২৯৮)

উপরোক্ত তথ্যগুলোতে আধুনিক গবেষকরা প্রমাণ করতে সক্ষম হতে পারেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে মুসলমানবিদ্বেষী জমিদার হিসেবে জমিদারের পক্ষীয় লোক ছিলেন বা পরশ্রীকাতর বা মিথ্যাবাদী ছিলেন কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন প্রমাণিত হওয়া কঠিন। কিন্তু ঐ অপরাধই হচ্ছে তাঁর ঐতিহাসিক অপরাধ, অবশ্য যদি প্রমাণের অভাব না হয়।

স্বদেশী আন্দোলনে যখন চারদিকে বিলিতি জিনিসপত্র ব্যবহার করা বন্ধ করার নীতি প্রচারিত ও প্রচলিত হতে থাকে সেই সময় ইংরেজরা খুব ভীত হয়ে ওঠে, যেহেতু তাদের ব্যবসার নামে শোষণের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ওটা।

তখন ইংরেজপ্রেমিক বঙ্কিম লিখলেন, "যদি (ইংরেজরা) কাহারো ক্ষতি না করিয়া মুনাফা করিয়া থাকে তবে তাহাতে আমাদের অনিষ্ট কী? যেখানে কাহারো ক্ষতি নাই সেখানে দেশে অনিষ্ট কী? আপত্তির মীমাংসা এখনো হয় নাই, আপত্তিকারকেরা বলিবেন যে, ঐ ছয়টি টাকায় দেশী তাঁতীর কাছে ধান কিনিলে টাকা ছয়টা দেশেই থাকিত।..........স্থূল কথা, ঐ ছয় টাকা যে দেশী তাঁতী পাইল না তাহাতে কাহারো ক্ষতি নাই। তার্কিক বলিবেন তাঁতীর ক্ষতি আছে। এই থানের আমদানির জন্য তাঁতীর ব্যবসা মারা গেল। তাঁতী থান বুনেনা ধুতি বুনে। ধুতির অপেক্ষা থান সস্তা সুতরাং লোকে থান পরে ধুতি আর পরে না। এজন্য অনেক ব্যয়সায়ী লোপ হইয়াছে।"

"উত্তর। তাহার তাঁত বুনা ব্যবসা লোপ পাইয়াছে বটে, সে অন্যকিছু করুক না কেন? অন্য ব্যবসায়ের পথ রহিত হয় নাই। তাঁত বুনিয়া আর খাইতে পারে না, কিন্তু ধান বুনিয়া খাইবার কোন বাধা নেই।

(দ্রঃ বঙ্কিম রচনাবলী ২ খণ্ড পৃঃ ৩১১-৩১২)

গ্রন্থে কলেরর বৃদ্ধির ভয়ে কোন বিষয়েরই পূর্ণ তথ্য পরিবেশন সম্ভব নয় তবুও বঙ্কিম ইংরেজকে শোষক মনে করতেন না তাই ইংরেজদের শোষণের একটু চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে টাকায় ১ মণ ৫ সের চাল পাওয়া যেত। ১৮১৪ সালে শোষণের ফলে টাকাপ্রতি মাত্র ৩৭ সের চাল পাওয়া যেত। ১৮২১ সালে আরও শোষণে টাকায় ৩০ সের হয়। ১৮৩৫ সালে টাকায় ২৪ সের চাল। ১৮৭৫ সালে টাকায় ১৭ সের চাল। ১৯২৫ সালে এসে দাঁড়ায় টাকায় সাড়ে চার সের চাল মাত্র।

আমাদের দেশের কাপড় প্রস্তুত কারকদের বংশ ধ্বংস করার জন্য কি পরিমাণ আমদানি করা হয়েছে তা একটু দেখা যাক, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিলেতি কাপড় খুব একটা আসেনি। কিন্তু ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আট লক্ষ গজ কাপড় কলকাতায় পৌঁছায়। ১৮২১ সালে একেবারে দুই কোটি গজ। ১৮৩৫ সালে পাঁচ কোটি গজ। ১৮৭৫ সালে আনা হয় একষট্টি কোটি গজ। ১৯২৫ খৃঃ একেবারে বিলেতি কাপড়ের পাহাড় এসে পরিমাণ হয় এক অর্বুদ ছাপান্ন কোটি গজ।

এইবার ভারতকে শোষণ করে কী পরিমাণ বিলেতে নিয়ে যেত তার **পরিমাণ দেখলেই** বুঝতে সহজ হবে কেন বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ মণ চাল ভারত হতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ৩ কোটি ৫০ লক্ষ মণ গম আর দেড় কোটি মণ তুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাট আড়াই কোটি মণ আর চা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৩৬ লক্ষ মণ। (দ্রঃ মায়ীশাতুল হিন্দ পৃঃ ৯৫)

উপরোক্ত হিসাব ছাড়াও ভারতের বাইরে ১৯১৮ হতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মাঝে আরও ৫৬ কোটি ৫০ লক্ষ মণ চাল পাচার হয়ে যায়। (বর্ণনাকারী শ্রী দয়াশংকর দোবে, "মজলুম কিষাণ" পৃঃ ৮২)

এগুলো জানার পর এইবার মহামতি ঋষি বঙ্কিমের উপরের ওকালতিগুলো এবং নিচের উদ্ধৃতিগুলো পড়লেই অনুসন্ধিৎসুরা তাঁদের কর্তব্য ঠিক করবেন। বঙ্কিম বলেন, "বাণিজ্য বিনিময় মাত্র। আমরা যদি ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রাদি লই তার বিনিময়ে আমাদের কিছু সামগ্রী ইংল্যাণ্ডে পাঠাতে হবে নইলে আমরা বস্ত্র পাব না। আমরা কি পাঠাই? অধিকাংশের বিনিময়ে আমরা কৃষিজাত দ্রব্য যথা চাল, রেশম, কার্পাস, পাট, নীল ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, যে পরিমাণের বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে সেই পরিমাণ এই সকল কৃষিজাত দ্রব্যাদির আধিক্য আবশ্যক হইবে। সুতরাং দেশে চাষীও বাড়বে। বৃটিশ রাজ্য হইয়া পর্যন্ত এদেশের বাণিজ্য বাড়তেছে সুতরাং বিদেশে পাঠানোর জন্য বছর বছর অধিক কৃষিজাত সামগ্রীর আবশ্যক হইতেছে। অতএব এদেশে প্রতি বছর চাষ বাড়তেছে। চাষ বৃদ্ধির ফল কী? দেশের ধন বৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি।"

(দ্রঃ বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৩)

অতএব বঙ্কিমের মুসলমান বিদ্বেষ আসলে ইংরেজদের পদ সেবার নামান্তর। ইংরেজ চেয়েছিলো কৃষক বা প্রজাদের শোষণ আর মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি। তাই তাদের স্বার্থেই করতে হয়েছিল কলকাতায় বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়। আর তারই ভেতর থেকে বাছাই করা ডিগ্রী পাওয়া দালাল নির্ধারণ। বঙ্কিম উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজ প্রেমিক ও ভারতের ক্ষতিকারক হিসেবে শীর্ষ স্থানীয়রূপে উল্লেখযোগ্য কি না তা বিচার করিতে কাঠিন্য নেই।

তাই অধ্যাপক বদরুদ্দিন উমর লিখেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র যে শুধু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট ভূমি ব্যবস্থা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার স্বার্থ ও সংস্কারের **রক্ষক** ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলে প্রতিক্রিয়ার সর্ব **প্রধান** প্রতিনিধি......। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য প্রচেষ্টা একদিকে যেমন **নিযুক্ত ছিল** কৃষক স্বার্থের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে তেমনি তা সমান নিষ্ঠার সাথে **নিযুক্ত ছিল ঈশ্বর** চন্দ্রের সমগ্র চিন্তা ও সংস্কারের আন্দোলনের বিরুদ্ধে।" (**ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর** ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, পৃঃ ১০৫-১০৬)।

সাধারণ হিন্দুদের নিকট তিনি ঋষি উপহার পেলেও আসলে ওটা ইংরেজদেরই দেওয়া পরোক্ষ উপাধি। তিনি আসলে ইংরেজ শাসককেই দেবতা বলে জানতেন। "তাই বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম একত্র হইবে সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে।

(বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, সৌরেন্দ্র, পৃঃ ১০২)

ইতিহাসে যেটাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলা হয়েছে সেই বিপ্লবে যারা যোগ না দিয়ে বিরোধিতা করেছে তারা যদি নেতা হয় যারা নীলকরদের অত্যাচারকে সমর্থন করেছে তারা যদি নেতা হয় তাহলে দেশের শত্রু কারা তা বলা খুবই কঠিন।

সৌরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাই ঋষি মহাশয়ের জন্য লিখেছেন, "বাংলার সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের মতো তিনিও সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করেননি। আবার দীনবন্ধু মিত্রের একান্ত বান্ধব বঙ্কিমচন্দ্র নীলকরদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেও সে বিষয়ে নীরব থাকেন।"

(বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃঃ ১১৪)

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা 'উপরোক্ত সমকালীন বুদ্ধিজীবী' বলতে কাদের বলা হয়েছে? যে কথা আগেই জানানো হয়েছে সারা ভারতের বিপ্লবের অবস্থা বা প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনে নানা স্থানের জঙ্গি ভূমিকার আত্মত্যাগের কথা, কিন্তু কলকাতা নীরব ছিল কেন? তার একমাত্র কারণ আশুতোষ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ বিরাট প্রতিভাধারী ব্যক্তিরা শোষক সরকারের ডিগ্রিপ্রাপ্ত শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সরকার চাকরি দিয়ে, উপাধি দিয়ে, বশে রেখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ দর্শন' পত্রিকা একটি ছেলে ধরার ফাঁদ ছিল বলা যেতে পারে। ' 'বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনকে ঘিরে যেসব জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ ঘটে তাঁদের মধ্যে ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদাস সেন, ভূদেব মখোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমুখ চিন্তানায়ক।"

তাই 'বঙ্গ দর্শনের' জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বঙ্কিমের 'বঙ্গ দর্শন' আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল।" অতএব প্রমাণ হতে বাকি নেই যে, অখণ্ডিত ভারতের রাজধানী কলকাতার বিপ্লবের বিরাট বহ্নি শিখাগুলোকে ছাই-এর মত ঢেকে রেখেছিলেন তদানীন্তন উচ্চশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ। (রবীন্দ্র রচনাবলী, পঃ সরকার প্রকাশিত সংস্করণ, খণ্ড ১০, পৃঃ ৫৫) বঙ্কিম যে কোন্ তন্ত্র অবলম্বন করেছিলেন তা এক কথায় বলা শক্ত। প্রথম জীবনে আস্তিক পরে নাস্তিক তার পরে আবার আস্তিক তারপর আবার ঋষি। তিনি একদিকে বলছেন, "সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ, ঈশ্বর ভিন্ন আর কেউ নেই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের

>Goto List

আদর্শ হইতে পারেন না।" আরও বলেছেন, "জগদীশ্বর এক ছিলেন, বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন" আবার তিনিই এই মত পোষণ করতেন যে, " ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনটি পৃথক সত্তায় তিনি বিভক্ত। সেই ত্রিসত্তার একজন করেন সৃজন, অন্যজন পালন করেন ও অপর জন ধ্বংস করেন।"

(দ্রঃ বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তা, সৌরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় পৃঃ ১১৬-১১৭)

আবার ঐ বঙ্কিমই যা দেখা যায় না ভাববাদ বা কল্পনাবাদ একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, সকল প্রমাণের মূল"। আবার তাঁরই লেখা 'ধর্মতত্ত্বে' তিনি পাগলের প্রলাপের মত লিখলেন, "সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে"। (দ্রঃ ঐ) এই প্রলাপের ওপর প্রলেপ চড়িয়ে বলতে দ্বিধা করলেন না "এই সকল মত এখন আমি পরিত্যাগ করিয়াছি"।

কমিউনিস্টরা তাঁকে গোঁড়ার চেয়ে গোঁড়ামিতে শীর্ষস্থানীয় মনে করলেও ভারতীয় কংগ্রেস কর্মীরা বোধহয় তাঁকে এক নম্বর খাঁটি কংগ্রেসী মনে করবেন তারও উপায় নেই। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস মহলে তিনি একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন যার অর্থ কংগ্রেসীদের তিনি বিশ্বাস করতেন না যথা "......কিন্তু যে প্রণালীতে উহার কার্য পরিচালিত হইতেছে আজ পর্যন্ত উহা সাধারণে যোগদানের উপযুক্ত হয়নি। উহার সমস্ত আন্দোলন যেন ক্ষণস্থায়ী ও অন্তসার শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।" (দ্র: ঐ)

ঐ বঙ্কিমই আবার ঠাকুর দেবতার কথা উল্টিয়ে দিয়ে সমাজকেই দেবতা বলেছেন, যেমন "সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ড প্রণেতা, ভরণ-পোষণ ও রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে।" (বঙ্কিম রচনাবলী, ২খণ্ড পৃঃ ৬৭১ ধর্মতত্ত্ব)। কিন্তু ঋষি একথা বলার সময় হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন যে সমাজের বৃহত্তর অংশ মুসলমান জনগণ ও হরিজন।

সাম্যবাদের গতি কোন দিকে বইবে সঠিক বুঝতে না পেরে তিনি ১৮৭৩ খৃঃ হতে ৭৫ পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শনে' সাম্যবাদের পক্ষে অনেক বাণী দান করেন। অবশ্য মুসলমান নিধন আর ছোট লোক নির্ধারণে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান থাকলেও তিনি অনেকের কাছে সাম্যবাদী। "পরে গ্রন্থাকারে (বঙ্কিম) সেগুলো প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন যে ঐ বিষয়ে তাঁর মতে পরিবর্তন ঘটে। তাঁর বহুরূপী চরিত্রের বিচিত্রতা বেশি হলেও ঋষি উপাধি নেওয়ার দারুণ শখ্ তাঁর মনের মধ্যে ছিল তাই তিনি নিজেই তার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই তিনি লিখেছেন, "প্রাচীন ঋষি ও পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্যাদা ও অনাদর করিবে না............. আমিও সেই আর্য ঋষিদের পদারবিন্দ ধ্যান পূর্বক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি।" (দ্রঃ ঐ)

বঙ্কিম আসলে মিঃ কোঁৎ-এর মতাবলম্বী ছিলেন কিন্তু বাজারে চাহিদার সাথে তিনি ঘনঘন মত পরিবর্তনে খুব পটুতা প্রদর্শন করেছেন। মত পরিবর্তের পরিমাণ এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে ঋষির অমর্যাদা করা হলেও অন্তত অল্প বিস্তর প্রতিবাদের ঝড় বইতে শুরু হয়, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম তাঁর বাণী বর্ষণ করলেন " আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি, কে না করে? মত পরিবর্তন বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। যাহার কখনও মত পরিবর্তন হয় না তিনি হয় অভ্রান্ত, দৈব্যজ্ঞানবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন।"

বিশেষত বাঙালীরা বঙ্কিমকে নানা কারণে শ্রদ্ধা করে আসছেন। কিন্তু যাঁর বন্দেমাতরম মন্ত্র ভারতের মাটিতে সর্বত্র প্রচারিত যাঁর 'আনন্দ মঠ' পুস্তক স্বাধীনতা যুদ্ধের বেদ, তাঁর একটু ইঙ্গিত হলে ভারতের সর্ব ভারতীয় ভাষা বাংলাই হতো কিন্তু বাংলা, উর্দু, হিন্দি কোন ভারতীয় ভাষার জন্য তিনি সুপারিশ না করে ইংরেজিকেই তিনি সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে মত প্রকাশ করেন। (দ্রঃ বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃঃ ১৪৩)

ভারতের পলিটিক্যাল বেদ আনন্দ মঠকে অনেকে ভক্তি শ্রদ্ধার ভাষার ভারে ভারাক্রান্ত করে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও বিপ্লবাত্মক বই বলে মনে করেন কিন্তু স্বাধীনতার প্রকৃত প্রথম বিপ্লব ১৮৫৭ তে প্রথমাঙ্ক শেষ হয়, তখন তিনি নীরব! তাঁর আনন্দ মঠ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে।

যাঁরা আনন্দ মঠকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন তাঁরা ভ্রান্ত না বঙ্কিম ভ্রান্ত তা বোঝার সুবিধার জন্য মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, 'রাজসিংহ' বই 'আনন্দমঠের' পরে প্রকাশ হয়। তাতে তিনি ভূমিকায় লিখেছেন "পরিশেষে বক্তব্য যে আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। ....এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।" অনত্রে আরও বলেন, "ইংরেজ ভারতের পরম উপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নতুন কথা শিখাইতেছে যাহা আমরা কখনো জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে। যাহা কখনো দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখনো চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজদের চিন্তাভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুটি আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।"

(বঙ্কিম রচনাবলী,পৃঃ ২৪০-১)

অথচ তিনি ভারতের প্রাচীন ঋষিদের পথে চলছেন বলে ঋষি উপাধি পেলেন কিন্তু তিনিই জানাচ্ছেন তাঁর নয়, তাঁদের বরং ভারতের সমগ্র হিন্দু জাতির পথপ্রদর্শক ইংরেজ জাতি।

কোন ইংরেজ আসামির বিচার ভারতীয় জজরা করতে পারতেন না এটা খুবই অসভ্য আভিজাত্য সন্দেহ নেই কিন্তু ভারতবাসী প্রতিবাদীদের প্রতিবাদে বঙ্কিম বলেছিলেন। "ভারতীয়রা ইংরেজদের বিচার করতে পারে না। কিন্তু শূদ্রেরা কি ব্রাহ্মণের বিচার করতে পারতো?

তাই বিপ্লবের জন্য যে কলম চলে সে কলম এক কলম নয়। উপন্যাস লেখায় গাঁজার গন্ধ আর বাজার হাত করার ইচ্ছা থাকে আর বিপ্লবীর লেখায় রক্তের রঙ, গন্ধ আর প্রাণ দেওয়ার আকুতি, বিপদকে ডেকে নেওয়ার স্পষ্ট স্পর্ধা বিদ্যমান থাকে সেখানে।

স্বাধীনতার জন্য শিক্ষিত ছেলেরা যাতে মাথা না তুলে ভেড়ার মত মাথা নিচু করে থাকে তার জন্যই তিনি কি লেখেননি? "স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতি আমদানি, 'লিবার্টি' শব্দের অনুবাদ.......ইহার এমন তাৎপর্য নয় যে রাজা স্বদেশীয় হইতেই হইবে।"

বঙ্কিমের জন্য আসল তথ্য প্রকাশ করে পূর্ণভাবে লিখলে একটি চিত্তাকর্ষক স্বতন্ত্র গ্রন্থ হতে পারে আর তার জন্য আমাদের দেশে যোগ্য ছেলেও বহু আছে কিন্তু তা লিখে 'ডক্টর' টাইটেল পাওয়া যাবে কি? বরং তিনি ঋষি ছিলেন কি না? বিজ্ঞানী ছিলেন কি না? বিপ্লবী ছিলেন কি না? এগুলোর 'হ্যাঁ' উত্তরের পেছনে লেখা দিতে পারলে নামের সঙ্গে 'ডক্টর' শব্দ যোগ হবে এ এক রকমের গ্যারান্টি বলা যায়। মুসলমান ছাত্র ছাত্রীরা এবং নিরপেক্ষ প্রকৃত শিক্ষিত হিন্দু বা যেকোন পাঠক যাঁর বঙ্কিম সম্বন্ধে সত্যিকার অভিজ্ঞতা আছে তিনি এক মুহূর্তও বঙ্কিমকে শ্রদ্ধা করতে পারবেন বলে আশা করা যায় না। মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে কলম ধরে সীমা অতিক্রম করেছিলেন কি না আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে, যেমন তাঁর সহস্র সহস্র বাণীর মধ্যে দু-এক টুকরো পেশ করে শেষ করছি। "ঢাকায় দুই-চারদিন বাস করলেই তিনটি বস্তু দর্শকদের নয়ন পথের পথিক হবে। কাক, কুকুর এবং মুসলমান। এই তিনটিই সমভাবে কলহপ্রিয়, অতি দুর্দ্দম, অজেয়। ক্রিয়া বাড়িতে কাক আর কুকুর। আদালতে মুসলমান।" বঙ্কিম বিখ্যাত আনন্দ মঠেও লিখেছেন, "ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন তো প্রাণ পর্য্যন্তও যায়। এ নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?"

সবশেষে একথা বলা যায় ভারতবাসীকে তিনি ইংরেজের দাসে পরিণত করতে যে 'নেমক' খেয়েছিলেন সে 'নেমকের' বিনিময়ে তিনি পুরো মাত্রায় কাজ করেছেন নেমক হারামি বা ইংরেজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। তাই সাহিত্য সম্রাট, ঋষি, স্বাধীনতার মন্ত্রের স্রষ্টা, সেকালের শিক্ষিত ভারতবাসীর পথপ্রদর্শক বঙ্কিমের অসংখ্য বাণীর একটি মূল্যবান বাণী দিয়েই শেষ করছি "গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন সমাজের সেই গঠন। গৃহকর্তার ন্যায়, পিতা-মাতার ন্যায় রাজা সমাজের শিরোভাগ। তাঁহার গুণে তাঁহার দণ্ডে, তাঁহার পালনে সমাজ

রক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা যেরূপ সন্তানের ভক্তির পাত্র রাজাও সেরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র।" বঙ্কিম অবশ্যই ইংরেজ রাজত্ব রাজা ও রাণীর ক্ষেত্রে বাবা ও মার মতই শ্রদ্ধা রেখে কাজ করেছিলেন সন্দেহ নেই। আর তাঁর দলবল ও পর পুরুষরাও তাঁর ঐ বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করছিলেন কিন্তু মুসলমান জাতি ইংরেজের প্রতি একেবারেই নেমক হারামি করেছে। অন্তত ঋষির উপদেশ ও আদেশের উপেক্ষা করে এবং শেষে দলে দলে হিন্দুরাও ইংরেজকে শোষক মনে করে হত্যা করতে দ্বিধা করেননি।

রাজা রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায় ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৩ সালে পরলোক গমন করেন। রামমোহনকে হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধনে বিশেষ ঐতিহাসিক ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায়। তবুও ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর দণ্ডায়মান হয়ে বলা যায় যে, তার পূর্বেও হিন্দু ধর্ম বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিপরীত অনেক পথ ও মতের প্রচারক বা প্রচারের সন্ধান মেলে। যথা-কর্তাভজা, বাউল, দরবেশ, সাঁই, ন্যাড়া, সংযোগী, জগমোহনী, সাহেব ধনী, বলরামী, সহজী, বিশ্বাসী, খুশী, যদু পাতিয়া প্রভৃতি অমুসলমান দল। এরা প্রত্যেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও ধর্মে ও সমাজে পছন্দসই স্থান না পেয়েই স্বধর্ম বিরোধী হযে ওঠে। দু-একটি দল রাজনৈতিক বললে ভুল হয় না। বহু প্রাচীন মত যা আকবরের সময় ইরান হতে আমদানি হয়েছিল তাদেরই বিবর্তনবাদ বিশেষ করে আউল বাউল ও ভণ্ড মারফতি ফকিরের দলগুলো ধর্ম বলে প্রচারিত হলেও এগুলো আসলে ইসলাম ধর্মের ক্ষেতের আগাছা।

উপরোক্ত দলগুলোর জন্য প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে'র মতানুযায়ী বলা যায় যে, "অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের মধ্যে কয়েকটি ধর্মীয় দল পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদের সপক্ষে জাতিভেদ প্রথা ও অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রয়াসী হয়।"-দ্রঃ বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃঃ ১-২। ফলে হিন্দু ধর্মের ক্ষয়িষ্ণুতা একটু কমে যায়। কাশীর রাজার মুখ্য সচিব শ্রী শীতল সিং এবং সেখানকার কলেজের লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ মথুরানাথ পার্সী ভাষায় অনেকগুলো বই লিখেছেন এবং তাতে অনেক সম্প্রদায়ের মতামত, আচরণ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐ সমস্ত লেখক তাঁদের লেখাতে স্বাভাবিকভাবেই নিজস্ব প্রভাব প্রকাশে সক্ষম হন। পরে পার্সী ভাষা বিলোপ হতে লাগলো, ও একশ্রেণীর মুসলমান ঐগুলোকে কেন্দ্র করে স্বধর্মে বিভ্রান্ত হতে বাধ্য হয়েছে। কারণ তাদের অনেকের নিকট এই কুসংস্কার বদ্ধমূল ছিল যে যা আরবী, ফারসী ভাষায় লেখা থাকে তাই পবিত্র, তাই নির্ভুল এবং গ্রহণযোগ্য। ফলে আউল বাউল প্রভৃতি দলগুলো না হিন্দু না মুসলমানরূপে পরিণত হয়। তাছাড়া তাদের অধিকাংশ লোকের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি মানবতাশূন্য।

আমরা কবির ভাষায় ছোটবেলা হতেই আউল বাউল প্রভৃতি দলের লোকের ওপর শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু ভেতরের ইতিহাস এদের অত্যন্ত নোংরা, কদর্য বরং কুপরিকল্পনাপ্রসূত। এই প্রকার আউল বাউল, জিকির, নিরঞ্জন, শাহ সাহেব প্রভৃতি দল হিন্দু বা মুসলমান ছিল না। এরা গীত বা গানের মাধ্যমে বাহ্যিক উদারমতের প্রচারক ছিল। কালে বিবর্তনে আজ বাউলকে হিন্দু বলা হয় আর মারফতি ফকির ও আউলকে অনেকে নির্বুদ্ধিতার কারণে মুসলমান মনে করেন। আসলে তারা উৎকট গোপনবাদী দল।

(ক্ষিতিশ মোহন লিখিত “ভারতীয় মধ্য যুগে’ পুস্তক দ্রঃ)

রামমোহনের সমসাময়িক কুষ্টিয়া জেলার দেউরিয়া গ্রামের লালন শাহও একজন বিখ্যাত বউল কবি ছিলেন এবং তারই পাশের গ্রামে হরিশঙ্করপুরের মকসুদ সাঁইও একজন কুখ্যাত বাউল গায়ক ছিলেন। এঁদের অনেক তথ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত মহম্মদ মনসুর উদ্দিন সম্পাদিত ‘হারানো লোকসঙ্গীত সংগ্রহ’ সংকলনে পাওয়া যায়। এইসব যথেচ্ছাচারী দলের প্রভাব সর্ব ভারতে বহুল প্রচারিত হয়েছিল। তবে এদের প্রায় সকলেই ছিল মূর্খ নিরক্ষর প্রভৃতি নিম্ন মানের মানুষ। অবশ্য কতিপয় শিক্ষিত বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সন্তান এতে যোগদান করে। উদ্দেশ্য ছিল অনুপযুক্তদের মাঝে নিজেকে উপযুক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করে নেতা হয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার উৎকট বাসনা। একদিকে এরা পেত সম্মান অন্যদিকে ঐ শাহ সাহেব বাউল আউল মারফতি সাঁই-এর দল তাদের প্রশংসা করে সাধারণ মানুষকে নিজেদের দিকে প্রলোভিত, প্রভাবিত আর আকর্ষিত করতো।

এছাড়া ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামীর জন্য চারদিকে একটা আন্দোলনের চাপা পড়া আগুন যেন ধিকিধিকি জ্বলছিল। মাঝে মাঝে তার বহ্নি প্রকাশ হতো। যেমন ইংরেজি ১৭৭১ সালে দেধরাজ ব্রাহ্মণ হয়েও বৈশ্যকন্যা বিবাহ করেন এবং পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। শেষে অনেক কারণে বা অনেকের আবেদনের ফলে অঞ্চলে শান্তি রক্ষার জন্য ঝাঝারের নবাব জনাব নজারত সাহেবের আদেশে তাঁকে কারাগারে আটক করা হয়। পরে তিনি মুক্ত হন এবং পুনরায় তাঁর পূর্ব প্রচার শুরু করেন। তাঁর নীতিতে মুসলমান ধর্মের গাঢ় রঙ দেখা যায়। কিন্তু তিনি পর্দা প্রথার সমর্থক ছিলেন না এবং রামায়ণ মহাভারতকেও সঠিক ও নির্ভুল মনে করতেন না।

(“ভারতীয় মধ্যযুগে” পুস্তক দ্রঃ)

ঠিক ঐ সময় আর একজন সাধক পলটু সাহেব ফৈজাবাদ আইরওলার অধিবাসী গোবিন্দর শিষ্য ছিলেন। পলটু বানিয়া বংশের লোক। তিনি ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মূল কথা ছিল-“নীচ জাতিকে নষ্ট করিল উচ্চ জাতিরা, এবং নিজেরাও নষ্ট হইল।” “ভগবান কোন সম্প্রদায়

বিশেষের সম্পত্তি নহেন।" এইভাবে সারা ভারতে অন্তত নামকরা দুইশতজন হিন্দু বিভ্রান্ত হয়ে নানা পথে স্বধর্মের বিরোধী হয়ে ওঠেন। তাঁরা ইসলাম ধর্মের প্রভাবে প্রতাপে বা প্রচারে আকর্ষিত হলেও ইসলাম গ্রহণকারী বলে স্বীকার করে মুসলমান হিসেবে নিজেদের প্রচার করতেন না। এসব সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায় I.N Sarlar-এর লেখা In Indo Iranicaতে। এঁদের প্রচারে প্রায় লক্ষ লক্ষ লোক দলভুক্ত হয়ে পড়েছিল। এঁরা না মুসলমান আর না হিন্দু ভাব নিয়ে থাকতেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর পুস্তক 'ভারতীয় মধ্য যুগে'র ভূমিকার তাদের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজার লিখেছেন। আসলে তিনি ১৯১১ সালে Census of India অবলম্বন করেই পঁয়ত্রিশ হাজার লিখেছেন। কিন্তু এমন বেশির ভাগ লোকই ছিল, যারা কাগজ বা কলম, সরকার আর সরকারি কাগজপত্রের ধার ধারতো না। লেখাপড়াও জানতো না। আবার টিপ দিতেও আপত্তি ছিল। সেই সমস্ত লোকের তালিকা নির্ধারণ করা ঐ রকম সেন্সাসের দ্বারা সম্ভব ছিল না।

পরে রাজা রামমোহন যে ব্রাহ্ম ধর্ম সৃষ্টি করেন তার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মের ক্ষয়রোধ করে আবার নতুন জীবন ধারা ফিরিয়ে আনা। তবে যাইহোক, তাঁর ব্রাহ্ম ধর্মে ঐ প্রকার পৈশাচিক এবং নোংরামীর স্থান ছিল না। এটা ছিল একটা মুসলমান ধর্মের হিন্দুয়ানি রূপ। তবে তিনিও তার ধর্ম প্রচারে কৃতকার্যতা লাভ করতে পারেননি। প্রমাণস্বরূপ ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা দেখলেই যথেষ্ট হবে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সর্ব ভারতীয় লোকসংখ্যার মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছিল সারা ভারতে মাত্র পাঁচ হাজার পাঁচ শত চারজন।

(Census of India, 1911. Vol-1, Part-1, Page-123, Calcutta ফাইল দ্রষ্টব্য)

ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে রামমোহনের মনোভাব নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে শ্রী সুপ্রকাশ রায়ের লেখা 'ভারতের কৃষক।

বিদ্রোহ এবং রমেশ চন্দ্র মজুমদারের লেখা 'রামমোহন' ইত্যাদি প্রামাণিক পুস্তক হতে প্রমাণিত হয় যে, রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজপ্রীতি যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। তিনি ইংরেজ রাজত্বকে স্বাগতম জানিয়েছিলেন। ভারবর্ষে "ব্রিটিশ কলোনাইজেশন" অর্থাৎ ব্রিটিশ উপনিবেশকে তিনি সমর্থন করতেন। নিঃসন্দেহে এই অভিযোগ যেকোন ক্ষেত্রে সত্য হলে তাঁকে স্বাধীনতা আনন্দোলনের নেতা বলে বরণ করে নেয়ার তো কোন কথাই ওঠে না বরং তাঁকে স্বাধীনতার শত্রু বলতে প্রকৃত বুদ্ধিজীবীদের কাউকে বিরত রাখা সম্ভব নয়।

রামমোহনের দাবি ছিল অসভ্য ভারতে ইংরেজ না থাকলে ভারত সভ্য হবে না। ইংরেজদের টিকিয়ে রাখতে এবং ইংরেজদের অত্যাচারের হাতিয়ার ছিল জমিদার শ্রেণী। তিনি ছিলেন এই জমিদারী প্রথার একজন পাকা সমর্থক।

>Goto List

ইংরেজ আমলে নিষ্ঠুর নীলকরদের অত্যাচারকেও তিনি প্রশংসা করতে ছাড়েননি। তাঁর মতে 'নীল করেরা দেশের উপকার করেছে।' ইংরেজের ভারত আক্রমণ এবং ছলে বলে কৌশলে ভারতকে গ্রাস করার অন্যায়কে দোষ না দিয়ে তাদের অপরাধকে চাপা দিয়ে রামমোহন বলেছেন, 'দেশীয় শাসকদের পারস্পারিক কলহ, ভারতের তদানীন্তন নেতাদের কাপুরুষতা, সামরিক শক্তি বিশেষ করে নৌবিভাগের, দৌর্বল্য প্রভৃতি কারণে ইংরেজ আধিপত্য স্থাপিত হয়। অবশ্য কথাগুলো অনেকাংশে সঠিক হলেও তাই বলে ভারতবাসীর কাপুরুষতাকে মোটেই স্বীকার করা যায় না।

Susovan Chandra Sarkar লিখিত Rammohan Roy on India Economyতে রামমোহনের দোষগুলো ওজুহাতের আচ্ছাদনে ঢেকে ফেলার প্রয়াস পেয়েছে। যেমন বলা হয়েছে তিনি ইংরেজদের টিকে থাকা চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু মাত্র কয়েক যুগের জন্য, চিরদিনের জন্য নয়। ইংরেজের ওপর বিদেশী বলে যাঁরা ঘৃণাপোষণ করেন আসলে তার ন্যায্য কারণ হচ্ছে এই যে, ইংরেজ এদেশকে নিজের মনে করতে পারেনি, তাই বাস করার চেষ্টাই করেনি। শুধু এখানকার সম্পদ শোষণ করে বিলেতকেই সমৃদ্ধশালী করেছে।

মিঃ সরকারের ঐ পুস্তকে আরও পাওয়া যায় যে, রামমোহন ইংরেজ জাতিকে ভারতের উন্নতির জন্য বসবাস করার অনুরোধ করেন এবং ভারতবাসীকেও নানাভাবে নানা দিকে নানা পদ্ধতিতে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে প্রয়াস পান। B.N.Ganguli মশাই তাঁর পুস্তকে রামমোহনের উপরোক্ত অভিযোগকে ঢাকা দেওয়ার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী। ইংরেজ কর্তৃক নীলচাষ সারা ভারতে এক অত্যাচারের ইতিহাস, নিপীড়ন আর শোষণের ইতিহাস। কিন্তু রামমোহন লর্ড উইলিয়াম বেনটিক এবং শ্রী দ্বারকানাথের মতে মত মিলিয়ে সুরে সুর মিলিয়ে এই মত সমর্থন করতেন যে, ইংরেজ কর্তৃক নীলচাষে দেশের কল্যাণ হয়েছে বা হবেও, যেহেতু জমির দাম বৃদ্ধি হবে এবং ভারতবাসী তাদের কাছে চাকরি পাবে বা পাচ্ছে আর রাস্তা-ঘাটের উন্নতি হয়েছে এবং আরও হবে। তবে অত্যাচার যদিও স্বীকার করা হয় তবে তার চেয়েও তুলনামূলকভাবে ভারতবাসীর লাভ অনেক বেশি।' তাই ইংরেজ শাসনকে তিনি "বিধাতার আশীর্বাদ" বলে মনে করতেন। অথচ H.C. Sarkar লিখিত Life and letters, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা, 'ভারতের শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন', হুমায়ুন কবীরের সুবিখ্যাত পত্রিকা "চতুরঙ্গ" এর ১৯৬৬ সালে বৈশাখ ও চৈত্রের লেখা হতে বেশ প্রমাণ করা যায় যে, শুরু হতেই ইংরেজদের নীলচাষ অভিযান অত্যাচারের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল।

ইংরেজ জানতো ভারতবাসীর বেশ একটা অংশ লবণ তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে, যাদের বলা হতো মলাঙ্গী। তবুও তারা বিলেত হতে লবণ আমদানি আরম্ভ করে দিল। বলাবাহুল্য ইংরেজ প্রেমিক রামমোহনই ইংরেজকে বিলেত হতে লবণ আনতে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে নিচের একটি উদ্ধৃতি খুবই অনুধাবনযোগ্য।

"ইংরেজ স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই রামমোহনের মত ব্যক্তি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন বাংলা দেশে লবণ প্রস্তুত বন্ধ করে ইংলণ্ড থেকে লবণ আমদানির। হয়েছিলও তাই। এর ফলে একদিকে দেশীয় লবণ শিল্পের উচ্ছেদ হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ লবণ শিল্প শ্রমিক বেকার হয়েছিল এবং অন্যদিকে রামমোহনের শ্রেণীভুক্ত ব্যবসায়ীরা সেই ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করে ইংরেজের মুনাফার এক ক্ষুদ্র অংশ নিজেদের পাতে উঠিয়েছিলেন। রামমোহনের ও তাঁর শ্রেণীভুক্ত অন্যদের এই কর্মের ফলে দেশীয় অর্থনীতির বিকাশ না ঘটে তার ধ্বংসের পথই প্রস্তুত হয়েছিলো।"

(দ্রষ্টব্য The Economic History of India, Romesh Dutta, vol-2.p-103-0)

ভারতীয় লবণ ও বিদেশী লবণের মধ্যে মূল্যের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কিন্তু ইংরেজ এক প্রকার বিনা লাভে বা অল্প লাভেই লবণ আমদানি করে। উদ্দেশ্য ছিল গরিব ভারতবাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে না পেরে ব্যবসা ছেড়ে দিলেই ইংরেজদের ওটা একচেটিয়া হবে, ফলে শোষণ আর শাসনের অবস্থা আর একধাপ উন্নত হবে। তাই ইংরেজ চেয়েছিলো দরিদ্র ভারতীয় লবণ ব্যবসায়ীদের লবণের কাজ ছাড়িয়ে দিয়ে অন্যদিকে অন্যকাজে জুড়ে দিয়ে ব্যবসা হাত করা এবং ইচ্ছামত দর চড়ানোর রাস্তা খোলা। এক্ষেত্রেও রামমোহন মলাঙ্গীদের মিষ্ট পরামর্শ দেন যে, তারা বেকার হলেও তাদের জন্য অন্য কাজ দেওয়া যেতে পারে। যথা বাগানের মালী, বাড়ির চাকর, দিনমজুর প্রভৃতি।

ইংরেজের ওপর সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীর নাগরিকদের অনেক অভিযোগ ছিল। রাজা রামমোহন তার যে সমস্ত উত্তর দিয়েছিলেন তাতে অভিযোগগুলোও স্মরণ করা যেতে পারে আর রামমোহনের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের পরিমাণ ও গভীরতাও উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। অভিযোগকারীদের উত্তরে রামমোহন বলেন- সাধারণ লোকের উন্নতি না হওয়ার কারণ তাঁরা সরকারের সম্বন্ধে 'অজ্ঞ এবং উদাসীন'। যেসব অত্যাচার তাঁরা ভোগ করেন তাঁর জন্য দায়ী সরকার নয় বরং সরকারি কর্মচারী। আর চাকরি না পাওয়ার কারণ ইংরেজের অধীনে চাকরি করা তাঁরা অসম্মানবোধ করেন। ফলে যাঁরা সরকারের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছেন তাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারির মালিক হয়েছেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করে সম্পদশালী হয়েছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন "বৃটিশ শাসন

দেশের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ"। আর যারা খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি তাঁরা আজ অনুন্নত। এর জন্য দায়ী তাঁরা নিজেরাই, সরকার নয়। S.C. Sarkar এর On India Econamy পুস্তকে রামমোহনের লেখা উল্লিখিত আছে-

"But I have no hesitation in Stating, with reference to the general feeling of the more intelligent part of the native community, that the only course of policy which can ensure their attachment to any form of the governmant would be; that of making them eligible to gradual promotion, accarding to their respective abilitics and merits, to Situations of trust and respectability in the State."

যাইহোক, রামমোহন নাস্তিক ছিলেন না অবশ্যই। এর অনেক প্রমাণ তাঁর লেখা এবং কর্মের মধ্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া ইংরেজি ১৮৩৩ সালে ইংলণ্ডের কমিউনিস্ট নেতা মিঃ রবার্ট আওয়েন তাঁকে সমাজতন্ত্রে দীক্ষা দিতে গিয়ে ধর্ম নিয়ে একমত হতে পারেন নাই। আওয়েনের মতে, রাজনীতিতে মানবিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টি প্রসূত। এমনকি পারিবারিক ক্ষেত্রেও ধর্মের এক বিরাট অবদান এটা তিনি স্বীকার করতেন। তাই শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রের নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারেননি।

ইংরেজ শাসনের সময় তদানীন্তন জমিদাররাই শাসকের সহায়, পৃষ্ঠপোষক, প্রচারক ও প্রশংসাকারী ছিলেন। রামমোহন নিজেও একজন জমিদার সন্তান। তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার বিপক্ষে তিনি প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা তৎপরিবর্তে প্রশংসা ও সমর্থনই করে গেছেন। তাই জনৈক প্রভাবশালী লেখক লিখেছেন, "তথাকথিত স্বাধীনতার পূজারী রামমোহন। যখন গ্রামাঞ্চলে স্বাধীনতার জন্য, ইংরেজ বিতাড়নের জন্য, এর দরিদ্রতার বিরুদ্ধে লড়ানোর জন্য' কৃষক বিদ্রোহ' শুরু হয় তখন রামমোহন 'ইংরেজ শাসন' শুরু করতেই ব্যস্ত ছিলেন। রামমোহন জমিদারি প্রথাকেই আদর্শ ভূমি ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেন। এই সব উক্তি গভীর তাৎপর্য বহন করে।"

অবশ্য রামমোহন সারা জীবনে যত কিছু লিখেছেন ও বলেছেন তাতে খুঁজলে হয়ত দেখা যাবে তাঁর মতের প্রতিকূল কথাও আছে কোথাও কোথাও। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বলা যায়, তাঁর লেখা ও বলাই সব সময় মাপকাঠি না হয়ে যদি বলা, লেখা এবং তাঁর কাজের দিকে লক্ষ্য করা যায় তবে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের উপরোক্ত ধারণা পোষণ করতে কোন বাধা থাকে না। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে রামমোহন রায়কে একজন যথার্থ আস্তিক বলা যেতে পারে কিন্তু স্বাধীনতা

আন্দোলনের নায়ক বলা কঠিন এবং অনেকের দৃষ্টিতে অসম্ভব। একজন ব্যাধের নিষ্ঠুরভাবে পাখি মারাই ঐতিহাসিক কর্ম, যদিও সে কোন দিন আহত পাখির জন্য সমবেদনা জানায়নি। দুঃখের বিষয়, শুধু রাজা রামমোহন নয় আরও অনেক তদানীন্তন নেতার লেখনীর মধ্যেও ঐ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সুনাম ঘোষিত হয়েছে। মাননীয় রমেশ দত্ত তাঁর 'Famines in India' গ্রন্থে ঐ কুপ্রথার সপক্ষে ওকালতি করেছেন। দত্ত মহাশয়ের 'Economic History of India Under Early British Rule' গ্রন্থেও পাওয়া যায় " চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশে এমন কোন দুর্ভিক্ষ হয়নি, যার ফলে বহু লোক মারা গেছে, বরং এই ব্যবস্থায় সমগ্র কৃষক সমাজ উপকৃত হয়েছে।"

অনেকের মতে, ইরেজ সৃষ্ট বিরাট একটি শিক্ষিত শ্রেণী ছিলেন যাঁরা ইংরেজের ভারত শোষণের মাধ্যম ছিলেন। তাদেরও উভস্বত্বভোগী নাম দেওয়া চলে। অনুন্নত জনসাধারণের কাছেও তাঁরা ছিলেন গুরু দেব। অজ্ঞ মানুষেরা তাঁদের পালকি, ঘোড়া ও ঠাটবাট দেখেই শ্রদ্ধায় সম্মানে মাথানত করত আর দু-একটি ইংরেজি দরখাস্ত প্রভুর দরবারে লিখে সঙ্গে সঙ্গে সুফল দেখিয়ে সাধারণ মানুষ কৃতজ্ঞতা নিবেদনে গদ গদ হয়ে পড়তো। অন্য দিকে ইংরেজ দরবারেও তাঁদের সম্মান ছিল। মধ্যে মধ্যে উভস্বত্বভোগীর দল ইংরেজের বিরুদ্ধেও বলতেন ও লিখতেন যা নিছক অভিনয়ের নামান্তর ছিল।

ইংরেজ জাতি সিরাজউদ্দৌল্লার পতনের পর হতেই ভারত শোষণের মাত্রা পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করে। কোন এক সাহেবের মতে, প্রতি বছরে দু মিলিয়ন পাউণ্ড ধন সম্পদ ভারত হতে পাচার হতে থাকে। ঐ বহুনীতির ওপর দৃষ্টিপাত করেন বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ মি বার্ক তাঁর রচিত Ninth Report গ্রন্থের মাধ্যমে। রামমোহনের পক্ষে বলা যায় যে, তিনি ভারতে ইংরেজদের স্থায়ী বসবাসের পক্ষপাতী। তার কারণও তিনি একটা মনে করতেন যে ইংরেজ এখানে স্থায়ীভাবে বাস করলে দেশের সম্পদ দেশেই থাকবে! কিন্তু স্বাধীনতাকামী নেতার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, ইংরেজকে ভারত হতে বিতাড়নের ব্যবস্থা করা। ফলে চারদিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছোট বড় অনেক বিদ্রোহই যখন ঘটে চলেছিল তখনো বাবু রামমোহনের ইংরেজ মুক্ত 'ভারত বর্ষ, শোষণমুক্ত ভারতের জন্য স্বাধীনতার পরিবর্তে অধীনতার যুক্তি প্রদান সঠিক হয়েছে' বলে আজকের বুদ্ধিজীবীরা এক বাক্যে স্বীকার করে নেবেন এ রকম ভাবার পেছনে কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না।

শোষণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক মান এত নিচে নেমে গিয়েছিল যার প্রমাণ রামমোহনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ রচনা হতে পাওয়া যায় "গ্রামের গরিবদের তরকারি খাবার সাধ্য ছিল না; শুধু লবণ ভাত খেত।" বলাবাহুল্য, ইংরেজদের দোষ দেওয়ার পরিবর্তে তিনি দেশের ও দশের দোষ ধরে সমাজের

কল্যাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি মাংস খাওয়ার উপর খুব জোর দিয়েছিলেন। নানা দেশের জনসাধারণের পরিবেশ, পরিস্থিতি ও আহার্যে সমালোচনা করে তিনি জাত হিন্দুদের খুব জোর দিয়ে বলতেন মাংস খেতে। বহুদিন পর বিবেকানন্দের কণ্ঠে যেন এই সব কথাই অনেক বলিষ্ঠতার সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

রামমোহন শুধু ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজকে থাকতে আবেদন করেছিলেন তাই নয় বরং তাঁর অনুগত বান্ধবদের সঙ্গে নিয়েই তাঁর এই আবেদন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রামমোহন, দ্বারকানাথ, প্রসন্ন ঠাকুর প্রমুখ বিখ্যাত নেতাগণ ইংরেজদের এখানে বাস করার আইনগত অনুমতি প্রার্থনা করেন। আর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে হাউস অব কমনসের কাছে তিনি নিজেও বিশেষভাবে প্রার্থনা করেছিলেন।

[(ক) রামমোহন রচনাবলী, ৫২৯ (খ) সমাচার দর্পণ ২৬-১২-১৮২৯, উদ্ধৃত অসিত কুমার ভট্টাচার্য রচিত বাংলার নব যুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা, পৃঃ ২৯]

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো এই যে, যখন স্বদেশে নীলকর অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চলছিল প্রকাশ্য চাবুক মারা আর আঙুল কেটে দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে, ঠিক সেই সময়েই উক্ত আবেদন। তাই আবেদনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও গবেষণার বস্তু।

রামমোহনের একটা সুনাম আছে যে, ইংরেজ যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় আঘাত হেনেছিল তখন তিনি খুব জোরালো প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু আজকের সমীক্ষায় আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি যে, তিনি দেশের স্বার্থে প্রতিবাদ করেননি বরং সরকারের পক্ষেই ওকালতি করেছিলেন। তিনি কীভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন তার অন্তর্নিহিত স্বরূপ তুলে ধরলেই এ সত্য সহজে প্রমাণিত হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রয়োজনে রামমোহন বলেছিলেন, ...এই স্বাধীনতা দরকার কারণ তা না হলে জনসাধারণ অভাব অভিযোগ স্বাধীনভাবে সরকারকে জানাতে পারবে না এবং তার ফলে সরকারের পক্ষে দেশের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত ঃ সংবাদপত্রের মাধ্যমে যদি স্বাধীনভাবে অধিকার ব্যক্ত করার অধিকার জনগণের না থাকে তাহলে এদেশে ইংরেজ শাসনবিরোধী বিপ্লবী শক্তি জোরদার হবে এবং পরিণতিতে তা হয়ে দাঁড়াবে বৃটিশ শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক।" (দ্রঃ অধ্যাপক বদরুদ্দিন উমর সাহেবের লেখা 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ পৃষ্ঠা, ১৪)।

উল্লেখ করার যেতে পারে, এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এদেশে সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহনের জোরালো আবেদন। এর মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আর দেশপ্রেম কোথায় আছে তা সুবিবেচক পাঠক-পাঠিকারাই বিবেচনা করবেন।

দেশের দরিদ্র কৃষক আর ইংরেজ সরকারের সঙ্গে যখন সংগ্রামের বহ্নি শিখা জ্বলে উঠেছে ঠিক সেই সময় 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা যে ভূমিকা নিয়েছিল তা থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হবে রামমোহন পুরোপুরি ইংরেজের সাহায্যকারী ও পরম আত্মীয়ের ন্যায়। (দ্রষ্টব্য'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র'। প্রথম খণ্ড সংবাদ প্রভাকর। বিনয় ঘোষ।)

রামমোহন হিন্দু ধর্মের কঠিন পুরোহিতবাদ বা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস করেননি। অবশ্য তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে, এ অসম্ভব তাই নূতন ধর্ম স্রষ্টার ভূমিকায় ব্রাহ্ম ধর্মের জন্ম দিলেন। কিন্তু তাতেও তিনি অনেক শ্রম. অর্থ আর সময় কাটিয়ে নাস্তিক, মুসলমান, মৌলবী, (রামমোহনকে 'জবরদস্ত মৌলবী' বলা হতো। কারণ সে যুগে পাটনার বড় মাদ্রাসা হতে তিনি আরবী, ফারসী ও উর্দুতে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি ঐ সমস্ত ভাষায় কিছু বই পুস্তকও লিখেছেন।) প্রভৃতি উদ্ভট উপাধি লাভ করেও সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হন। কারণ তিনি অনেক সংগ্রামী সমাজ সংস্কারক নেতা তৈরি করে তাঁদের পুরনো মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে অনেক কিছু করলেন কিন্তু নিজে ব্রাহ্মণের পৈতা পরিত্যাগ করতে পারেননি।

(দ্রঃ রামমোহন রচনাবলী ভূমিকা ঃ ডক্টর অজিত কুমার ঘোষ। পৃষ্ঠা ২১।)

রামমোহন জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন এবং খাদ্যাদির ব্যাপারে যা পুষ্টিকর তাই খেতে বলতেন। তিনি মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং এক স্রষ্টাতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর লেখায় ও কথায় যা পাওয়া যায় তার সাথে তাঁর কাজের অনেক গরমিল দেখা যায়। যেমন তিনি যে মতবাদই প্রচার করুন না কেন অব্রাহ্মণদের খাদ্য তিনি কোন দিনও গ্রহণ করেননি এবং অন্য জাতিভুক্ত লোকদের সাথে একত্রে আহার পর্যন্ত করতেন না। ব্রাহ্মণের পবিত্র সূত্র উপবীতও তিনি নিজদেহে ধারণ করতেন।

(দ্রঃ রামমোহন রচনাবলী পৃঃ ২১)

১৮৪৭ সালেই তাঁর মতবাদের ওপর ধর্মের নাম 'ব্রাহ্ম ধর্ম' বলে প্রথম ঘোষণা করা হয়। তিনি হিন্দু ধর্মের নাম 'সনাতন ধর্ম' বলতে যা বোঝা যায় তার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে লড়াই করে তৃপ্তি পেতেন। যেমন তিনি নিজের এক পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন একজন বিধবার সঙ্গে।

রামমোহনকে শিক্ষিত মুসলমান সমাজের জন্য ইংরেজের আনুকূল্যে অনেক কিছু লিখতে ও বলতে হয়েছে। কারণ সারা ভারতে মুসলমান শিক্ষিত সমাজ মানেই ফারসী ও আরবী জানা লোক। এদিকে রামমোহনও আরবী ফারসী আগে হতেই জানতেন। তিনি বাংলা, ইংরেজি বাদ দিয়ে তথাকথিত মুসলমানী ভাষায় কয়েকটি বই লিখেছিলেন। যথা-'তহফাৎ-উল-মুয়াহ হিদিন' ও'মোনাজারাৎ-উল-আদিয়াম' প্রভৃতি। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত মুসলমান সমাজের

উদ্দেশে একটি ফারসী পত্রিকারও তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পত্রিকাটির নাম ছিল 'মীরাৎ-উল-আখবার'। তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশে যে বইগুলো লিখেছিলেন তা বেশির ভাগ মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে বাংলা ও ইংরেজিতে। তার মধ্যে 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম প্রণালী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রামমোহন বিলেতে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন একবার নয় একাধিকবার। তাই তিনি স্বদেশী ও বিদেশীদের চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি অনেকখানি বিলেতি প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন। অবশেষে বিলেতেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হয়। তাঁর প্রথম বিলেতে পদার্পণের জন্য প্রচুর অর্থ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যিনি করেছিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন দিল্লীর মুঘল সম্রাটের বংশধর শাহ্ আলম। যদি শাহ্ আলম অর্থের ব্যবস্থা না করে দিতেন তাহলে জীবনেও হয়তো রামমোহনের ইউরোপ যাওয়া হয়ে উঠত না। তিনি নামে মাত্র রাজপুত্র হয়েও খুব অর্থাভাবে দিনাতিপাত করতেন। যেহেতু পিতার ত্যাজ্যপুত্র ছিলেন।

(দ্রঃ বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ-৩০)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক 'হঠাৎ নেতা' স্বাধীনতা কল্পনাই করতে পারেননি। অনেকে এইমত পোষণ করতেন যে, "ভারতের প্রশাসন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধীনেই অধিক কল্যাণকর হবে।" আমাদের আলোচ্য রামমোহনও ছিলেন এই মত বা দলেয় সমর্থক। দ্রঃ বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে রামমোহনের আমলে অচিন্তনীয় ছিল........। তিনি মনে করতেন, ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে ভারত কিছু লাভ করেছে.......। শিবপ্রসাদ শর্মার নামে লিখিত প্রবন্ধেও তিনি ঐ মত প্রকাশ করেন। তিনি পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, for having unexpectedly dilivered this country, from the long continued tyranny of its former rulers and placed it under the Government of the English, ...as well as free enqury into liberty and religlous subjects, among those nations to which that in fluence extends........"

(দ্রঃ The English works of Raja Rammohun Roy. Part lll, P-105)

সারা বিশ্বে যেখানে স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছে সেখানেই রামমোহনের সমর্থন ও উৎসাহ প্রদানের প্রচুর প্রমাণ আছে, কিন্তু নিজের দেশের ক্ষেত্রে তাঁর ইংরেজ শাসনের যৌক্তিকতা প্রদর্শন তথা তাঁর বিপরীত মনোভাব ও বিরুদ্ধে ভূমিকা দেখে যাঁরা তাঁকে ইংরেজদের গোপন কর্মচারী বা চর মনে করেন তাঁরা

যে তাঁকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা বলতে অস্বীকৃত হবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাঁদের মতে মুসলমান, শিখ, মারাঠা প্রভৃতি জাতি যখন ইংরেজদের বিতাড়নে কৃত সংকল্প সে সময় তিনি ইংরেজদের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

(দ্রষ্টব্য Modern India political Thought, by V.P Varma, P-26) সারা ভারতে জমিদারগণ রাজা সেজে ইংরেজের দালালের ভূমিকায় দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ করতো। রামমোহন এহেন জঘন্যতম শোষণ প্রক্রিয়াকে সুপ্রথা বলে মনে করতেন। জমিদারি প্রথা বা মধ্যস্বত্বভোগ করা তাঁর দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ছিল না। শুধু জমিদারদের মাত্রাধিক অত্যাচার পছন্দ করতেন না মাত্র।

শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন রামমোহন। হুগলী হতে ১৮১৫ সালের পরেই তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতায় বাস করতে থাকেন। "তারপর থেকে তিনি হিন্দু ধর্মের প্রাচীন প্রথা, যেমন বহু দেবদেবীর পূজা, মুর্তিপূজা, সতীদাহ বা সহমরণ ইত্যাদি দূর করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাস ও সামাজিক আচারের বিরুদ্ধে এই অভিযানে গোঁড়া হিন্দুরা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং সম্ভবত সেই কারণে একমাত্র হিন্দু ছাত্রদের জন্য স্থাপিত এই নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে (বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও ব্যবসায়ী ঘড়ি ডেভিড হেয়ার এবং বিচারপতি এডওয়ার্ড ইস্টের সহায়তায় কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালি ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৮১৭ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যার নাম ছিল হিন্দু কলেজ, মহাবিদ্যালয় ও এংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ। বর্তমানে সেই শিক্ষা নিকেতনটিই কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। রামমোহনের কোনও সাহায্য তাঁরা নিতে চাননি। .....রামমোহন তাঁর নীতিতে অটল থেকে আর্মহার্ষ্টকে লিখিত এক পত্রে তিনি ভারতে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের প্রাচ্য বিদ্যামুখী নীতির বিরোধিতা করেন এবং কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে তীব্র সমালোচনা করেন। তার অনুরোধ প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের যার মধ্যে থাকবে "গণিত শাস্ত্র, প্রকৃত বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, শরীরবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র-যেগুলো যথাযথ অনুশীলনের ফলে ইউরোপীয় জাতিরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের চেয়ে অনেক উন্নতি করতে পেরেছে।" (দ্রঃ 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', বিনয় ঘোষ, পৃঃ-১৬)

ইংরেজি ১৮১৬ সাল হতে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত রামমোহন আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে সর্ব ভারতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি ভাষাটাকে চালু করা হয়। এদিকে এই কয়েক বছরের মধ্যে ঐ হিন্দু কলেজে পাস করা একটি তরুণ গোষ্ঠী ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে ইংরেজি ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্র ভাষা

>Goto List

করতে তাঁরাও আন্দোলন আরম্ভ করলেন। এটি ঘটেছিল ১৮৩০ সালে। সুচতুর ইংরেজ সরকার তবুও অপেক্ষা করতে লাগলো।

সংস্কৃত কলেজ নামে হিন্দু হলেও ব্রাহ্মণ আর বৈদ্য ছাড়া আর কোন গোত্র বা বংশের ছাত্রের সেখানে প্রবেশাধিকার বা পাঠ্যাধিকার ছিল না। আর মুসলমান ছাত্রের কথা তো উল্লেখ না করাই শ্রেয়। কিন্তু যদিও হিন্দু কলেজে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ছাড়া সকল বংশের ছাত্র পড়তে পেত কিন্তু মুসলমানদের সেখানে ঢোকার উপায় পর্যন্ত ছিল না। হিন্দু কলেজে বিখ্যাত একজন বিলেতি সাহেব কলেজের মুখ্য দায়িত্ব নিয়ে থাকতেন। তার নাম ছিল 'ডিরোজিও'। তাঁর প্রযত্নে বড় একটি ছাত্র দল তার গোঁড়া ও পূর্ণ ভক্ত সৈনিকে পরিণত হয়। তাঁরাই হিন্দু ধর্মের পুরান আইন কানুনগুলোকে বিলেতি কায়দায় ঢেলে ভারতকে নূতন বিলেত বানাতে আত্ম প্রকাশ করেন। ঐ দলটিকে বলা হয় 'ইয়ং বেঙ্গল' বা ইয়ং ক্যালকাটা'। তাঁরা হিন্দু ধর্ম বা জাতিকে ধ্বংস করতে চাননি, চেয়েছিলেন নূতন করে ঢেলে সাজাতে -তাই তাঁরা ধর্মের প্রত্যেক জিনিসকে যুক্তি দিয়ে বিজ্ঞান দিয়ে যাঁচাই করতেন। তাঁরা শিখেছিলেন "প্রশ্ন করতে. সন্দেহ করতে, কোন বিধান বা নির্দেশকে নির্বিচারে মেনে না নিতে"।

ইংরেজ সাহেবদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ 'ইয়ং বেঙ্গল' দল একটি সংগঠন করেছিলেন, যার নাম ছিল "দি এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন"। রেভারেন্ট লালবিহারী দে তাঁর 'রিকালেকশন' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে উপরোক্ত এ্যাসোসিয়েশনের সাপ্তাহিক সভায় " ইয়ং ক্যালকাটা দলের শ্রেষ্ঠ সভ্যরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম বিষয়ক সমস্যা সম্বন্ধে ভাষণ দিতেন। এই সব আলোচনার মূল সুর ছিল প্রচলিত ধর্ম সম্বন্ধীয় বিধি বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ....সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে একাডেমীর সিংহ শিশুদের গর্জন শোনা যেত, 'হিন্দু ধর্ম ধ্বংস হোক' , 'গোঁড়ামি ধ্বংস হোক'।" (দ্রঃ 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্রাসাগর', পৃঃ ২১)

রামমোহন এমনই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যে, ১৮২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় ইংরেজদের ভারতে বসবাস করার যে নিবেদন তিনি করেছিলেন তার উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে রাজনৈতিক উন্নতির কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন, যা অনেকের মতে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তিনি বলেছিলেন, "I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European gentlemen, the greater Will be our improvemvnt in literary, Social and political affairs."

Raja Rammohun Roy and progressive Movements in India, by Jatindra Kumar Majumdar, PP:439-49)

ইংরেজি ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা রহিত হওয়ার ওপর আইন প্রণয়ন করা হয়। কারণ রাজা রামমোহন রায় আর ইয়ং বেঙ্গল ছিল সরকারের আইনের পক্ষে আর বাকি প্রাচীনপন্থিরা প্রায় বিরুদ্ধবাদী হয়ে 'ধর্মসভা' গঠন করেন বিরোধিতা করার জন। ঠিক ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে বুঝতে পেরেই ১৮৩০ সালে ২৭ মে বিখ্যাত খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারক মিঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ কলকাতায় এসে পৌছালেন। এবং দেখতে পেলেন বাংলা দেশের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা বিপ্লব চলছে। মিঃ ডাফ তাঁর 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া মিশন' গ্রন্থে লিখেছেন, "তখনকার অবস্থা খুব অনুকূল ছিল। এই অবস্থার জন্যই আমরা এতদিন প্রতীক্ষা করেছি, এই অবস্থার জন্যেই গভীরভাবে কামনা করেছি।"

মিশনের পাদরীরা প্রবল স্রোতে বক্তৃতা করতে শুরু করলেন ঐ হিন্দু কলেজে। এখন ছাত্রগণ প্রায় খ্রীষ্টান হওয়ার জন্য প্রকাশ্যেই প্রস্তুত। কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের বক্তৃতা শোনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন। ছাত্ররা খেপে উঠল। স্বেচ্ছাচারী আইনের ভিত্তিতে অনেক ছাত্রকে বের করা তো দূরের কথা একেবারে প্রগতিবাদীতার উৎস স্বয়ং ডিরোজিওকেও সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা হলো। তার পরের বছরেই তিনি অল্প বয়সে আকস্মাৎ মারা যান। তখন সারা ভারতের মূল কেন্দ্র কলকাতায় তিনটি দল। একটি প্রাচীনপন্থী, একটি ইয়ং বেঙ্গল শোষণ পন্থি আর একটি মধ্যম পন্থী অর্থাৎ রাজা রামমোহনের দল। প্রাচীনদের পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা' ইয়ং বেঙ্গলীদের ইংরেজি পত্রিকা 'এনকোয়ারার' আর বাংলা পত্রিকা 'জ্ঞানান্বেষণ' এবং রামমোহন দলের রবীন্দ্রনাথের পিতৃব্য শ্রী প্রসন্নকুমার ঠাকুর সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'রিফর্মার'-এর মধ্যে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগুন জ্বলতে থাকে।

খ্রীষ্টান মিশন প্রবলগতিতে ভারতে খ্রীষ্টান করার চাষ শুরু করে দিল। ঠিক এই সময়েই ১৮৩০ সালে রামমোহনের বিলেতে ডাক পড়ে। তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সেখানেই পরলোকগমন করেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম ধর্ম হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু তাঁর উপযুক্ত শিষ্য শ্রী রবীন্দ্রনাথের পিতা শ্রী দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় আবার তা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

মোট কথা রামমোহন ইংরেজি প্রভাবে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছিলেন দেশের শিক্ষিত জনসাধারণকে ব্রাহ্ম ধর্মের আড়াল হতে। তিনি মদ্যপানের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ ইংরেজরা চিরদিনই মদ্যপানে রুচিশীল ছিল। আর তিনি ছিলেন তাদের পরম বন্ধু।

সংক্ষেপে একথাই বলা যেতে পারে, রামমোহন যদি ইংরেজদের সব কিছুই উন্নত আদর্শ মনে করে থাকেন তবে তা নিঃসন্দেহে মস্তবড় অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। তাই বক্তব্য, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, মুখ্য নায়ক, অথবা অন্যতম ভারত বন্ধু কিম্বা ইংরেজ সরকারের বিশ্বাস ভাজন গুপ্ত দালাল প্রভৃতি উপাধির মধ্যে কোনটি রামমোহনের জন্য প্রযোজ্য তা নির্ধারণ করবেন বর্তমান যুগের নিরপেক্ষ ছাত্রছাত্রী বা পাঠক-পাঠিকার দল। রামমোহন কোনদিন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেননি বরং তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজ সাম্রাজ্যাধীনে সমমর্যাদাসম্পন্ন অধিকার মাত্র। এই যদি স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্মদাতা পিতৃদেবদের অবস্থা হয় তাহলে সন্তানদের অবস্থা আরও মারাত্মক হওয়া অনুচিত হবে কী করে বলা যায়? রামমোহনের প্রত্যেক শিষ্য, ছাত্র ও অনুগতের আলেখ্যই অদ্ভুত। যেমন অক্ষয় কুমারের ইতিহাস।

অক্ষয় কুমার দত্ত

নবদ্বীপ থেকে মাইল চারেক দূরে টুপী গ্রামে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে অক্ষয় কুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে। তিনি রামমোহনের মত ইংরেজদের ভারত দখলকে আশীর্বাদ মনে করতেন না বরং বিরক্তিবোধ করতেন। এতদ্ব্যতীত ইংরেজ শাসনকে সর্বোতভাবে সমর্থন এবং রামমোহনের মত তাঁদের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপনে অপছন্দ করতেন। অক্ষয় বাবু বিলেত গিয়ে ভারতবাসীর জন্য করুণ আবেদন জানান যে, "অবস্থা বিপাকে, আমরা ইংরেজদের সানন্দে সব কিছু সম্পূর্ণ করে এদেশের রাজ সিংহাসনে বসিয়েছি। তাদের উচিত এদেশবাসীর যথোচিত মঙ্গল সাধন।" (দ্রঃ বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা পৃঃ ৭৯)

তিনি প্রকাশ্য নাস্তিক ছিলেন তবে মদ খাওয়া পচন্দ করতেন না। সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ও এই উক্তির সমর্থনে বলেছেন, "রামমোহন সুরা পানের বিরোধী ছিলেন না; কিন্তু অক্ষয় কুমার স্পষ্টভাবেই সুরাপানের বিরোধিতা করেন।"

(দ্রঃ বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃঃ ৭৯)

প্রথম দিকে অক্ষয় কুমার ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন নিজস্ব মত ও স্বতন্ত্র পথে। তাঁর মতে 'ব্রাহ্মধর্ম সংক্রান্ত সমুদয় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, আর কিছুই নির্ধারিত হইবার সম্ভাবনা নাই আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় নহে। .....সহস্র শতাব্দী পরেও যদি কোন অভিনব ধর্মতত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় তাহাও আমাদের ব্রাহ্ম ধর্ম। (দ্রঃ তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকা বৈশাখ, ১৭৭৭ শতাব্দ। ১৪১ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১০)

স্বভাবতই তাঁর মতবাদের ফলে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাঁর তীব্র মতবিরোধ দেখা দিত। ইণ্ডিয়ার মিরর' পত্রিকায় এ সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। **যথা**-The negative, critical and destructive part of the work of the Brahmo Samaj, thirty years ago, was principally done by him. " (hs" Bengali literature in the Nineteenth Century. by S.K.De. P-606)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে নাস্তিক বলে মনে করতেন - দ্রঃ 'আত্মজীবনী' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৪১২।) রাজ নারায়ণ বসু অক্ষয় কুমারকে অজ্ঞাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন-দ্রঃ 'আত্মচরিত' রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ ৬৮। অবশ্য এসব মন্তব্যাদির পেছনে যুক্তিকেন্দ্রিক প্রমাণও যথেষ্ট বিদ্যমান। যথা-" অক্ষয় কুমারের মতে বিশ্ব জগৎ প্রকৃতির নিয়মে চলে, বিশ্বাতীত কোন ঈশ্বরের নির্দেশ নয়। তাঁর কাছে প্রাকৃতিক নিয়মই ঈশ্বর সৃষ্ট নিয়ম। দ্রঃ অক্ষয় কুমার দত্ত, " ভারত বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়"। ১ম খণ্ড। উপক্রমণিকা পৃঃ ৪০। তাছাড়া ব্রাহ্ম সমাজে সংস্কৃতের পরিবর্তে বাংলায় প্রার্থনার নিয়ম প্রবর্তন করেন। ব্রাহ্মের উপাসনায় পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্যাদি ব্যবহারের তিনি বিরোধী ছিলেন। মানুষ যখন পঞ্জিকা দেখে শুভ দিন নির্ধারণ করে যাত্রা করত তিনি তখন অশুভ দিনে ভ্রমণালে যাত্রা করতেন। যেদিন সকালে গঙ্গাস্নান ব্রত পালন করতেন সেই দিনেই তিনি বিপরীত দিকে গমন করে সরোবরে স্নান করতেন ইত্যাদি। (দ্রঃ B. B. Mojumdar, History of political thought', P-139)

অক্ষয় কুমার উপাসনা প্রার্থনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ধার ধারতেন না। তিনি একবার কাল্পনিক পয়েন্টের উপর নির্ভর করে এক সমীকরণের সাহায্যে উপাসনার ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করেন। তিনি বলেন, পরিশ্রম=শস্য। আর প্রার্থনা+পরিশ্রম=শস্য। অতএব প্রার্থণা=0। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রথম যুগে বেদ ঈশ্বর প্রণীত ও অভ্রান্ত' বলে বিশ্বাস করার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু অক্ষয় বাবু ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এক বাৎসরিক সভায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন –বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ব বেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত। দ্রঃ রাজ নারায়ণ বসু 'আত্মচরিত পৃঃ ৬৮। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও এই মত সমর্থন ও স্বীকার করেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কিশোরী চাঁদ মিত্রের বাসগৃহে প্রতিষ্ঠিত যুক্তিবাদী নব্য সম্প্রদায়ের 'সমাজোন্নতি বিদায়নী সুহৃৎ সমিতি'তে অক্ষয় কুমারের নেতৃত্ব উল্লেখযোগ্য ছিল। ঐ দলে আরও ছিলেন নব্য শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল দল। যথা রাধানাথ শিকদার, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, প্যারী চাঁদ মিত্র, হরিশ চন্দ্র মুখার্জি, রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রমুখ প্রখ্যাত ধর্ম শোধক ব্যক্তিবৃন্দ।

ইংরেজ সাহেব নীলকররা ভারতবাসীর ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার করেছিল তার সত্যতা প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় বিশ্বাসযোগ্য হলেও যেখানে রামমোহনের মতে নীলকরদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগকে 'অতিরঞ্জিত ও কায়েমি স্বার্থ বৃদ্ধি প্রসূত' বলে অভিহিত করা হয়েছে সেখানে অক্ষয় কুমার, দীনবন্ধু মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখার্জি প্রমুখ ব্যক্তি রামমোহনের উপরোক্ত মন্তব্যের বিরুদ্ধপক্ষে মত পোষণ করতেন।

কিন্তু তবুও অক্ষয় কুমারের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক তিনি স্বাধীনতা আন্দোলন বা সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনিই ইংরেজদের করুণার ওপর চরম ও পরমভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। "তিনি মনে করতেন যেহেতু ভারতীয়েরা ইংরেজদের সার্বভৌম কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত করে নিজেদের জীবন ও ধনসম্পদ তাঁদের কাছে সঁপে দিয়েছে, সেহেতু তাঁদেরই ওপর ভারতীয়দের কল্যাণ সাধনের মহান দায়িত্ব নির্ভর করে।"

(সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় রচিত বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা পুস্তকের ৮০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এমন দুর্বল ও ভীতচিত্ত মহাপুরুষ কেমন করে স্বাধীনতাকামী বা সংগ্রামী নেতা বলে বরণীয় ও স্মরণীয় হতে পারেন?

কেশবচন্দ্র সেন

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের প্রসিদ্ধ নেতা। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতার কলুটোলা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল প্যারীমোহন সেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। রাজনারায়ণ বসু লিখিত 'বক্তৃতা' নামক একখানি পুস্তক পাঠে মুগ্ধ হয়ে ১৮৫৭ সালে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র ছিলেন রামমোহনের পুরো ভক্ত। তাই তার যোগ্যতা দেখে যদিও তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না তথাপিও ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে ১৮৬২ সালে ব্রহ্মানন্দ উপাধি দিয়ে আচার্য পদে ভূষিত করেন। কিন্তু নূতন নিয়ম প্রচলনের চেষ্টা করতে তাঁর সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হলে তিনি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে ১৮৬৯ সালে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' নামে এক নুতন ধর্ম মত প্রচার করতে থাকেন। এবং এরই মুখ্যপত্ররূপে 'ধর্মতত্ত্ব' নামক পত্রিকার পত্তন করেন। ১৮৭০ সালে 'সুলভ সমাচার' নামে এক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ বছরেই তিনি ইংলন্ডে গমন করে ধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। তারপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে Indian Reform Association. 'নৈশ বিদ্যালয়' 'মাদকতা নিবারণ সভা' গঠন করেন।

তিনিও বিধবা বিবাহ সমর্থনে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে হিন্দু পৌরাণিক নীতি বর্জনের জোর প্রচারক ছিলেন। কিন্তু লক্ষ করার মত বিষয়, তিনি তাঁর নিজের বাচ্ছা মেয়ের বিয়ে দিলেন কুচবিহারের মহারাজার ছেলের সাথে। এবং সেই বিয়েতে হিন্দু পুরনো প্রথার সদ্ব্যবহার করা হয়েছিল। এই বিবাহ ব্যাপার নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজে তুমুল কলহের সৃষ্টি হয়। ফলে ঐ সময় তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সামাজ ত্যাগ করে 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ' নামে নূতন এক ধর্মমত গঠন করলেন। এবং নববিধান' নামক এক পত্রিকার দ্বারা এর প্রচারে উদ্যোগী হলেন। এক কথায় ব্রাহ্ম সমাজ তখন দু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল।

>Goto List

সেই সময় রাণী ভিক্টোরিয়া, লর্ড লরেন্স ও একেশ্বরবাদীদের আমন্ত্রণে কেশবচন্দ্র অতি সাগ্রহে বিলেতে যান এবং ভোজসভায় অংশ গ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণ পরম হংস দেবকে কেশবচন্দ্রই সমাজে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সব ধর্মের সমন্বয় সাধনে প্রত্যেক গোত্র বা ধর্ম হতে মেম্বার নিয়ে "ইণ্ডিয়ান রিফর্মস অ্যাসোসিয়েশন্" স্থাপন করেন। দেশব্যাপী প্রচারের সুবিধার্থে তিনি একটি প্রচার সভাও সৃষ্টি করেছিলেন। আর কলকাতায় অ্যালবার্ট হল, অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউট' তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা বিস্তার ও চিন্তায় আদান-প্রদানের কেন্দ্রস্বরূপ।

সর্ব শেষে তিনি বৈষ্ণব ধর্মের অঙ্গগুলি গানে পরিণত করেন। সহযোগী ছিলেন বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী। বিজ্ঞান চর্চাকে কেশবচন্দ্র যথোচিত গুরুত্ব দিতেন। এবং ধর্মকে বিজ্ঞানমুখী করতে চেয়েছিলেন। হিমালয় ভ্রমণকালে একপত্রে তিনি তার শিষ্য বা সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন—"ঈশ্বর বলিয়াছেন, বিজ্ঞান আমাদের ধর্ম হইবে। তোমরা সকলের উপর বিজ্ঞানকে সম্মান করিবে। বেদাপেক্ষা জড় বিজ্ঞানকে, বাইবেলাপেক্ষা আধ্যাত্ম্য বিজ্ঞানকে সম্মান করিবে।..............নূতন ধর্ম বিশ্বাসে প্রতি বিষয় বৈজ্ঞানিক, কিছুই অবৈজ্ঞানিক নয়। নিগূঢ় রহস্য দ্বারা তোমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিও না, স্বপ্ন বা কল্পনার আশ্রয় দিও না, কিন্তু পরিষ্কৃত দৃষ্টিতে এবং প্রশস্ত বিচারে সকল বিষয় প্রমাণিত কর।" (দ্রঃ কেশবচন্দ্র সেন রচিত 'পত্রাবলী' ২৩২-৩৩)

রাজনীতিকে কেশবচন্দ্র ধর্মের অঙ্গ হিসেবে মনে করতেন। সরাসরি রাজনীতি করা তাঁর কাজ ছিল না, ধর্মের সঙ্গে যতটুকু ছিল ততটুকুই। তার বেশি রাজনীতি নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে চাইতেন না। উদ্দেশ্য কী ছিল তা আলোচনা না করলেও বলা যায় তিনি ইচ্ছা করলে বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা হয়ে নূতন পথের পাথেয় পরিবেশন করতে পারতেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতে, "তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলে বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ হতে পারতেন।"

(দ্রঃ A Nation in making, by Surendranath, p-131)

করমচাঁদ গান্ধী

আমরা প্রচলিত ইতিহাস পাঠান্তে একথা জানি, স্বাধীনতা এনেছে কংগ্রেস আর বিজয় মাল্য ও পুরস্কারে পূর্ণ অধিকার যেন কংগ্রেস কর্মীদেরই। তাই আমরা প্রচলিত মতে গান্ধীজিকে জাতির জনক বলে আসছি। আর মতিলাল, জওহর লাল, মাওলানা আজাদ, সর্দার প্যাটেল প্রমুখ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নেতাদের আর ঐ নেতাদের পথ দেখিয়েছেন যাঁরা সেই রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিম চন্দ্র, বিদ্যাসাগর, হেয়ার, তিলক, আবদুল লতিফ, স্যার আহমাদ খাঁ, নজরুল,

>Goto List

শরৎচন্দ্র প্রমুখকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে আসছি। কিন্তু বর্তমান ইতিহাস বিজ্ঞানীরা এগুলি কিছু স্বীকার কিছু কিছু অস্বীকার আর চাপা দেওয়া তথ্যকে তুলে ধরে পুরাতন কঠিন বিশ্বাস বুহ্যকে বাতিল করে নূতন-পুরাতন ধারণার সংমিশ্রণে মিলিত একটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চান, যেটা আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে নাতিদীর্ঘাকারেই তুলে ধরছি।

পলাশী যুদ্ধের পর হতে বহু আন্দোলনে মুসলমান প্রজাবৃন্দ বারে বারে ইংরেজকে যারপরনাই ভাবিয়ে তোলে। তাই তারা মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের ধ্বংস করার সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে একদিকে প্রয়োগ করল সরকারি ব্যবস্থায় ফারসী ভাষাকে সরিয়ে 'ইংরাজির প্রবর্তন' অপর দিকে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' চক্রান্ত। তেমনিভাবে ইংরেজ হিন্দু ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের ও কিছু মুসলমানদের নিয়ে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে কংগ্রেস পার্টির জন্ম দেয়। ১৮৮৫ সালে ইংরেজ নেতা মিঃ হিউম ছিলেন এর উদ্যোক্তা।

"ওহাবী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতির সঙ্গে যে জাতীয় চেতনা ক্রমশ সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল তাহা ব্যর্থ করিয়া দেয়ার জন্য শাসনগত ব্যাপারে ভারতে একশ্রেণীর লোকের সহযোগিতা লাভই এই প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি। এই সময়ে উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীগণ কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিতেন। তখনকার দিনের উচ্চ শিক্ষিত ও পদ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বিশেষ করিয়া ইংরাজি ভাষার মারফত পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহারাই কংগ্রেসের কর্ণধার ছিলেন। ইহাদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত, স্যার ফিরোজ শাহ মেটা, আনন্দমোহন বসু, দাদা ভাই নৌরোজী, রানাডে, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহারাষ্ট্রের গোপাল রাও প্রমুখ মনীষী নব আলোক আন্দোলন প্রবর্তিত করে...............ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন।

(দ্রঃ পনেরই আগষ্ট', সত্যেন সেন পৃঃ ৯৮)

ঐ কংগ্রেস নামে মাত্র জাতীয় কংগ্রেস হলেও জনসাধারণের প্রতিনিধি ছিল না। এক কথায় জনসাধারণের সাথে সম্বন্ধবিহীন এক রাজনৈতিক দল। এ কথা উক্ত দলের সদস্য স্যার ফিরোজ শাহ মেটা নিজ মুখে স্বীকার করেছিলেন, "The Congress was indeed not the voice of the masses." অর্থাৎ কংগ্রেস প্রকৃত পক্ষে জনসাধারণের মুখপাত্র ছিল না।

(দ্রঃ পনেরই আগষ্ট, পৃঃ ৯৯)

ঐ কংগ্রেসেরই মধ্যে আবার একটি দল নিজেদের খাঁটি হিন্দু জাতীয়তাবাদীরূপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এঁরা হচ্ছে "মহারাষ্ট্রের গঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় এবং বাংলার অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিন চন্দ্র পাল। ইহারা

নিজেদের জাতীয়তাবাদী অথবা গোঁড়া জাতীয়তাবাদীরূপে অভিহিত করিলেন।" দ্রষ্টব্য পনেরই আগষ্ট, পৃঃ ৯৯। এরা লক্ষ্য করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমান জাতি প্রায় একাই লড়াই করে যাচ্ছে এবং এও বুঝতে পারলেন যে ইংরেজরা বেশ বিব্রতবোধ করছে এবং আমাদের দালাল শ্রেণীতে মর্যাদা দিয়ে নিজেদের রক্ষা করতে চায়। এঁরা আরও লক্ষ্য করেছিলেন মুসলমানদের সংগ্রাম শুধু ইংরেজ বিতাড়নের উদ্দেশ্যে হলেও সেই সঙ্গে নিজেদের ধর্মের পুরাতন ধারাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে তারা সমানভাবে সচেষ্ট। অপরদিকে হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় নাস্তিক বা খৃষ্টান হয়েছে, হচ্ছে বা হতে চলেছে, ফলে মুসলমান যখন একাই স্বাধীনতা নিয়ে আসবে তখন হিন্দু জাতির অস্তিত্ব না থাকতে পারে। তাই এরাও হিন্দু ধর্মের পুরাতন সব নিয়মনীতিকে আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধ পরিকর হলেন। ফলে তখন স্বাভাবিকভাবেই এঁদের সংগ্রামে সাম্প্রদায়িকতা মিশ্রিত হয়। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এই চরমপন্থী ও নরমপন্থীর বিভাজন চতুর ইংরেজেরই সুদক্ষ ইঙ্গিতে।

সে যাইহোক, আপাতত চরমপন্থী দলের উদ্দেশ্য ও কাজে প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগলো যে তারা পুরোপুরি মুসলমানবিরোধী দল। অতএব তাঁদের কার্যকলাপে দলে দলে সহজে জাতীয় কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগ দেওয়া নিঃসন্দেহে সম্ভব ছিল না। হিন্দু ধর্ম ধর্মের অনেক কুসংস্কার ও কুৎসিত প্রথাকে বর্জন করে যেমন উন্নত হতে শুরু করেছিল যথা বর্ণাশ্রমের কারণে অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, সীমাহীন প্রাত্যহিক পূজাপার্বণ প্রভৃতি। এই নতুন দলটি সমস্ত কিছু আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে ফলে সহজেই প্রাচীন সংস্কারপন্থী হিন্দুরা ঐ দলকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। সত্যেন সেন মহাশয় লিখেছেন, "বাল গঙ্গাধর তিলক এই সনাতনপন্থীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বালিকাদের বিবাহের বয়স দশ হইতে বারো বছর করার উদ্দেশ্যে আনিত একটি বিলের বিরুদ্ধে তিলক প্রবল আন্দোলন শুরু করিয়া দিলেন। রানাডে প্রমুখ উদারপন্থীগণ এই বিলের সমর্থক ছিলেন। অতঃপর তিলক গোহত্যা নিবারণের উদ্দেশ্যে গো রক্ষা সোসাইটি নামে একটি সমিতি সংগঠন করিলেন। এতদ্বতীত শিবাজী উৎসব, হস্তী মুখো দেবতা গণেশ প্রভৃতির পূজাও মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিলো। বাংলাদেশে শুরু হইল ধ্বংসের দেবতা কালী সাধনা।" "তথাপি হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপরে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিবার ফলে জাতীয় আন্দোলনের গতিধারা সম্মুখ গতি অবলম্বন না করিয়া পশ্চাদগামী হইয়া পড়িল। কারণ গো হত্যা নিবারণ, দেব দেবীর পূজা প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠান কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মসূচি হইলে অপরাপর ধর্ম সম্প্রদায় সেই প্রতিষ্ঠানকে প্রীতির চক্ষে দেখিবে ইহা আশা করা যুক্তিযুক্ত নয়। বলা বাহুল্য, এই গোঁড়া হিন্দু মনোভাবই শেষ পর্যন্ত মুসলমান সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।" (দ্রঃ পনেরই আগষ্ট, পৃঃ ১০০-১০১)

প্রচলিত স্বাধীনতার ইতিহাসে দেখা যায় মুসলমানগণ সামগ্রিকভাবে যেন হিন্দুদের সঙ্গে যোগ না দিয়ে ইংরেজদের পক্ষই অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু আসল ইতিহাস তা নয়, বরং মুসলমান জাতি প্রথম হতে শেষের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অনাহার আর অত্যাচারকে সানন্দে বরণ করে নিয়ে লড়তে লড়তে মৃত্যুর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তখন তারা শত চেষ্টা করেও যোগ দেওয়াতে পারেনি সামগ্রিকভাবে হিন্দু সম্প্রদায়কে। ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মত পোষণ করে চলেছে সেই বৃহত্তর সম্প্রদায় আর নানা পত্রপত্রিকায় গদ্য ও পদ্যে মুসলমান বিপ্লবীদের বিপ্লবকে বিদ্রূপ ও উপেক্ষা করা হয়েছে। তথাপিও মুসলমান বিপ্লবী দল চালিয়ে গেছেন তাঁদের বিপ্লবের চলন্ত ধারা। ১৯০৬ সালে দাদা ভাই নৌরোজী চরমপন্থীদের নিয়ে কলকাতায় কংগ্রেসে সর্ব প্রথমে স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বরাজের দাবি করা হয়। স্বাধীনতা আর স্বরাজ এক নয়। স্বরাজ হচ্ছে নিজেদের দাবি দাওয়া ইংরেজের কাছ হতে আদায় করা আর স্বাধীনতা হচ্ছে ইংরেজকে তাড়িয়ে নিজেরা ইচ্ছামতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। যাইহোক মুসলমান বিদ্বেষী এই দলের নীতির সঙ্গে মুসলমানগণ হাত মেলানোর পরিবর্তে স্বভাবতই বিরোধিতা করেছিলেন। (দ্রঃ সত্যেন সেনের রচনা)

গান্ধী কি সত্যই জাতির জনক?

স্বাধীনতা বিপ্লবী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কংগ্রেস তথা হিন্দ জনতার নেতার ভূমিকায় কাজ করেছিলেন। গান্ধীজি প্রকৃতপক্ষে সরল, সহজ ও সৎলোক ছিলেন। তাঁর শ্রম, ত্যাগ ও তিতিক্ষা নিশ্চয়ই একটা বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে যে বৈশিষ্ট্যের গুণেই দেশবাসী তাঁকে মহাত্মা উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। অবশ্য আধুনিক ইতিহাসবিদরা যাঁরা গান্ধীজিকে দেশ বিভাগের জন্য দায়ী করেন তাঁরা তাঁকে একটা রাজনৈতিক ভ্রান্ত পথিক মনে করে জাতির জনক বলে একবাক্যে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করেন। তাঁদের এই দ্বিধা যুক্তির মানদণ্ড কতখানি গ্রহণযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত বা কিসের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা গান্ধীর ওপর অনাস্থা রাখেন তাই ধারাবাহিকরূপে তুলে ধরা হচ্ছে।

মুসলমান জাতির নায়ক হিসেবে তখন কয়েকজন আলেম এই মনে করলেন যে, যে মুসলিম জাতি যুগ যুগ ধরে ইংরেজের সাথে সংগ্রাম করে তাদের শক্তি, সামর্থ্য ও আশা-ভরসা নিঃশেষ করে এনেছে এই মুহূর্তে হিন্দুদের সাথে তাদের রাগ বা দুঃখ করে সরে দাঁড়ালে মুসলিম জাতির আসল ইতিহাস পাল্টে যাবে। বিশেষ করে মাওলানা মহম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী এই দুই ভায়ের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা গান্ধীজির সঙ্গে বিশেষ এক গোপন বৈঠকে পরামর্শ করে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা প্রস্তাব করেন। তাতে সুফল ফলেছিল। দুই দল আপাতত এক হয়, একটি কংগ্রেস অপরটি খিলাফত কমিটি। খিলাফত নাম আরবী। আরবীয় চিন্তাধারা নামেই বোঝা যায়।

>Goto List

১৯২১ খৃষ্টাব্দে আহমাদাবাদে কংগ্রেসের মিটিং-এ খেলাফত নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের ইংরেজ তোষণ, আংশিক স্বাধীনতা, স্বরাজ প্রভৃতি কথার উচ্ছেদ করে মাওলানা হজরত মোহানী পূর্ণ স্বধীনতার দাবি করেন। এটি খুবই উল্লেখযোগ্য এবং অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল এই যে, ভারতে কংগ্রেসের সভায় স্বাধীনতার দাবি এই সর্বপ্রথম সেদিন মুসলমান খিলাফত কমিটির কথায় প্রায় সকলেই যখন চুপচাপ ভাবছিলেন তখন মহাত্মা. গান্ধী মহত্ত্বের পরিচয় দিয়ে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, "........The demand has grived me because it shows lack of responsibility." অর্থাৎ "পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি আমাকে বেদনা দিয়েছে। কারণ প্রস্তাবটি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক।"

গান্ধীজি লোক হিসেবে ভাল হলেও তিনি নেতা হিসেবে একেবারেই অনুপযুক্ত বলে অনেকের ধারণা। তাঁর সন্ন্যাসীর মন রাজনীতির সূক্ষ্ম স্তর উপলব্ধির উপযুক্ত ছিল না। তাই তাঁর মতের কোন দৃঢ়তা ছিল না এবং কোন্ কথা বললে তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আঁচ করতে পারতেন না। অনেকের মতে তাঁর ভুল ভ্রান্তিই দেশ বিভাগের প্রধান কারণ। ১৯২২ সালে পুনরায় লাক্ষ্ণৌতে খিলাফত কমিটি ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ স্বরাজের পরিবর্তে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করে–The best interests of India and the Moslems demand that in the Congress creed the term `Swaraj' be substitude hence forth by the term Complete independence". অর্থাৎ " ভারতবর্ষ এবং মুসলমানদের স্বার্থের খাতিরে এখন হইতে কংগ্রেসের মূলমন্ত্র 'স্বরাজের' পরিবর্তে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' হওয়া উচিত।"

এবারও কংগ্রেস মুসলমান সৃষ্ট প্রস্তাব সমর্থন না করে প্রকাশ করে "এতদ্বারা কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন হইবে।" দ্রঃ পনেরই আগষ্ট, সত্যেন সেন, পৃঃ ১০৬। কিন্তু তবুও হিন্দু-মুসলমানে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়নি। ঐ অবস্থায় ইংরেজ হিন্দু-মুসলমানের আকস্মিক মিলনে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। হঠাৎ গান্ধীজি ঐ ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে খিলাফত আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। গান্ধীজির নিজস্ব মতের কোন স্থায়িত্ব ছিল না, যে পক্ষ যা বোঝাতো তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাই সঠিক মনে করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এর অপর এক কারণ এই যে, তিনি ছিলেন খুব সরল ও সিধা মানুষ।

যখন তিনি মুসলমানদের বিপ্লবী চিন্তাধারা, সারা বিশ্বে তাদের প্রভাব, প্রচারসংখ্যা প্রভৃতি লক্ষ করতেন তখন মুসলিম ও কুরআন-হাদীসের পক্ষে অনেক বড় বড় কথা বলতেন যা মানুষকে চমক লাগাতো। ফলে গোঁড়া হিন্দুর দল তখন রেগে তাঁর সমালোচনা করতো তখন তিনি আবার এমন মত পরিবর্তন

করতেন যে, স্বাভাবিক স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি অবাক না হয়ে পারতো না। গান্ধীজির উদারনীতি মুসলমানদের এবং উদারপন্থী হিন্দুদের মনে এক আশার আলো জ্বালিয়ে তোলে। কিন্তু ১৯২৫ সালে লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে তিলক, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ মুসলমানবিদ্বেষী নেতারা হিন্দু মহাসভা গঠন করলেন। এদিকে গান্ধীকে মুসলমানের দালাল ইত্যাদি উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয় তখন গান্ধীজি দেখলেন যে মুসলমানরা তো আমাকে হিন্দু বলেই জানেন কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় যদি আমাকে অহিন্দু বলে মনে করে তাহলে আমার নেতা হয়ে প্রশংসা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই ১৯২১-২২ সালে যখন তিনি আন্দোলনের পুরোভাগে ভারতের অবিসংবাদিত নেতারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত; যখন খিলাফত কমিটির সহযোগিতায় হিন্দু-মুসলমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংহত ও সক্রিয় তখন তিনি গোঁড়া হিন্দুদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ঘোষণা করলেন, "I call myself a Santanist Hindoo because (a) I believe in the vedas, the upanishad, the puranas and all the gose by the name Hindoo Seriphires and therefore in avatars and rebirth; (b) I believe in the Varnasram Dharma, in a sense in my opinion strictly vedic, but not in its present, popular and crude sense; (c) I believe in the protection of the cow in its much larger sense than the popular. (d) I do not disbelieve in idol warship."

(Young India oct, 12, 1921)

অর্থাৎ "আমি নিজেকে প্রাচীনপন্থী সনাতনী হিন্দু বলি যেহেতু (ক) আমি বেদ, উপনিষদ, পুরাণ অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্র মতে যাহা কিছু বোঝায় সুতরাং অবতার বাদ এবং পুনর্জন্ম বিশ্বাস করি। (খ) বেদের বিধান সম্মত বর্ণাশ্রম ধর্ম আমি বিশ্বাস করি অবশ্য প্রচলিত ব্যবস্থায় আমার আস্থা নেই। (গ) প্রচলিত অর্থে নয় বৃহত্তর অর্থে আমি গোরক্ষানীতি সমর্থন করি। (ঘ) মূর্তি পূজা আমি অবিশ্বাস করি না।"

গান্ধীর উপর যাঁদের ধারণা ছিল তিনি হিন্দু মুসলমানের মিলনের মিলন সেতু, তাঁদের ঐ ধারণা উপরোক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বদ্‌লে যেতে বাধ্য হয়। হিন্দু মহা সভাও তাঁর দুর্বলতা লক্ষ্য করে তাঁর ওপর নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে থাকে। তাই স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামী সত্যেন সেন বলেন যে, "

ব্রিটিশ সরকারগণ আন্দোলন দমন করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক ভেদ বৈষম্যের সুযোগ লইয়াছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই বেদনীতির অস্ত্রকে তিলক ও গান্ধীবাদ তীক্ষ্ণ ধার করিয়াছে তাহাও নিঃসন্দেহ।"

(পনেরই আগষ্ট, পৃঃ ১০৯)

এরপর হতেই এক দলের ইঙ্গিতে গান্ধীজির কণ্ঠে ও কর্মে প্রকাশ হতে লাগলো আদর্শের পরিবর্তে ব্যক্তিগত আনুগত্য। এমনকি কোন প্রকার প্রতিবাদ করার উপায়ও বন্ধ হয়ে যায়। " যাঁহারা ইহার প্রতিবাদ করেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে থাকে। এই সম্পর্কে গান্ধীজির মন্তব্য উল্লেখযোগ্য Those who are insede the Congress, must remain silent and those who will not must go out" –দ্রঃ ঐ পুস্তক, পৃঃ ১০৯, ১ম মুদ্রণ। অর্থাৎ যাঁরা কংগ্রেসের ভেতরে আছেন তাঁরা অবশ্যই মৌনতা অবলম্বন করলেন আর যাঁরা এটা পারবেন না তাঁরা বাইরেই থাকবেন।

মুসলমান বিপ্লবীদের মধ্যে একজন বিচক্ষণ আলেম অনেক দিন হতে চিন্তা করছিলেন যে, কী উপায়ে সৈন্যদের খেপানো যায়, কী উপায়ে সরকারের শয়তানীর স্বরূপ তাদের কাছে পৌঁছানো যায়। যাঁরা ঐ মারাত্মক এবং দুঃসাহসিক কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা হুসাইন আহমাদ (রহ), মাওলানা মহম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় নৌবাহিনী কতৃর্ক বোম্বেকে কেন্দ্র করে মাদ্রাজ ও করাচীতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। ১৯ ফেব্রুয়ারি তলোয়ায় ট্রেনিং স্কুল (বোম্বে) হতে শুরু করে হিন্দু-মুসলমান বিশ হাজার নাবিক ইংরেজের পতাকা নামিয়ে হিন্দু-মুসলমান তথা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পতাকা উত্তোলন করে সারা ভারতে ইংরেজ জাতিকে হতভম্ব করে তোলে এবং মনে করিয়ে দেয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মহা বিপ্লবের আগ্নেয়গীরণের চিত্র। সমগ্র ভারতে যাঁরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন তাঁরা খুশির পরশে প্রতীক্ষা করছিলেন ইংরেজের পরাজয় পর্ব অবলোকন করার।

এই নাবিক দলের বিদ্রোহের পূর্বে তাঁদের অভাব-অভিযোগ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দরবারে পৃথকভাবে জানানো হয়েছিল কিন্তু কোন দলই সাহায্য করেনি। তবু তাঁরা নিজেরাই কমিটি গঠন করে এই ধর্মঘট পালন করেন। ইংরেজ সরকার বন্দুকের নল দিয়েই ঘুম পাড়াতে চেয়েছিল ঐ বিশ হাজার নৌসেনা এবং তাঁদের সমর্থক হাজার হাজার ভারতবাসীকে। ভারতীয় পদাতিক সৈন্য বাহিনী ইংরেজকে জানিয়ে দিল ভারতীয় হয়ে ভারতবাসীর বুকে গুলি করা তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। অগত্যা ব্রিটিশ বাহিনীকে নিয়েই তখন ঝাঁপ মারতে হয় ইংরেজকে। ২১ ফেব্রুয়ারি ক্যাসেল ব্যারাকের বাইরে প্রবল সংগ্রাম শুরু হল।

মিঃ গড্ ফ্রে ঘোষণা করলেন যদি ভারতবাসী নিরস্ত্র না হয় তাহলে নৌশক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেলেও ইংরেজ শক্তি দিয়ে বিদ্রোহ দমন করবার জন্য সরকার প্রস্তুত। এই সময়ে লীগ ও কংগ্রেস কেউ যোগ দেয়নি, "উপরন্তু কংগ্রেসের পক্ষ হতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ধর্মঘট ও হরতাল পালন করবার জন্য জনসাধারণের নিকট এক পাল্টা নির্দেশ জারি করিলেন।" ঐ পুস্তক দ্রঃ)। অবশ্য সাধারণ মানুষের গান্ধীজির অহিংসনীতি অবলম্বনের পরিপ্রেক্ষিতেই ঐ ব্যবস্থা, কিন্তু আসল কথা তা নয়। "কংগ্রেস হিংসা ও অহিংসাকে বরাবরই সুবিধা অনুযায়ী গ্রহণ ও বর্জন করিয়া আসিয়াছে।" অবশ্য লীগ ও কংগ্রেস ধর্মঘটীদের আত্মসমর্পণ করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জানিয়ে দিল, যাতে আর তাদের ওপর গুলি না চলে বা তাদের সাজা-শাস্তি না হয় তার ব্যবস্থা করা হবে।

এখানে বেশ প্রমাণ হয়, কংগ্রেস ও লীগ আসলে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত ছিল না বরং গদি ও ক্ষমতার লড়াইয়ে জেতাই তাদের টার্গেট ছিল। এমনকি কংগ্রেস ও লীগ যে সেনাপতি ঐ দল ও সমর্থকদের ধ্বংস করতে সাবধান বাণী করেছিলেন তার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেননি। উপরন্তু কংগ্রেস নেতা সর্দার প্যাটেল বলেন, "নৌ-ধর্মঘটীদের অস্ত্রধারণ করা উচিত হয়নি।

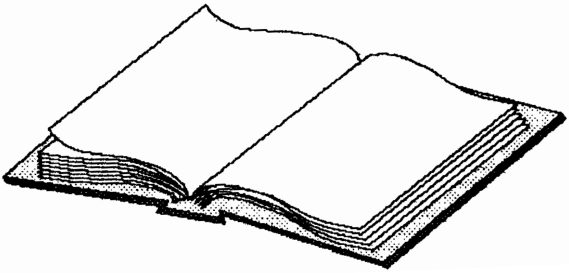

এমনকি নৌ-বাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে প্রধান সেনাপতির অভিমতকে অভ্যর্থনা করিলেন।"(১৫ আগষ্ট, পৃঃ ৪২)। আজাদকেও প্যাটেলের নীতি সমর্থন করতে হয়েছিল। তিনিও প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করেননি। হয়তোবা গদিতন্ত্রের কারণ হতে পারে।

মহাত্মা তার স্বভাবসিদ্ধ সুরে ১৯৪৬ সালে ৭ এপ্রিল 'হরিজন' পত্রিকায় মন্তব্য করলেন, "I Migiht have understood it if they had combined from top to bottom, that would of course have meant delivering India over to the rabbe. I would not want ot live up to 125 to witness that Consummation, I would ratther berish in the flamws." অর্থাৎ আমি এটা উপলব্ধি করতে পারতাম যদি তারা সমগ্র দেশকেই দলে টানতে পারত। উচ্ছৃঙ্খল জনতার হস্তেই ভারতের সমর্পণ বুঝাত। ১২৫ বছর বেঁচে থেকে সেই পরিণতি দেখার ইচ্ছা আমার নেই। তারচেয়ে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেওয়াই শ্রেয়। এক কথায় গণঅভ্যুত্থানকে অভিহিত করা হল, "উচ্ছৃঙ্খল জনতার উদ্ধত আচরণরূপে।"

(দ্রঃ ১৫ আগষ্ট পৃঃ ৪৩)

সবচেয়ে বোঝার বিষয় এই যে, ইংরেজের ক্ষতি হলে গান্ধীজির অহিংসনীতি যেমন গর্জে উঠতো ভারতবাসীর ওপর ইংরেজদের অত্যাচারের ক্ষেত্রে তাঁর ঐ নীতি তুলনামূলকভাবে গর্জে উঠতো না। দেশ এখন চায় ইংরেজ রাজ তাড়াতাড়ি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাক। কিন্তু দয়ালু নেতারা ইংরেজের ওপর বড় মমতা রাখতেন আই এ, আই, সি, সির বোম্বাই অধিবেশনে ৭ জুলাই দেশবাসীকে উগ্রতা ত্যাগ করে শান্ত হওয়ার জন্য দেশপ্রেমিক গান্ধীজি গোষণা করলেন, "ইংরেজরা ভারত ছাড়িবার জন্য নিজেরাই খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের শান্তিতেই যাইতে দেওয়া উচিত, আন্দোলন করিয়া তাহাদের যাইবার পথে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়।" ঐ সময় কংগ্রেসের মহামান্য সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে মিঃ রাজা গোপালাচারী ছাব্বিশে নভেম্বর স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে জামসেদপুর অধিবেশনে বোঝাতে চাইলেন ইংরেজের রাজত্বে কোন অসুবিধা নেই। সুতরাং স্বাধীনতার বিপক্ষে তিনি বললেন, "আমরা তো ইতিমধ্যেই স্বাধীন হইয়া গিয়াছি। ....একদল রোগী আছে, যাহারা আরোগ্য লাভ করিয়াও মনে করে অসুখ সারে নাই এবং তদনুযায়ী ঔষধ সেবন করিতে থাকে।" (দ্রঃ ঐ পুস্তক) মীরাটের কংগ্রেস অধিবেশনে মিঃ প্যাটেল বলেন, "ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামের আর প্রয়োজন নাই। তাহারা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।" (দ্রঃ ঐ পুস্তক পৃঃ ৫৮-৫৯)

এদিকে কলকাতা, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা এমনভাবে আরম্ভ হলো, যা পশুত্ব অপেক্ষা ঘৃণ্য। আচার্য নরেন্দ্র দেব মীরাট অধিবেশনে বললেন, "বর্তমান দাঙ্গা কংগ্রেস ও লীগের সংগ্রাম।" ২৪ এপ্রিল নয়া দিল্লীতে মুসলীম লীগের সর্বময় কর্তা মিঃ জিন্নাহ বললেন, ÍAs a result of my talk, I feal that the viceroy is determined to play fair." অর্থাৎ আলাপ আলোচনার ফলে আমি বুঝিয়াছি যে, বড়লাট ন্যায়পরায়ণতার সহিতই কাজ করিবেন। (দ্রঃ পনেরই আগষ্ট)

নানা তথ্যের উপর গবেষণা করলে বলা যায় কংগ্রেস যেন ধনী ও চোরাকারবারিদের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান ছিল। ভারতে কোটি কোটি অভাবী মানুষ যখন মোটা ভাত আর সামান্য একটুকরো কাপড়ই বড় বলে জানে তখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিজেদের মধ্যে লড়াই, ইংরেজদের তোষণ, অনুরোধ আর আবেদনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুখর। তাই কংগ্রেসের মধ্যে কিছু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নিরপেক্ষ কর্মী কংগ্রেস ভেঙে ফেলার ইচ্ছা পোষণ করেন। এ উক্তির যথার্থতা প্রমাণে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি শংকর রাও দেও-এর করেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাই যথেষ্ট। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, "And yet there were Congressmen who were not only thinking in terms of dissolution of the congress, but were openly advocating it. They thought that either the Congress had no usful role to play or that even it had, it would not be in a position to do so in the future. For, they asserted that the Congress, even if it had not passed into the hands of the capitalists and blackmarketers, was being dominated by them." অর্থাৎ অনেক কংগ্রেসসেবীই কংগ্রেসকে ভেঙে দেয়ার কথা বলিতেছেন। তাঁহাদের মতে এই প্রতিষ্ঠানটি ধনিক শ্রেণী ও চোরাবাজারিদের পুরোপুরি কবলস্থ না হইলেও তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত।

ভারতীয় কংগ্রেসের সংগ্রাম সম্পর্কে ডাঃ পট্টভী সিতারামিয়া স্পষ্টই বলেছেন, "The fight of Congressis is the fight of the Indian capitalist against the British capitalist." অর্থাৎ কংগ্রেসের সংগ্রাম ব্রিটিশ ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর সংগ্রাম। তবুও কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ নেতা গান্ধীজির মতামত অন্তত স্বতন্ত্র হতে পারতো কিন্তু তাও নয়। যখন সোদপুরে গান্ধীজিকে কংগ্রেসের সঙ্গে ধনিক শ্রেণীর সম্পর্কের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয় তাতে তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে হতভম্বই হতে

হয়। তিনি বলেন, "My relation with the capitalist is the relation of Congress with the capitalist." অর্থাৎ আমার সঙ্গে ধনকুবেরদের যে সম্পর্ক, কংগ্রেসের সঙ্গে ধনীদের সেই সম্পর্ক। (উপরোক্ত তথ্যগুলো মিঃ সেনের লেখা ঐ পুস্তকের ১৬১-১৬৩ পৃঃ দ্রঃ)

আগেই বলা হয়েছে যে, গান্ধীজি কী কথা বল্‌লে কী পরিমাণ ফল দাঁড়াবে তা অনেক ক্ষেত্রে আঁচ করতে পারতেন না। গান্ধীজির কাজকর্ম তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট তদানীন্তন বিখ্যাত ইংরেজি পত্রিকা "হিন্দুস্থান টাইমস্"-এর সম্পাদক ছিলেন দেবীদাস গান্ধী, যিনি গান্ধীজিরই পুত্র। আর লক্ষণীয় বিষয়টি এই যে, পত্রিকাটির মালিক ছিলেন তাঁদের পরম প্রিয় ধনকুবের মিঃ জি ডি বিড়লা। কংগ্রেসের সম্বন্ধে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগকেও বোঝা কঠিন নয়, কারণ আজ যাঁরা মুসলিম লীগে গতকাল তাঁরাই ছিলেন বেশির ভাগ কংগ্রেসেরই হাতের পুতুল বা দলের দালাল। আর একথা তো পূর্বেই বলা হয়েছে যে, গান্ধীজির অহিংসনীতি একটা পলিসি মাত্র, যা সুবিধামত প্রয়োগ করা হতো। যুদ্ধে কাটাকাটি-মারামারি যদি অহিংসনীতির বিরুদ্ধেই হয় তাহলে কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের সময় তিনি ঐ নীতি প্রয়োগ করেননি কেন? পরন্তু বিপরীত মন্তব্য করেছিলেন। যেমন, ২৯ অক্টোবর তিনি তাঁর প্রার্থনা সভায় বলেছিলেন, "শ্রীনগরে ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট সৈন্য প্রেরণ করা সমীচীন হইয়াছে।"

অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি জাপানীদের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং এ সম্পর্কে জুলাই মাসের এক বক্তব্যে গান্ধীজির যে মর্মবেদনা ব্যক্ত হয়েছিল তার সাথে কাশ্মীর সম্পর্কিত বিবৃতির কোথাও কোন সামস্য বিহিত হয়নি। শুধু তাই নয়, তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ইউনিয়নযুদ্ধ ঘোষণার যৌক্তিকতাও স্বীকার করেছেন।" (১৫ আগষ্ট, পৃঃ ১৬৫ দ্রঃ)

এক কথায় কংগ্রেস ও লীগ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে সত্যি কিন্তু সে লড়াই ইংরেজদের সঙ্গে নয়, লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের লড়াই, হিন্দু আর মুসলমানের লড়াই। ইংরেজ তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতে যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয়, তার সমস্ত ব্যবস্থা করেছিল। এমনকি বিলেতি পিস্তল, বন্দুক, গোলা-বারুদ হিন্দু ও মুসলমানদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল। পয়লা জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন রুয়েদাদ ঘোষিত হওয়ার মাত্র কয়েক দিন পূর্বে লন্ডনের বিখ্যাত 'রেওস্ নিউজ' পত্রিকায় ভারতের বোম্বাইস্থ সংবাদদাতা মিঃ আর্নেস্ট সাটি যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তা ঐ রূপ-Enough arms and amunitions to equip more than a millionmen have been smuggled into India in the last few years. The arms range from pistol to tommy-guns. It is said that The muslim Leagur have weapons for half a million and Congress, the Hindoo organision, has about the

Many Hindus and Muslim are reliably reported to be organizing their own private defence groups, turning their houses into strong points, and preparing for a prolonged stuggle if necessary, by laying in stoods of food." অর্থাৎ গত কয়েক বছরে দশ লক্ষ লোককে সুসজ্জিত করার মত পিস্তল ও টমি বন্দুক ভারতবর্ষে গোপনে আমদানি করা হয়েছে। প্রকাশ যে, মোসলিম লীগ এবং কংগ্রেস উভয়েই যথাক্রমে এর অর্ধেকের অধিকারী। বিশস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে যে, বহু হিন্দু ও মুসলাম নিজেদের ঘরবাড়ি ঘাঁটি রূপে প্রস্তুত করেছে। এবং দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের জন্য (প্রয়োজন হলে) খাদ্য সংগ্রহ করে রাখছে। (দ্রঃ ঐ পুস্তক পৃঃ ১১৮)

উপরোক্ত তথ্যবহুল আলোচনায় কংগ্রেস ও লীগের স্বরূপ বোঝা সম্ভব অর্থাৎ নেতাদের বেশির ভাগের স্বরূপ। কিন্তু হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান সমর্থক অনেকে এমন ছিলেন যাঁরা পরিস্থিতির ঘৃণ্য অবস্থা জেনেও কিছু করতে পারেননি। অথচ উভয় দল হতে নানা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরে দাঁড়াতেও সক্ষম হননি। প্রকৃত দেশহিতৈষী দরিদ্রর কল্যাণকামী ও ধর্মভীরু মুসলমান পুরাণ সংগ্রামীদের মুসলিম লীগের প্রচার প্রসার আর ইংরেজের গোপন ঢালাও সহযোগিতা এমনই রূপ নিয়েছিল যে, তাঁরাও ঐ ইংরেজ সৃষ্ট লীগে নিজেদের যুক্ত করতে বাধ্য হন। হিন্দুদের মধ্যে মহান নেতা অনেকেই কংগ্রেসের লেবেল এঁটে কংগ্রেসে প্রবেশ করতে হয়। যথা–শ্রী সুভাষ চন্দ্র, শ্রী চিত্তরঞ্জন প্রমুখ ।

ইংরেজ সৃষ্ট কংগ্রেস ও লীগের লড়াইয়ে কে জয়ী হলো এই প্রশ্নের উত্তরে সত্যেন সেনের ভাষায় বলা যায়–"অখণ্ড ভারতের ভিত্তিতে কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ষাট বছরের লড়াই যে খণ্ডিত ভারতের দাবির ভিত্তিতে মুসলিম লীগের এক বছরের সক্রিয় প্রচেষ্টার নিকট পরাজিত ইহা সাধারণ মানুষের অনুমানের বাইরে ছিল।"

মিঃ জিন্নার পলিসি কংগ্রেস পলিসির চেয়েও মারাত্মক ছিল। ১৯৪২ সালের দুর্ভিক্ষে মানুষ যখন উলঙ্গ অর্ধোলঙ্গ অনাহারে হাজারে হাজারে মরতে লাগলো তখন কংগ্রেসের নেতাদের 'স্বরাজ' গবেষণায় ওদিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু লীগ রিলিফ নোঙ্গরখানা খুলে হাজার হাজার মানুষকে খেতে দিয়ে এবং শ্রমিক শ্রেণীতে অনেককে চাকরির ব্যবস্থা করে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করে। অনেকের মতে গান্ধীজির রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা এবং ডিক্টেটারি বা একনায়কত্ব আর পদ প্রিয়তাই কংগ্রেসকে উন্নত করে জনসাধারণের উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়নি। তাই বিখ্যাত এক সাহিত্যিক এবং প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার একজন নায়ক গান্ধীজির পদত্যাগ চেয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "যেখানে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন উক্তি, স্বাধীন অভিমত বারম্বার প্রতিরুদ্ধ হইয়া জাতীয় মহা সমিতিকে পঙ্গু করিয়া আনিয়াছে, সেখানে মহাত্মা অথবা কাহারও নিরবচ্ছিন্ন সার্বভৌম আধিপত্য কল্যাণকর নয়।" (সত্যেন সেনের 'পনেরই আগষ্ট', পৃঃ ৩৩)। এই মূল্যবান বজ্র উক্তিটি ধারাল কলমনবীশ শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের।

>Goto List

আধুনিক সমীক্ষায় প্রমাণিত হয় কংগ্রেস সর্বভারতীয় জনসাধারণের মুখপাত্র তো ছিলই না, এমনকি সাম্প্রদায়িক দল হিন্দু মহাসভাও কংগ্রেসকে অস্বীকার করেছিল। প্রমাণস্বরূপ নিম্নরূপ উক্তি গভীর প্রণিধান যোগ্য–" হিন্দু মহাসভা দাবি করল যে তারাই ভারতের হিন্দুদের প্রতিনিধি, কংগ্রেস নয়। কংগ্রেস অভিজাত সম্প্রদায়ের, সাধারণ লোকের সাথে তাদের যোগ নেই। কংগ্রেসের নীতি শুধু তোষণনীতি।" (দ্রঃ 'অবিস্মরণীয়', গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৪৪)

ইংরেজ মাঝে মাঝে কিছু ভারতবাসীকে নানা কারণে প্রকাশ্য প্রয়োজনে বন্দি করে কারাগারে পাঠালেও তাদের অনেকের ওপর ইংরেজের দারুণ আস্থা ছিল। অনেকে মনে করেন, গান্ধীর ওপরও ইংরেজের খুব ভরসা ছিল কারণ তিনি সব সময় বিপ্লবীদের অন্য পথে অর্থাৎ অহিংস পথে চালাতে চেষ্টা করতেন। তাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যা মিস্ উইল কিনসনের কথায়–"ইংরেজের ভয় গান্ধীকে ততটা নয় যতটা ভয় খেপা ছেলের দলকে। গান্ধী ইংরেজের সবচেয়ে বড় পুলিশ অফিসার অর্থাৎ আমাদের পোষা লোক।" (অবিস্মরণীয়, গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র, ১ম মুদ্রণ, পৃঃ ৪১৮)

গান্ধী কেন ইংরেজ তোষণনীতি গ্রহণ করেছিলেন তা নিয়ে অনেকে এই জন্যই ভাবেন যাঁকে কেন্দ্র করে ইউরোপের ছায়া ছবিতে দেখানো হলো "Every body loves music"। সারা ইউরোপ কি তোলপাড়! কী বিশ্রী ছিল সেই ছবি! যেখানে দেখানো হয়েছে অর্ধ উলঙ্গ ইংরেজ রমণীর কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে নেংটি পরা গান্ধীজি উন্মত্ত হয়ে বলড্যান্স করছেন। তবুও তা প্রতিবাদের বিষয়। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ভুল-ত্রুটিকে সারা দেশে ফলাও করে দেখিয়ে একটা দেশের জাতির নায়ককে তথা ভারতবাসীকে অপমান করা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। শুধু ওটাই নয় বরং "ইণ্ডিয়া স্পিকস্" এবং "বেঙ্গলী" ইত্যাদি ছবিতেও ঐ সমস্ত কুকীর্তি দেখানো হয়েছে। কংগ্রেসের অনেক নামজাদা লোকই তো তখন ছিলেন কিন্তু প্রতিবাদ কেউ করেননি। যখন জার্মানী ও ভিয়েনায় ঐ সমস্ত ছবি দেখিয়ে ভারতের সম্মান নাশ পর্ব প্রতিপালন করা হচ্ছিল তখন বাংলার বিপ্লবী নেতা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র আপত্তি জানালেন Archbishop cardinal Intizar এর কাছে। ফলে ভিয়েনায় ঐ ছবি দেখানো বন্ধ হয়। হিটলারকে তিনি অনুরোধ জানালেন ঐ ছবি বন্ধ করতে; সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীতেও ঐ বই দেখানো বন্ধ হয়। সুভাষের যোগ্যতাকে অনেকেই ভয় করতেন, বিশেষ করে যাঁরা বুঝতেন তিনি থাকলে তাঁর ওপর নেতা হয়ে থাকা মুশকিল।

যাইহোক, ঐ সুভাষ চন্দ্র যিনি গান্ধীর কত বড় বহু প্রচারিত সুনাম ঢেকে ফেললেন সেই সুভাষ চন্দ্রকেই পরে জোর করে প্রকাশ্যে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। প্রমাণস্বরূপ শ্রী গঙ্গানারায়ণ চন্দ্রের লেখা ঐ অবিস্মরণীয় পুস্তকের ১ম সংস্করণের ৪১৯ পৃষ্ঠার তথ্য খুবই স্মরণীয়–"সেই সুভাষ চন্দ্রকেই পরে গান্ধীজি কংগ্রেস

থেকে তাড়ালেন তিন বছরের জন্য. অপরাধ বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। আজও মনে পড়ে দেশের সেই দুর্দিনে যিনি সুভাষ চন্দ্রকে প্রথম আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।”

তাহলে যাঁর বা যাদের মতে বিপ্লবী হওয়ার অপরাধ তাঁকে বা তাঁদের Father of Nation বা জাতির জনক বলা হয়—এটা ঠিক না অবশ্যই ভুল তা নিয়ে আজ অনেকেই ভাবছেন। বর্তমানে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যাঁদের নিয়ে মাতামাতি হৈ চৈ করা হয় তাঁদের অধিকাংশই ‘হঠাৎ নেতার দল’। বরং তাঁরা অনেকে ইংরেজের পক্ষেই ওকালতি করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের আসল ইতিহাস ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ বলে কথিত ১৮৫৭ খৃঃ মহা বিপ্লবই হচ্ছে আন্দোলন বা সংগ্রাম। আর ঐ সংগ্রামে সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ, যোগ্যতা ও বীরত্বের বিচার করে নূতন করে ইতিহাসকে ঢেলে সাজানো যদি প্রয়োজনই থাকে তবে তা অবশ্যই সংবর্ধনীয়। কিন্তু তবুও সেই সাধু প্রকৃতির কোমলপ্রাণ মানুষকে বৃদ্ধ বয়সে প্রকাশ্য রাজপথে ক্রোধ চরিতার্থ করার জন্য গুলি করে হত্যা করা ন্যূনতম সভ্যতাকেও অতিক্রম করেছে। আর তাঁর ছবি পোড়ানো ও মূর্তি চূর্ণ করা অনেকের দৃষ্টিতে বাহুল্য উচ্ছ্বাস প্রবণতা ছাড়া কিছু নয়।

শ্রী অরবিন্দ

শ্রী অরবিন্দও বঙ্কিমের মত ঋষি উপাধি পেয়েছেন। ১৮৭২ সালে জন্ম আর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন গোঁড়া মুসলমান বিদ্বেষী নেতা। শক্তির বোধনকল্পে কালী, দুর্গা, বগলা, ভবানী প্রভৃতি দেবীর পূজা করতেন আর ভক্তিবাদ, লীলাবাদ প্রভৃতিকে বিশ্বাস করতেন আর শিবাজীকে তিনি তাঁর দলের আদর্শ করেছিলেন। এক কথায় বলা যায়, বঙ্কিম যখন মারা যান তখন তাঁর প্রথম শ্রেণীর যুবক শিষ্যদের মধ্যে অরবিন্দ অন্যতম। অরবিন্দ শুধু মুসলমান জাতির শত্রু ছিলেন না; বরং যেকোন অহিন্দু তাঁর বা তাঁদের শত্রু ছিল তাতে ইংরেজরাও পড়ে। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপতরায় মুসলমান ও অহিন্দু ধর্মবিরোধী আর্য সমাজে দীক্ষিত।........জনশক্তির বোধন ও শত্রুনিধন কল্পে বরদায় অরবিন্দ বগলা মূর্তি গড়িয়ে পূজা করেন (১৯০৩) গুপ্ত মিতিতে নবাগত কর্মীদের তিনি একহাতে গীতা এবং অপর হাতে তলোয়ার দিয়ে বিপ্লবীদের শপথ গ্রহণ করাতেন। লাল, বাল, পাল অভিহিত এই তিনজন আর অরবিন্দঘোষ ছিলেন চরমপন্থী দলের চার স্তম্ভ। এঁদের মধ্যে অরবিন্দ ছাড়া কেউ হিংসাত্মক বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন না।” (বাঙ্গালী রাষ্ট্রচিন্তা, পৃঃ ২৬০)। ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘অনুশীলন দল’ প্রায় পাঁচশত শাখা নিয়ে গুপ্ত সমিতি চালু হয়েছিল। যেখানে শরীরচর্চা ও অস্ত্রচর্চা অনুশীলন হতো আর তার সভ্যরা বেশির ভাগই ডাকাতি, লুট ও হত্যার সঙ্গে জড়িত হলেন। কিছু নেতা তা সমর্থন

>Goto List

করতেন না।"প্রমথমিত্র, সরলা দেবী প্রথম নেতৃস্থানীয় অনেকেই গুপ্ত হত্যা, ডাকাতি ইত্যাদি সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করতেন না।"−(দ্রঃ ঐ পৃঃ ২৬২)। অতএব প্রমাণিত হচ্ছে বাকি অরবিন্দের দলের প্রায় সকলেই ঐ কাজে লিপ্ত ছিলেন। সমিতির বিভিন্ন শাখা ১৯০৯ সালের মধ্যে একের পর এক বেআইনি ঘোষিত হয়।... পরের দিকে নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই দু'টি বিপ্লবী দলের অনেক কর্মী ও নেতা কংগ্রেসের সদস্য পদ ও কর্মপন্থা অবলম্বন করেন।"−(দ্রঃ ঐ পুস্তক পৃঃ ২৬২) কংগ্রেস এতদিন ছিল ইংরেজের পোষ্য অনুগত, এখন হতে নুতন মানুষদের আগমনের 'অনুশীলন ও যুগান্তর' দলের যুগ্ম যোগে মুসলমান বিদ্বেষ যুক্ত হয়। আজও তার জের চলে আসছে। ফলে ভারতের ইতিহাসে যেন তিনিই তত বড় হীরো, যিনি যতবেশি মুসলমান বিদ্বেষী।

ঋষি অরবিন্দের ঋষি "বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাই ছিল তাঁর প্রেরণার উৎস। আনন্দমঠের আদর্শে অরবিন্দ ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠা উদ্যোগী হয়ে ছিলেন" দ্রঃ ঐ পুস্তক ২৬৩। অরবিন্দ বিলেতে আই, সি, এস পরীক্ষায় ফেল করেন। অনেকে বলেন ইচ্ছা করে ফেল করেছিলেন। যদি তাই হয় তাহলে গোটা কোর্স পড়ার দরকার কি ছিল তা তিনিই জানতেন। সেখানেও তিনি সন্ত্রাসবাদী দল গঠন করেন দাদাভাই নৌরজির নেতৃত্বে। "ঐ সময় সেখানে Lotus and Daggre নামে গঠিত প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের এক গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হন"−দ্রঃ ঐ পুস্তক, পৃঃ ২৬৪। "অভ্যন্তরীণ বিবাদ বিসংবাদের ফলে অরবিন্দের গুপ্ত সমিতি গঠন ও বৈপ্লবিক তৎপরতায় প্রথম প্রয়াস (১৯০২-৪) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। −দ্রঃ ঐ। ঋষির শিষ্য ঋষি অরবিন্দ কলকাতায় একটি পত্রিকার সম্পাদানা করেছিলেন। পত্রিকাটির নাম "বন্দেমাতরম"−দ্রঃ ঐ।

গুপ্ত হত্যা ডাকাতি তা তাঁর নীতিতে রাজনৈতিক কারণে ইংরেজবিরোধী নেতার ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জেল হয়। প্রায় এক বছর জেলে হাতুড়ি পেটাই হয়ে তাঁর মনের গতি বদলে গিয়ে মুখের সুরও বদলে যায়। তাছাড়া আরও কারণ জেল হতে বেরিয়ে তিনি দেখলেন তার যেন কোন সমাদরই নেই। আসলে তাঁকে লোকে শ্রদ্ধা করতো বলে যে ধারণা তাঁর ছিল সত্যিকার কথায় তা শ্রদ্ধা ছিল না; বরং ছিল বিপদের ভয়ে ভক্তি যা মূল দৃষ্টিতে ভক্তির মতই মনে হয়। (দ্রঃ Sri Aurobindo, Speeches, 1952, P-52)

জেল হতে বেরিয়ে অরবিন্দ কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও উৎপীড়ন সম্পর্কে বলেন যে, "দমননীতি যেন ইশ্বরের হাতুড়ি−যা দিয়ে পিটিয়ে তিনি আমাদের একটি শক্তিশালী নেশনে পরিণত করতে চায় এবং আমাদের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে বিশ্বকে পরিচালনা করাই তাঁর ইচ্ছা।" (দ্রঃ ঐ)। পুলিশের ভয়ে ঋষি অনেক দিন আত্মগোপণ করে শেষে রাজনীতি ছেড়ে পালিয়ে যান এবং যোগ সাধনা জপ্‌তপ্‌ প্রভৃতি করে ঋষি নাম অক্ষুণ্ণ রাখেন।

"অরবিন্দের সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যাওয়াকে অনেকে পলায়নী মনোবৃত্তি বলে মনে করেন।" (দ্রঃ বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা)। জেলখানা হতে বেরিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন ঠাকুর বাসুদেব তাঁকে জানিয়েছেন স্বাধীনতার চেষ্টা করা ভুল, ভগবানে আত্মসমর্পণ করাই ভাল পথ। আর রাজনৈতিক স্বাধীনতা কাজের জিনিস নয়: বরং বাজে বস্তু।"এখন সকলের কর্তব্য যোগস্থ হয়ে কাজ করা–ভগবানে আত্মসমপর্ণ করাই হল যোগ সাধনার প্রথম পদক্ষেপ"। কারাগারে তিনি বাসুদেবের এই মর্মেই 'আদেশ' পেয়েছিলেন। তাছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেও তিনি খুব বড় করে দেখেননি"। (দ্রঃ ঐ ২৭০)।

"বিবেকানন্দ ও তিলকের মতো শ্রী অরবিন্দ গীতার মর্মবাণী সর্বভূত হিতে বিশ্বাসী ছিলেন.............তবে হিতবাদীদের পন্থায় সংখ্যালঘুরা উপেক্ষিত হয়েছে। পক্ষান্তরে গীতার মর্মানুসারী ভারতীয় দার্শনিকরা মনে করতেন যে পরম দিব্য যেখানে সর্বব্যাপী সেখানে সকল মানুষের প্রতি সমান দৃকপাত তথা সর্বাত্মক মঙ্গল সাধনই চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।"–দ্রঃ ঐ পৃঃ ২৮৪। এই উদ্ধৃতিতে প্রমাণিত হয় যে, কাগজে-কলমে বা বক্তব্য বলনে ঋষি মহাশয় গীতা ভক্ত হলেও আসলে তিনি বঙ্কিম ভক্ত ছিলেন তাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনা করা তাঁর নীতিবিরুদ্ধ ছিল। তবে গুরু বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর একটা বিশেষ পার্থক্য এই, তিনি ইংরেজদের ভাল নজরে দেখতেন না: বরং বিরোধিতা করতেন। "তাঁর মতে কম্যুনিষ্টদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পরিমাণ মুষ্ঠিমেয় ক্ষমতাসীনের আধিপত্য।" দ্রঃ ঐ। আবার কংগ্রেস দলকেও তিনি ভাল চোখে দেখতেন না প্রকাশ্যভাবে ঘৃণা করতেন, তিনি লিখেছেন–

"A body like the Congress, which represents not the mass of the population, but a single and very limited class could not honestly be called national," অতএব তাঁর নীতি বলিষ্ঠ ও উদারতা হতে বহু দূরে ছিল। তিনি নিজেই টিকে থাকতে পারেননি তাঁর মতবাদের ওপর। কাটতে মারতে পছন্দ করতেন কিন্তু নিজের ওপর আঘাত বরদাস্ত করার ধৈর্য তাঁর ছিল না তাই তিনি তাঁর মতের পথে চলতে চলতে প্রাণ না দিয়ে রাজনীতি হতে সরে দাঁড়ালেন। প্রকৃত ঋষিদের চরিত্রে দেখা যায়, তাঁরা প্রস্ফুটিত সুগন্ধি ফুলের মত, তার সুঘ্রান সকলের জন্য সমানভাবে পরিবেশিত কিন্তু ঋষি বঙ্কিমকে দেখেছি শুধু ইংরেজকেই সুগন্ধ দান করেছেন আর সামান্য দিয়েছেন ভদ্র হিন্দুদের এবং ইংরেজ ভক্ত জমিদারদের। আর ঋষি অরবিন্দকে দেখলাম তাঁর সুগন্ধ শুধু গীতাওয়ালাদের জন্যই নির্ধারিত। মুসলমান, কমিউনিস্ট, তখনকার কংগ্রেস সব তার কাছে উপেক্ষিত। আমাদের দেশের বর্তমান ছেলেরা ঋষি দেখেনি যদি এই দুই ঋষিকেই তারা ঋষি মনে করে তাহলে আসল ঋষিদের প্রতি অবিচার করা হয় না কি?

স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৫ সালে মারা যান। তাঁর পিতা ছিলেন ডেভিড হেয়ারের ছাত্র ও শিষ্য। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর তাঁর সব দায়িত্ব তিনিই নিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে ইংরেজরা বিলেত হতে আই. সি. এস পাস করিয়ে শ্রীহট্টের ম্যাজিষ্ট্রেট করে দেন। পরে একটি মিথ্যা মামলায় তাঁর চাকরি চলে যায়। তিনি বিলেতে গিয়ে আবেদন করেও ব্যর্থ হন। দেশে এসে নিজেই একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং কয়েক বছর পর ইংরেজ বড় লাট লর্ড রিপনের নামে কলেজ পরিণত করেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার দশ বছর আগে হতে তিনি রাজনীতিতে নামেন।

কংগ্রেসের জন্মদাতা ছিলেন মিঃ হিউম। ১৮৯৫ ও ১৯০২ খৃষ্টাব্দে পুনা আহমাদাবাদে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। তাঁর স্যার উপাধির বিবরণ দেওয়ার বিষয়ে বিরক্তিবোধ হচ্ছে। ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিম তাঁকে স্বাগতম জানান এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মানার জন্য দেশবাসীকে আবেদন জানান। (দ্রঃ ১৩১৩ বঙ্গাব্দের রবীন্দ্রনাথের 'দেশ নায়ক প্রবন্ধ)

সবচেয়ে ভাববার কথা. "রাজদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালের ১৮ মার্চ 'রৌলট বিল' কেন্দ্রীয় আইন সভায় বিধিবদ্ধ করার প্রতিবাদে সারা দেশে তুমুল বিক্ষোপ শুরু হয়।" তখন ইংরেজদের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে ভারতবাসীকে মাছি মরার মত মরতে হয়. যেখানে রবীন্দ্রনাথকে চক্ষু লজ্জায় নাইট উপাধি ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছিলো কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ সেখানে নীরব থাকেন। (দ্রঃ বাঃ রাষ্ট্রচিন্তা পৃঃ ১৬৪)। কেন নীরব থাকেন তার উত্তর আজ অজানা নেই। স্যার টাইটেলের মর্যাদা তিনি রক্ষা করেছিলেন। তবে তাঁর গুণাবলীর মধ্যে প্রখর বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি মুসলমান জাতিকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মতে রামমোহন ইংরেজদের রঙ্গে রঞ্জিত ছিলেন আর চৈতন্য মুসলমান সংস্কৃতিতে প্রভাবিত। সুতরাং হিন্দু জাতি চৈতন্যের আদর্শে চললেই মুসলমান জাতিকে বুঝতে শিখবে। (দ্রঃ Speeches of Surendranath Banerjee. 1865,1880, ed by R. C. Polit, p. 21 FmÄ Ibid p. 54 (Speech on Chaitanya at the students Association on July 15. 1876)

তিনিও কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার কথা একদিনও বলেননি, তবে তিনি যা বলেছিলেন তা হচ্ছে এই "We have on wish to assume sovereign authority" তিনি চেয়েছিলেন "শান্তি, সমৃদ্ধ সমানাধিকার।" তবু কিন্তু অন্য নেতাদের তুলনায় তিনি আপেক্ষাকৃত যোগ্য ও সুন্দর চরিত্রের ছিলেন তথাপি তার নাম নিয়ে হৈ চৈ নেই কেন'? বাজারে ক্যালেণ্ডারে ছবিতেই বা অদৃশ্য কেন'? একটা কারণ হচ্ছে এই তিনি ভারতের

হিন্দু ও মুসলমান প্রধান জাতি দুটির মিলন ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে মুসলমান জাতিকে উদার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর কথা– The Progress of India does not mean the progress of the Hindus alone. It means the advance ment of Hindus and Mohamedans alike. It means that Hindus and Mohamedans must march han in hand" (দ্রঃ Speech of surendranath Banerjee by R. J Mittra, p.95)

তিনিই উপলব্ধি করেছিলেন মুসলমান শুধু সর্ব ভারতীয় জাতি নয়; বরং সর্ব জাগতিক জাতি আর স্বাধীনতার সমস্ত সংগ্রাম তাদেরই অবদান প্রায়। অতএব এদের বাদ দিয়ে স্বাধীনতা আনা যায় না আর যদিও ভবিষ্যতে স্বাধীনতা আসে তাহলে মুসলমান জাতিই হবে তার জনক।

স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৬৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হয় এবং ১৯০২ সালে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি মোটামুটি রামমোহনের প্রভাবপ্রাপ্ত ছিলেন তাই ব্রাহ্ম সমাজে তাঁর যাতায়াত ছিল। আমরা জানি তিনি রামকৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন। তাই এও ভাবি বিবেকানন্দ যদি এত বড় পণ্ডিত, প্রতিভাবান, বিপ্লবী ও বুদ্ধিমান হন তাহলে তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ আরো জানি কত না মহান। আমরা বিবেকানন্দকে যেভাবে পেয়েছিলাম তাতে জানতাম তিনি অত্যন্ত ধর্ম ভীরু ব্যক্তি ছিলেন, বেদ ও গীতার মতাদর্শভাবে চলতেন। একটি অক্ষরেও এদিক ওদিক যেতেন না। আর কালির বাণীপ্রাপ্ত হয়ে একেবারে হিন্দু ধর্ম প্রচারে আমেরিকা গিয়ে এমন বক্তৃতা দেন যে, গোটা আমেরিকা নাকি তোলপাড়।

আসলে তিনিও সেকালে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বি, এ, পাস করেছিলেন এবং ইংরেজকে সরানো যায় কি না তার জন্য হাবভাব বুঝতে প্রায় সারা ভারত ঘুরলেন, কিন্তু হিন্দু জাতির কোন সাড়া তিনি পাননি। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করার জন্য আমি ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তি জোট তৈরি করতে চেয়েছিলাম। সে জন্যই আমি হিমালয় থেকে কন্যা কুমারীকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি, সেই জন্যই আমি বন্দুক নির্মাতা স্যার হাইরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু দেশের কাছ হতে আমি কোন সাড়া পাইনি। দেশটা মৃত। (দ্রঃ ভুপেন্দনাথ দত্তের 'স্বামী বিবেকানন্দ' ঃ ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১০৮)

এবার তাঁর আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারটা আসলে যে টাকা আনতে যাওয়া তা সহজে কেউ বিশ্বাস করবে না আর আমেরিকার চিকাগোতে বক্তৃতা যা

>Goto List

দিয়েছিলেন তা তেমন কোন যুক্তি ও মুক্তির কথা নয়, শুধু টাকা ও রুটির কথাই মুখ্য ছিল, তাও বিশ্বাস করা মুশকিল তাই প্রমাণের জন্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি "সতের দিন ধরে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনের উদ্বোধন অধিবেশন ও বিভাগীয় অধিবেশনগুলোতে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাগুলোতে এ কথাই সবচেয়ে বেশি ফুটে ওঠে, ধর্ম নয় রুটির ভারতীয়দের সর্বাগ্রে প্রয়োজন" (দ্রঃ সৌরেন্দ্র মোহনের বাঃ রাঃ চিঃ পৃঃ ২২৫)

"স্বামীজি আমেরিকা যাওয়া উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলেছিলেন- দেখ ভাই, এ দেশে যে রকম দুঃখ দারিদ্র্য, এখানে এখন ধর্ম প্রচারের সময় নয়। যদি কখনও এদেশের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করতে পারি, তখন ধর্মের কথা বলব। সেই জন্য কুবেরের দেশে যাচ্ছি; দেখি যদি কিছু উপায় করতে পারি। (দ্রঃ স্বামী অখণ্ডানন্দের 'স্মৃতি কথা'-১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১০৮)

আমেরিকা হতে তিনি লণ্ডনে যান অর্থাৎ তখনকার মনিবের দেশে সেখানে একটি সুন্দরী রমণী তাঁর প্রতি মুগ্ধ হন এবং নিজেকে সর্ম্পূণভাবে নিবেদন করেন। সুন্দরীর নাম ছিল মিস মার্গারেট নোবল্। তিনিই নিবেদিতা নাম নিয়ে বিবেকানন্দের সঙ্গে সারা জীবন ছায়ার মত ছিলেন। তিনি শিক্ষিতা এবং রাজনীতি সচেতন নারী সন্দেহ নেই। তবু কেন তিনিই ছায়ার মত স্বামীজিকে বরণ করলেন তাও বিতর্কিত বিষয়। ওখান হতে ভারতে ফিরেই ভারতের শ্রেষ্ঠতম ঘাঁটি কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তখন স্বামীজির হাতে অঢেল টাকা। কী শর্তে এত টাকা চালাক ইংরেজ দিল তাও সহজেই অনুমেয়। মিশনের মাধ্যমে অনেক শিক্ষিত মানুষ রাজনীতি হতে পরিত্রাণ পেয়ে স্বর্গ রাজ্যের স্বপ্ন দেখতে লাগলো। তাই স্বামীজিকে ঘোষণা করতে হয়েছিল রাজনীতির সঙ্গে মিশনের কোন সম্বন্ধ নেই। "The aims and ideals of the Misson being purly spiritual and humanitarian it shall have no connection with politics." (hs" The life of Swamin Vivekananda by his Eastern and Western Disciples. 1960. p 501)

আসলে রামকৃষ্ণের নাম অনুসারে মিশনের নাম হলেও রামকৃষ্ণ মিশন মানেই বিলেতি মিশন। আর যাদের দান নিতে হয় তাদের মানও রাখতে হয়। আজও যারা ইংরেজদের টাকা নিচ্ছে, টাকা নেওয়া ও দেওয়ার পেছনে কারণ আছে আর সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে অতি মারত্মক। তাহলে স্বামীজি কি রামকৃষ্ণকে অবোধ শিশুর মত চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করেননি? উত্তরে বলা যায়, না। যেহেতু একবার মিশনের বড় বড় সভ্য এবং রামকৃষ্ণের প্রাক্তন বিখ্যাত প্রত্যক্ষ শিষ্যদের সঙ্গে তার কর্মসূচি নিয়ে তর্ক বিতর্ক হয় ফলে তিনি সদম্ভে বলেন, "I am not a servant of Ramkrishna or any one, but of him only who serves and helps others, without caring for his own Mukti." (দ্রঃ ঐ p 507) অবশ্য উত্তরেই প্রশ্ন বোঝা যাচ্ছে। আর এও দেখা যাচ্ছে, আমি রামকৃষ্ণ অথবা কারো চাকর নই, কিন্তু তার চাকর যে অপরকে সাহায্য করে নিজের মুক্তির ধার ধারে না।

তিনি প্যারিসে দ্বিতীয় সফর করেন, সেখানে বক্তৃতায় তিনি ভারতের শালগ্রাম শিলা ও শিবলিঙ্গের পূজার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই সময় একজন রুশ বিপ্লবীর সাক্ষাৎ হয়। (দ্রঃ 'স্বামী বিবেকানন্দ' , ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ পৃঃ ৫)।

তাকে যত বড় ধর্মভীরু বলে আমাদের শেখানো হয়েছে আসলে তিনি তা ছিলেন না অর্থাৎ গোঁড়া ছিলেন না; বরং প্রগতিবাদী ছিলেন তাই তিনি গীতা পড়ার চেয়ে ব্যায়াম করা উত্তম মনে করতেন। তাই তাঁর উক্তি "You will be nearer to Heaven through football than through the study of the Gita" (hs" The complete Works of Swami Vivekananda, 1960, Vol 3,p 242) বিবেকানন্দ ব্রাহ্মণ্যবাদের একচেটিয়া প্রভুত্বেরও নিন্দা করেছেন। "তিনি চাইতেন সবাই যেন ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করে।" অস্পৃশ্যতাবাদের তিনি নিন্দা করেছেন। (বাঙ্গালীর রাষ্ট্র চিন্তা পৃঃ ২-৪) "আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ক্রিয়া কলাপে উচ্চ বর্ণের একচেটিয়া অধিকারবাদ উপনিষদে স্বীকৃত। বিবেকানন্দ প্রাচীন চিন্তার সব কিছুকেই অন্ধভাবে গ্রহণ করেননি"। -দ্রঃ The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples, 1960, p, 624)।

স্বাধীনতার জন্য ভারত ঘুরেছিলেন, বিপ্লবের জন্য বন্দুক নির্মাতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু আমেরিকা, ব্রিটেন ও প্যারিস ঘুরে এসে, অর্থপ্রাপ্ত হয়ে আর স্বাধীনতার কথা না বলে হিন্দু জাতিকে মুসলমানের মত সর্ব সভ্য জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তাই ইংরেজদের ওপর দোষারোপ না করে দোষ দেশবাসীর ওপরেই নিক্ষেপ করতেন। ভারতের দুর্দশা ও দুর্গতির জন্য দায়ী ইংরেজ নয়, দেশীয় "সমাজপতি ও পূর্ব পুরুষদের" ত্রুটি। তিনি বিপ্লবীদের ক্রীতদাস উপাধি দিয়ে বলেছিলেন, "এদেশের ক্রীতদাসরা মুক্তি চাইছে অপরকে ক্রীতদাস করার জন্য" (দ্রঃ The Complete works of Swami Vivekannda. 195. Vol, 4,p.368)

ইংরেজের ওষুধ খাওয়া বঙ্কিম যেমন দেশ ও সরকারকে দেবতার আসনে বসিয়ে ভারতবাসীকে ভেড়ায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন, বিবেকানন্দও যা বলেছিলেন, তাতে সেই গন্ধই পাওয়া যায়। "আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্য দেবী হন, অন্যান্য অকেজো এই

কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নেই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত"। এখানে তিনি কেমন দেব দেবতা ভক্ত স্বামীজি ছিলেন তাও বোঝা যাচ্ছে আর যতদিন তিনি মাতৃ পূজা করতে নির্দেশ দিচ্ছেন ততদিন তাঁর বাঁচবার সম্ভাবনা ছিল না অর্থাৎ তাঁর জীবদ্দশায় তিনি দেশবাসীকে বিপ্লবের পরিবর্তে মাতৃভূমিকেই একমাত্র 'কেজো' ও জাগ্রত দেবতা হিসেবে পূজা করিয়ে ইংরেজের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সততা পালনে শৈথিল্য বা বিশ্বাসঘাতকতা করেননি।

আরও স্পষ্ট প্রমাণের প্রয়োজনে বলা যায় তিনি সরকারকেও পূজার আরাধ্য বিষয় বা বস্তু মনে করতে দ্বিধা করেননি। যেমন তিনি লিখেছেন, "রাজা প্রজাদিগের পিতা-মাতা, প্রজারা তাহার শিশু সন্তান। প্রজাদের সর্বতোভাবে রাজ মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিত।" (দ্রঃ 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' খণ্ড ৬, পৃঃ ২৩৬ বর্তমান ভারত)

নিঃসন্দেহে তাঁর রাজনৈতিক মনোভাব জানার জন্য উপরোক্ত মন্তব্যগুলো যথেষ্ট আর ধর্মভীরুতার গভীরতাও পূর্বে পাওয়া গেছে তবু পরিশেষে বিবেকানন্দের আর একটি বাণী দিয়েই প্রসঙ্গ খতম করতে চাই। তিনি বলতেন, "First bread and then religion" অর্থাৎ প্রথমে রুটি তার পরে ধর্ম। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, "রুটি চাই—যে ঈশ্বর কেবল স্বর্গের চিরন্তন সুখের কথা বলে, অথচ রুটি যোগাতে পারে না তার প্রতি আমার কোনও বিশ্বাস নেই।" (দ্রঃ ঐ)। বিবেকানন্দকেও স্বাধীনতার ইতিহাসে স্থান দেওয়া কী করে যাবে তাও চিন্তার বিষয়।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশের নেতারা যাঁদের নেতা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জন্ম আর ১৯৪১ এ তাঁর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা প্রাচুর্য এত বেশী যে বিরুদ্ধে কোন সত্য তথ্যও মিথ্যার মত হবে বলেই অনেকেই কিছু বলতে সাহস করেন না। তিনি ডিগ্রিধারী শিক্ষিত না হলেও প্রকৃত যোগ্যতাযুক্ত সুপ্ত সনদে বিজড়িত ছিল তাঁর প্রতিভা। বঙ্কিমের যেমন বন্দেমাতরম ধ্বনী ভারতে প্রতিধ্বানিত তেমনি রবীন্দনাথের 'জনগণ মন অধিনায়ক' গানটিও সারা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। অতএব তাঁর স্বাধীনতায় অবশ্যই যে অবদান থাকবে তা আশা করা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু অন্য পক্ষ রবীন্দ্রনাথকে সাহসিকতার সহিত সমীক্ষা করে তার অন্য ইতিহাস খাড়া করতে প্রস্তুত। গোঁড়া হিন্দুদের 'হিন্দু মেলায়' তাঁর 'হিন্দু মেলার উপহার' পঠিত হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র চৌদ্দ। তাঁর লেখার অন্যতম গুরু ছিলেন বঙ্কিম। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা নিবিড় যোগ ছিল। কিন্তু

বঙ্কিমের মত তাঁর লেখায় মুসলমান জাতি পীড়িত ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ সকলের কাছেই প্রিয় হতে চেয়েছিলেন, আর সফলও হয়েছিলেন প্রায়। কবির আমলে কংগ্রেসকেও খুশী করতে এবং ইংরেজ সেবক বঙ্কিমেরও স্নেহ ভাজন হতে এক ঢিলে দুই পাখী মারার মত ১৮৯৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সভায় 'বন্দেমতরম' মন্ত্রটি শুধু পাঠ করেননি; বরং তাতে নতুন সুর সৃষ্টি করলেন এবং আজও সেই সুরে ঐ মন্ত্র বা গান পড়া চলছে। তখন হতে বঙ্কিম একেবারে রবীন্দ্রনাথের গুণ গাইতে দ্বিধা করতেন না। ফলে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের সুনজরে বিশেষভাবে ধরা পড়লেন। ইংরেজরা তখনই ঠিক করে ফেলল তাঁকে খুব উচ্চাসনে বসিয়ে তাঁকেও বঙ্কিমের মত সরকারের তোতা পাখি করা চলতে পারে। কবির কবি প্রতিভা যে জীবন্ত ও চলন্ত ছিল তাতে সন্দেহ ছিল না।

মুসলমান জাতির প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদের তিলক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জেলে যান। তখন কবি অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং ঐ হিন্দু মহাসভায় এক নম্বর নেতা তিলকের মামলা খরচা চালানোর জন্য একটি অর্থভাণ্ডার খোলেন। (দ্রঃ বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃঃ ৩২২)। গোঁড়া হিন্দুরা যখন দেখলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদান সবই প্রায় মুসলমানদের আর হিন্দু নেতাদের অবস্থা এক এক জনের এক এক রকম তখন তাঁরা শিবাজীকে আকবরের মত সাজিয়ে গুজিয়ে ছত্রপতি বীর বলে ঘোষণা করতে চাইলেন। সেই জন্য ১৯০৪ অন্য মতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে শিবাজী যদিও মারাঠা তবুও তাঁকে হিন্দুরা ব্রাহ্মণের ভূমিকায় দাঁড় করাতে শিবাজী উৎসব পালন করা হয়। এবং সেই উৎসব ভবানী পূজা করা হয়। ঐ রকম উৎসবেও কবি 'শিবাজী উৎসব' নামে স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। শুধু তাতেই শেষ নয়, যাঁরা সেদিন হতে শিবাজীকে গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতায় প্রকাশ ও প্রচার করার দায়িত্ব নেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথমশ্রেণীর অর্গাইনাইজার। শিবাজীর প্রশংসা আর মুসলমান সম্রাটদের দুর্নাম করা যাদের ব্রত ছিল রবীন্দ্রনাথ সে দলের লোক নন বলেই জানতাম। কিন্তু লিখেছেন"ম্লেচ্ছ সেনাপতি এক মহাম্মদ ঘোরী–তস্করের মত আসে–আক্রমিতে দেশ", (রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৩০২)

শিবাজী সম্বন্ধে আলোচনা আওরঙ্গজেবের পাশে বিশেষভাবে হয়েছে তাতে শিবাজীর ডাকাতি জীবনের তথ্য ও প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ সত্য স্বীকার করেও তাঁর প্রতিশ্রুতির ভূমিকা পালন করেছেন। তাই শিবাজীর জন্য লিখেছেন "বিদেশীর ইতবৃত্ত দসুবলি করি পরিহাস অট্টহাস্য রবে তব পুণ্য চেষ্টা বত তস্করে নিষ্ফল প্রয়াস এই জানে সবে॥"

তিনি আরও লিখেচেন "এক ধর্ম রাজ্য হবে এ মহাবচন করিব সম্বল। "কবিতার শেষে কবি বলেছেন "মারাঠা সাথে আজি হে বাঙালী, এক কণ্ঠে বল জয়তু শিবাজী।"

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ৩০ এপ্রিল স্বাধীনতার জন্য ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং তাঁর ফাঁসি হয়। আর ঐ ১৯০৮ সালেই ঠিক তার পরের মাসেই 'চৈতন্য লাইব্রেরী হলে' রবীন্দ্রনাথ "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধ পড়ে শোনান ২৫ মে। যদি খুলে না বলা হয় তাহলে মনে হবে ঐ প্রবন্ধে বুঝি ইংরেজ বিতাড়নের কথা ছিল, কিন্তু না। তাতে ছিল উল্টোই। "শ্বেত ও কৃষ্ণ, মুসলমান ও খ্রীষ্টান, পূর্ব ও পশ্চিম কেউ আমাদের বিরুদ্ধ নহে, -ভারতের পুণ্য ক্ষেত্রেই সকল বিরোধ এক হইবার জন্য শত শত শতাব্দী ধরিয়া অতি কঠোর সাধনা করিবে বলিয়াই................।" যখন মানুষ একটি জিনিসই বুঝেছিল ইংরেজ চলে যাক। দেশ স্বাধীন হলেই শোষণ পরাধীনতার অশান্তি হতে, বিভেদের অশান্তি হতে রেহাই পাওয়া যাবে। তখন কবি যা বলেছেন "ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ সর্বসাধারণের প্রতি ঐক্য বন্ধনের সূত্র-এ কথাও গ্রাহ্য নয়, কেননা ইংরেজ দেশ ত্যাগ করিলে রক্ত পিপাসু বিদ্বেষ বুদ্ধি................পরস্পরে ক্ষতবিক্ষত করবে। সুতরাং বৈচিত্র্যের মধ্যে, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যই একমাত্র কার্য"। অন্যত্র কবি বলেছেন, "একথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোন পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।" বঙ্গভঙ্গ যখন রদ হয় তখন ১৯১২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। কত রক্তারক্তি, গুলি, জেল প্রভৃতির তাণ্ডব নৃত্য। কবি তখন সপক্ষ-বিপক্ষ কোন পক্ষেই না গিয়ে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য খুব কর্মব্যস্ত ছিলেন। অর্থাৎ ঠিক ঐ সময়েও তিনি বিলেতে, বিলেতে একবার নয় বহুবার তাঁকে যেতে হয়েছে। এনয় যে তাঁর প্রতিভার বিচার হয়েছে তার লেখার ওপর তারপর তাঁকে তাঁর প্রাসাদে থাকা অবস্থায় পুরস্কৃত করা হয়েছে। বরং ১৯১২ তে বঙ্গভঙ্গ হয় আর ১৯১৩ তে তিনি দেশে ফেরেন অক্টবরে। আর তাঁর পেছনে পেছনে নভেম্বর মাসেই তাঁর নোবেল প্রাইজের সংবাদ পৌঁছালো। কোন শর্ত হয়েছিল কিনা কোন রাজনৈতিক চক্রান্ত ছিল কিনা তা নিয়ে অনেকে মাথা ঘামালেও আমরা ওদিকে না গিয়ে; বরং তাঁর লেখা ও কাজ দেখতে দেখতে এগিয়ে যাওয়াই ভাল মনে করি।

১৯১৪তে আবার আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণ আরম্ভ হয়। কোন ইঙ্গিতে কার হাত ছানিতে বারে বারে বিলেত যেতে হয়েছিল তাও বিতর্কিত ব্যাপার। বঙ্গভঙ্গ ঝামেলার কয়েক বছর পরে আবার ইংরেজদের সঙ্গে বিরাট ঝগ্লাট আরম্ভ হয় অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের নামে। পরিণাম মারধর আচার-বিচার অনেক কিছু। ঠিক ঐ কাণ্ড ঘটার পূর্বেই বিলেত চলে গেলেন তিনি ১৯২০ সালে। ফিরলেন ১৯২১ সালে এসেই দেখলেন সকলের একরোল প্রায়। ইংরেজী স্কুল-কলেজ বর্জন কর বিলেতী সভ্যতা স্তব্ধ কর। সঙ্গে সঙ্গে 'শিক্ষার মিলন' নামক প্রবন্ধ লিখে কলকাতা ইউনিভারসিটিতে পড়লেন তাতে তিনি বললেন, "বিদ্যার জোরেই ইউরোপ বড়, সুতরাং বিদ্যায়তন বর্জনে সমূহ ক্ষতি।

বিদ্যায়তনকে বরং প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলন ভূমি করতে হবে।" (কালান্তর বিশ্বভারতী, ১৩৫৫ সংস্করণ, পৃঃ ১৬৯)

এমনকি "গান্ধীজির অসহযোগ নীতি যে সত্যের আহ্বান নয়" রবীন্দ্রনাথ তা স্পষ্ট ভাষায় বলেন। (দ্রঃ রবীন্দ্র রচনাবলী চতুর্বিংশ খণ্ড, পৃঃ ৩৩১-৩৩৪)

অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। চোর, ডাকাত ও গুণ্ডাদের সম পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করতেন স্বাধীনতা বিপ্লবীদের। "রাজনৈতিক খুন-জখম লুটপাটের জন্য যারা দায়ী তারাও অন্য অপরাধীদের চেয়ে কম ঘৃণ্য নয় বলে তিনি মনে করতেন।" (দ্রঃ বাঙ্গালী রাষ্ট্রচিন্তা, পৃঃ ৩৪৮)

অথচ কবি অন্য স্থানে বলেছেন, "ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা– হে রুদ্র নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা–তোমার আদেশে যেন বাসনায় মম–সত্যবাক্য বলি ওঠে খর খড়্গ সম–" এই পরস্পরবিরোধী দুটি কথার কোন্‌টি সমাজ গ্রহণ করবে?

গান্ধীজি যখন প্রয়োজনে বিলেতী জিনিস বর্জন ও বিদেশী কাপড় পোড়ানের নীতি সমর্থন ও গ্রহণ করেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, "গান্ধীনীতি সংকীর্ণ চিন্তাপ্রসূত জাতীয়তাবাদে প্রতিষ্ঠিত–ভারতের সনাতন, বৈশ্বিক ভাবধারা থেকে গান্ধীনীতি পৃথক। বিদেশী বস্ত্র পোড়ানোয় জাতি বিদ্বেষই প্রকাশ পায়।" (দ্রঃ বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা)

বঙ্কিম যাঁদের নিকট অনাদর্শ তাঁদের নিকট কবিকে তাঁর ভাব শিষ্য বলা কবির ওপর অবিচার করা হয়, যদি প্রমাণ না থাকে। তাই প্রমাণের জন্য এটাই যথেষ্ট হবে "বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আমাদের সাহিত্য প্রাসাদের বড়ো সিংহদ্বারটা খুলিয়া দিয়াছিলেন। এখন আবার তাহার এক একটি মহলে চাবি খুলিবার সময় আসিয়াছে 'ঐতিহাসিক চিত্র' অদ্য 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক একটা প্রকাণ্ড রুদ্ধ বাতায়ন রহস্যাবৃত হর্ম্য শ্রেণীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।" আজ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার কদর্য প্রচলন যাতে ইতিহাসের ব্যভিচার বলা যায় তারও প্রবর্তনে রবীন্দ্রনাথের

সীমাতিরিক্ত সমর্থন ছিল। অবশ্য তিনি জানতেন তাতে সামান্য ইতিহাস আর বাকি মিথ্যা, তুচ্ছ ও অলীক, অলিখিত লোক কথার ভেজাল ছাড়া কিছু নয়। তবুও তিনি 'ঐতিহাসিক চিত্র' ত্রৈমাসিক পত্রিকার জন্য লিখেছেন, "এখন সংগ্রহ ও সমালোচনা ইহার প্রধান কাজ। সমস্ত জনশ্রুতি, লিখিত এবং অলিখিত তুচ্ছ এবং মহৎ, সত্য এবং মিথ্যা, অথবা অতিরঞ্জিত, যাহা কেবল স্থানীয় বিশ্বাসরূপে প্রচলিত তাহার মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায়। কারণ ইতিহাস কেবল তথ্যের ইতিহাস নহে, তাহা মানব মনের ইতিহাস, বিশ্বাস। আমরা একান্ত আশা করিতেছি, এই সংগ্রহ কার্যে 'ঐতিহাসিক চিত্র' সমস্ত দেশকে আপন সহায়তায় আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিবে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর লিখিত "ইতিহাস" পুস্তকে লিখেছেন, "কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, নিরুৎসুক হিন্দুগণ মরিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মুসলমানরা যুদ্ধ করিয়াছে, আর হিন্দুরা দলে দলে আত্মহত্যা করিয়াছে। মুসলমানদের যুদ্ধের মধ্যে একদিকে ধর্মোৎসাহ, অপর দিকে রাজ্য অথবা অর্থ লোভ ছিল, কিন্তু হিন্দুরা চিতা জ্বালাইয়া স্ত্রী-কন্যা ধ্বংস করিয়া আবাল বৃদ্ধ মরিয়াছে, মরা উচিত বিবেচনা করিয়া বাঁচা তাহাদের শিক্ষা বিরুদ্ধ সংস্কার বিরুদ্ধ বলিয়া। তাহাকে বীরত্ব বলিতে পারো, কিন্তু তাহাকে যুদ্ধ বলে না, তাহার মধ্যে উদ্দেশ্য অথবা রাষ্ট্রনীতি কিছুই ছিল না।" উপরোক্ত মন্তব্য মুসলমান জাতির সস্তা প্রশংসা থাকলেও তিনি হিন্দু জাতিকেই মুসলমানের মত গড়ে তোলার জন্যই কষাঘাত করেছেন।

কবি প্রথমে জীবনে 'হিন্দু মেলা' বঙ্গদর্শনে বিজড়িত রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু ধর্মে আত্মপ্রকাশ করে। অনেকের মতে পরে তার নিরপেক্ষতার অদ্ভুত নীতি ইংরেজ তোষণে পরিণত হয় এবং ইংরেজ জাতির সঙ্গে তথা ইউরোপে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয় এবং নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত হন। পরে ইংরেজদের দেওয়া স্যার উপাধি ও নাইট উপাধিও প্রাপ্ত হন। জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজদের ভারতীয়দের ওপর পৈশাচিক অত্যাচারগুলি চালালোর প্রতিবাদে দেশে বিক্ষোভ এবং ক্রোধ চরম সীমায় পৌছায়। তখন রবীন্দ্রনাথের ওপর অনেকের ভক্তিতে ভাটা পড়ে। যেহেতু দেশ যখন রক্তাক্ত বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ তখন তিনি বিলেত গমন আর ডিগ্রি গ্রহণে ব্যস্ত। তখন কিন্তু কবি 'নাইট' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু নোবেল প্রাইজ ত্যাগ করা বা আরো অনেকে যা আশা করেছিলেন তা তারা পাননি। এখানে প্রশ্ন, তহলে কি রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা চাননি? যদি তাই হয়, যদি তাঁর স্বাধীনতায় অবদানের পরিবর্তে বাধাদানই বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে, তাহলে সারা ভারতে তাঁর বিখ্যাত রচনা "জনগণ মন অধিনায়ক জয়হে ..." গানটি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেল কেমন করে? তাহলে কি বঙ্কিমের বন্দেমাতরমের মত এই সঙ্গীতের অবস্থা?

স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা লড়েছেন অস্ত্র দিয়েই হোক আর বক্তৃতা দিয়েই হোক, তাঁদের স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে, জেলে দেওয়া হয়েছে, ফাঁসি দেওয়া বা চাবুক মারা হয়েছে আর যাঁরা কলম নিয়ে লড়েছেন তাদের লেখাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব ঐ বিপ্লব, যুদ্ধ ও জাগরণের সময় হিন্দু-মুসলমান যারা সরাসরি পান নোবেল প্রাইজ, স্যার নাইট প্রভৃতি উপাধি আর বিলেতে গিয়ে ফুলের মালা আর মানপত্র এবং তা যে কেন তা সহজেই বোঝা যায়। তবে অনুমান করা আর প্রমাণ পাওয়া দু'টি কিন্তু এক জিনিস নয়।

কবি রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত একটি বিতর্কিত বিষয়। কবি জানতেন মুসলমান জাতি আল্লাহ ছাড়া কোন বস্তু বা স্থানকে ভাগ্য বিধাতা বলে মেনে

নিতে পারেন না তবুও তিনি তৈরি করলেন তার কবিতা "জনগণ মন অধিনায়ক জয়হে ভারত ভাগ্যবিধাতা ...।" কবি তাহলে এত বড় ভুল করলেন কি করে! একজন সুদক্ষ শিল্পীর এত বড় গলদ থাকা তো সম্ভব নয়। আমাদের বক্তব্য, কবির কবিতা লেখা ভুল হয়নি। আসলে যারা ঐ কবিতাটিকে জাতীয় সঙ্গীত বলে ভোটাভুটি করে ঠিক করেছেন, ভুল তাদের। আসল তথ্য প্রকাশ করলে আমাদের মহামান্য নেতাদের অনেকেই ইংরেজদের খাস দালাল ও কেনা গোলাম মনে হওয়া অসম্ভব নয়।

আমাদের ভারত স্বাধীনতার স্বীকৃতি পেয়েছে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে আর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ১৯৪১ খৃস্টাব্দে। অর্থাৎ স্বাধীনতার অর্দ্ধযুগ পূর্বে। সুতরাং পরাধীন ভারতের নাগরিক হিসেবে তাঁর দ্বারা ঐ কবিতাটি রচিত হয়েছিল। তাই জাতি, ধর্ম নির্বিশেষের জন্য জাতীয় সঙ্গীত সুন্দর হয়নি। আলোচনার আর একধাপ অগ্রসর হলে যা পাওয়া যাবে তাতে হয়তো রবীন্দ্রনাথ এবং আমাদের জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারকদের প্রচারিত সম্মানের ভাবমূর্তি বিকৃত বিশ্রী হয়ে যেতে পারে।

১৯১২ সালে শোষণ, অত্যাচার আর অনাচারের প্রতীক ইংরেজ সম্রাট পঞ্চম জর্জের সম্মানেই ডিসেম্বরে দিল্লীর লাল কেল্লায় কবি ঐ ইংরেজ বাহাদুরকেই লিখিত কবিতা উপহার দিয়েছিলেন। "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা"ই হচ্ছেন মহামতি পঞ্চম জর্জ। অন্য কেউ একই কবিতা লিখলে তাতে স্বাধীনতার শত্রু বা দালাল বলতে এতটুকু অত্যুক্তি থাকতো না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বলা কঠিন বৈকি! ভারতের কোন বীর সন্তান শোষক ইংরেজ সম্রাটকে ভারতের ভাগ্যবিধাতা বলে জয় হে, জয় হে, বলতে পারে কি? আমরা যাদের হোমরা চোমরা মনে করি সেই কবিত্য ও সাহিত্যিক ও লেখকদের বইগুলো বা লেখাগুলো নিষিদ্ধ হয়নি? লেখার দায়ে জেল তো হয়নি? তাহলে কি নিষিদ্ধ হওয়া ইংরেজের আমলে নিয়ম ছিল না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ছিল। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম লিখিত 'যুগবানী' ১৯৩১ খৃস্টাব্দে নিষিদ্ধ হয়। ঐ সালেই ব্রজবিহারী বর্মণের তরুণ বাঙালী বই নিষিদ্ধ হয়। "১৯২০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ১৭৪টি বাংলা বই নিষিদ্ধ হয়েছে। এর আগেও বাংলা বই নিষিদ্ধ হয়েছে। তার সংখ্যাও কম নয়। ১৯৩৪ সাল হতে এ পর্যন্ত শ আড়াই বই নিষিদ্ধ হয়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ১৬৬টি বাংলা বই নিষিদ্ধ হয়েছে।" (শ্রী শিশির করের লেখা হতে নেওয়া) বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'কালের ভেরী' বই নিষিদ্ধ হয়েছে। মুকুন্দ দাসের ভালো নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর দে। তার অনেক বই বাজেয়াপ্ত হয়। যথা 'কর্মক্ষেত্র' 'মাতৃপূজা' প্রভৃতি। তিনি গ্রামে গ্রামে তাঁর গান সাহসিকতার সঙ্গে শুনিয়ে বেড়াতেন আর তার ফলেই তাঁর বই বাতিল। ১৯৩৪ সালে জেলদণ্ড আর জরিমানা লেগেছিল। তার নোবেল প্রাইজ পাওয়া টারগেট ছিল না। তাই ইংরেজকে ভয় ও তোষণ দিয়ে পূজা করার প্রয়োজন ছিল না।

কবি নজরুলের 'ভাঙ্গার গান', বিষের বাঁশী', প্রভৃতি বইগুগো বাতিল হয়। এরা ছিলেন গরিব মানুষ। টাকার মারও হয়েছিল আর জেলখানায় পুলিশের প্রহারও খেতে হয়েছিল। এদের কাউকে বিলেতে খানা খেতে নেমন্তন করেনি। এমনিভাবে সাবিত্রি প্রসন্নর 'রক্তরেখা', 'কালি কিংকরের', 'মন্দিরের চাবি', যশোদা লালের 'মায়ের ডাক', মনীন্দ্র নারায়ণের 'দেশের ডাক' (জেলে শাস্তিপ্রাপ্ত), নগেন্দ্র নাথের 'রক্ত পতাকা'। তাছাড়া মোহনের 'মুক্তি পথে', (জেল শাস্তিপ্রাপ্ত), বিমলা দেবীর 'শিখি পুঞ্জ;, সুরেন্দ্রচন্দ্রের 'হোল কী'। চারুবিকাশ দত্তের 'রাজদ্রোহীর জবান বন্দী' (জেল শাস্তিপ্রাপ্ত), পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস", যেটিতে প্রমাণ করা হয়েছে ১৮৫৭'র বিপ্লব সিপাহীদের নয় বরং ওটিই হচ্ছে স্বাধীনতার শ্রেণীবদ্ধ সংগ্রাম। "ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম"। এই সমস্ত বই বাজেয়াপ্ত করেছিল ইংরেজ সরকার। কাউকেই স্যার, নাইট ও নোবেল প্রাইজ উপাধি দেওয়া হয়নি। রজনীকান্ত গুপ্তের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'টি অনেক সত্য সংবাদ প্রকাশের জন্য নিষিদ্ধ হয়। জানা ন নিয়োগীর 'দেশের ডাক', 'বিপ্লবী বাংলা' এবং 'বিলাতি বস্ত্র বর্জন করিব কেন? বই তিনটিই ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। এর কারণে বারে বারে তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। সোমনাথ লাহিড়ীর 'সাম্যবাদ' বই বাজেয়াপ্ত হয় এবং লেখককে জেল খাটতে হয়। আসামের অমরেন্দ্র কৃষ্ণ সেনের 'আমরা খেতে পাই না কেন'? বইও সরকার বন্ধ করে দেয়। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের তথাকথিত বেদ আনন্দ মঠের ওপর কেন নিষেধাজ্ঞা ছিল না।

আবদুস সামাদ ও আসিরুদ্দিনের যুক্তভাবে লেখা 'হযরত আলী ও হনুমানের লড়াই', ১৯০৮ সালে কলকাতা হতে প্রকাশিত পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত হয়। দুই লেখক এবং প্রকাশক আফাজুদ্দিন আহমাদকে শাস্তি নিয়ে হয়েছিল। এগুলোকে যা বলা হচ্ছে বাংলা বই-এর ক্ষুদ্র খতিয়ান। কিন্তু সারা ভারতের মুসলমান লেখকদের কয়েক সহস্র উর্দু বই, পত্রিকা ও পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক ভাষায় বহু বই সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। পরিশেষে এক দরিদ্র বলিষ্ঠ লেখকের একটি বই বাজেয়াপ্ত হওয়ার কথা না বললে রবীন্দ্রনাথের বিষয় বলা পূর্ণাঙ্গ হবে না। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে ১৫ জানুয়ারি শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' বইটি ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। বইটি অবশ্য উপন্যাস তবু তাতে ইচ্ছাকৃতভাবে লেখক বীরের মতো ইংরেজেকে আঘাত করেছেন। দরিদ্র শরৎ বাবুর বইটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য অর্থনৈতিক কারণে তিনি দুঃখিত হন এবং রবীন্দ্রনাথ দ্বারা একটু ইংরেজকে সুপারিশ করিয়ে বইটি মুক্ত করার চিন্তা করেন। কারণ তখন ইংরেজ রাজত্বে রবীন্দ্রনাথের 'নেম ও ফেমের' ছড়াছড়ি।

কথাশিল্পী বিপ্লবী শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখলেন কিন্তু 'পথের দাবী' বই ও পত্রের উত্তরে কবি যা লিখেছেন তা এ যুগের বেশির ভাগ মানুষকেই চমকে দেবে।

'কল্যাণীয়েষু

তোমার 'পথের দাবী' পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে।.... আমি নানা দেশে ঘুরে এলাম– আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলাম একমাত্র ইংরেজ গভর্নমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রচার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্নমেন্ট এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না।....."

ইতি

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭ মাঘ ১৩৩৬

উত্তরে শরৎচন্দ্র লিখেছেন .... "আপনি লিখেছেন ইংরেজ রাজ্যের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। উঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি অসত্য প্রচারের মধ্য দিয়ে করার চেষ্টা করতাম তাহলে লেখক হিসেবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুই-ই ছিল। কিন্তু জ্ঞানত তা করিনি। করলে Politicianßhr Propaganda হত, কিন্তু বই হত না। নানা কারণে বাংলা ভাষার এ ধরনের বই কেউ লিখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে, অবিচারে অথবা বিচারের ভান করে কয়েদ, নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে তখন আমিই যেন অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ রাজ পুরুষরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন, এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই.... আমার প্রতি আপনি অবিচার করেছেন। .... দেশের বাইরের অভিজ্ঞতাও আপনার অত্যন্ত বেশি, আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে, এই বই প্রচারে দেশের সত্যিকার কল্যাণ নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হত।"

(দ্রঃ মনীন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত দরদী শরৎচন্দ্র)

শ্রীমতী রাধারানী লিখিত এক পত্রে (সামতাবেড় ১০ অক্টোবর, ১৯২৭) শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "... একটা কথা তোমাকে জানাই, কারুকে বোলো না। 'পথের দাবী' যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল তখন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে, আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন তো কাজ হয় যে, পৃথিবীর লোকে জানতে পারে গভর্নমেন্ট কি রকম সাহিত্যের প্রতি অভিচার করছে। ... তিনি জবাবে লিখেন, পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম, ইংরেজ রাজশক্তির মত সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল রাজশক্তি আর নেই। তোমার বই পড়লে পাঠকের মন ইংরেজ গভর্নমেন্টের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে উঠে। তোমার বই চাপা দিয়ে তোমাকে কিছু না বলা তোমাকে প্রায় ক্ষমা করা। এই ক্ষমার ওপর নির্ভর করে গভর্নমেন্টকে যা-তা নিন্দা করা সাহসের বিড়ম্বনা।" (দ্রঃ শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ, ১০ম সম্ভার) সবচেয়ে মজার কথা, এই লেখাটি গোপনপত্র হিসেবে দেয়নি বরং শরৎবাবুকে ছেপে বের করার জন্যই দিয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান লেখক তখন তা প্রকাশ করেননি। করলে যতটুকু

বিপ্লব হিন্দু সমাজে চলছিল রবীন্দ্রভক্ত দেশবাসী সঙ্গে সঙ্গে অন্য পথে চলতো। তাই শরৎবাবু লিখেছেন "ভাবতে পারো বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এত বড় কটুক্তি করতে পারে? এ চিঠি তিনি ছাপার জন্যই দিয়েছিলেন কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনি এই জন্য যে, এত বড় সার্টিফিকেট তখুনি স্টেটসম্যান ইংরেজি কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেছে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যাবে"। (দ্রঃ ঐ)

শরৎচন্দ্র আরও লিখেছেন, সে কী উত্তেজনা। কী বিক্ষোভ! রবীন্দ্রনাথ নাকি পথের দাবী পড়ে ইংরেজদের সহিষ্ণুতার প্রশংসা করেছেন। এই বইতে নাকি ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের ভাব আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। আমার 'পথের দাবী' পড়ে আমাদের দেশের কবির কাছে যদি এই দিকটাই বড় হয়ে থাকে, তাহলে স্বাধীনতার জন্য আর আন্দোলন কেন? সবাই মিলে তো ইংরেজদের কাঁধে করে নেচে বেড়ানো উচিত। হায় কবি, তুমি যদি জানতে তুমি আমাদের কত বড় আশা–কত বড় গর্ব, তাহলে নিশ্চয় এমন কথা বলতে পারতে না। কবির কাছে আমার 'পথের দাবী' এত বড় লাঞ্ছনা হবে এ আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। কী মন নিয়েই যে আমি বইখানা লিখেছিলুম তা আমি কারুকে বুঝিয়ে বলতে পারব না'। (দ্রঃ শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা, অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল)

শরৎবাবু মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে বলেছিলেন, "আমার আর পাঁচখানা বই যদি সরকার বাজেয়াপ্ত করতো তাহলে আমার এত দুঃখ হত না।" (নিষিদ্ধ বাংলা পৃঃ ৩৩) শরৎ চন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বে কেউ তাঁর স্বপ্নকে সফল করতে পারেননি; মৃত্যুর পরে যিনি করেছিলেন তিনি হচ্ছেন মৌলবি ফজলুল হক। তখন তিনি বাংলার মন্ত্রী ছিলেন। (দ্রঃ ঐ পৃঃ ৩৪)

রবীন্দ্রনাথকে জানতে গিয়ে শরৎচন্দ্রকে ও নজরুলকে আনতে হয়েছে। কিন্তু ররীন্দ্রনাথকে যে চোখে আমরা দেখি বা দেখানো হয়েছে, শরৎচন্দ্রকে কিন্তু তা হয়নি। শুধু জানি একজন কথাশিল্পী কিন্তু নজরুল, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র, চিত্তরঞ্জন দাস এরা যে স্বাধীনতা শিল্পী তা আমাদের অজানার মত। এই শরৎচন্দ, নজরুল, রবীন্দ্র ও বঙ্কিমের চরিত্র যদি পর্যালোচনার তুলাদণ্ডে ওজন করা হয় তাহলে কি দেখা যাবে না যে, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র ইংরেজবিরোধী, তাঁর বই বাজেয়াপ্ত, তিনি জেল খাটতে প্রস্তুত, নিজে একজন বিপ্লবী। কিন্তু বঙ্কিমও একজন সাহিত্যিক, ইংরেজ প্রেমিক, ইংরেজ সরকারের মাইনে খাওয়া চাকর, ইংরেজ পক্ষে প্রকাশ্য লিখিত ওকালতি বা দালালিতে শীর্ষস্থানীয় আর দুজন প্রায় একই সময়ে ভারতের মাটিতে জীবন্ত। কিন্তু তাকে কতটা মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তা আজ হিসেবের দিন না হলেও আগামী কাল হয়ত হিসাব হবে বন্দেমাতরম চলবে কী করে? রবীন্দ্রনাথ একজন কবি বিরাট ধনী, জমিদার, পৃথিবী ঘোরার অর্থ তার ছিল।

ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভূমিকা কতটা ছিল আর ইংরেজ পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন স্তব্ধ করতে কতটা ভূমিকা ছিল তা উপরোক্ত তথ্যে উদ্‌ঘাটিত। ইংরেজ কর্তৃক নোবেল প্রাইজ, স্যার ও নাইট উপাধিপ্রাপ্ত এবং 'জনগণমন অধিনায়ক' কবিতাটি জাতীয় সঙ্গীতে মর্যাদাপ্রাপ্ত আর ইংরেজদের পক্ষ হতে সেই রক্তাক্ত আন্দোলনের সময় তিনি বার বার তাঁদের দেশে নেমন্তন্নপ্রাপ্ত মনীষী ছিলেন।

আর এদিকে নজরুল অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের অর্থাভাবী কবি। প্রকাশ্যে ইংরেজবিরোধী, তাই তাঁর বই বাজেয়াপ্ত আর হাতকড়া দিয়ে জেলখানায় বন্দি জীবনযাপন, কারাগারে চাবুকের আঘাতপ্রাপ্ত। ইউরোপ বা বিলেত হতে নেমন্তন্ন হতে বঞ্চিত ইংরেজের দেওয়া নোবেল প্রাইজ স্যার, নাইট প্রভৃতি উপাধি হতে বঞ্চিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে উপযুক্ত মর্যাদায় আমরা যা দেয়ার তা দিয়েছি? জনগণমন কবিতা এত সমাদৃত কেন তা নতুন ছেলেমেয়েদের জানা নেই। কারণ সব জানা সত্ত্বেও ওপর মহল হতে এ কাণ্ড ঘটেছে। নীচু মহলের লোক তা যে বুঝতে পেরেছেন তাতে সন্দেহ নেই। নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের পাশে যতটুকু জানতে পারা গেছে তার অন্যতম কারণ কমিউনিষ্ট জুজুদের এবং প্রাক্তন পূঃ পাকিস্তান বা বাংলাদেশের অধিবাসীদের সম্মান প্রদর্শন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খৃিস্টাব্দে জন্মে জীবন্ত জীবনী রেখে ১৯৩৮ খৃিস্টাব্দে কলকাতায় দরিদ্র ও অভাবী অবস্থায় পরলোকগমন করেন। যদিও তাঁর জন্য পৃথকভাবে লিখলাম না। তবে যা লেখা হয়েছে সেটাকে বৃহৎ গ্রন্থ রচনার কাঠামো করা যায়।

জহরলাল নেহরু

মতিলাল নেহরুর পুত্র জহরলাল ১৮৮৯ খৃিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে পড়তে গিয়ে দেখা গেল তিনি একেবারেই বোকাটে। তখন পিতা পাঠিয়ে দিলেন পণ্ডিতদের দেশে এবং শাসক মনিবের দেশ ইংলণ্ড। সেখান থেকে এলেন কেমব্রিজ। ১৯১২ তে ব্যারিস্টারি পড়ে দেশে এলেন, একেবারে সাহেব হয়ে চলনে, বলনে– চরিত্রে ও চিন্তায় একেবারে বিলেতি সাহেব। বাপ চাইলেন ছেলের নাম ছড়িয়ে পড়ুক আইন ব্যবসায়। কিন্তু মস্তিষ্কটা জোরালো ছিল না। তাই তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। তবু বাপের পয়সাতেই সাহেবী চাল চালাতে লাগলেন। ১৯১৬ তে হয় বিবাহ। ১৯১৯ সালে চলে জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। তখন জহরলাল চুপচাপ আরামে দিন কাটাচ্ছিলেন স্ত্রীকে নিয়ে সিমলায় বড় হোটেলে। আর সাহেবী হোটেলগুলোতে সাহেবী ফরমায়েস অনুযায়ী চটপট কাজ পাওয়া যায়। ঠিক ঐ সময় আফগানদের সঙ্গে ইংরেজদের একটা চুক্তির কথা কইতে আফগানী নেতাদের ঐ হোটেলে আনা হয়। ঐ সময় একজন ইংরেজ ডিঃ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে ভারতীয় বলে হোটেল হতে চলে যেতে

বললেন। জহরলাল অনেক অনুনয় করলেন, শেষে বলা হল একটা লিখিত ছলেখা মুবণ্ড দিতে হবে যেকোন আফগানীর সঙ্গে কথা বলবেন না। জহরলাল সাহেবদের কথায় খুব দুঃখ পেলেন কিন্তু বণ্ড দিতে রাজি হলেন না। তাই সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হল চার ঘণ্টার মধ্যে শুধু হোটেল থেকে নয় একেবারে সিমলা ছেড়ে চলে যেতে হবে। ট্রেনের কামরাতেও ইংরেজ প্যাসেঞ্জারদের কাছ হতে অপমানিত হয়ে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। এখানে তাঁর ব্যক্তিগত আভিজাত্য পাটিতে নামতে বাধ্য করে বোঝা যায়। এটা জালিয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরেই যদি হত তাহলে তাঁর পার্টিতে যোগ দেওয়া একটা স্বর্ণোজ্জ্বল পদক্ষেপ হত। বছরখানেক নানা কিছু ভূমিকা পালন করে তাঁর কারাদণ্ড হয়। সেই সময় তাঁর ইংরেজপ্রীতিতে কিছু দিনের জন্য ভাটা পড়লে তিনি কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন বটে কিন্তু অন্তরে অকৃত্রিম ইংরেজপ্রীতি থেকেই গেল।" (দ্রঃ Mosley The last days of British Raj, P-76) গান্ধীজির কাছে নেহরু একরকম আত্মসমর্পণ করলেন। আর দু'জনের নীতিতে প্রায় মিল হয়ে গিয়েছিল। গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের মতবিরোধ চরমে ওঠে। গান্ধীজি দেশকে ঠাণ্ডা রাখতে চাইলেন আর সুভাষ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে দেশবাসীকে প্রেরণা যোগাতে লাগলেন তখন জহরলাল কোন পক্ষে যাবেন সকলেই দেখতে চান, তাই তিনি ঠিক ঐ সময় ইউরোপ ভ্রমণে বের হলেন। শ্রী গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র জহরলালের জন্য লিখেছেন, "পণ্ডিত নেহরু গণতন্ত্রের একজন বড় পাণ্ডা ছিলেন-তিনি মুখে বলেন এটা অন্যায় কিন্তু কাজের বেলায় চুপ করে থাকলেন। আর যাঁরা চিরদিনই গোপনে ইংরেজকে সাহায্য করে এসেছে, এমনকি শোনা যায় শ্রী চন্দ্রশেখর আজাদ ও শ্রী ভকৎ সিং-এর মৃত্যু ও ফাঁসির জন্য যাঁদের দু-একজন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী, সেই বঞ্চিত দুস্থ ভীরুরাই তখন কংগ্রেসের মন্ত্রণাদাতা! পণ্ডিত নেহরু ইচ্ছা করলে এ বিরোধের সমাধান করতে পারতেন মনে বুঝেও ভয়ে কাজে কিছু করতে পারলেন না। ভয়ই কাপুরুষতার লক্ষণ।" কারণ, সুভাষ বাবু যখন ব্যক্তিত্বের জোরে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন তখনই প্রস্তাব পাস হয়ে গেল আজ হতে সভাপতির ইচ্ছায় নয়, একমাত্র গান্ধীজির ইচ্ছানুসারে ওয়ারকিং কমিটির সভ্য মনোনয়ন হবে। নেহরু গান্ধীকে বলতেন, "You permanent Super President of Congress"। ১৯৩৯ সালের ২৯ এপ্রিল অগত্যা সুভাষ বাবু পদত্যাগ করেন। যোগ্য লোকের পদত্যাগে কংগ্রেসের কেউ দুঃখ করেনি আর আপত্তিও জানায়নি; বরং বিজয় উল্লাসে 'গান্ধীজি কি জয়' স্লোগান দিয়েছিল। সারা ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর স্বাধীনতার নায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মতাবলম্বী সুভাষ বোসকে নেহরু কুৎসিত কথা বললেন-"সুভাষ ফ্যাসিষ্ট।" সুভাষ উত্তর দিলেন- "যদি ফ্যাসিষ্ট বলতে হিটলার, মহান হিটলার বা ক্ষুদে হিটলার বোঝার তাহলে সেরকম

অনেক লোকই কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থীদের মাঝে পাওয়া যাবে।"

(দ্রঃ Michael Edwardes-The Last year of British India, p. 67

সুভাষ তাঁর বড়দের পরামর্শ নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করলেন। কংগ্রেস সেই অজুহাতে তাঁকে তিন বছরের জন্য তাড়িয়ে দিলেন। তিনি জানতেন, এরা বিপ্লব করেনি, করবে না ও করতে দেবে না, তাই আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন। ছাত্রদল তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতেই সরকারের পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ছাত্র নেতা জ্যোতির্ময় ভৌমিক ও ঢাকার অনিলচন্দ্র দাস প্রাণ দিলেন।

দলে দলে বীর জোয়ানরা যখন কমিউনিস্ট দলে যোগ দিতে লাগলো তখন জয় প্রকাশ নারায়ণ, নরেন্দ্র দে ও আর অশোক মেটার চেষ্টায় কংগ্রেসের ভেতর জন্ম হয় কংগ্রেস সোশালিষ্ট পার্টির। এইবার মুসলমান জাতির পুরাতন পথে ও কমিউনিস্ট পার্টির নতুন পথ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা ও বিপ্লবের বুলি বলে সংগ্রাম চালানোর কথা ঘোষণা করে। (দ্রঃ V.V. Balabushevich-A Contemporary History of India. p 294-95)

১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। জার্মানদের আক্রমণে শাসক ইংরেজ ব্রিটিশের জাহাজ একে একে জলের তলে তলিয়ে গেল। তখন গান্ধীজি খুব শোক পেলেন এবং দুঃখময় বিবৃতিও দিলেন (দ্রঃ অবিস্মরণীয়, ৩২ পৃঃ ২য় খণ্ড) লণ্ডনে পড়তে লাগলো প্রচণ্ড বোমা। ইংরেজ বাহাদুররা বাদুড়ের মত কোথায় লুকাবে ভাবছে। ঠিক ঐ সময় গান্ধীজি কামনা করেছিলেন ইংরেজের জয়। কারণ তারা জয়ী হয়ে ভারতকে স্বাধীনতা দেবে আর যদি পরাজিত হয় তাহলে রাগে, দুঃখে, অভিমানে তা নাও দিতে পারে।

কিন্তু নেতাজী গান্ধীর কাছ হতে আঘাত আর অপমানের কষাঘাত পেয়েও দেশের জন্য সব ভুলে নিজের ইজ্জত নষ্ট হওয়ার কথা চিন্তা না করেও গান্ধীর কাছে করুণ আবেদন করলেন যে, এই উপযুক্ত সময় এখন যদি আমরা ভারতে বিপ্লব জোরদার করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাই তাহলে বহুদিনের আশা পূরণ করে আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবো। আপনি একটু চিন্তা করুন। অপূর্ব সুযোগ।

"সেদিনের সেই শ্রী ভ্রষ্ট দিনে গান্ধীজি ইংরেজের শোকে মুহ্যমান।" (দ্রঃ অবিস্মরণীয় ২য় খণ্ড) তাই বা উত্তরে বললেন তাতে অবাক অথবা ক্রোধ কোনটি এগিয়ে আসবে কে জানে? গান্ধী বললেন, ইংরেজকে ধ্বংস করে আমরা স্বাধীনতা চাই না– অহিংসা সংগ্রামের নীতি এ নয়।" (দ্রঃ Indian struggle, 3, 34) সারা ভারতের কোন বুদ্ধিমান ও দেশভক্ত ঐ কথা মানুন আর নাই মানুন পণ্ডিত জহরলাল তা সমর্থন করলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য আরও জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো। মাওলানা আযাদ কিন্তু প্রতিবাদ করে বলেছিলেন,

“কংগ্রেস আপস করবার সমিতি নয়, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ব্যবস্থা। অনন্যোপায় হলে ভারতবাসীর অস্ত্র ধারণেরও অধিকার আছে। (দ্রঃ Arad India Wins freedom, 34)

ঐ অবস্থায় মাওলানা আজাদের একটা স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হল। কিন্তু জহর যেন গান্ধীর ছায়া আর গান্ধী যেন তাঁর ছায়া। ২ জুলাই সুভাষ বন্দি হলেন, নয় তাঁকে বন্দি করা হল। অপরাধ হচ্ছে বিপ্লবের পক্ষপাতী আর মুসলমান শহীদ নবাব সিরাজের অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যা মনুমেন্ট ভেঙে ফেলার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন। কারণ ওটা শুধু মুসলমানদের হীন চোখে দেখার চিহ্ন শুধু নয়; বরং জাতীয় মর্যাদাহানির মনুমেন্ট সেটা। সুভাষের জেলে যাওয়া যেন সারা ভারতে মানুষের মনে তাঁর প্রতি ভক্তির জোয়ার এনে দিল। তখন গান্ধীজি, জহরলাল বুঝে দেখলেন জেলে যাওয়া ছাড়া সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা বা জনসাধারণের মনের মোড় ঘোরানো যাবে না। তাই ১৯৪০ সালে অক্টোবর মাসে করলেন সত্যাগ্রহ নামে জ্বলন্ত বিপ্লব। গলায় মালা পরে ইংরেজের মালের ও সম্মানের তেমন ক্ষতি না হয় এমন ছোট একটা আইন অমান্য করে একে একে ভদ্রভাবে জেলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। প্রথমে বিনোবাভাবে গলায় মালা পরে প্রথম সত্যাগ্রহী সাজলেন। তিন মাস জেল মঞ্জুর হল। গঙ্গানারায়ণ বাবু লিখেছেন, “এক দিনেই তিনি পরম ত্যাগী দেশকর্মী হয়ে গেলেন আর সেই জোরেই আজও ভূদান যজ্ঞের পৌরহিত্য করেছেন আর কংগ্রেস তাঁর পৃষ্ঠপোষক। এর আগে দেশের লোক হয়ত তাঁর নামই নিত না।” কয়েকদিন পরে সারা ভারতের দু নম্বরের সত্যাগ্রহী এগিয়ে এলেন পণ্ডিত নেহরু। তিনিও চার বছর কারাদণ্ড পেলেন। এমন করে ভারতে বিশ হাজার সত্যাগ্রহী বন্দি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। এখানে নেতাজী আর নেহেরুর পথ ও মতের কত তফাৎ। ঐ বিশ হাজার লোকের ইচ্ছাকৃতভাবে জেলে ঢোকার আগ্রহ নিছক ভ্রান্ত পথ বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের মতে জেলের বাইরে থেকে কাজ করলে তাতে লাভ ছিল বেশি।

আজ কিন্তু সেই সত্যাগ্রহী দলের অনেকে জেল খাটার সনদ দেখিয়ে বাস চালানোর রুট আর ছেলের বড় চাকরি উদ্ধার করে উপকৃত হচ্ছেন। সুভাষ বসু জেলে অনশন আরম্ভ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল বাইরে আসা। তাঁকে মুক্তি না দিয়ে তাঁর গৃহেই বন্দি রাখার ব্যবস্থা হয়। ওখান হতেই নেতাজী মুসলমান সেজে মওলুবী জিয়াউদ্দিন নাম ধারণ করে বাইরের সাহায্য বা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে এবং ভারতের বাইরে হতে কোন রেডিও সেন্টার খুলে তার মাধ্যমে ভারতের জনগণ বিশেষত হিন্দু জনগণকে কংগ্রেসের মায়াজাল হতে মুক্ত করার জন্য একেবারে কাবুলের পথে রাশিয়ার দিকে রওনা হলেন। পৌছালেন পেশোয়ার। ওখান হতে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন রহমতখা কাবুলে। কাবুল হতে সুভাষ চললেন রাশিয়ার

>Goto List

বেখারায়. ওখান হতে সমরখন্দ। ২৮ মার্চ বিমানে বার্লিনে এলেন। সুভাষ জার্মান হতে দু'টি রেডিও সেন্টার খুললেন– একটির নাম দিলেন 'কংগ্রেস রেডিও' যার দ্বারা কংগ্রেস ভক্তদের ডাক দেবেন। আর সুদূর দৃষ্টিসম্পন্ন সুভাষ জানতেন ভারতের স্বাধীনতার স্রষ্টা মুসলমান জাতি, তারা শুধু কংগ্রেস, ইংরেজ সৃষ্ট ভারতীয় নেতাদের বাধা দান ও বিরোধিতার জন্য অকৃতকার্য হতে চলেছে। তাই অপর রেডিও সেন্টারের নাম রাখলেন আজাদ মুসলিম রেডিও। ভারতে ঐ মহানেতা সুভাষের বড় শত্রুদের মধ্যে অন্যতম ঐতিহাসিক শত্রু ছিলেন নেহরু। সুভাষ যখন ভারতের বাইরে গিয়ে আজাদ হিন্দু ফৌজ গঠন করে লড়াই করতে করতে ভারতের দিকে এগিয়ে আসছেন তখন ব্যারিষ্টার পণ্ডিত নেহরু দেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন আর বক্তৃতার বড় অংশ হচ্ছে সুভাষ এলে আমি রাইফেল হাতে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব।" (দ্রঃ অবিস্মরণীয়, ২ খণ্ড) তাছাড়া অন্য জায়গায় তিনি নিজ হাতে গুলি করে মারবো' বলে প্রকাশ্য সভায় ভাষণ দিয়েছেন। এর কারণ চিন্তা করলেই বোঝা যাবে তিনি কেন এ কথা বলেছিলেন? কে বা কারা তা বলিয়েছিলেন? আর এ অশোভন অন্যায় উক্তি দেশের কল্যাণে বলেছেন না নিজের কল্যাণে?

আর আজ আমাদের মাতৃভূমিকে ত্রিখণ্ডিত দেখছি প্রথমে বিনা প্রমাণে জানতাম যত দোষ সব জিন্নার কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। জিন্নাও ইংরেজেরই হাতে গড়া নেতা। কিন্তু গান্ধী, জহরলাল, প্যাটেল প্রমুখ পণ্ডিত যদি রাজি না হতেন ভারত ভাগ হত না এটা শত শত বর্তমান ইতিহাস বিজ্ঞানীর মত। মিঃ মাইকেল ব্রীচার খ্রিস্টান লেখক জহরলালের একজন প্রথম শ্রেণীর বন্ধু ছিলেন। প্রমাণে বলা যায় নেহরু তাঁর জীবনী লিখতে ভার তাঁকেই দিয়েছিলেন। নেহরু তাঁকে বলেছিলেন, "অখণ্ড ভারত থাকলে প্রতিদিনই সাম্প্রদায়িক অশান্তি লেগে থাকত, তাতে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হতো না এবং অচিরে স্বাধীনতা পাওয়ার কোন উপায় থাকত না। তাই তিনি দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছেন।" (অবিস্মরণীয়, ২য় খণ্ড, পৃঃ-১৭৮)

পরে মিঃ মসলেকে নেহরু যা বলেছিলেন তা আরও স্বচ্ছতর। "সত্যি কথা বলতে কি, আমরা ক্লান্ত, বার্ধক্যও আসছে। আর জেলের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের অনেকেরই নেই। যদি ভারতের ঐক্যের জন্য লেগে থাকতাম তাহলে আমাদের জেলে যাওয়া অনিবার্য হয়ে উঠত। পাঞ্জাবে অশান্তির আগুন দেখেছি, প্রতিদিন নরহত্যার খবর পেয়েছি– এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় দেশ বিভাগ মনে করে এটা গ্রহণ করেছি। তবুও গান্ধীজি 'না' করলেই আমরা সংগ্রামই করে যেতাম। আমরা এই মনে করে দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছিলাম যে, পাকিস্তান হবে স্বল্পায়ু আর আমাদের কাছে ফিরে আসতে বাধ্য হবে। আমরা কোনদিনই ভাবতে পারিনি যে এত লোক মরেও কাশ্মীর নিয়ে আমাদের এত তিক্ততা বাড়বে।" (Mosley, P-248)

>Goto List

উপরোক্ত মন্তব্যে ভেতরের তথ্যও যেমন প্রকাশিত তেমনি নেহরুর দুরদর্শিতার কত স্বল্পতা তাও অনুমেয়। ভারতবর্ষকে ভাগ করবার জন্য যখন বিলেত হতে আনানো হয়েছিল মিঃ লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে তিনি শুধু তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকেই আনেননি তিনি এনেছিলেন তাঁর পরমা সুন্দরী কন্যাকেও। তার অনেক কারণ ছিল। জহরলালের সঙ্গে তিনঘণ্টা আলাপ করে তাঁর কোথায় দুর্বলতা ছিল সাহেব সব বুঝে ফেললেন। এও বুঝলেন একটু প্রশংসা করলে খুশিতে অনর্গল কথা বলে যান (Mosley 94)। নেহরুকে মিঃ মাউন্ট ব্যাটেন প্রশ্ন করলেন–'জিন্না লোকটা খুব একটা ভাল নয়, আপনি কী বলেন? নেহরু নিন্দের গুদাম ঘর খোলার মত বলতে লাগলেন, জিন্নার নামে অনেক কিছু বলে ফেললেন, যার সার কথা হচ্ছে 'জিন্নাহ নামেই ব্যারিস্টার, কাজে কিছুই নয়, নিরেট বোকা ইত্যাদি। সাহেব জিন্নাহকে জানার ভানে জেনে ফেললেন জহরলালকে আর বুঝলেন জহরলাল একান্তই অযোগ্য। অথচ নেহরু নিজেই আইন ব্যবসায়ে অকৃতকার্য তা তিনি জানতেন। আর জিন্নাহ ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে বিলিতি ছাত্রদের চমকে দিয়েছিলেন তাও তিনি জানতেন। আর জিন্নাহ যে বুদ্ধির যুদ্ধে জহরলাল, গান্ধী ও কংগ্রেসের হর্তাকর্তাদের অধিকাংশকে পরাজিত করেছেন তাও মিথ্যা বলা মুশকিল।

লণ্ডনে কমিউনিস্ট পার্টির তরফ হতে একবার জিন্নাকে কেস দিতে গিয়ে দেখা যায় তাঁর তখনকার দিনে ফিস ছিল দুই হাজার পাউণ্ড বা ত্রিশ হাজার টাকা। তাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্মদাতা কমরেড মুজাফফর আহমাদ লিখেছেন, "তিনি ফিস নিতে অস্বীকার করেননি কিন্তু ফিস দাবি করেছিলেন দুই হাজার পাউণ্ড (ত্রিশ হাজার টাকা)। মিঃ সি, অলস্টনের দৈনিক ফিস ছিল এক হাজার টাকা। এই হিসেবে জিন্নাহ কিছু বেশি ফিস্ দাবি করেননি।" (দ্রঃ আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি পৃঃ ৪৪৭, মুজাফফর আহমাদ)।

মাউন্ট ব্যাটেন তাঁর স্ত্রীকে নেহরুর প্রতি নিক্ষেপ করলেন আর তাঁর সুন্দরী কন্যা কুমারী প্যামেলাকে রাজনীতি শেখানোর ভান করে গান্ধীর দিকে নিক্ষেপ করলেন। আর নেহরুর অত্যন্ত আদুরে মাতৃহীনা কন্যা ইন্দিরাকে স্নেহ ও ভালবাস দেয়ার জন্য মিঃ জানসনকে নিয়োগ করলেন। আর লর্ড ইসমে এবং জর্জ এবেলকে নিক্ষেপ করলেন মুসলিম লীগ নেতাদের প্রতি। প্রায় সকলকে বাগে আনা গেল শুধু জিন্নাহ ব্যতিক্রম। জহরলালের স্ত্রী অনেক দিন আগে মারা গিয়েছিলেন তাই তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করতে যেন এগিয়ে এলেন মাউন্ট ব্যাটেনের স্ত্রী এডউইনা কিন্তু সেটা যে অভিনয় ছিল নেহরু তা বুঝতে পারেননি। মিঃ মশলে তাই লিখেছেন, He had long been a widower, and he was a lonely man, Lady Mount Batten filled an important gap in his life (Mosley 103)। মাওলানা আজাদ

ও নেহরুকে একগুঁয়ে বা একরোখা বলেছেন কিন্তু একমাত্র সুন্দরী এডউইনার কথা তিনি কাটতে পারতেন না। ওখানেই ছিল তাঁর গুপ্ত অপ্রকাশ্য বিতর্কিত দুর্বলতা।

চতুর ইংরেজ বিলেত হতে কাজ সমাধা করলো প্রেরিত নেতার চাতুরী দিয়ে। আমাদের দেশের হঠাৎ নেতার দল তাদের চাতুরীর শিকার হয়ে ইতিহাসকে অন্ধকার করেছেন বললে ঠিক হবে কি ভুল হবে কে জানে?

চিত্তরঞ্জন দাস

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে চিত্তরঞ্জন দাস জন্মগ্রহণ করে ১৯২৫ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁকে অনেকেই দেশবন্ধু বলে থাকেন। অতি অবশ্যই তিনি দেশবন্ধু তো ছিলেনই; বরং সর্ব ভারতীয় হিন্দু নেতার শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যিকার চিন্তাশীল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সত্যবাদী নেতা। তিনিও একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন। তিনি আইসিএস পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন। তাতে তিনি ইচ্ছা করে ফেল করেছি বা ইচ্ছা করে ঘোড়ায় চড়ি নাই বলে কোন অজুহাত করতে পারতেন কিন্তু তিনি সহাস্যেই বলেছিলেন I came out first in the unsucessful list অর্থাৎ ফেল করার তালিকায় আমি প্রথম হয়েছি।

তিনি দাদাভাই নৌরজী, সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, অনুকূল ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিদের আদর্শ কি তা বোঝার চেষ্টা করেন আর ব্রাহ্ম পরিবারে তো তাঁর জন্মই হয়েছিল। ফলে প্রত্যেক নেতা ও সাধু পুরুষদের অকৃতকার্যতার পরিণাম ও পরিমাণের পরিমাপ তো তিনি করেই ছিলেন। সেই সঙ্গে সমস্যার সমাধান কী তাও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। প্রথমে তিনি সাম্প্রদায়িক 'অনুশীলন' দলের টানাটানিতে সেখানে যুক্ত হয়েছিলেন। আর তাঁকে ভাইস প্রেসিডেন্টের পদও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রথমেই বুঝেছিলেন এই সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গি খুব ক্ষীণ তবুও তাঁদের সংশোধনের চেষ্টা করলেন। যখন বুঝলেন তাঁর পক্ষে তা সম্ভব নয়, তখন তিনি নিজেই সরে এলেন 'অনুশীলনের' আওতা থেকে। ক্রমে ক্রমে লোকে তাঁর যোগ্যতায় মুগ্ধ হতে থাকে এবং আইন ব্যবসায়ে খুব নাম ছড়িয়ে পড়ে। টাকা উপার্জনও বহুল পরিমাণে হতে থাকে। কিন্তু দেশবন্ধু দু'হাতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দান করতে থাকেন। লোকে তাঁকে দাতা দধীচি বলতো, মুসলমানরা তাঁকে দাতা হাতেম তাই বলতো। এইবার তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নেমে পড়লেন। জহরলাল ও গান্ধীজি বেচারাদের ভাগ্য মন্দ, ব্যারিস্টারী পাস করেও আইন ব্যবসা চলেনি। তাই রাজনীতিতে এসে বরং ভালই করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু দেশবন্ধুর অবস্থা তা নয়, উপার্জনের জোয়ার তখনই তিনি জাতির জন্য, দেশের জন্য দু'হাতে খরচা করতেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে যখন আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে তখন তিনি তাঁর উপার্জনের রাস্তা ইচ্ছা করে বন্ধ করে দেন।

কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, এই আন্দোলনে অনেকের চাকরি ও রোজগারে বাধা আসবে সেখানে। তার আগেই তিনি নিজের আদর্শ সামনে রেখে জনগণকে অবাক করেন। যখন জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড ঘটে তখন কংগ্রেসের এক তদন্ত কমিটিতে সদস্য হিসেবে চিত্তরঞ্জনের চমকপ্রদ ভূমিকা ছিল। জহরলালের পিতা মতিলালের সভাপতিত্বে অমৃতসর কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনের "Total Obstruction" এর পন্থা সুপারিশ করেন এবং কংগ্রেস চিরকাল শোষক সরকারের তোষাক হিসেবে এবারেও সভায় ভারত সচিবকে ধন্যবাদ জানানোর প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ভারত বীর চিত্তরঞ্জন বীর সাহসী সৈনিকের মত তীব্র প্রতিবাদ করে জানান যে, ধন্যবাদ জানানো বন্ধ হোক। যেহেতু এই ধন্যবাদ প্রদান ভীরুতা ও তোষণ ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু তাঁর এই যুক্তি কেউ গ্রহণ না করায় সে প্রস্তাবটি নিহত হয়। চিত্তরঞ্জনের পূর্বে জাতির জনক গান্ধীজির আর্বিভাবই হয়নি। গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন একই সময়ে কাজ করেছেন। গান্ধীর বহু কাজের তিনি প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু গ্রহণ হোক আর নাই হোক তিনি তাঁর উদার ও সমতাবাদের বা ন্যায়নীতিকে বর্জন করে গান্ধীবাদে আত্মসমর্পণ করতে পারতেন না।

১৯২২ সালে ডিসেম্বর মাসে মতিলাল, লালালাজপৎ রায়সহ অনেকেই দেশবন্ধুর প্রভাব আঁচ করতে পেরে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। ১৯২৩ সালে স্বরাজ দল পরিষদের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। কিন্তু মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন না। চিত্তরঞ্জন বুঝেছিলেন স্বাধীনতার ইতিহাসে মাওলানা শাহ ওলিউল্লাহ আর সৈয়দ আহমাদ ব্রেলবী হতে মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী প্রমুখ হাজার আলেম ও কোটি কোটি মুসলমানের অবদানকে চাপা দিয়ে এবং মুসলমানদের উপেক্ষা করে স্বাধীনতা ও সংহতি, সংগঠন, সংগ্রাম কিছুই সম্ভব নয়। তাই বাংলার হিন্দুও মুসলমানদের মিলনের জন্য একটি চুক্তিপত্র রচনা করেন। কারণ বাংলা হচ্ছে ভারতের মস্তিষ্ক। বাংলা ঠিক হওয়া মানে ভারত ঠিক হওয়া। বাংলার চুক্তি পত্রটি ছিল এই রকম-

১। "বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু-মুসলমান নির্বাচন লোকসংখ্যানুপাতে হইবে। কিছুকাল পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন।

২। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড ইত্যাদিতে ৬০ ও ৪০ অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে, অর্থাৎ যেখানে মুসলমান সংখ্যা বেশি সেখানে শতকরা ৬০ জন মুসলমান এবং হিন্দুর সংখ্যা বেশি হইলে শতকরা ৬০ জন হিন্দু নির্বাচিত হইবেন।

৩। বাংলার মুসলমানগণ লোকসংখ্যানুপাতে চাকরি পাইবেন।

৪। আইনের দ্বারা ধর্ম সংক্রান্ত কোন বিষয় বন্ধ হইবে না। যে সম্প্রদায়ের ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে কোন কিছু নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হইবে, সে সম্প্রদায়ের শতকরা অন্তত ৭৫ জন লোক অনুমোদন করিলে তবে উহা হইতে পারিবে।

৫। (ক) ধর্মের জন্য যদি গোহত্যার প্রয়োজন হয় তবে হিন্দুগণ উহাতে বাধা প্রদান করিতে পারিবে না। আর মুসলমানগণও হিন্দুর প্রাণে ব্যথা লাগে এমন স্থানে গোবধ করিবেন না।

(খ) নামাজ পড়িবার সময়ে মসজিদের সম্মুখে সঙ্গীত হইতে পারিবে না।" (দ্রঃ সুকুমার রঞ্জন দাসের 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' ১৯৩৬, পৃঃ ২০২-২০৩)।

উপরোক্ত চুক্তিপত্রের জন্য শ্রী সৌরেন্দ্র বাবু বলেছেন, "তিনি মনে করতেন যে মুসলমান সম্প্রদায় সর্ব দিক দিয়ে হিন্দুদের মত সমান যোগ্যতা অর্জন করলে এ ব্যবস্থার প্রয়োজন স্বতঃই চলে যাবে।" চিত্তরঞ্জন একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার অতীতকে স্মরণ করে, বর্তমান পরিস্থিতি পরিদর্শন করে আর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে চমৎকার চূড়ান্ত সমাধান সৃষ্টি করলেন। যাঁরা সত্যিকারের শান্তিপ্রিয় ও ভারতপ্রেমিক হিন্দুরা তা মেনে নিলেন আর অন্য ধারে সমগ্র মুসলিম সমাজও তা মেনে নেয়। তাই ভারতবন্ধু চিত্তরঞ্জনের এই বিখ্যাত চুক্তিটি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে অনুমোদিত হয়। কিন্তু হিন্দু মহাসভার সমর্থকরা এবং মুসলমান বিদ্বেষী কংগ্রেসের খোলস পরা নেতারা নানা গুঞ্জন, আলোচনা, সমালোচনা ও পর্যালোচনা করে একটি আইনের ফাঁক বের করে সেটি হচ্ছে এই যে, একটি উপসমিতি গঠন হোক এবং এই প্রস্তাবটি সারা ভারতে কতটা গ্রহণযোগ্য দেখা হোক। (দ্রঃ Subhas Chandra Bose, The Indian Struggle, 1920-42, 1964, p-92)

বিরাট ষড়যন্ত্র চলতে লাগলো। চিত্তরঞ্জনের কোমল হৃদয়ে বড় ব্যথা পেলেন, বুঝতে পারলেন নেতাদের কাছে দেশ আগে নয় সাম্প্রদায়িকতা আর নিজেদের জেদ বহালই বড়। তবু তিনি বীরত্বের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। সুভাষের ওপর তাঁর আস্থা ছিল খুব বেশি। আর গান্ধীজি সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণাই থাক তবু তাঁকে তিনি অন্তত হিন্দু -মুসলমান মিলনের ক্ষেত্রে পক্ষে পাবেন বলেই আশা রাখতেন। কলকাতায় পৌর সভার নির্বাচন আরম্ভ হয়। সেই নির্বাচনে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সর্ব প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। আর তাঁর চিন্তা, কর্ম ও মনের সঙ্গী সুভাষ চন্দ্র হন চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। তাঁদের দুজনেরই জনপ্রিয়তা আরও প্রমাণিত হয়। গুপ্ত বিরোধীরা হিংসার দাবানল লুকিয়ে রাখে কোন মুহূর্তের প্রতীক্ষায়। গান্ধী, সুভাষ ও চিত্তরঞ্জনকে অনেক বিষয়ে ভাল চোখে দেখতেন না। ফলে তাঁরাও তাঁকে অনেক ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা সংযত অপমান করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তবুও দেশের খাতিরে তাঁকেও এক পথ ও মতে মিলিতে ১৯২৪ খৃঃ বেলগাঁও কংগ্রেসে আপস হয়ে যায়। ফলে ভারতের ভাগ্যাকাশে পূর্ণিমার রাত্রি এগিয়ে আসে। ঐ সময় দেশে সুস্থ পরিবেশ গড়তে তাঁকে খুব পরিশ্রম করতে হয়। ১৯২৫ সালেই জুন মাসে হঠাৎ দেশবন্ধুর মৃত্যু হয়। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে দেশ কাঁদতে থাকে কিন্তু দেশ শত্রুর দল গোপন আনন্দে

>Goto List

নরকের নতুন পথ আবিষ্কার করে। সেই ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট, যার জন্ম দিয়ে গিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন। ১৯২৬'র সমীক্ষায় প্রহসন করে সেই ঐতিহাসিক চুক্তিটি বাতিল করা হয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হিসেবে করে নিয়েছিলেন। জ্ঞান-বুদ্ধি, বীরত্ব ও মহত্বে মুসলমানরা হিন্দুদের অপেক্ষা কোন দিকে পশ্চাৎপদ নয়, তবুও তাঁরা ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করেছেন স্বাধীনতার জন্যই। ফলে চাকরির রাস্তা নিজেরাই বন্ধ করেছেন। সেই সময় হিন্দু জাতি সহযোগিতা না করে বরং বেশির ভাগই তাঁদের বিরোধিতা করে এসেছেন। এখন মুখে শুধু মিলন মৈত্রীর লম্বা বুলি না বলে মিলন মৈত্রীর কিছু কাজের দরকার মনে করে তাই তিনি নির্দিষ্ট কালের জন্য মুসলমানদের শতকরা ৮০ আর হিন্দুদের বাকি শতকরা ২০টি হিসাবে চাকরি বণ্টনের কথা বলেছিলেন–

"Once Mr Das announced as A.I.C.C. president that as the Muslims of Bengal are baekward in every sphere of life, therefore they will have the facilities to join in cvery government office by 80%. It's a matter of regreat that after he died some of his followers assailed his opposition and his declaration was repudiated. The result was that the Muslims of Bengal moved away from the Congress and the first seed of partition was sown" (দ্রঃ India wins freedom by Azad)

মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মতে চিত্তরঞ্জনের হঠাৎ মৃত্যু না হলে ভারতবর্ষ ভাগই হতো না। ভারতের ইতিহাস অন্য রকম হতো। “হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ছিল তাঁর অহোরাত্রের চিন্তা। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। ঐক্য ও সহযোগিতার তাগিদে রচিত তাঁর কর্মপন্থা। উট্র এমরবলফট নামে পরিচিত। ঐ কর্মপন্থার জন্য তাঁকে যথেষ্ট অপ্রিয়ভাজন হতে হয়।” (বাঃ রাষ্ট্রচিন্তা, পৃঃ ৩১৮)। ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পরেই হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের নানা সংগঠন মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, যথা ‘শুদ্ধি সভা’, ‘হিন্দুসভা’, হিন্দু মিশন, হিন্দু সংগঠন। অনুরূপভাবে সৃষ্টি হয় মুসলমানদের মধ্যে আঞ্জুমান, খিলাফত কমিটি, তানজীম কমিটি, জমিয়তে-ই-উলামা ইত্যাদি। হিন্দু মহাসভা ও আর্য সমাজ শুদ্ধি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং ভারতের উত্তর প্রদেশের প্রায় ৮৪টি মুসলমান গ্রামে আন্দোলনের হানা দিয়ে তাদের হিন্দু ধর্মের অর্ন্তভুক্ত করে।” (দ্রঃ ঐ) মদন মোহন মালবা, লাজপাতরায় প্রমুখ নেতার পরিশ্রমে সে বাজারে মুসলমানবিরুদ্ধ

ষড়যন্ত্রকে কাজে পরিণত করতে দশ লাখ টাকা সংগ্রহেরও ব্যবস্থা করা হয় এবং ঐ ১৯২৬ সালেই 'হিন্দু সংঘ' নামে একটি মারাত্মক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাছাড়া "অভয় আশ্রমে' শিবাজী উৎসব পালন করার গোড়াপত্তন করে। হিন্দু মিশনের ভূমিকাও ছিল খুবই মারাত্মক এবং ধ্বংসাত্মক। (দ্রঃ A. E.porter, census of India, 1931, Vol, V.part I, Report, P.394)

ইং ১৯২৭ সালে ফরিদপুর ও বরিশালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়। ছোট বড় নানা দাঙ্গা নানা স্থানে চলতে থাকে। ১৯৩০ সালে ঢাকায় জোর দাঙ্গা হয়। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষ হতে যে দাঙ্গা গুলি হয়েছিল তার বেশির ভাগ ছিল শোষক মহাজন ও জমিদারদের ওপর আক্রমণ। আর জমিদাররা ঐ আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়েই দাঙ্গা ভীষণ রূপ নেয়। আসলে মিথ্যাভাবে কাগজে সাম্প্রদায়িক বলে উল্লেখ করলেও তা ছিল অর্থনৈতিক। প্রমাণ, দ্রঃ-বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃঃ ৩২০, অধ্যাপক অমলেন্দু দে)

১৯২৯ সালে আগাখাঁর নেতৃত্বে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স হয় এবং জিন্নাও তাঁর অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ ১৯৩১ খৃিষ্টাব্দে সজাগ হয় এবং ঐ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য অগ্রসর হন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর হতেই এইভাবে ভারতের সর্বনাশ সাধনের মহড়া চলতে থাকে। চিত্তরঞ্জন দাসের মত এতবড় বিরাট চিন্তাশীল নেতাকে ইতিহাসে যেভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে তা বড়ই লজ্জাকর। তাঁর বড় অপরাধ তিনি সাম্প্রদায়িকতা হতে দূরে ছিলেন। সেই জন্যই কি তাঁর খ্যাতি কম?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আলোচনা বঙ্কিম প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ করা হয়েছে। অবশ্যই প্রখ্যাত নেতা প্রত্যেকের বিষয়ে আলোচনা অনেকের কাম্য, তবুও তা সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও কোন দিন স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক ছিলেন না। পুরোপুরি ইংরেজের বেতনভোগী বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজের সৃষ্ট ফরমুলায় ভারতে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থায় শুধুমাত্র সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের বশে আনতে যে সকল মূল কলেজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার বিরাট দায়িত্ব যাঁর ওপর দেওয়া হয়েছিল তিনিই হচ্ছেন বিদ্যাসাগর। অনেক উন্নতি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা ইংরেজরা তাঁর জন্য করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজগুলোতে শুধু ব্রাহ্মণ সন্তানরা পড়ার অনুমতি পেত। সেখানে বিদ্যাসাগর কায়স্থদেব ছেলেদের নেওয়ার সুপারিশ করেন এবং তা সরকারকে মঞ্জুরও করতে হয়। কিন্তু কোটি কোটি অনুন্নত শূদ্র বা অব্রাহ্মণ জাতির জন্য কোন রকম সুপারিশ তিনি করেননি। (দ্রঃ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ওরিয়েন্ট লং ম্যান, পৃঃ ৫২৪-৫৪৪)

তিনি বিধবা বিবাহের প্রচলনে যেভাবে বাধা পেয়েছিলেন, যার ফলে তিনি ভারতবাসীর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, “আমার দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবা বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।” (দ্রঃ ডক্টর দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, পুস্তক ঐ, পৃঃ ৪৫৩) বিদ্যাসাগরের ঐ ভূমিকা ধর্মভীরুতার জন্য বলে অনেকে মনে করেন না। অনেকের ধারণা, তিনি একটি বাল্য বিধবাকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। কিন্তু ধর্মের বাঁধন ছিঁড়ে তার জন্য তিনি যা চেয়েছেন তা পারেননি। কিছু দিনের মধ্যে বিদ্যাসাগরের ঐ ভালবাসার পাত্রী সমাজচ্যুত হয় এবং তাকে নিষ্ঠুরভাবে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। ঐদিন হতেই তাঁর প্রতিজ্ঞা ধর্মগ্রন্থ মন্থন করে বিধবা বিবাহ বৈধ করার রাস্তা বের করতেই হবে এবং সরকারকে মঞ্জুর করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। (দ্রঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রী বিনয় ঘোষ, পৃঃ ৭৪)

বিদ্যাসাগরকে আমরা সরস্বতীর বরপুত্র মনে করলেও তিনি ধর্ম মানতেন কি না তাই আজ তর্কের ব্যাপার। কারণ কোন দিনই তাঁকে মন্দিরে পুরোহিত আর দেব-দেবতাকে ভক্তি করতে দেখা যায়নি। শুধুমাত্র সরকারের স্বার্থে রাজনৈতিক কারণে ধর্ম সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। যেমন তিনি কোন হিন্দুকে পত্র লেখার সময় উপরে শ্রী হরি শরনম্ প্রভৃতি লিখতেন মাত্র। বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা শম্ভুমিত্র লিখেছেন, “একদিন দাদা সুখাসীন হইয়া কথাবার্তা বলিতেছেন এমন সময় দুইজন ধর্ম প্রচারক ও কয়েকজন কৃতবিদ্য ভদ্রলোক আসিয়া উপবেশন পূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়। ধর্ম লয়ে বঙ্গ দেশে বড় হুলস্থুল পড়েছে যাহার যা ইচ্ছা সে তাই বলতেছে, এ বিষয়ে কিছুই ঠিকানা নাই, আপনি ভিন্ন এ বিষয়ে মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই।”

এক কথায় দাদা বললেন, ধর্ম যে কি তাহা মানুষের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানবারও উপায় নাই।” (দ্রঃ ঐ পৃঃ ৩৬০) বিদ্যাসাগর কোনদিন ধর্মের জন্য ধর্ম সভায় যোগ দেননি শুধু বিধবা বিবাহের প্রচলনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মকেন্দ্রিক জাতিকে বশে আনার জন্য তিনি ধর্মের কথা বলেছেন বা লিখেছেন মাত্র। (দ্রঃ অধ্যাপক বদরুদ্দিন উমরের লেখা) সংস্কৃত কলেজগুলোর যদিও তিনি সরকারপক্ষের বড় অধিকর্তা ছিলেন, তথাপিও বেদ, সাংখ্য প্রভৃতি পাঠ্য তালিকায় থাকলেও তিনি ঐ সব পুরাতন ধর্মগ্রন্থের ওপর আস্থা রাখতেন কতটুকু তা তাঁর লেখায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন-‘কতকগুলো কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হয়। কী কারণে পড়াতে হয় তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন

সে সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ মতভেদ নেই। তবে ভ্রান্ত হলেও এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। সংস্কৃত যখন এগুলো পড়তেই হবে তখন তার প্রতিশেধক হিসেবে ছাত্রদের ভাল ইংরেজি দর্শন শাস্ত্রের বই পড়ানো দরকার।" (দ্রঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনবিংশ শতকের বাঙালী সমাজ, অধ্যাপক বদরুদ্দিন উমর) উদ্ধৃতিটি খুব বুঝে পড়া প্রয়োজন।

আর একটি উদ্ধৃতি-বিদ্যাসাগর, "একজন সুলেখক হওয়া সত্ত্বেও পত্রপত্রিকা, ছাপাখানা, প্রকাশন সংস্থা ইত্যাদির ওপর তাঁর যথেষ্ট কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি কৃষকদের দুরবস্থা অথবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও রচনা করেননি। বিদ্যাসাগর সেটা না করার কারণ। বঙ্কিমের মত তিনিও জানতেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অর্থ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো; তার উচ্ছেদ ঘটতে সহায়তা করা"...। (দ্রঃ ঐ)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংরেজি শিক্ষা ও ইউরোপীয় উদারনীতিবাদের বাঙালী সমাজের চিন্তাগত পশ্চাদপদত্ব এবং অন্তঃহীন কুসংস্কার দূরীকরণের একটা নিশ্চিন্ত উপযুক্ত প্রতিশোধক হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন এবং সেজন্যই তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধিতা তো করেনই না, উপরন্তু সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন, থেকে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের দীর্ঘ জীবনই কামনা করেছিলেন।" (দ্রঃ অধ্যাপক বদরুদ্দিন উমরের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, পৃঃ ১০৫)

এমনিভাবে আজকাল যাঁরা ঐতিহাসিক নেতা তাঁদের একটি একটি করে তুলে ধরলে বহু বেড়ে যাবে। বেশিরভাগ চরিত্রে না পাই পূর্ণ দেশপ্রীতি আর না পাই ধর্মের নির্ভেজাল ভক্তি। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও আজকাল একজন ঐতিহাসিক পুরুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁরও নাকি বহুকিছু অবদান আছে। তাঁর কাছে ভক্তের দল পিপাসার্ত হয়ে যাবেন আর তিনি উদার হস্তে পরিবেশন করবেন ধর্মের অমৃত বাণী এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁকে বিদ্যাসাগরের দরবারে যেতে হয়েছে। বিদ্যাসাগর কোনদিনও রামকৃষ্ণের ছায়া স্পর্শ করারও এতটুকু প্রয়োজন মনে করেননি।

বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করে বললেন, "আমি সাগরে এসেছি, ইচ্ছে আছে কিছু রত্ন সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।" বিদ্যাসাগর বুঝতেই পারলেন তাকে দলে ভেড়াবার ষড়যন্ত্র। তিনি উত্তর দিলেন, "আপনার ইচ্ছে পূর্ণ হবে বলে তো মনে হয় না, কারণ এ সাগরে কেবল শামুকই পাবেন।" রামকৃষ্ণ বললেন, এমন না হলে আর সাগরকে দেখতে আসব কেন?" তারপর গুরু হওয়ার সাধ নিয়ে পরকাল আর মোক্ষ লাভের অনেক কথা বললেন। কিন্তু সুবিধা করতে না পেরে প্রকারান্তরে

>Goto List

অপমান আর উপেক্ষার বোঝা নিয়ে ফিলে গেলেন। যাঁরা তাঁর কাছে ধর্মীয় রিপোর্ট নেয়ার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন তাদের তিনি বললেন, "এমনকি তাঁর নিজের মোক্ষ লাভের জন্য ভগবানের নাম করারও তাঁর কোন স্পৃহা নেই, সেটাই বোধহয় তাঁর সবচেয়ে বড় ত্যাগ।" আরও অনেক কথার মধ্যে বললেন আপন কল্যাণ মুক্তি পর্যন্ত তিনি উপেক্ষা করলেন।" (দ্রঃ শ্রী বিনয় ঘোষের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

(মিঃ মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ)

মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট ব্যারিস্টার ও নেতা ছিলেন। পনের বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। লণ্ডনে পড়ার সময়েই তাঁর স্ত্রী মারা যান। গান্ধীজিও মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিয়ে করেন।

১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেস জিন্নাহর সঙ্গে গান্ধীর মতান্তর হয়। "তিনি অহিংসা অসহযোগে নীতি সমর্থন না করে বললেন আইনসঙ্গত উপায়ে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম।" সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের সভ্যরা প্রতিবাদ ও বিদ্রূপে তাঁকে উপেক্ষা করেন। সভায় বিশিষ্ট একজন কংগ্রেসী বললেন, "মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।" গান্ধীজি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ উপভোগ করলেন কোন প্রতিবাদ করলেন না। মিঃ জিন্নাহ ক্ষোভে দুঃখে কংগ্রেস ছাড়লেন। তিনি বুঝলেন যে গান্ধীজি থাকতে তিনি কোন দিনই হিন্দু কংগ্রেসে প্রাধান্য পাবেন না।"

জিন্নাহ সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে তার দেশ প্রেমাপেক্ষা কিসের প্রেম বেশি? তবে একথা দিবালোকের মত সত্যি যে, জিন্নাহকে যদি উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া যেত অথবা অন্তত মুসলমান হিসেবে ঘৃণা ও অপমাণিত না করা হতো তাহলে তিনি পূর্বের মত কংগ্রেসের ভ্রান্ত পথের গোলামি করতে কসুর করতেন না। জিন্নাহ দেশ ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি করে সারা ভারতের যে চরম ক্ষতি করেছেন তাও যেমন সত্য গান্ধীর অবিচার, পক্ষপাতিত্ব, অদূরদর্শিতা 'মামার জয়' বলারও সমর্থন করার নীতিও ততই ক্ষতি করেছে। জিন্নাহ ইসলাম ইসলাম করে চিৎকার করলেও সেটা ছিল প্রহসন আর অভিনয় মাত্র।

কথায় তিনি ইসলামের এজেন্ট মনে হলেও কাজে তিনি পুরোপুরি সাহেব ও সাহেবদেরই গোলামি করেছেন। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস "হঠাৎ নেতার দল" বেশির ভাগই যে প্রশংসা পেয়েছেন তা প্রায় সবটুকুই ভাঁওতাবাজি। কারণ মস্ত বড় একটা সত্য হজম করা হয়েছে ইতিহাসের পাতায়। সেটা হচ্ছে এই মূলতঃ হিন্দুদের কংগ্রেস ও মুসলমানদের মুসলিম লীগ লড়াই করেছে সত্য কিন্তু

ইংরেজের সঙ্গে নয়, লড়াইটা হিন্দু ও মুসলমানে। আর মীমাংসা বিচার করতে উভয়েই গোলামি করেছেন ইংরেজের দরবারে। আর তাঁরাই ক্রীতদাসের খাদ্য ও পোশাক বণ্টনের মত ভাগ বণ্টন করে দিয়ে গেছেন। জিন্নাহকে প্রত্যেক বিষয়ে কোণঠাসা করে রাখার প্রবণতা গান্ধীর যে কেন ছিল তার অন্যতম কারণ তাঁরা উভয়ে একই বংশের লোক, একই রক্তে জন্ম।

প্রমাণে বলা যায় যে, "মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ও শ্রী মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধীর পিতামহ ছিলেন কাথিয়াড়ের এক সম্প্রদায়ভুক্ত গুজরাটী হিন্দু। কোন বিশেষ কারণে মিঃ জিন্নাহর পিতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে করাচীতে বসবাস করেন।" (দ্রঃ অবিস্মরণীয়, ২ খণ্ড, পৃঃ ৫, শ্রী গঙ্গা নারায়ণ) এই গ্রন্থে পূর্বে আরও প্রমাণিত হয়েছে হিন্দু হতে যাঁরা মুসলমান হয়েছেন সেই নতুন মুসলমানরা পুরাতন মুসলমানদের অপেক্ষা অত্যন্ত গোঁড়া এবং হিন্দুবিদ্বেষী।

স্যার সৈয়দ আহ্মাদ খান

চলতি ইতিহাসে ভেজাল সমালোচনা এই গ্রন্থের বিশেষ অঙ্গ। এই গ্রন্থে মাওলানা সৈয়দ আহমাদ ব্রেলবীর অবদান দেখানো হয়েছে এবং স্বাধীনতার অবদান বিষয় সমীক্ষা করলে সৈয়দ ব্রেলবীর একার অবদান অপরাপর শতাধিক প্রকৃত নেতা অপেক্ষাও বেশি। তার নাম চাপা দেয়ার জন্য দিল্লীর একজন সৈয়দ আহ্মাদকে শাসক আমদানি করে।

অর্থাৎ ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে দিল্লীতে আর এক সৈয়দ আহ্মাদ জন্মগ্রহণ করেন প্রথমে তিনি মাদরাসায় পড়ে একটি অর্ধ মওলুবীর বিদ্যা অর্জন করেন। সরকার নিঃশব্দে তাকে একটি সরকার পোস্টে সেরেস্তাদারের পদ দিয়ে নিজেদের সেবায় নিয়োজিত করেন। কিছুদিন পরে দয়ালু বৃটিশ সরকার তাঁকে ইংরেজি শেখার পরামর্শ দেয়। শুধু তাই নয়, ভাল শিক্ষক দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিলিতি কায়দায় যবনিকার অন্তরাল হতে তাঁকে ইংরেজি শিখিয়ে ফেলার ব্যবস্থা হয়। তার পরেই এক লাফে তিনি মুনসেফের পদ পান। পরের পদক্ষেপেই স্যার সৈয়দ আহ্মাদ খান সাব জজ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

চারদিকে যখন ইংরেজবিরোধী বিপ্লব তখন নয়া আহ্মাদ বহু ইংরেজকে বিপ্লবীদের হাত হতে বাঁচান। তাঁকে দেশবাসীর সঙ্গে শঠতা করতে হলেও ইংরেজের সঙ্গে সততা বজায় রাখতে তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। ইংরেজের নেমক খেয়ে তিনিও ইংরেজের নেমক হারামি করেননি। সরকার খুব খুশি হয়ে তাঁকে নাইট উপাধি দান করেন। শুধু তাই নয়, প্রতি মাসে জীবনভর সেই বাজারে দুইশত টাকা করে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এবার ইংরেজ মনিবের

পরামর্শে তিনি একটি উর্দু বই লিখলেন, যার নামের অর্থ সিপাহী বিদ্রোহের কারণ। ইংরেজের চালে বহু মুসলমান বিভ্রান্ত হয় এবং অনেকের ধারণা মাওলানা, মৌলভী ও বুযুর্গরা সমাজে যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন এবং ইংরেজি শিক্ষা নিষেদ করেছেন আর চাকরি বয়কট করেছেন, এ সমস্তই ভুল পদক্ষেপ। আজও অনেক ইংরেজি শিক্ষিত মানুষকে বলতে শুনেছি যে ইংরেজি শিক্ষা হারাম বা নিষেধ বলে দিয়ে মৌলভীরা মুসলমান জাতির প্রগতিকে একশত বছর পিছিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তা নয়। দুধ বড় উপকারী নিদ্রা শ্রমের প্রতিষেধক। টাইফয়েড রোগীকে দুধ দেওয়া আর সদ্য সাপে কাটা রোগীকে ঘুমাতে দেওয়া অনেক ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। ঠিক ইংরেজ তাড়াবার জন্য 'নন কো-অপারেশনই একমাত্র উপায় ছিল তখন।

১৮৬০ খৃস্টাব্দে নয়া সৈয়দ আহমাদ The Royal Mohammedan মত India নাম দিয়ে একটি পত্রিকা চালাতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, সম্মানীয় সমগ্র মৌলভী সমাজকে বোকা ও বেকুফ বানাবার জন্য নানা মতবাদ জাহির করলেন। যথা–কোরআন শরীফ সংক্ষেপ করা ইত্যাদি।

স্যার আহমাদ মনিবদের আদেশ নিষেধ ও পরামর্শমূলক বহু বই ইংরেজি হতে উর্দুতে অনুবাদ করার জন্য অনুবাদ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

ইংরেজরা উপযুক্ত লোক চিনতে পারেন। এ প্রশংসা তাদের করলে বোধহয় অবিচার হয় না। এবার নয়া সৈয়দ আহমাদকে ইংলণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভালভাবে ট্রেনিং দিয়ে আবার ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। ফিরে এসে একটি সোসাইটি তৈরি করলেন, সেটা Society for Education progress of Indian Muslims' নামে বিখ্যাত। এই সমিতি বিলিতি টাকার গাড়িতে চড়ে প্রচার কাজ চালিয়ে ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে Mohammedan Anglo Oriental আলীগড় কলেজ তৈরি করলেন বা করালেন। আর ঐ কলেজই বিশ্ব বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এইবার যাচাই করা, বাছাই করা, ভাল ভাল কর্মী এখানে নিয়োগ করা হয়। তারই ফলস্বরূপ নবাব ভিকারুল মূলক, নবাব মহসীনুল মুলক, কাজী আলতাফ হুসাইন হালী, মিঃ নজির আহমাদ প্রমুখ নেতা নয়া আহমাদ সাহেবের পাশে এসে দাঁড়ান। ভারতের মুসলমান ১৭৪৭'র পর হতে যে লড়াই চালিয়ে আসছিল এতদিন পর যেন তাঁরা বুঝলেন আর নয় এখন ইংরেজবিদ্বেষী না হয়ে কিছু দিনের জন্য ইংরেজের সঙ্গে হিন্দু নেতাদের মত সহযোগিতা করার প্রয়োজন মেনে নেন।

ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামী মুসলমান জাতি ইংরেজ ভক্ত ও ইংরেজবিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে জাতীয় ঐতিহ্য শিক্ষা ও সংহতি হারিয়ে ফেলে। ভারতের

স্বাধীনতা সংগ্রামে এই সময়ে ভাটা পড়ার দরুন সংস্কৃতি শিথিল বৃটিশ রাজের ভিত্তি মজবুত হয়। চতুর ইংরেজ চাতুরী দিয়ে ভারতে কেরানী শ্রেণী সৃষ্টির আস্বাদ পায়। অসহযোগী নীতি রাতারাতি বদলে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার দুষ্টক্ষত দ্বিজাতি তত্ত্বের অদৃশ্য ভূমিকার সৃষ্টি হয়। নয়া আহমাদকে নাইট ও খান উপাধি আগেই দেওয়া হয়েছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁকে তাঁর মনিবরা চরম চাঞ্চল্যময় পরম পুরস্কার 'স্যার' টাইটেল দান করেন। তার পরের দশ বছর সরকারের সর্ব প্রকার সেবা করে ১৮৯৮ খৃঃ তিনি মারা যান।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু বিদ্বেষের বীজ বপনের ব্যবস্থা ও ইংরেজের প্রতি অনুগত্যের তালিমের ওপর বেশ জোর দেওয়া হয়। তারই ফলস্বরূপ ১৯০৬ খৃস্টাব্দে ঐ মহা বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত নেতারা এবং আলিগড় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দই মুসলিম লীগের জন্ম দেন। আর সেই নবজাতক শিশুকে গড়ে তোলেন মিঃ জিন্নাহ আর ঐ শিশুর খোরাকের ব্যবস্থা করেন কংগ্রেস ও তাঁর প্রধান সাধু নেতা গান্ধীজির দুর্বলতা ও অদুরদর্শিতা।

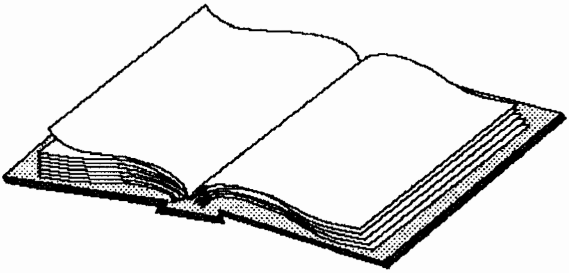

>Goto List

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিখ্যাত হয়েও অখ্যাত যাঁরা

আগেই বলা হয়েছে, মুসলমান জাতি কোনদিনই ইংরেজকে গ্রহণ করতে পারেনি। এবার পরিবর্তনের পালা আরম্ভ হল। উনিশ শতাব্দীর গোড়ায় বা বিশ শতকের শুরুতে মনে হয় যেন মুসলমান আর কিছুই করেনি, যা কিছু করেছিল যদি সত্যই হয় তো সেই সিপাহী যুদ্ধের আগে বা সময়ে। কিন্তু তা নয়। শুধু ১৯০৬ সালে যে সমস্ত বিখ্যাত মুসলমান রাজনীতি সচেতন নেতারা নতুন ইংরেজ ভাইসরয় আর্ল অব মিন্টোকে সেণ্ট্রাল মুহাম্মাডান এ্যাশোসিয়েশনের তরফ হতে অভিনন্দন করেছিলেন তাঁরাও বেশির ভাগই মাওলানা ও মাওলানা ধাঁচের ব্যক্তিবৃন্দ যথা-মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা সৈয়দ নাসিরুদ্দিন, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা বজলুল খান, মাওলানা মোস্তাফা খান, মাওলানা দেলওয়ার হুসেন, মাওলানা সিরাজুল হক খান, মাওলানা আবদুল হামিদ, মাওলানা বদরুদ্দিন, মাওলানা মির্জা মুঃ মাসুম, মাওলানা আবদুল লতিফ, মাওলানা ইবনে আহমাদ, মাওলানা সৈয়দ আশরাফুদ্দিন, মাওলানা আবদুল কাদের, মাওলানা গোলাম রহিম, মাওলানা আবদুল মজিদ, মাওলানা কাজী মমতাজুদ্দিন, মাওলানা শামশুল হুদা, মাওলানা সৈয়দ নাসিরুদ্দিন, সৈয়দ আমীর আলী এম এ, জনাব মির্জা কাদের, অনারবল নবাব মমতাজ উল্লাহ, আঃ নবাব সৈয়দ মহম্মদ, প্রিন্স হাবিবুজ্জামান, প্রিন্স আক্রাম হুসেন, জনাব মুহাম্মদ হাফিজ, জনাব মুহাম্মদ ভাই, জনাব হাজী নূরমুহাম্মদ জ্যাকারিয়া, জনাব নূরমুহাম্মদ ইসমাইল, জনাব ইসমাইল খাঁ, জনাব হুসেন ভাই, হাজী শেখ বখশে ইলাহি, জনাব আলিবেগ খান, জনাব করম আলী ভাই, জনাব সরফরাজ খান, জনাব সৈয়দ বাদশাহ নবাব প্রমুখ নেতাই সেদিন এ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে সরকারের সাহায্যে ভারতীয় মুসলমানদের উন্নতি সাধন করেন। (দ্রঃ অধ্যাপক অমলেন্দু বাবুর ঐ পুস্তক, পৃঃ ৩৩০)

উপরোক্ত মুসলমান নেতারা বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। আর যাঁরা বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিলেন তাঁদের মধ্যেও খ্যাতনামা মুসলমান নেতা যথেষ্ট ছিল যেমন-ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ রসুল, আবদুল হালিম গজনবী (পরে স্যার উপাধি পেয়েছিলেন), ইসলামাবাদের মাওলানা

মনিরুজ্জামান, মাস্টার মাওলানা কাজেম আলী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বর্ধমান জেলার কাসিয়ারা গ্রামের মৌলভী সৈয়দ আবুল কাসেম, মাওলানা আবদুল মজিদ (দি মুসলমান নামে সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক), পাটনার জনাব আলি ইমাম, (পরে স্যার উপাধি পেয়েছিলেন) হাসান ইমাম, ব্যারিস্টার মোজাহেরুল হক, মাওলানা লিয়াকত হোসেন, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী প্রমুখ। (দ্রঃ ঐ পুস্তক এবং সমকালের কথা পৃঃ ৭)

কমরেড মুজাফফর আহমাদ লেখেন, "সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে প্রথম পর্যায় (১৯০৪-১৯১৭) কঠোরভাবে হিন্দু ধর্ম অনুশাসিত ছিল।... হিন্দু রাজত্বের প্রতিষ্ঠাই তাঁদের অভিপ্রেত ছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের আন্দোলন শুধু হিন্দু আন্দোলন ছিল না, আসলে তা ছিল বর্ণ হিন্দুদের আন্দোলন। (দ্রঃ সমকালের কথা, পৃঃ ১০)

মুসলমান সামগ্রিকভাবে যখনই ইংরেজবিদ্বেষ প্রকাশ বন্ধ করল সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরা মুসলমানকে সমর্থন ও হিন্দুদের বিষ নজরে দেখতে আরম্ভ করল। যুগ যুগ পরে মুসলমানরা যে অগ্নি আন্দোলন জ্বালিয়ে তুলেছিল তা সামগ্রিক হিন্দু সমাজের সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থন অভাবে যেন স্তব্ধ হল। এবার ইংরেজের প্রতি আন্তর্জাতিক নানা প্রকার চাপের কারণে নিজেরাই দেশ ছেড়ে পলায়নের প্রয়োজন অনুভব করে। এই সময় হিন্দুদের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে সাথী হিসেবে মুসলমানদের তেমনভাবে ডাকেওনি আর মুসলমানেরাও একটু পালা বদলের জন্য ব্যাপকভাবে যায়ওনি।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভা স্বীকার সকলকেই করতে হবে। তিনি ভারতের বাইরে ঘুরে বেশ করে বুঝেছিলেন মুসলমান জাতি সর্ব ভারতীয় নয় বরং আন্তর্জাতিক জাতি। তাই তিনি শেষের দিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যাদের তীব্র বিদ্বেষ ও পদোন্নতিকাতরতা ছিল তাদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলতে গিয়ে রবীবাবু লিখেছেন, "হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধ লয়ে আমাদের দেশে একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেকদিন হতে চলে আসতেছে। তা না ভোগ করে আমাদের কোন মতেই নিস্তার নেই।"

"আর মিথ্যা লেখার প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করতেই হবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে, আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।...

"আমরা জানি অনেক স্থানে ফরাসে হিন্দু মুসলমানে বসে না—ঘরে মুসলমান এলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।

"তর্কের বেলায় বলে থাকি কি করা যায়, শাস্ত্র তো মানতে হবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করে ঘৃণা করার তো কোন বিধান দেখি না। যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয়, তবে সে শাস্ত্র লয়ে স্বজাতি স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনদিন হবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করে যাদের জাতি রক্ষা করতে হবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হয়ে তাদের গতি নাই। তারা যাদিগকে ম্লেচ্ছ বলে অবজ্ঞা করতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাদিগকে সহ্য করতে হবে।" (দ্রঃ রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃঃ ৬২৮-৬২৯)

ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে যাঁরা বিখ্যাত হয়েও অখ্যাত অথবা অবলুপ্ত তাঁদের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই রয়েছেন। মুসলমানদের নাম চাপা দেওয়ার কারণ সাম্প্রদায়িকতা ও গোষ্ঠী সঙ্কীর্ণতা। যখন হঠাৎ নেতার দল দেখলেন মুসলমানদের পূর্বপরিকল্পিত পথে স্বাধীনতা আসবেই, তাকে আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না তখন গান্ধীজি, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ নেতা দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছিলেন। একথা আগেই জানানো হয়েছে কিন্তু কেন যে নিয়েছিলেন তাঁর এক অপ্রচারিত অকাট্য, কারণ আধুনিক চিন্তাশীলরা নির্ধারিত করেছেন, সেটা হচ্ছে এই যে, যদি ভারত অখণ্ড থাকে তাহলে স্বাধীনতার ইতিহাস মঞ্চে হঠাৎ নেতার দলের বেশির ভাগই বাদ পড়ে যাবেন আর চিরদিনের বিরুদ্ধবাদী মুসলমান জাতিই হবে সর্বেসর্বা। নিজেদের নামে জয় ঢাক বাজানো আর ইচ্ছামত ইতিহাস লেখানোর সন্ধানেই আজ অখণ্ড ভারত নিষ্ঠুরভাবে আহত অথবা ত্রিখণ্ডে নিহত।

সুভাস বসু, চিত্তরঞ্জন, নজরুল, শরৎচন্দ্র প্রমুখ প্রকৃত স্বাধীনতা প্রার্থী আজ উপেক্ষিত প্রায়। তাঁদের তো তবুও কোন প্রকারে নামটুকু জানানো হয়েছে কিন্তু অবদানের মূল্যায়ন হয়নি। এছাড়াও বহু হিন্দু যোদ্ধা শহীদ ও প্রবাসীর নাম হজম করা হয়েছে তার কারণ কী? যদি সাম্প্রদায়িকতাই কারণ হয় তাহলে হিন্দুদের নাম গোপন করা হয়েছে কেন? তার সত্য ও সহজ উত্তর তাঁরা সব কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছিলেন তাই তাদের বিষয়ে ভালমন্দ কিছু না বলে চুপ থাকাই ভাল মনে করা হয়েছে। অবশ্য কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হয়নি তা নয়।

ইংরেজবিরোধী সংগ্রামী, যাঁদের ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থান নেই তাঁদের সংখ্যা সহস্র সহস্র। কিন্তু আমাদের ইতিহাস সেদিকে না গিয়ে যদি রাম, সীতা, বানর, দ্রৌপদী, লাইলি মজনু আর রুস্তম পালোয়ানের নাম দিয়ে ইতিহাসকে ভরিয়ে তোলে তাহলে আর কি বা বলা যায়?

কমরেড মানবেন্দ্রনাথ রায়, কমরেড মুজাফর আহমাদ, কমরেড শওকত উসমানী, কমরেড গুলাম হুসাইন, কমরেড শ্রীপাট অমৃত ডাঙ্গে, কমরেড সিঙ্গার ভেলু চেটিয়ার, কমরেড রামচরণ শর্মা, কমরেড শামসুদ্দিন হাস্‌নান, কমরেড

কমরেড মনিলাল, ডক্টর কমরেড সম্পূর্ণনন্দ ও কমরেড সত্যভক্ত প্রমুখ নেতার নাম কানপুর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার রেকর্ডে পাওয়া যায়। অবশ্য এদের অনেকের বিপক্ষেও বিপক্ষীয়দের বক্তব্য নেই তা নয় তবুও এঁরা হঠাৎ নেতাদের অনেকের চেয়ে বিপদকে মাথায় নিয়ে পথ চলেছেন (দ্রঃ আমার জীবন ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি, মুজাফফর আহমাদ)

যাঁরা জেল খেটেছেন ইংরেজের বিরুদ্ধবাদী বলে তাঁদের অনেকের মধ্যে ডাঃ যদু গোপাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, ভুপতি মজুমদার, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভুপেন্দ্র কুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুপ্ত, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ভট্টাচার্য, রবি সেন, অমৃতলাল সরকার, রমেশ চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তির আজও মূল্যায়ন হয়নি। এমনিভাবে ব্যারিস্টার পুলিন বিহারী দিন্দাও একজন কমরেড ছিলেন। আর ছিলেন কমরেড ক্লেমেন্স, পামদত্ত একজন নামকরা লোক। এছাড়া কমরেড সাজ্জাদ জহীর, কমঃ ডক্টর জেড এ, কমরেড মোসাম্মাৎ হাজেরা বেগম, কমরেড কুমার মঙ্গলম, কমঃ পার্বতী কৃষ্ণাণ, কমঃ নিখিলনাথ চক্রবর্তী, কমঃ ইন্দ্রাজৎ গুপ্ত, কমঃ রেনুরায় ও কমঃ জ্যোতি বসু প্রমুখ ভারতীয় বিলেতে পড়তে প্রবাসী অবস্থাতেই কমিউনিস্ট পার্টিকে আদর্শ বলে মনে করেন এবং দেশে ফিরে এসে ভারতে পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত হন। এরা বেশির ভাগই দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট। "আর জ্যোতি বসু প্রমুখ ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসিস্ট)-এর সভ্য। বাকি সকলেই দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিতে রয়েছেন।" (দ্রঃ ঐ পৃঃ ৫৮১)

এমনিভাবে ভারতের বাইরে যেসব ভারতীয়র অভিযান তাঁদের মধ্যে রাজ্য মহেন্দ্র প্রতাপ, মুহাম্মদ সফীক, মুহাম্মদ মাসউদ আলী শাহ, হাবীব আহমাদ, মথুরা সিং প্রমুখ কমরেডের নাম ও তাঁদের কর্ম ও জীবন সংগ্রাম সমীক্ষিত হয়নি। মুসলমানরা যখন হতে মোটামুটি লোক দেখানো ইংরেজপ্রীতি দেখাতে থাকেন তখনকার স্বাধীনতার চিত্রটুকুই ইতিহাসে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে মনে হয় স্বাধীনতা শুধু হঠাৎ নেতার দল ও হিন্দু ভ্রাতারাই এনেছেন আর এক–আধজন মাত্র মাওলানা আযাদের মত মুসলমান স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু আসল কথা তা নয়, মুসলমান যখন বারে বারে প্রমাণ পায় তারা ছাড়া কেউ স্বাধীনতা চায় না তখন তারা সাময়িকভাবে বাহ্যিক ইংরেজ প্রীতি দেখালেও ভেতরে ভেতরে ইংরেজবিরোধী আগুন জ্বালাতে বদ্ধপরিকর হয়। সেখানেও মাওলানা উবায়দুল্লাহ (সিন্ধু), মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (দেওবন্দ), মাওলানা আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও আরও শতশত আলেম নিজেদের কার্যসিদ্ধি করতে অন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ কিছু শিক্ষিত যুবককে ভারতের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। যেমন ১৯২৫ খৃস্টাব্দে লাহোরের বিভিন্ন কলেজ হতে বিপ্লবী, দেশগত প্রাণ প্রচুর ছাত্রকে উধাও বা

নিরুদ্দেশ হতে দেখা যায়। যাঁরা দেশান্তরে গিয়েছিলেন দেশের জন্য তাঁদের নামের আংশিক তালিকা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোক্তা মুজাফফর আহমাদ বলেছেন, "লাহোরে বিভিন্ন কলেজ হতে যে পনেরজন ছাত্র পালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম নিচে দিলাম।

১। খুশী মুহাম্মদ (২) আবদুল হামিদ (৩) জাফর হাস্‌সান (৪) আল্লাহ নওয়াজ (৫) আবদুল বারী (৬) মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (৭) আবদুর রহমান (৮) আবদুর রশীদ (৯) রহমত আলী (১০) আবদুল মজিদ। বাকি পাঁচজনের নাম আমি জানতে পারিনি।" (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৮৯)

অবশ্য ঐ সব দেশগত প্রাণ বীরদের ইংরেজের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' করার জন্যই পাঠিয়েছিলেন এ মাওলানাদেরই দল। এ কথাটির প্রমাণ ঐ বয়েতেই আছে "তবে একটি কথা এখানে বলে রাখা ভাল যে লাহোরের ছাত্রদের দেশ ত্যাগ করার বৈপ্লবিক প্রেরণা জুগিয়েছিলেন মৌলভী ওবায়দুল্লাহ সাহেব।... উল্লিখিত ১৫ জন ছাত্র পরে 'পলাতক ছাত্র' বা 'মুজাহিদ ছাত্র' নামে অভিহিত হয়েছেন। জিহাদ শব্দের অর্থ ধর্মযুদ্ধ। যাঁরা ধর্ম করেন তাঁদের বলা হয় মুজাহিদ। পলাতক ছাত্রদের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।" (দ্রঃ ঐ, ১৮৮ পৃঃ)

আগেই বলা হয়েছে, মুসলমানরাই শুধু পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বারবার দাবি করেছেন আর কংগ্রেস নেতারা তা বারবার প্রত্যাখ্যান করেছেন। শেষে মুসলমানদের খিলাফত কমিটি এবং কংগ্রেস যখন এক হয়ে যায় তখনও অনেকদিন অনেকবার ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়ে শেষে যখন পূর্ণ স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন রেজুলেশনে যে কথাটি লেখা হয়েছিল তা জানতে পারলে হঠাৎ নেতাদের প্রতি অনেকের ঘৃণা আরও বৃদ্ধি হয়। সেটি হচ্ছে এই-The best interests of India and the Moslems demand that the Congress creed the term "Swaraj" be subtituted, henceforth bv the term "Complete independence," অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বার্থে এবং মুসলমানদের দাবিতে এখন হতে কংগ্রেসের মূলমন্ত্র "স্বরাজের পরিবর্তে পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত।" (দ্রঃ সত্যেন সেনের পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃঃ ১০৬) নতুন সরকার গঠনের দুঃসাহস মুসলমান নেতারা বারে বারে বিক্ষিপ্তভাবে করেছিলেন আর হিন্দু নেতাদের মধ্যে একমাত্র যিনি ঐ সাহসে সাহসী হয়েছিলেন তিনিই হচ্ছেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র। ভারতের বাইরে কাবুল রাষ্ট্রে গিয়ে মাওলানা উবায়দুল্লাহ ভারতের জন্য একটি সরকার গঠন করেছিলেন এবং সেই সুচিন্তিত পদক্ষেপ যে শুধু মাত্র মুসলমানী ভাবধারা ঘেঁষা ছিল তা মোটেই বলা যায় না। কারণ ঐ সরকারের কমিটিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মাওলানা বরকতুল্লাহ

আর স্বরাষ্ট্রপদে যোগ্যতার পূর্ণ প্রতীক মাওলানা উবায়দুল্লাহ স্বয়ং আর রাষ্ট্রপতির সম্মানীয় পদে যাঁকে বরণ করা হয়েছিল তিনি হচ্ছেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ। আর লাহোর হতে আগত মুসলমান যুবকগণ অন্যান্য পদ গ্রহণ করেছিলেন। (দ্রঃ মুজাফফর আহমাদের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৮৯)

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আসল নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পাক্কা একজন ব্রাহ্মণ। অতএব তিনি তখনকার নীতি অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদীর দলেই ঢুকেছিলেন। "অস্ত্র সংগ্রহের তাগিদে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্যই বিপ্লবীরা তৎকালে রাজনৈতিক ডাকাতিতে লিপ্ত হতেন। ১৯০৭ সালে নরেন্দ্রনাথ এক রেল স্টেশনে ডাকাতির দায়ে অভিযুক্ত হন।" (বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, পৃঃ ৪১০) বহুবার বয়স অল্পের জন্য তিনি মুক্তি পান শেষে ১৯১০ সালে তাঁর জেল হয়। পরে জেল হতে মুক্তি পেয়ে তিনি পাকা ধার্মিক ও সন্ন্যাসী হয়ে পড়েন। পুনরায় আবার অস্ত্র সরবরাহ মামলায় অভিযুক্ত হন এবং বিদেশে পাড়ি দেন। তখন শিক্ষিত ও সাহসী যাঁরাই বিদেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হতেন মাওলানার দরদিদের সঙ্গে যোগাযোগ পেয়েছিলেন। তাঁকে অনেকে বিদেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির স্রষ্টা বলে থাকেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। অবশ্য তিনিও একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। তাই কমরেড মুজাফফর আহমাদও বলেছেন, "প্রবাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিরও তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।" মানবেন্দ্রনাথের রাশিয়ার মস্কোয় পৌঁছাবার আগেই মাওলানা জ্যাকোরয়; সেখানে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা সারা মস্কোকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ১৯১৯ সালের ৯ জুন তাশখন্দে অনুষ্ঠিত তুর্কিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে জাকারিয়া বক্তৃতা দিয়েছিলেন।" (দ্রঃ আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পৃঃ ১৯৫) পরে ঐ জাকারিয়া সাহেব পৃথিবীর নানা রাষ্ট্র ঘুরে প্যারিসে আরও পড়াশোনা করেন এবং ফরাসী ভাষায় একটি থিসিস লেখেন সেটার অর্থ হচ্ছে 'মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' এবং তিনি ডক্টর উপাধি লাভ করেন।

স্বাধীনতার জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করে যাঁরা ইংরেজের তোষণ, পোষণ ও আমন্ত্রণে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন তাঁদের কথা বলছি না। সুভাষচন্দ্র আর মাওলানা উবায়দুল্লার মত মানুষের কথাই এখানে আলোচ্য। জানলে অবাক হতেই হবে মুসলমান জাতির "খিলাফত আন্দোলন হতে 'হিজরত' আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল।" (দ্রঃ ঐ) হিজরত মানে ধর্মের জন্য অত্যাচারিত হয়ে দেশ ত্যাগ। অতএব মাওলানার দল সাধারণ মুসলমানদের কোন যাদুতে বশ করেছিলেন, যে দলে দলে লোক ভারত হতে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত ছুটে বেড়িয়েছে। ডাঃ পট্টভি সীতা রামাইয়া তাঁর কংগ্রেসের ইতিহাস The History of the Indian National Congress, Vol. I.P 199 এ লিখেছে। যে "আঠারো হাজার মুসলমান এই সময়ে দেশ ত্যাগ

করেছিলেন।" এই অব্যর্থ সত্য ঘটনা মুজাফফর আহমাদও স্বীকার করেছেন আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পুস্তকে ১৯৭ পৃষ্ঠায়।

১৮,০০০ মুসলমান প্রত্যেকেই ইতিহাসখ্যাত মানুষ। তাদের ভেতর হতে ১৮ শতও দূরের কথা ১৮ জনও চলতি ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থান পাননি। একধার হতে তাঁদের নাম যদি পরপর লিখে তাদের সম্বন্ধে অল্পস্বল্প করেও পরিচয় দেওয়া যায় তাহলে এক পৃষ্ঠা করে লিখলেও ১৮০০ পৃঃ হবে তাই কয়েকজন মুসলমান ও হিন্দুর নাম ইঙ্গিত হিসেবে আরও লিখছি। কমঃ আবদুল কাদীর (গুলিতে নিহত হয়েছিলেন), মুহাম্মদ আকবর খান, অবনী মুখার্জি প্রমুখ। পরে আরও কিছু ভারতীয় ইউরোপ হতে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন যেমন ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, সৈয়দ আবদুল ওয়াহিদ, অধ্যাপক পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে, হেরম্বলাল গুপ্ত, গুলাম আম্বিয়া লুহানী, আগনেশ স্মেড়লি, নলিনী গুপ্ত প্রমুখ। এছাড়াও নামজাদা অনেক তরুণ ভারতের বাইরে অনেক কাজ করেছেন, নিজামুদ্দিন, সাঈদ আহমাদ রাজ, সুলতান মাহমুদ, ফিদআ আলী, আঃ কাদের শেহরাই, হাবীব আহমাদ, রফিক আহমাদ, ফিরোজুদ্দিন মনসুর ও মীর আবদুল মজিদ, আমীর হায়দার খান, কলকাতার শামসুল হুদা, অধ্যাপক ক্ষিতিশচন্দ্র চট্টপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার জীবন লাল কাপুর, মুঃ কুতুবুদ্দিন প্রমুখের নামও উল্লেখযোগ্য। মাওঃ ব্যতীত বাকি যাঁদের নাম করা হলো তাঁরা প্রায় সকলেই কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছিলেন। মাওলানা উবায়দুল্লাহ আশা করেছিলেন যাঁদের পাঠানো হচ্ছে তাঁরা ঠিকমত নামায রোযায় অভ্যস্ত না হলেও বা পোশাক-পরিচ্ছদে খানিকটা সাহেবী গন্ধ থাকলেও ধর্মীয় বিশ্বাস তাদের গাঢ়। ফলে তারা জয়ী হবে এবং পরে তাদের খুব পাকা মুসলমান বানিয়ে নিতে পারা যাবে। রাশিয়ার মস্কোতে এক বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়েছিল তা প্রবাসীদের জন্য। সেখানে শুধু মাথা গুঁজবার জায়গাই ছিল না বরং ফ্রীতে খাওয়া দাওয়া থাকা আর সম্ভাব্য আরাম আয়েস ও গোলাপি বিলাসিতারও ব্যবস্থা ছিল। তার চেয়েও লোভনীয় জিনিস ছিল অন্য রাষ্ট্রে যাতায়াত বা যোগাযোগের ও রাষ্ট্রের তরফ হতে তখন করা হতো সেটির নাম ছিল "Communist Univecity of the Toilng East" নামে শ্রমজীবীদের প্রাচ্যের কমিউনিস্ট বিদ্যালয়। রাশিয়ায় আরো একটি ÍRussian's Univercity of Oriental Communism" প্রাচ্য কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। মিঃ এ. সি. ফ্রি ম্যান যা লিখেছেন তাতে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা থাকতো বেশ বোঝা যায়-"নয়ন তৃপ্তিকর পোশাক পরিহিত লোকেরা এই বাড়ির ভেতরে ছিলেন, কারুকার্য খচিত টুপি পরা বুখারার দর্জিরা, ভোল্গা আর ক্রিমিয়ার বাদাম চোখো তাতারেরাও ছিলেন, ছিলেন ককেসাসের পার্বত্য মুসলমানরা, আরও ছিলেন ভারত, চীন, জাপান ও কোরিয়ার রাজনীতিক আশ্রিতেরা।" (দ্রঃ ঐ পৃঃ ৮৯)

>Goto List

এখান হতে বোঝা যায় যে পুরোপুরি অগ্নিমন্ত্রে রঞ্জিত এবং দীক্ষিত না করে বিদেশে পাঠানো ঠিক হয়নি। ওখানেই যাঁরা থাকার ছলনায় পড়েছেন ও থেকেছেন তাঁরাই পরে কমিউনিস্ট ও কমরেড উপাধিতে ভূষিত হয়ে আমাদের কাছে নাস্তিক বলে চিহ্নিত। অথচ তাঁদের ধর্মীয় যশ ও হুঁশ কিছুই কম ছিল না। শুধু অভাব ছিল পূর্ণ ধর্ম শিক্ষা ও ইসলামের মতবাদ হতে বিচ্ছিন্নতা মাত্র। রাশিয়ানরা মানবেন্দ্রনাথ রায়কে একটা শিক্ষকের পোস্ট দিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের নানাভাবে দলে টেনেছিল। অথচ তাঁদের ইংরেজি শিক্ষা ধর্মের পূর্ণ উন্মাদনা পুরো মাত্রায় ছিল। যেহেতু মিঃ রায় লিখেছেন... Most of them transferred their fanantical allegiance from Islam to Communism... "এই অল্পসংখ্যক মুহাজির যুবকের ভেতরে ইসলাম সম্বন্ধে যতটা উম্মাদনা ছিল ঠিক ততটাই উন্মাদনা তাঁদের ভেতরে এসে গেল কমিউনিস্ট সম্বন্ধেও।" (দ্রঃ ঐ, পৃঃ) ৫০) কমরেড মুজাফফর আহমাদ নিজেও একজন পূর্ণ মওলুবী না হলেও বেশ কিছু জানতেন, যেহেতু তিনি প্রথমে নোয়াখালীতে আখতারিয়া মাদ্রাসায় পড়েছিলেন এবং পরে পড়া ছেড়ে দিয়ে অন্য লাইন গ্রহণ করেন। পরে তিনি কেমন করে নাস্তিক হয়ে পড়লেন তা চিন্তা করা উচিত।

এই কমিউনিজম সাধারণত গরিব শ্রেণীরই বেশি পছন্দ যেহেতু তাতে দরিদ্র শ্রেণী মোটা ভাত কাপড়ের আর অনটনের হাত হতে রেহাই পাওয়ার আশ্বাস পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার ভারতের মৌলানা মওলুবী ধর্মভীরু বিরাট পণ্ডিত সম্প্রদায়টি ধনী নয়, কোটি কোটি মুসলমান এখনো তাঁদের সঙ্গে বিজড়িত কিন্তু তাঁরা কেন কমিউনিজমবিরোধী? তাহলে কি তাঁরা সেই ইজমের প্রতীক্ষায় আছেন, যেখানে আল্লাহকে স্বীকার করে নিয়ে শান্তিবাদ ও সমতাবাদ থাকবে, সেখানে থাকবে না মানুষের মনগড়া পরিবর্তনশীল অস্থায়ী অসার আইন?

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ঘটেছিল ১৯১৭ সালে ১৩ এপ্রিল আর কিসসাখানি বাজারে অনুরূপ আর একটা ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ২৩ এপ্রিল। ১৯১৭ সালে আমেরিকায় ভারতীয় রামচন্দ্র ভরদ্বাজ ইংরেজের বিরুদ্ধে গদর পত্রিকায় লিখতেন। তাই ইংরেজরা ১৯১৭ সালে ২৩ এপ্রিল তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। ঐ তারিখকে কেন্দ্র করে ১৯৩০ সালে ২৩ এপ্রিল মাওলানা আবদুর রহিম পোপলজি, আল্লাহ বখশ হরতী, গোলাম রব্বানী শেঠীর নেতৃত্বে একটি কাউন্সিল গঠিত হয়। বহু লোক তাঁদের ভাষণ শুনতে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে সরকারি গাড়ি আসে এবং মাওলানাদের এ্যারেস্ট করে। জনতা বাধা দিতে গিয়ে বাধা পায়। অবশেষে পুলিশ গুলি চালায়। জনতা তখন গাড়ির প্যাট্রোলের ড্রাম ফাটিয়ে গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে মিঃ মেটকাফ ও মিঃ গার্ডন অল্প সময়ের মধ্যেই ম্যাসিনগান, কামান ও গোলাগুলি আনিয়ে নেয় তখনও জনতা নেতাদের মুক্তির দাবিতে চিৎকার করছিল। আরম্ভ হল ফায়ার সমস্ত মানুষই প্রায়

আগুনে আহত হতে বাকি থাকে নাই আর অনেকেই বাজারের উপর শহীদ হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে সন্ধি করলেন। ওখানে লালকোর্তা বাহিনীর বীরত্ব ভোলার নয়। যার নেতা ছিলেন সীমান্ত গান্ধী আবদুল গাফফার। তিনিও কিসসাখানিতে বন্দি হলেন। আজ গাফফার খানের অবদান হঠাৎ নেতাদের চেয়েও সহস্র সহস্র গুণে বেশি এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইতিহাস প্রায় নীরবই বলা যায়।

আবদুল গাফফার খানের একটি বিরাট বীর বিপ্লবী দল ছিল। প্রত্যেকটি বিপ্লবী দু-চার দিন না খেয়ে তাঁরা লড়াই করতে পারতেন। তাঁরা রক্ত দিতে ও রক্ত নিতে দুটোতেই সমান সক্ষম ছিলেন। তাঁদের জামার রঙ ছিল রক্তের মত লাল, তাই "লালকোর্তা" বা রেডশার্ট এক ঐতিহাসিক শব্দ।

গান্ধীজির দুর্বল অহিংস পুতুল বিপ্লবীদের থামিয়ে রাখা সহজ ছিল কিন্তু বীর বাহিনীকে থামিয়ে রাখা তার এক বিরাট কীর্তি। যদি তিনি কংগ্রেসের খপ্পরে না পড়তেন তাহলে তাঁকে তাঁর বাহিনীকে নিয়ে তিনি অন্য পথে চলতে পারতেন। মাওলানা আযাদের কথায় তাঁকে গান্ধী, জহরলাল ও প্যাটেল প্রমুখের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হয়েছিল। খান সাহেবের সৈনিক দলটির নাম ছিল খোদায়ী খেদমতগার, যার বাংলা মানে স্রষ্টাসেবক। তাঁর ভাই, তিনিও বিখ্যাত নেতা ছিলেন, তিনিই ডাঃ খান সাহেব বলেই বেশি পরিচিত ছিলেন। তাঁদের বিরাট অবদান ঐ খান 'ব্রাদার্সদের ঐতিহাসিক অবদান এবং নেহরুর অনেক তথ্য নেহেরুর অবিচার ও নির্বুদ্ধিতা এবং রাজনৈতিক অনেক ত্রুটির ইতিহাস, আসল ইতিহাসে বিজড়িত। মুসলিম লীগের নেতাদের দেশপ্রেমের পরিমাণের পরিমাপ করেই তিনি কংগ্রেসে গিয়েছিলেন কংগ্রেসীদের শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং ত্রুটি সংশোধন করতে। ফলে মুসলিম লীগ খান ভ্রাতৃদ্বয়কে খুবই ঘৃণার চোখে দেখতো। কিন্তু কংগ্রেসে যিনি বা যাঁরা মিঃ মাউন্টব্যাটেনের দেশ ভাগের সময় পর্যন্ত সংযুক্ত ছিলেন তিনি আজ ইতিহাসে বঞ্চিত কেন? যাঁকে তখন সীমান্ত গান্ধী উপাধি দেওয়া হয়েছিল তাঁর আজ গান্ধীর পাশে একটুও স্থান নেই।

"Khan Abdul Gaffar Khan and his party had always supported Congress and opposed the Muslim League. The League regarded the khan brothers as mortal enemies. (hs" India wins Freedom by Azad)

খান আবদুল গাফফার খান এবং তাঁর বাহিনী খোদায়ী খেদমতগারদের কংগ্রেস এমনভাবে ত্যাগ করে, যেমন নেকড়ে বাঘের মুখে ফেলে দেওয়া। (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৯৩)

এমনিভাবে আরও বহু বিখ্যাত মানুষের নাম আজ অজ্ঞাত যেমন ১৮৭২ সালে মিঃ লর্ড মেয়োকে হত্যা করেছিলেন মুহাম্মদ শের আলী এবং তাঁর ফাঁসি

>Goto List

হয়েছিল। ১৮৭১ সালে কুখ্যাত বিচারপতি কথায় কথায় লাল কেতাবের আইনে বিপ্লবীদের ফাঁসি দিতেন তাঁকে উপযুক্ত পুরস্কার হিসেবে খতম করেন মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে যিনি প্রথমে বিদ্রোহী শহীদ তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ রফিক মণ্ডল। এদের নাম আজও মুছে যাওয়া উচিত নয়। (দ্রঃ আজকাল পত্রিকায় প্রবন্ধ ভারতের মুক্তি সংগ্রাস ও মুসলিম সমাজ, শান্তিময় রায়। ১৯০৮ ডিসেম্বর)

১৯০৬ সালে বরিশালের সংগ্রামে যিনি নেতৃত্ব দেন তিনি হচ্ছেন আবদুল্লাহ রসুল। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন শুধু হিন্দুরাই করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু তার সঙ্গে মুসলমান উকিল, মোক্তার, তালুকদার প্রমুখ প্রচুর মুসলমান যোগ দিয়েছিলেন তার কিছু কিছু নাম বলা হয়েছে তবু তার তাথ্যিক হিসেবে কোন জেলা হতে কতগুলো নেতৃস্থানীয় মুসলমান যোগ দিয়েছিলেন বলতে হলে নোয়াখালী ৪০, বরিশালে ৮০, চট্টগ্রামে ৫০, ফরিদপুরে ৫০, ময়মনসিংহে ১১০, ঢাকায় ৭৫ ও কলকাতায় ২০০ সভা হয় তাতে মুসলমানদের সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। "এই সব জেলায় বিপুলসংখ্যক মুসলিম জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিলেন ও মুসলিম জননেতা এই সব সভাগুলোতে ভাষণ দিয়েছিলেন। (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩৭-৩৮) আমরা ইতিহাসে হিন্দুদের গুপ্ত সমিতির নাম পাই তা সঙ্কীর্ণ ও অসঙ্কীর্ণ যাই হোক। কিন্তু মুসলমানদের প্রচুর গুপ্ত ঘাঁটির নাম ইতিহাসে গুপ্তই আছে।

"অনেক মুসলিম যুবক মুসলিম গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। মৌলানা আযাদ মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মধ্যপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, পেশোয়ার ও উত্তর ভারতের অনেক জায়গায় পরিক্রমা শেষ করে কলকাতায় হালিবুল্লাহ (আল্লার দল মিসবাহুল লুগাত অভিধান দ্রঃ) নামে বিপ্লবী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই সমিতির মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশে ও বাংলার বাইরে অনেক দেশপ্রেমিক মুসলিম বুদ্ধিজীবীকে তাঁর দলভুক্ত করেন।

'জাহানী ইসলাম' নামে একটি পত্রিকা জাহাজীরা বন্দরে বন্দরে বিলি করতেন তাঁরা প্রায় সবই মুসলমান তার একটিতে মিসরের ইনভার পাশার একটি মন্তব্য ছিল; "হিন্দু-মুসলমান, তোমরা উভয়ে একই বাহিনীর সৈনিক। তোমরা দুই ভাই। এই নিচ ইংরেজ জাতি তোমাদের শত্রু। এদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে (জেহাদ) যোগ দিয়ে তোমরা মহত্ব লাভ কর।" (দ্রঃ ঐ)

"এই সংগঠিত প্রচেষ্টার ফলে ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ১৩০ নম্বর বেলুচি রেজিমেন্ট রেঙ্গুনে, ব্যাঙ্ককে ও সিঙ্গাপুরে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সালে ৫ নং নেটিভ লাইট পদাতিক সেনাবাহিনী (যার প্রায় গোটা সেনাবাহিনীই মুসলিম) সিঙ্গাপুরে বিদ্রোহ করে।" (শান্তিময় রায়, ঐ)

শোষক ইংরেজ বন্দুকের নল দিয়ে তা ব্যর্থ করে দুজন নেতার ফাঁসি দেয় আর বাকি প্রত্যেককে যাবজ্জীবন দীপান্তর দেয়।

১৯১৭ সালে দ্বিতীয় মান্দালয় ষড়যন্ত্র মামলায় তিনজন বিপ্লবী সৈনিকের প্রাণদণ্ড হয়। অবশ্য তাঁদের নাম প্রচলিত ইতিহাসে নেই কিন্তু সত্য ইতিহাসে খোদিত। তাঁরা হচ্ছেন জয়পুরের মুজতবা হুসেন, লুদিয়ানার অমর সিং আর ফৈজাবাদের আলী আহমাদ।

১৯১৫ সালে বিপ্লবীদের সর্বোতভাবে সাহায্য করার জন্য এবং ধনী হয়েও বিপ্লবীদের সাহায্য করে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করার অপরাধে যে মহামনীষীর ফাঁসি হয় তিনি হচ্ছেন কাসেম ইসমাইল খান।

১৯১৫ সালে মার্চ মাসে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বজ্র হামলা ও বিদ্রোহের অপরাধে মুহাম্মদ রাইসুল্লা খানের ফাঁসি হয়। ইংরেজি রিপোর্টে এই নামটি রাসূলুল্লাহ আছে কিন্তু এই নামটির বানান ভুল a-এর মধ্যে একটি i বাদ গেছে বলেই মনে হয়। সুতরাং আমরা রাইসুল্লাহ লিখলাম। ঐ ১৯১৫ সালেই মুহাম্মদ ইমতিয়াজ আলীও বীরদর্পে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন এবং জীবন আর সমস্ত রক্ত বিন্দু দান করেন। ঐ ১৯১৫তে রুকনুদ্দিন ফাঁসির মঞ্চ অলঙ্কৃত করেন। সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা, শয়তান ইংরেজ সরকার, তাঁর প্রাণভিক্ষার আবেদন নিবেদন করলে প্রাণদণ্ড শিথিল হতে পারে বলে জানায়। কিন্তু তাঁরা শত্রু শাসক সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন জানানো তীব্র ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। তাই হাসিমুখে মঞ্চে আরোহণ করেন।

১৯২৭ সালে বিপ্লবী বরকতুল্লাহ ভারতের বাইরেই প্রাণত্যাগ করেন, মরবার আগেই জানিয়েছিলেন একটি সাদের কথা সেটা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা পাওয়া আর ভারতের মাটিতে তাঁর কবর হওয়া।

ভারতের বিখ্যাত বীর আমীর হাইদার ভারতের বাইরে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, জাভা, সুমাত্রা, জাপান প্রভৃতি দেশে এমনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন যে কোন দিন যায় সরকার তাঁকে ধরতে পারেনি। অবশেষে তিনিও কমিউনিস্ট হয়ে গেছেন। তাই তাঁর অবদানও বোধহয় চাপা পড়ে গেছে।

মৌলানা আযাদের একজন অন্যতম বিপ্লবী সহকর্মী ছিলেন নাম রেজা খাঁ, অস্ত্রশস্ত্র আমদানিতে তাঁর আবেদন আছে যথেষ্ট। তিনিও পরে কমিউনিস্ট হয়ে গেছেন। এমনভাবে নেত্রকোনার মকসুদ্দিন আহমাদ, নাসিরুদ্দিন আহমাদ, মাওলানা গিয়াসুদ্দিন আহমাদ, নাসিরুদ্দিন আহমাদ এবং তাঁর কন্যা রাজিয়া খাতুন বিপ্লবী ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। আরও অমর হয়ে আছেন মওলুবী আবদুল কাদের, কিশোরগঞ্জের আলী নওয়াজ, মুহাম্মদ ইসমাইল, চাঁদ মিঞা ও আলতাফ আলীর নাম বিপ্লবী দলে বিশেষভাবে বিদ্যমান। যুগান্তর দলের সঙ্গে যোগ দিতে গিয়ে নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্য নামায-রোযা বাদ দিয়েও সিরাজুল হক

>Goto List

ও হামিদুল হক সন্ত্রাসবাদী হয়ে কাজ করেছিলেন। তাঁদের জেল হয়েছিল। ১৯৩০ সালের মে মাসে সোলারপুরের ফাঁসি মঞ্চে যারা গলা দিলেন, যাঁদের ইংরেজের পক্ষ হতে প্রাণ ভিক্ষার আবেদন করতে বলা হয়েছিলো, যাঁরা তাদের আবেদন পরামর্শে পদাঘাত করেছিলেন এবং ফাঁসি মঞ্চে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন কোরবান হুসেন ও আবদুর রশীদ।

উত্তর ভারতে বটুকেশ্বর, চন্দ্রশেখর, ভগৎ সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ "হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান আর্মি নামে একটি দল তৈরি করেছিলেন। ঐ দলেও মুসলমান মাথা গুঁজে অংশগ্রহণ করতে ভোলেনি। তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ আসফাকুল্লার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফাঁসির পূর্বে তাঁর আত্মীয়স্বজন অনেকে তাঁকে দেখতে এসে কাঁদছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন আমাদের নামাযের মধ্যে প্রতিদিন ভালদের পথে, বীরদের পথে, শহীদদের পথে চলার কথা স্মরণ করতে হয় সূরা ফাতেহার মধ্যে। তাই তোমরা কেঁদে আমাকে অশান্ত করো না।

আজ মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকের মত আমিও ভারতে স্বাধীনতার জন্য অসত্যের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে ফাঁসিতে যাচ্ছি তাতে আমার অনেক আনন্দ ও গর্ব আছে। এই বলে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে জোরে জোরে গম্ভীর কণ্ঠে তিনি কোরআনের আয়াত পাঠ করেছিলেন। (শান্তিময় রায়ের ঐ লেখা পৃঃ ৪৫)

বীর রাম প্রসাদেরও বিপ্লবের অপরাধে ফাঁসি হয়। উপরোক্ত তথ্যগুলো সংগৃহীত হয়েছে মৌলানা আবুল কালাম আযাদের লেখা (মহাফেজখানা) কালিচরণ ঘোষের The Rule of Honour, পেশওয়ার ষড়যন্ত্র মামলার কাগজপত্র, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি কথা, যদু গোপাল মুখপাধ্যায়ের বিপ্লবের পদচিহ্ন, ভুপেন্দ্র দত্তের, সমকালের কথা, মুজাফফর আহমাদ প্রমুখের পুস্তক হতে।

হঠাৎ নেতাদের আবির্ভাব বা জন্মের পূর্বে মুসলমানদের কি বিরাট ভূমিকা ছিল তা বিশেষ করে বিশদভাবে দেওয়া সম্ভব হল না। যদি মন বোঝানো করে ধরেই নেওয়া যায় জাতির জনকদের জন্ম পরেই হয়েছে আর এদের পূর্বে যাঁরা আন্দোলনকারী আহত ও নিহত হয়েছেন তাঁরা জাতির জনক নন, জাতির শিশু পুত্র, তাহলেও তো হঠাৎ নেতার দলের সাথে যারা তালে তালে চলেছেন তাঁদের নাম বাদ গেল কেন?

ফররুখ আবাদের নবাব ইকবাল মন্দ খাঁ দেশের জন্য ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছেন। গজনফর হুসাইন খাঁও প্রাণ দিয়েছেন ফাঁসির নিষ্ঠুর ফাঁসে। এমনিভাবে সাখওয়াত হুসাইন ও তাফাজ্জু হুসাইনকেও ক্ষুদিরামের মত ফাঁসি দেওয়া হয়।

মুনসী আবদুল করীম, কাজী মিঞাজান, শেখ রহিম বখশ ও মাওলানা ইলাহী বখশকে সারা জীবনের জন্য নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছিল যা ফাঁসির চেয়ে কম নয়। শুধু তাই নয়, তাঁদের যথা সম্পত্তি সমস্ত কিছু ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল।

মাওলানা জাফর এবং আলহাজ মুহাম্মদ শফী সাহেবের ফাঁসির রায় হয়। কিন্তু শহীদ হওয়ার জন্য তাঁদের আনন্দ স্ফূর্তি দেখে ইংরেজরা অবাক হয়। হয়ত ভেতরে ভয় ও দুঃখ নিয়েও উপরে বীরত্বের ভান করা যে যায় না, তা নয়। কিন্তু এদের শহীদ হওয়ার আনন্দে শরীরের ওজন বেড়ে গিয়েছিল। তাই সরকার ক্রোধে তাঁদের বীরত্বপূর্ণ হতে না দিয়ে ফাঁসির রায় বাতিল করে চির নির্বাসন দিয়েছিল। জেলখানায় নানা অত্যাচার করা হয়েছিল এমনকি ইসলামী জাতীয় প্রতীক তাঁদের শ্মশ্রু ও মাথার কেশ মুণ্ডন করে দেওয়া হয়েছিল।

হযরত আহমাদুল্লাহ সাহেব শহীদ হয়েছেন ইংরেজেদের অস্ত্রে অবশ্য এদের কিছু আলোচনা পূর্বে হয়েছে। কিন্তু এরা প্রত্যেকে এত বড় বড় মানুষ যে, এদের নামে এক একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব।

এমনিভাবে পীর আলীর নাম পূর্বেই করা হয়েছে কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি ও তাঁর আর ৩১ জন সঙ্গী মুসলমান যোদ্ধাও বন্দি হন। আর ঐ ৩১ জনেরই একটি একটি করে ইংরেজ নিষ্ঠুরভাবে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে।

“বিভিন্ন প্রসিদ্ধ উচ্চপদস্থ ইংরেজদের রিপোর্ট মতে ও ২৭/২৮ হাজার মুসলমানকে বিনা বিচারে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে এবং প্রায় সাতশত বিশিষ্ট আলেমকেও ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছে।” (দ্রঃ হায়াতে মাদানী, পৃঃ ৪১-৪২) কিন্তু আসলে এটা ইংরেজদের রিপোর্ট-এর চেয়ে বহু বহু গুণ মুসলমান আলেম আর বিপ্লবীকে নিহত হতে হয়েছিল।

বহু মুসলমানকে শূকরের চামড়ায় মাথা মুখ ঢেকে জলন্ত উনান বা চুলাতে ফুটন্ত তেলের উপর ছাড়া হয়েছিল। (এ বর্ণনা মিঃ এডওয়ার্ড টমসনের। দ্রঃ ঐ)

সর্দার বিঠল ভাই মরার আগে সুভাষ বোসকে ভারতের বাইরে কাজ করার জন্য ১ লাখ টাকা দিয়ে গিয়ে ছিলেন কিন্তু সে টাকা কোন এক কঠিন চক্রান্তে তাঁকে দেওয়া হয়নি।

গান্ধীজি ১৯২৮ সন থেকে সুভাষ বাবুকে দেখে এসেছেন সন্দেহের চোখে। সুভাষ বাবুর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ কংগ্রেসের বামপন্থীদের আয়ত্তে এনে আপসহীন সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাবেন এই আশঙ্কা তাঁর ছিল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে তখন কংগ্রেসরাই বড় দেশের কল্যাণ কিছু নয়।” (দ্রঃ অবিস্মরণীয় ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০ শ্রী গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র) ১৯৪১ সালে ১ মার্চ ভারত ত্যাগ করেন সুভাষ আর দেশের নেতারা কেউ খোঁজ করেননি। ২৫ দিন পর সংবাদপত্রের প্রকাশ হয় ‘সুভাষচন্দ্র বসুকে পাওয়া যাচ্ছে না।’

বিশ্বযুদ্ধ যখন জোরে চলছে, তখন ভারতবাসীকে জোর করে দলে দলে শাসক ইংরেজ সৈন্যদের দলে ভর্তি করেছে হাজারে হাজার। আর ভারতকে পিষে পিষে কোটি কোটি টাকার পণ্য চালান দিয়েছে বিদেশে। কারণ ঐ যুদ্ধে ভারত হতে ২৮,০০০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থ ১৯৩৮ হতে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময়ে ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি

>Goto List

হয়। ভারতীয় মাল পাচারের যে পরিমাণ ছিল তা আরও বেড়ে গেল। আর ভারতের জন্য যতটুকু ইংরেজরা আমদানি করতো তা ছিল শতকরা ৩০% এখন যুদ্ধের সময় তা কমিয়ে করা হয় ২০%। ফলে ভারতের লোক অনাহারে মরতে লাগলো এবং ঐ সময় আমেরিকা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ছিল তাই ১৯৪১ সালের মার্চ হতে ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমেরিকা, ভারত ও সিংহলকে ২১১৬ লক্ষ ডলার মূল্যের খাদ্য ও মালপত্র সরবরাহ করে। এইসব তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। (a) Banker. London, gamary 1946 P,I,The Eastern Economist at 21-10-49 p633 (b) India Review of Commercial conditions (London) Aug, 1945, P,12-16 (c) Survey of current-business (Washington) March 1946 p,9

ঐ সময় জিন্নাহ বললেন, তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধেই লড়বেন (ভারতের বিরুদ্ধে নয়) "হিন্দু মহাসভার নেতারা বললেন, তাঁরা লীগের বিরুদ্ধে লড়বেন (ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়) আর ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।" (শ্রী গঙ্গানারায়ণ চন্দ্রের লেখা ঐ পৃঃ ৫৪)

শ্রী সুভাষচন্দ্রের এক গৌরবময় ইতিহাস আছে অবশ্য তিনি ইতিহাসে স্থান পেতে একেবারে বঞ্চিত হননি কিন্তু জহরলাল কেন বলেছিলেন "সুভাষ এলে আমি রাইফেল হাতে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব।"

আসল কথা হচ্ছে এই, ইতিহাসখ্যাত হঠাৎ নেতার দলরা প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষে উদিত হয়ে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই না করে হিন্দু-মুসলমানে লড়াই করেছেন আর শাসক ইংরেজ হাসি চাপা রেখে গম্ভীর মুখে ঐ মারামারিকে স্বাধীনতা যুদ্ধ আর মোড়লদের যোদ্ধা বলে টাইটেল দিয়েছেন। সুভাষকে দলে গ্রহণ না করার শ্রেষ্ঠতম কারণ হচ্ছে এই, তিনি মুসলমানদের আন্দোলনের ফরমুলা গ্রহণ করেছিলেন। আর তাঁর রাজনৈতিক গুরু মাওলানা উবাইদুল্লা সিন্ধী (সিন্ধু প্রদেশে বাড়ি ছিল তাই সিন্ধি বলা হয়)। সরকার যখন বুঝতে পারলো, উনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেখানে থাকবেন সেখানেই বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে তখন তার ওপর আইনের আদেশ চাপানো হল যে, তাঁকে চিরদিন ভারতবর্ষে প্রবেশ করা চলবে না। বাধ্য হয়েই তাঁকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু ইংরেজ যদি ভারতের বাইরে তিনি কতটা সংগঠন ও বিপ্লবীদের সাহায্য এবং ভারত ত্যাগী মুজাহিদদের পথ চলার পাথেয় পরিবেশন করতে পারেন চিন্তা করতো তাহলে তাঁকে ভারতেই আটকে রেখে বরং বর্হিভারতে যাতায়াত বন্ধ করতো।

মাওলানা উবাইদুল্লা বৃদ্ধ বয়সে দেশে আসার অনুমতি পান। প্রথমেই তিনি আসেন ভারতের মস্তকবঙ্গে। কলকাতায় ওখানে আলেমদের 'জমিয়তে উলামায়ের' অধিবেশন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আগে হতেই তাঁর যোগ্যতা, দৃঢ়তা ও

ভারত প্রেমের কথা সবই জানতেন কিন্তু শিষ্য হওয়ার মত বিশেষভাবে পরামর্শ করার মত সুযোগ পাননি। সুভাষ এবার মাওলানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর পরামর্শ চাইলেন এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাইলেন। তিনি জানালেন, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতায় তিনিও বিশ্বাসী আর ভারতের জন্য জীবন দিতে তিনিও প্রস্তুত। মাওলানা উবাইদুল্লা তাঁকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আস্তে আস্তে বললেন, আজ রাত্রে তৈয়েব ভাই জরিফের বাড়িতে গোপন আলোচনা হবে। রাত্রিতে আলোচনা হয়েছিল, অনেক গোপন কথা হয়েছিল। সেখানে ছিলেন চৌধুরী আশরাফুদ্দিন আর বর্ধমানের মৌলানা আবুল হায়াত প্রমুখ বিখ্যাত প্রকৃত নেতা। ওখানে উবাইদুল্লা তাঁকে আদেশ করেন "অত্যন্ত চুপি চুপি তুমি মাওলানা জিয়াউদ্দিন নাম নিয়ে ১৭ জানুয়ারি (১৯৪১) রওনা হও।" তারপর মালানা উবাইদুল্লা সাহেব নিজের হাতে অনেক চিঠিপত্র লিখে দিলেন এবং জানালেন, কোন জায়গায় কোথায় কী নাম, কী বেশে, কী পদে, কোন রাষ্ট্রে তাঁর শিষ্যভক্ত ও কর্মীরা আছেন। হয়েছিলও তাই। অতএব মুসলমানের পরামর্শ মত চললে আর ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা দাবি করলে তাকে গুলি করে মারার কথা তখনকার কংগ্রেস নেতা জহরলাল বলবেন বৈকি? তাই সুভাষ কোন দিন বিশ্বাসঘাকতা করেননি তাই তাঁর আযাদহিন্দ ফৌজে বড় নেতাদের বেশির ভাগই মুসলমান দেখা যায়। যেমন ক্যাপটেন শাহ নাওয়াজ ক্যাপটেন বুরহানুদ্দিন, ক্যাপটেন আবদুর রশিদ, জমাদার ফাতেহ খান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য ও মাওলানা উবাইদুল্লাহ সাহেব যে পরিকল্পনা ও প্রস্তাব সুভাষকে দিয়েছিলেন সেই প্রস্তাব "কংগ্রেস নেতাদেরও দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতা গান্ধীজি তা অস্বীকার করেছিলেন।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু মাওলানা জহীরুল হককে যে পত্র লিখেছিলেন তার তর্জমার কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি।

দিল্লি ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭
স্নেহের মওলুবী জহীরুল হক (দীনপুরী)
আসসালামু আলাইকুম অ রাহমাতুল্লাহ

আযাদী উপলক্ষে আপনার প্রেরিত পত্রের জন্য শুভেচ্ছা জানাই। পত্র পড়ে স্মৃতিপটে ভাসে শুধুই মাওলানা উবায়দুল্লার সিন্ধির (র.) স্মৃতি। সে ঘটনা অনেক লম্বা, সংক্ষেপ করলেও যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। ১৮১৪ সালে বিশ্ব যুদ্ধের সময় শাহ ওয়ালিউল্লার (র.) কাফেলার নেতা হযরত মাওলানা মাহমাদুল হাসান (র.) অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে মাওলানা উবাইদুল্লা সিন্ধিকে কাবুল প্রেরণ করেন। সেখানে মাওলানা উবায়দুল্লাহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাজ-করার সুযোগ সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে জার্মান, ফ্রান্স এবং জাপানের এমন সব কর্মী নেতা ছিলেন, যাঁরা পরবর্তীকালে শাসন ক্ষমতার উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

পঁচিশ বছর নির্বাসনদণ্ড ভোগ করে ১৯৩৯ সালে তিনি যখন এখানে আসেন তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তিনি যাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা কংগ্রেসের কাছে পেশ করে সর্ব ভারতীয় সংগ্রামের প্রোগ্রাম রচনা করেন, সেই সময় গান্ধীজি পর্যন্ত ঐ পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। তাহলেও "ভারত ছাড়" আন্দোলনটুকু অনুমোদন লাভ করে। একদিন চায়ের মজলিসে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁর চোখ ও চেহারায় চিন্তার চিহ্ন দেখে আমার মনে অনুসন্ধিৎসুর প্রশ্ন জাগে। আমি প্রশ্ন করতেই তিনি উত্তরে জানালেন, "আমার ইচ্ছা সুভাষ ভারতের বাইরে চলে যাক।" কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে তিনি তাঁর বাসা উখলায় ফিরে যান।

দ্বিতীয় দফায় উখলা হতে দিল্লি পর্যন্ত আট মাইল সড়কের কোন একটি জনমানবশূন্য স্থানে তার সঙ্গে সুভাষের সাক্ষাৎ সংঘটিত হয়। তার পরের সাক্ষাৎটি হয়েছিল কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকায়। এই খানেই তিনি সুভাষকে জাপান যাত্রার জন্য রওনা করেন। জাপান সরকারের নামে একটি ব্যক্তিগত বিশেষ বার্তাও পাঠান। তাই সুভাষ সেখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে জাপান সরকারের সৈন্য বিভাগও তাঁর প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পেরেছিল। শেষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষ প্রয়োগ করে মাওলানা সাহেবের জীবন শেষ করা হয়। ১৯৪৪ সালের ২২ আগস্ট তিনি মহা মিলনে শামিল হলেন মহান মাওলা স্রষ্টার সাথে। সেদিন আকাশ হতে অশ্রু ঝরেছিল। সারা পৃথিবী শোকে মুহ্যমান হয়েছিল। (ভারতে এ সংবাদ ইংরেজ সরকার, গোপন রেখেছিল)...। অবশেষে সাধারণের ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। ১৯৪৫ সালের ১ সেঃ পুরো এক বছর নয়দিন পর সরকারিভাবে স্বীকার করা হয় মাওলানা সাহেব নিহত হয়েছেন। বাস্তবিক এমনি একজন বিপ্লবীকে ওজনের তুলাদণ্ডে এক পাল্লায় রেখে অন্য পাল্লায় সারা পৃথিবী চাপালেও এই বিপ্লবীর সমান হয় না। এখন রয়ে গেছে তাঁর অপরূপ স্মৃতি আর অপূর্ব বিরহ বেদনা। দুঃখ কিন্তু এ জন্য নয় যে, তিনি চলে গেছেন, এ জন্য দুঃখ যে এ জগতের মানুষ ছিলেন তা আজ প্রায় অবলুপ্ত। আমরা সেই দলেরই পশ্চাৎবর্তী কর্মী, সেই কাফেলার অনুরূপ দল আর পায় না আর পাচ্ছি না গন্তব্য স্থানের ঠিকানা। আমাদের কেউ চেনে না, আর অন্যদেরও আমরা চিনতে পারছি না। সেই শহীদদের ওপর স্বাধীনতার গৌরব অর্পিত হোক। তাঁদের কবরের ওপর আল্লাহর শান্তিধারা বর্ষিত হোক।

আলহামদুলিল্লাহ। (আল্লাহর প্রশংসা) আমি সুস্থই রয়েছি আপনার কুশল সংবাদ জানাবেন। আপনার সম্মানীয়া মাতার প্রতি রইল আন্তরিক সালাম।

ইতি–আবুল কালাম।"

পত্রটি প্রণিধানযোগ্য আজ সুভাষ বসুর ভারতের বাইরে যাওয়া ও রহস্যময় আত্মগোপনের কথা যে করেই হোক সকলের কাছে পৌঁছেছে কিন্তু কোন অপরাধে অন্তত দশগুণ যাঁকে সম্মান দেওয়া উচিত ছিল তিনি আজ নিষ্ঠুরভাবে নিক্ষিপ্ত।

মাওলানা আযাদই একমাত্র লোক, যিনি সত্যিকারে রাজনীতি বুঝতেন এবং কংগ্রেসকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। তবে বহুবার প্রতিবাদ করলেও তাঁকে অনেক কিছু মুখ বুঝে সহ্য করতে হতো। তার কারণ অনেকে খুঁজে পান না। অনেকের ধারণা, তিনি গদির জন্য অনেক অন্যায়কারী ও অযোগ্যদের মাঝে নিজের যোগ্যতা নষ্ট করেছেন। কিন্তু না, হযরত মুহাম্মদের (সা.) প্রিয় আরব খান্দানের একটি রত্ন আবুল কালাম আযাদ। তিনিই প্রকৃতপক্ষে ভারত বিভাগের বিরোধী ছিলেন। শেষে তাঁর কথা চললো না। দেশ বিভাগ হয়েই গেল তবুও তাঁর কংগ্রেসে থাকার কারণ মুসলমান জাতি আর অব্রাহ্মণ হরিজনদের প্রতি দরদ। তিনি মহান গোয়েন্দার মত যদি না থাকতেন তাহলে ভারতের মুসলমানদের ওপর যাঁরা খড়গহস্ত তাঁরা তাঁদের কার্যোদ্ধার করতে হয়ত পারতেন। তাই তিনি কোটি কোটি মানুষের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। তার লেখা 'ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম' বইটি প্রত্যেক ভারতবাসীর পড়া কর্তব্য, তাতে প্রত্যেকেই প্রকৃত রাজনীতি শিখতে পারবেন এবং ভারতের রাজনৈতিক গোপন তথ্য জানতে পারবেন আর তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিমাণ নির্ধারণ করতেও অসুবিধা হবে না। তবে তাঁর লেখা ঐ বইটি প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রণের বইগুলো অবিকৃত অবস্থায় দেখা যায়। পরে তাঁর লেখা অমৃত পুস্তকে ভেজাল দেওয়া হয়েছে। জল খাবারকে খাবার জল বললে অর্থ যেমন অনেকটা বদলে যায়, তাতেও তাই হয়েছে।

অবশ্যই ইনিও মাত্র যথাযোগ্য না হলেও কিছুটা স্থান পেয়েছেন। সিরাজের অন্ধকূপ হত্যার প্রহসনের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে অথচ ইংরেজ সত্যিকারের ঐ রকম অত্যাচার করেছে ভারতের মুসলমান বিপ্লবীদের ওপর।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে মুসলমানদের মোপলা বিদ্রোহ সম্বন্ধেও কিছু বলা হয়েছে। ঐ সময় বাংলা পত্রিকা প্রবাসীতে, বাংলা ১৩৩৮ সালে পৌষ মাসে যে সংবাদ ছাপা হয়েছিল তা অন্ধকূপের মিথ্যা ইতিহাসকে আর একবার প্রমাণ করিয়ে দেয়। মাওলানা ও মুসলমান বিপ্লবীর ১২৬ জনের একটি দলকে একটি মালগাড়িতে চড়িয়ে ৪৬০ মাইল পথ অতিক্রম করে নিয়ে যাওয়া হয়। ট্রেনের কুঠরীতে ছিল ১৮ ফুট লম্বা ও ৯ ফুট চওড়া অর্থাৎ ১৬২ বর্গফুট। দরজায় তালা লাগানো ছিল। ছোট একটি জানালার মত ছিল তাতে তারের জাল দেওয়া ছিল। জালে আবার রঙ লাগানো ছিল ফলে জালের ছিদ্রগুলো বুঝে গিয়েছিল। পথেই ৫৬ জন বন্দি পিপাসায় কাতর হয়ে শহীদ হলেন। আর বাকি বন্দিগণ ঘামে ভেজা জামা নিংরানো ঘাম পান করেন। তাঁরা পানি পানি করে চিৎকার

করেছিলেন, কিন্তু পরিবর্তে পেয়েছিলেন নিষ্ঠুর হাসি আর বিদ্রূপ। এসব ঘটনা হঠাৎ নেতাদের আবির্ভাবের আগে নয়। ঘটনাটি ঘটে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ২০ নভেম্বর। এই সব মুসলিম অবদান চিত্তরঞ্জনকে অবাক করে। তাই তিনি মুসলমানদের মর্যাদা স্মরণ রেখেই রাজ করতেন কিন্তু ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইংরেজের অতি আধুনিক গুপ্তচর বাহিনীকে এমনভাবে মুসলমান বিপ্লবীরা এড়িয়ে গেছেন যে, তাঁদের চিঠিপত্র পড়েও তার অর্থ উদ্ধার করতে পারতো না। কারণ কতকগুলো এমন শব্দ পত্রে ব্যবহার করা হত, যা একমাত্র প্রকৃত বিপ্লবীরা ছাড়া কেউ জানতেন না। যেমন... পত্রাদি আদান-প্রদানের ব্যাপারে তাহারা অভিনব উপায়ে যেরূপ গুপ্ত ও সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করিয়াছে, তাহাকে ষড়যন্ত্রের ইতিহাসেও বিস্ময়কর বলা যাইতে পারে। তাহারা তাহাদের সঙ্কেতিক ভাষায় যুদ্ধকে মোকদ্দমা নামে, খোদাকে আইনসঙ্গত এজেন্ট, সুবর্ণ মুদ্রাকে লাল বর্ণের হীরক, অথবা দিল্লির সোনার জরির জুতা কিংবা লালবর্ণের জন্তু এবং সুবর্ণ মুদ্রার আদান-প্রদানকে লালবর্ণের দানার তসবীহ (মালা), টাকা-পয়সা আদান-প্রদানকে পুস্তক আদান-প্রদান এবং ড্রাফট ও মনি অর্ডারকে সাদা প্রস্তর এবং উহার সংখ্যাকে তসবীহ দানার সংখ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। যেমন এক সহস্র মুদ্রা পাঠাইয়া বলা হইত-এক সহস্র দানার তসবীহ পাঠান হইল, ইত্যাদি। (দ্রঃ পাঞ্জাবের জুডিশিয়াল কমিশনারের নিকট অনুষ্ঠিত আপিল মামলার ফলাফলে নথিপত্রের ১৮৪ ও ১৮৭ প্যারা)। “১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ফেঃ হতে কুখ্যাত জেলখানা ভারতের বাইরে বহু দূর মাল্টার দ্বীপবন্দিখানায় মুসলমান তথা মাওলানাদের মধ্যে সেই সময় শুধু মাওলানা উবাইদুল্লাহ ঐ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ছিলেন তা নয়; বরং আরও অনেক অনেক নেতা প্রাণ দিয়ে সংগ্রাম করতে এগিয়ে ছিলেন। মাওলানা হাজী তোরঙ্গজয়ী, মাওলানা লুৎফর রহমান, মাওলানা ফজলে মাহমুদ, মাওলানা মুহাম্মদ মিঞা, মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধি, মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (র.), মাওলানা আলী ভ্রাতৃদ্বয় সহ অনেকে। উবাইদুল্লাহ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছে। এখন সামান্য একটু করে বর্ণনা দিলেও অনেক কিছুই বলতে হয় তবুও বলা যায় মাওলানা মাহমুদুল হাসানের (র.) নিজের এবং তাঁর ছাত্র ও শিষ্য মাওলানা হুসাইন আহমাদ (র.) ভারতের জন্য জেল খেটেছেন, অনেকের মত পুতুল খেলার মত নয়, দস্তর মত লড়াই করে বা জনতাকে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করে। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের কথা প্রচলিত ইতিহাসে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্তু যিনি তার গোড়াপত্তন করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন হযরত হুসাইন আহমাদ। অসহযোগের জন্য তিনি একটি বিখ্যাত পুস্তক লিখেছিলেন যেটির নাম ‘রেসালাতে তরকে মুআলাত। সারা ভারতে তা এত জনপ্রিয়তা ও মনপ্রিয়তা অর্জন করে, যাতে ইংরেজ খুব ভীত হয়ে পড়ে এবং সেই বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। (দ্রঃ হায়াতে মদনী, পৃঃ ১২৮, মাওলানা মুহীউদ্দীন খান ও মাওলানা মুঃ সফিউল্লাহ)।

>Goto List

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ১২ মার্চ পর্যন্ত তাঁদের কষ্টদায়ক জেলে থাকতে হয়। সেই সিল্ক লেটার বা 'রেশমি চিঠির' ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক বেশি যদিও চলতি ইতিহাসে তার স্থান নেই। মাওলানা উবাইদুল্লাহ দেওবন্দ মাদরাসা হতে মাওলানা হয়ে মাওলানা মাহমুদুল হাসানকে প্রথমে উদ্বুদ্ধ করেন এবং বিপ্লবে তাঁর মাদরাসার কর্তৃপক্ষ তাতে একটু বিব্রত মনে করেন। তবুও ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা হুসাইন আহমাদের ওস্তাদ মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব ১৮ সেপ্টেম্বর ভারত ত্যাগ করে আরবের হেজাজে উপস্থিত হন। (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১১৬-১১৭)। তারপর আরম্ভ হয় রেশমি চিঠির আন্দোলন। একটি হলুদ বর্ণের রেশমের কাপড়ে খুবই পরিষ্কার অক্ষরের লেখা চিঠি যেটি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ৯ জুলাই হায়দ্রাবাদের শাইখ আবদুর রহিমের নামে পাঠানো হয়। লেখক মাওলানা উবাইদুল্লাহ তাঁর সঙ্গে মুহাম্মদ মিঞা আনসারীরও পত্র সংযুক্ত ছিল। পত্রে ছিল তুর্কি ও জার্মানদের আগমনের কথা, জার্মানদের প্রত্যাগমন, গালেব নামার প্রচার, খোদায়ী যোদ্ধা বাহিনীর পরিকল্পনা এবং মদীনা, কাবুল, তেহরান প্রভৃতি নানা স্থানে কেন্দ্র স্থাপনের কথা।

"১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ৮, ৯ ও ১০ জুলাই করাচীতে 'নিখিল ভারত খিলাফত কমিটির" সম্মেলন আহ্বান করা হইল। সম্মেলনে মদানী এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন যে, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে যেকোন মুসলমানের পক্ষে ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীতে চাকরি করা বা চাকরি করিতে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণ হারাম (বা অবৈধ) এবং প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে কর্তব্য হইল ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীর প্রত্যেকটি মুসলিম সৈনিকের নিকট এই কথা পৌছাইয়া দেওয়া।' ... ব্রিটিশ সরকার মাওলানার এই প্রস্তাবকে প্রকাশ্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলিয়া ঘোষণা করে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০, ১৩১ ও ৫০৫ ধারা মোতাবেক মাওলানা মদানী, মাওলানা মুহাম্মদ আলি জওহর, মাওলানা শওকত আলি, ডক্টর সাইফুদ্দিন কিচলু, কানপুরের মাওলানা নিসার আহমাদ, পীর গোলাম মুজাদ্দিদ সিন্ধী ও স্বামী শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা দায়ের করে।" (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১৩৪)।

ঐ মামলায় শ্রদ্ধেয় আসামিরা কোন উকিল নিযুক্ত করেন নাই, নিজেরাই বক্তব্য রেখেছিলেন নিজেদের। কয়েকদিন ধরে শুনানি চলেছিল। বক্তৃতার ভেতর মদানী সাহেবের ও মুহাম্মদ আলীর বক্তৃতা এত উল্লেখযোগ্য ছিল যে তা ভারতের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য তালিকা হওয়া লাভজনক।

মদানী সাহেব কুরআন, হাদিস, আইন, ইতিহাস সংবলিত বিরাট বক্তব্য রেখেছিলেন যার শেষ কথা হচ্ছে এই', ... ভারতের তেত্রিশ কোটি হিন্দুকেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য আমি মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজ সরকারকে সতর্ক করে দিতে পারি যে, যদি সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে তাহলে মুসলমানগণ ধর্মের খাতিরে জীবন উৎসর্গ করতে কিছু মাত্র চিন্তা করবে না এবং আমিই সকলের আগে জীবন দিতে প্রস্তুত।'

ইংরেজ জাতির সেদিন হৃদকম্প হল যে, স্যার সৈয়দ আহমাদ অর্থাৎ নয়া আহমাদ দ্বারা মুসলমানদের যেভাবে ঘোরানো হয়েছিল আবার মাওলানা মুহাম্মদ আলি ও মাওলানা মদানীর ভূমিকা তা উল্টে-পাল্টে দিল। যাইহোক ১৯২১ সালে ১ নভেম্বর আসামিদের ৫০৫ ও ১০৯ ধারা মতে দু বছর করে জেল নির্ধারিত হয়।

তারপর হতেই মুসলমান জাতি সমবেতভাবে আবার ইংরেজবিরোধী হয়ে ওঠে। আগেই বলা হয়েছিল, ইংরেজকে মুসলমানদের সমর্থন ছিল সাময়িক লোক দেখানো মাত্র।

আমাদের উপরোক্ত আলোচনায় এ মনে করার কারণ নাই যে, হিন্দুদের কোন অবদান স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নেই। বরং অনেকে তাঁরা গান্ধীজির অহিংসনীতিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন তাই তাঁদের ওপর আমাদের ইতিহাস খুব রাগান্বিত।

১৯৪২ সালে ব্যাপকভাবে হিন্দু বিপ্লবী যাঁরা বুঝলেন সেই পথই একমাত্র পথ ইংরেজকে তাড়ানোর, তা হল পূর্ণ অসহযোগ এবং অস্ত্র হাতে লড়াই করে দেশে অচল অবস্থার সৃষ্টি করা। ৯ আগস্ট হতে লুট, অগ্নিসংযোগ সরকারি অফিস, রেল, টেলিগ্রাফ, পোস্ট অফিস, থানা সব কিছুর ওপর হামলা চললো। সরকার সৈন্য ও পুলিশ তলব করে কিছুই সুবিধা করতে না পেরে ইস্টার্ন রেল ওয়েজের সমস্ত ট্রেন বাতিল করল। ছাত্ররা দলে দলে মিছিল করে দেশকে কাঁপিয়ে তুলল "মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জিন্দাবাদ" আওয়াজও মিছিলে শোনা যেত। সৈন্যরা গুলি চালালে শ্রী বৈদ্য নাথ সেন ১৩ আগস্ট দেশের জন্য প্রাণ দিলেন। ১৪ আগস্ট ভবানীপুরে প্রচুর ছাত্র আহত ও দুজন নিহত হলেন। মওলুবী ফজলুল হকের অবিভক্ত বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথ্য হতে জানা যায়, আগস্টে ২০ জন নিহত, ১৫২ জন আহত ও ৩৫০০ জন বন্দি হন।

সিনেমা হলে বড় লাটকে মারার জন্য বোমা ফাটানো হয়, কিন্তু তিনি ঐ সিনেমায় আসেননি। পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেলের বাড়িতে আক্রমণ করা হয় এবং অনেক অস্ত্রশস্ত্র হাতে আসে। (দ্রঃ Amrita bazar patrika Iadepndence Nomber 1947, P 133-34, India in Revolt-Tarini Sankar p 29)

উত্তর ভারতে ১৫টি স্টেশন পুড়িয়ে দেওয়া হয় ১০৪টি আধপোড়া করা হয় এবং গুদাম, সরকারি ভবনগুলো প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৬০, ২২৯ জন বন্দি হন এবং ৯৪০ জন পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। আর ১৮ হাজার বিপ্লবী আহত হন। যাঁরা যুদ্ধ করেননি সমর্থন করেছেন তাঁদের জরিমানা করা হয়। মোট টাকার পরিমাণ ২ লক্ষ ৮৩ হাজার ২০০ টাকা। (দ্রঃ ঐ, ৩১)

২০ আগস্ট বালিয়ার লোকেরা বালিয়াকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে ছিটুর নেতৃত্বে নতুন সরকার ঘোষণা করে। ২২ ও ২৩ আগস্ট সরকার সৈন্য নামায়, সৈন্যরা নির্বিচারে লুট ও গুলি বর্ষণ করে। (দ্রঃ ehru on Gandi, 2-431)

২০ আগস্ট গুলিতে মারা যান শ্রীমতি কনক লতা এবং মুকুন্দ কাকোতী। তুলেশ্বরী নামে একটি কিশোরীও গুলিতে মারা যান। আরও নিহত হন ফুলেশ্বরী নামে এক বৃদ্ধা। আর প্রাণ দিলেন তনুরায়, বলুরাম ও শ্রীলক্ষ্মীরাম। ১৯৪৩ এ ১৬ জনু শ্রী কানওয়ারের ফাঁসি হয়। শ্রী কমলা জেলেই প্রহারে প্রাণ দিলেন। বিহারে ভাগলপুরে সৈন্যের সঙ্গে সাধারণের লড়াই হয়। ২১৮ জন নিহত হন, ২৮০ জন আহত হন, পীরপন্থী ৩৩৭ জন নিহত ৬২ জন আহত, সুলতানগঞ্জে ৬৭ জন নিহত ও ১৫০ জন আহত, দ্বারভাঙ্গার ৩৮ জন নিহত এবং শতাধিক লোক আহত হন। (দ্রঃ অমৃত বাজারের ঐ স্বাধীনতা সংখ্যা)

মেদনীপুরের ১৯৪২ সালে চারদিকে বিপ্লবের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। দুহাজার বাঙালী জনতা চিৎকার করে বললো, ভারত হতে চাল-ধান বয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না চলবে না। পুলিশ গুলি চালায়। প্রচুর মানুষ মারা যায়, মৃত দেহগুলো তাদের আত্মীয়দের ফিরিয়ে না দিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রী গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র লিখেছেন, “হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দলে দলে শোভা যাত্রায় চলেছেন তমলুকের দিকে।” বিরাট দল। আট হাজার লোককে শায়েস্তা করতে বহু পুলিশ ও বড় তেজী অফিসার মনীন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে পাঠানো হয়েছে। ব্যানার্জীর আদেশে লাঠিচার্জ আরম্ভ হয়। বহু লোক আহত হন, অনেকে মারা যান, তার মধ্যে আহত অবস্থায় রামচন্দ্রবেরা বুকে হেঁটে থানায় গিয়ে বললেন, থানা দখল করেছি' বলেই শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। এমনিভাবে প্রাণ দান করেছেন লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, মাতঙ্গিনী, হাজরা, শ্রী নিরঞ্জন জানা, পূর্ণচন্দ্র মাইতি। ২২ সেপ্টেম্বর প্রাণ দিলেন শ্রী যামিনীকান্ত, অনন্ত কুমার, ভজহরি, শ্রী চৈতন্য, সর্বেশ্বর প্রামাণিক ও রামপ্রসাদ, শশী ভূষণ মান্না, সুরেন্দ্রনাথ কর, ধীরেন্দ্রনাথ দিড়াবেরা। ২৭ সেপ্টেম্বর নন্দীগ্রাম থানায় প্রাণ দিলেন বীরেন্দ্র মণ্ডল, ভানুরানা, ভুতনাথ সাহু ও গোবিন্দ দাস। মহীষাদল থানায় প্রাণ দিলেন ভোলানাথ মাইতি, হরিচরণ দাস, আশুতোষ কুইলা, সুধীর হাজরা, পঞ্চানন দাস, রাখালচন্দ্র সামন্ত ক্ষুদিরাম বেরা প্রমুখ বীর কেশর কেশরী বৃন্দ। কেশপুর থানায় মারা গেলেন শ্রীমতি শশীবালা, রামকৃষ্ণ ঘোষ ও আরও অনেকে। অমূল্য শাসমল, সুধীর মাইতি, কেদারনাথ জানা, মুচিরাম দাস, ভগীরথ রথ, মুরারী মোহন বেরা, বিপিন মণ্ডল, চন্দ্রমোহন দিন্দা, হরেকৃষ্ণ ধর। ভগবানপুর থানায় প্রাণ দেন যুধিষ্ঠির, বিভূতি দাস, জগন্নাথ পাত্র, নাথচন্দ্র প্রধান, হরিচরণ, রামকান্ত, রঘুনাথ, পরেশচন্দ্র, কৃষ্ণমোহন চক্রবর্তী, শ্রী ভূষণ ও ধীরেন্দ্রনাথ দাস পাঠ প্রমুখ।

হাসপাতালে রোগীদের, রোগিনীদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ ও মেয়েদের ব্লাউজ ও গে খুলে সায়া তুলে দাঁড়াতে হত এবং ঐভাবে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। সরকারকে অনেক আবেদন নিবেদন করা হয়। কিন্তু অবশেষে মুসলমান নারীদের জন্য শুধু ঐ আইন রদ হয়। কারণ সমস্ত মুসলমান তার জন্য প্রাণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। (দ্রঃ অবিস্মরণীয় পৃঃ ৩০)

শ্রী দামোদরের ফাঁসি হয় ১৮ এপ্রিল। বালকৃষ্ণেরও ৮ মার্চ ফাঁসি হয়। (দ্রঃ Kali Charan Ghosh, The Roll of Honour p 45)। ৮ মে বাসুদেব ও রানাডের প্রাণদণ্ড হয়।

১৯৪২ এ ৯ নভেম্বর 'হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেল থেকে পালালেন ৯ জন, তার মধ্যে ছিলেন স্যোসালিস্ট নেতা শ্রী জয় প্রকাশ নারায়ণ।" "কংগ্রেস স্যোসালিস্ট দল (গান্ধীর) অহিংসানীতিতে বিশ্বাসী নয় তা প্রমাণ হয়ে গেল।" (দ্রঃ গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র, পৃঃ ৮৮-৮৯) এমনিভাবে অলিখিত অনেক তথ্য লুকিয়ে আছে বিস্মৃতির অতল তলে।

জহরলাল দুঃখ করে বলেছিলেন, "তারা গত কুড়ি বছর ধরে যে অহিংসনীতি প্রচার করে এলেন এক দিনেই ভুলে গেল তার প্রভাব।" (অবিস্মরণীয় ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭০)

"কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অবশ্য স্বীকার করেছিলেন যে ১৯৪২ সালের আন্দোলনে কংগ্রেসের সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল না। (দ্রঃ ঐ)

প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনে হযরত মুজাদ্দেস আলফেসানী জীবন্ত পরিকল্পনায় যিনি প্রথমে এগিয়ে এলেন তিনি হচ্ছেন স্বাধীন ভারতের প্রকৃত জনক মাওলানা শাহ ওলিউল্লাহ, মাওলানা আবদুল কাদের, (পুত্র) মাওলানা আব্দুল আজিজ, (পুত্র) মাওলানা আব্দুল গনি, (পুত্র) মাওলানা আবদুল হাই, (জামাতা) মাওলানা মাখসুসুল্লাহ, (ভাইপো) মাওলানা ইসমাইল, (ভাইপো) মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক, (নাতি) মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব, (নাতি) মাওলানা সৈয়দ আহমাদ ব্রেলবী, মাওলানা হোসেন আহমাদ মালিহাবাদী, মাওলানা হাসান আলী, (লাক্নৌ) মাওলানা সদরুদ্দিন, জনাব গোলাম আলী, মাওলানা বশিরুদ্দিন ও মাওলানা করীমুল্লাহ প্রমুখের নাম যেমন স্বর্ণময় ইতিহাস তেমনি শেষের দিকেও মাওলানাদের অবদান উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই। জনাবাবি, আম্মা গান্ধীজি ও নেহেরুর সময়েও মাওলানা মওলুবী ও মুসলমানদের যথেষ্ট অবদানের মধ্যে মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা মুহাম্মদ আলীর নাম হঠাৎ নেতাদের অনেক উচ্চে বলে উচ্চ শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণ মনে করেছেন।

১৯১৫ হতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে ইংরেজবিরোধী কর্মধারা এক রকম সাফল্যবিহীনই মনে হয়েছিল। মুসলমানরাও যেন একটু কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সারা ভারতে বিপ্লবে ভাটা পড়ার প্রধান কারণ ভারতের সিংহ

শাবক দুটি মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও শওকত আলীকে সরকার কারাগারে বন্দি করে রেখেছিলেন।

১৯১৭ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়, তখন বোরকা পরিহিতা একটি মুসলমান নারী সভায় প্রবেশ করলেন। সভাপতি ব্যবহারজীবী বৈকুণ্ঠ সেনকে বিদূষী রমণী পরিচয় দিলেন, তিনি আলী ভ্রাতাদের আম্মা বা মা, নাম বিআম্মা। সঙ্গে সঙ্গে সভায় 'আল্লাহু আকবার' আওয়াজ করা হয় এবং কংগ্রেসকি জয় বিআম্মাকি জয় ধ্বনিতে সভা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঐ সভায় ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিন পাল, বাল গঙ্গাধরতিলক, মদনমোহন মালব্য, সত্যমূর্তী, চিত্তরঞ্জন দাস, ফজলুল হক, গান্ধীজি ও জিন্নাহ।

বিআম্মা তাঁর স্বল্প বচনে জানালেন, মেয়েদের জাগ্রত হতে হবে। আর বললেন, আমি পরকালে আমার ছেলেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবো যদি তারা সারা জীবন ইংরেজকে তাড়ানোর জন্য লড়াই না করে। যদি সংগ্রাম না চালায় তাদের আমার স্তন্য পান করানো অন্যায় হয়েছে বলে মনে করব। বিখ্যাত বীর আলী ভ্রাতাদের বীরাঙ্গনা মাতা বি-আম্মা ১৯২৪ সালে ১২ নভেম্বর দেহত্যাগ করেন।

মাওলানা শওকত আলী

বি আম্মা পুত্র মাওলানা শওকত আলী ১৮৭৩ সালে ১৬ মার্চ রামপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ২৭ নভেম্বর দেহত্যাগ করেন। পিতার নাম ছিল আবদুল আলী সাহেব। তরুণ অবস্থায় তিনি কলেরায় মারা যান। বিধবা বি-আম্মার বয়স মাত্র তখন ছিল সাতাশ বছর। মা এর প্রচেষ্টায় আলিগড় হতে বি,এ পাস করে যে চাকরি পেয়েছিলেন, দেশে আদর্শ স্থাপনের জন্য ১৯১১ সালে সেই চাকরিতে পদাঘাত করে পদত্যাগ করেন। তারপর পূর্ণভাবে রাজনীতিতে আত্মবিসর্জন দেন। ১৯১৫ তে তাঁর জেল হয় এবং তাঁকে মারুক নামক স্থান হতে পরে চিন্দোধারায় স্থানান্তরিত করা হয়।

১৯২০ সালে গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ যুক্তি ও গোপন চুক্তি হয় দুই আলী ভাই-এর সাথে। পরে গান্ধীজির ব্যবহার ও ইংরেজ ঘেঁষা মনোভাবের জন্য গান্ধীজির সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হন। ১৯৩২ সালে ইয়র্ক শায়ারের এক মহিলাকে বিয়ে করেন। মাওলানা শওকত আলীর রাজনৈতিক ভূমিকা শুধু ভারতেই ছিল না। ছিল আরব, পারস্য, প্যালেস্টাইন, মিসর, তুরস্ক প্রভৃতি বহু রাষ্ট্রে। তুরস্কের কামাল পাশার উন্নতি ও প্রশংসার মূলে আছেন আল্লাহ ভক্ত সুচতুর নেতা মাওলানা শওকত আলী। কারণ তুরস্কের সুলতানের পরিবারের সঙ্গে ভারতের হায়দ্রাবাদের রাজ পরিবারের যে বিবাহ সম্বন্ধ হয়েছিল তা ছিল তাঁরই পবিত্র কৌশল। তাই এঙ্গোলার প্রধানমন্ত্রী এসেম্বলিতে বলেন, 'Had there been no Ali Brothers in India, there Would have no kamal pasha in Turky" অর্থাৎ ভারতে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্ম না হলে তুরস্কে কামাল পাশার অভ্যুদয় সম্ভব হতো না।

১৯৩২ সালে ইন্ডিয়ান মাইনরিটি প্যাক্ট তাঁরই অবদান। মৃত্যুর তিন ঘণ্টা পূর্বে যে সমস্ত পত্র লিখেছেন তাতে তাঁর জ্ঞান ও দেশপ্রেমের পরিচয় আরও গভীরভাবে অনুভব করা যায়।

মাওলানা মুহাম্মদ আলী

মাওলানা মুহাম্মদ আলী বি-আম্মার গর্ভে, মওলুভী আবদুল আলীর ঔরসে ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাওলানা শওকত আলীর সহোদর ভ্রাতা। দু বছর বয়সে পিতৃহারা হন। খেলাধুলায় ও পড়াশোনায় খুবই দক্ষ ছিলেন তিনি। আলিগড় হতে পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়ে বিলেতে অক্সফোর্ডে গিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। সেই সময়েই বিশ্ববিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলী এবং ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

তিনিই ভারতের সর্ব প্রথম অক্সফোর্ড সোসাইটির সেক্রেটারি নির্ধারিত হন।

তিনিই কমরেড পত্রিকার মূল প্রাণ ছিলেন। তাঁর লেখায় সারা বিশ্বের বুদ্ধিজীবীরা চিন্তার খোরাক পেতেন। তাঁর কমরেড পত্রিকার গ্রাহক নানা দেশের রাজকীয় মহলে পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল যেমন জার্মানীর প্রিন্স, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী প্রমুখ। তখন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মিঃ ম্যাকডোনা। তিনিও তাঁর প্রবন্ধ পড়ে বিস্ময় প্রকাশ করতেন।

তিনি দেশে ফিরে এসেও তাঁর রাজনীতি অব্যাহত রাখেন। দুটি পত্রিকার পরিচালনা করতে থাকেন–একটি "কমরেড অপরটি "হামদার্দ। সত্যিকারের স্বাধীনতার নায়ক তাঁদের শাসকের পক্ষ হতে অত্যাচারীত হতেই হবে। সেখানে উপাধিপ্রাপ্তি আর ভোজসভায় আমন্ত্রণ আর বিলেতে বেড়াতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ মেলে না। মাওলানা মুহাম্মদ আলীর ওপর বারে বারে জেলদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই কি? তাঁর পত্রিকা দুটিও বন্দ করে দেওয়া হয়েছিল এবং প্রেসটি পর্যন্ত ধ্বংস করা হয়েছিল। বাড়িতে পুলিশ দিয়ে আসবাবপত্র ভেঙেচুরে তছনছ করা হয়েছিল। বাড়ির শিশু ও নারীদের বাড়ি ছেড়ে প্রাণ ও ইজ্জতের খাতিরে পলায়ন করতে হয়েছিল।

তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মার খাওয়ার প্রধান কারণ হিন্দুদের আন্দোলন হতে সরে দাঁড়ানো। তাই তিনি বড় আলেমদের নিয়ে গোপনে পরামর্শ করলেন এবং জানালেন, ভারতে হিন্দু জাতি বিরাট একটা শক্তি, তাকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা আনা যায় না। যদিও তারা দূরে আছেন তবুও তাঁদের কাজে লাগাতে একজন এমন নেতাকে বলে জয় ঢাক

বাজাতে হবে, যার ফলে হিন্দু জাতি তাঁর আহ্বানে দলে দলে আসতে পারবে। তিনি জানান, যদি স্বাধীনতার কাম্য তাহলে নেতৃত্বের সর্বোচ্চ আসনে যদি কাউকে বা হিন্দু নেতাকে বসাতে হয় তাতে হিংসা করা সঠিক হবে না। মুসলমানদের আন্দোলনে হিন্দুদের যোগ না দেওয়ার অন্যতম কারণ, আন্দোলনটি পুরোপুরি ধর্মভিত্তিক ছিল। তাতে বড় ভুল বোধহয় এটিই হয়েছিল হিন্দু ধর্মের সংরক্ষণের বা ধর্মের উন্নতির জন্য তাদের আহ্বান করা হয়নি। শেষে গান্ধীজিকেই বাছাই করা হয়। তাঁকে মহাত্মা উপাধির পোশাক পরানো হয় এবং সারা ভারতে তাঁর নাম প্রচার করে তাঁর অধীনস্তের মত মুসলিম নেতারা সভা সমিতি করে বেড়াতে থাকেন। তখনই সারা ভারতে হিন্দু জনগণ ইংরেজবিরোধী হতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে, তাই মাওলানা মুহাম্মদ আলীর জন্য লেখক লিখেছেন, কংগ্রেসকে কংগ্রেসে পরিণত করেছেন গান্ধীজিকে 'মহাত্মা' বানিয়েছেন, দেশে স্বাধীনতার বীজ ফেলেছেন আর সিঞ্চন করেছেন বলিষ্ঠ বিরত্বের রাঙা রক্ত। কঠিন পথের সর্ব বিপদ সহ্য করেছেন, সরকারের সঙ্গে সমান তালে লড়েছেন, কঠিন কারাগারকে জীবন্ত করেছেন জীবনের সর্ব প্রকার আরামকে হারাম করে কষ্টের জীবনই বেছে নিয়েছেন। (দ্রঃ ইফাদাতে মুহাম্মদ আলী পৃঃ ১৪, ১৫, ১৯৪৫ সালে হায়দ্রাবাদে মুদ্রিত)

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বড় ভাই মাওলানা শওকত আলীই নিজের চাকরি ইচ্ছা করে ছেড়ে দিয়ে জনসাধারণকে জানিয়েছেন সরকারের যাঁরা শত্রু বলে দাবি করে তাদের সরকারি চাকরি করা পার্টির সংগঠনের জন্য মারাত্মক ক্ষতি। সেই সময়েই আলী ভ্রাতাদের উত্তপ্ত ভাষণে মুগ্ধ হয়ে চিত্তরঞ্জন দাস নিজের স্বাধীন ব্যবসা, ব্যারিস্টারী ছেড়ে দিতে উদ্বুদ্ধ হন, যেহেতু ইংরেজ বিচারপতিদের সম্মুখে "My Lord' আমার প্রভু বাহাদুর বলার ওপর ঘৃণা পোষণ করে। চিত্তরঞ্জন দাস ও বি-আম্মা অর্থাৎ আলী ভ্রাতাদের মাকে “আম্মা বলে ডাকতেন এবং বি আম্মা বা আবিদা বেগমকে মা-এর মতই শ্রদ্ধা করতেন।

ঐ ১৯১১ সালেই মুসলমানদের ইংরেজের বিরুদ্ধে পূর্বের মত সক্রিয় হওয়ার জন্য একটি সমিতি সৃষ্টি করেন যেটির নাম আঞ্জুমানে খাদেমে কাবা। এটাই হচ্ছে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্যান ইসলামিক প্রতিষ্ঠান (দ্রঃ মুহাম্মদী পত্রিকা, পৌস, ১৩৪৫ সাল, আঃ হাকিম পৃঃ ২৩০)

“যখন গান্ধীজি ভারতে আইন অমান্য ও সাইমন কমিশন বর্জন আন্দোলন আরম্ভ করলেন তখন আলী ভ্রাতৃদ্বয় মোসলেম সম্প্রদায়ের গোলটেবিলে যোগদানের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করলেন।”... উভয়ে ভারতীয় মোসলেম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য আহুত হন।” (দ্রঃ পৃঃ ২৩১) কংগ্রেসের ভেতর ব্রাহ্মণ্যবাদের গোঁড়ামি এত বেশি ছিল যার ফলে ভারতে অব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নেতাদের ওপর সন্তুষ্ট ছিলে না। মাওলানা

মুহাম্মদ আলী সমস্ত অব্রাহ্মণ হিন্দুকেও স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট মদনমোহন মালব্য সম্বন্ধে একটি ঘটনাতে তার পরিচয়ের কিছু প্রমাণ পাওয়া পর ১৯৩৩ সালে যখন তিনি পেশওয়ার গিয়েছিলেন তখন সেখানকার একজন কংগ্রেস সদস্য তাঁকে খাওয়ানোর জন্য ব্যবস্থা করেন। পণ্ডিত মালবীয়া যেহেতু ব্রাহ্মণ তাই তিনি সেই পাত্র থেকে খেতে পারেন না, যে পাত্রে কখনো মাংস খাওয়া হয়েছে। তাই তাঁর নিমন্ত্রণকারী বাজার থেকে কিনে আনেন সম্পূর্ণ নতুন এক ডিনারসেট আর যেহেতু পণ্ডিতজি ছিলেন নিরামিসাশী তাই তাঁর নিমন্ত্রণকারী বাজার থেকে যোগাড় করলেন সর্বোৎকৃষ্ট ধরনের কলা ও কমলাদি। ডিনার টেবিলে প্রশ্ন উঠলো তখন, তাঁকে প্রদত্ত এই সব ফল বাগান থেকে টেবিলে আসার মাঝখানে কোন মুসলমান বা অচ্ছ্যুত অস্পৃশ্য হিন্দু ছুয়েছে টুয়েছে কিনা?

দূর্ভাগ্যবশত নিমন্ত্রণকারী সেই হিন্দু কংগ্রেস সদস্য পণ্ডিতজিকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। ফলে, নিমন্ত্রণকারীকে সাংঘাতিক রকমের বিব্রত করে দিয়ে পণ্ডিত মালবীয়া কিছু না খেয়েই ডিনার টেবিল থেকে উঠে যান। (এসএ সিদ্দিকী বার এ্যাট ল-এর লেখা ভুলে যাওয়া ইতিহাস পৃঃ ৮৪) ১৯৩৩ সালে পর্যন্ত যদি এই মনোভাবের পরিণাম হয় তাহলে সেখানে হিন্দু মুসলমান মিলন সেতু রচনা করা কত কঠিন। ঐ কঠিন কাজ করেছিলেন ভারত সিংহ মাওলানা মুহাম্মদ আলী।

জহরলালকে রাজনীতি মৌলিক শিক্ষার তালিম তিনিই দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে গুরু বলে মেনে নিতে পারেননি। মতিলালের জীবদ্দশায় জহরলাল কলকাতার কংগ্রেসের মিটিং-এ মাওলানা মুহাম্মাদ আলীর পরামর্শে স্বাধীনতার প্রস্তাব করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মতিলাল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তখন মুহাম্মদ আলী রেগে সিংহ নিনাদে গর্জে উঠেছিলেন। তিনি নেহরুর জন্য বলতেন, "ফারসীতে একটা কথা আছে–কুকুর হয়ো, ছোট ভাই হোয়ো না... জহরলালের বেলায় বলল.. বিড়াল হয়ো, তোমার বাবার পুত্র হয়ো না। কারণ তাঁর পিতাই ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেচারা জহরলালের কণ্ঠরোধ করে দিয়েছিলেন তখন, যখন পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। তার স্থলে আমি উঠে দাঁড়াই এবং প্রতিবাদ করি ডেমিনিয়ন ষ্টেটাসের সেই ধারায়।" (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১২৬) বারবার মাওলানা মুহাম্মদ আলী হিন্দু-মুসলমানের মিলনের চেষ্টা করেছেন কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। গান্ধীজিকে মহাত্মা টাইটেল তিনিই দিয়েছিলেন। বিলেতে গোলটেবিল বৈঠকে **জহরলাল**, গান্ধী, মুহাম্মদ আলী প্রমুখ নেতারা এবং ছয় কোটি হরিজনের নেতা **ডঃ বি আর** আম্বেদকর একত্রে বসে একটা মিলনের চেষ্টার সিদ্ধান্ত হয়েছিল কিন্তু

সেই সভায় গান্ধীজি ও জহরলাল হাজির হননি। মুহাম্মদ আলী বিলেতে গিয়ে তাঁদের অনুপস্থিতে খুব দুঃখিত হন। ইংরেজরা তাদের চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী মুহাম্মদ আলীকে বশ করার চেষ্টা করে, যেন তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি না করেন।

মাওলানা আগে হতেই অসুস্থ ছিলেন। সারা ভারতে হিন্দু-মুসলমানকে এক করার জন্য তাঁকে শহর ও গ্রামে-গঞ্জে অগ্নিময় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়। তখন হতেই তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকে। হিন্দু-মুসলমান বন্ধু বান্ধব ও ডাক্তারদের পরামর্শে দেশের খাতিরেই তাঁকে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি তা উপেক্ষা করে উত্তর দেন, "বিশ্রাম নেব স্বাধীনতা পাওয়ার পর।" ঐ অবস্থাতেই লণ্ডনে পৌঁছালেন। ইংরেজদের বুকে বসে ঐ ১৯৩০ সালের ১৯ নভেম্বর যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন তা জাতির জন্য মূল্যবান দলিল। "স্বাধীনতার আসল জিনিস নিয়ে যেতে পারলেই আমি আমার ভারতে ফিরে যেতে চাই অন্যথায় আমি এক গোলামের দেশে ফিরে যেতে চাই না।" (দ্রঃ ঐ) তিনি তাঁর ভাষণে জানিয়েছিলেন, আমাদের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান করা উচিত ছিল ভারতের মাটিতেই। কিন্তু আমরা যারা গান্ধীজির সঙ্গে সকল অবস্থাতেই দশটি বছর কাজ করেছি আমরা তাঁকে এ জন্য চাপ দিয়েছি। কিন্তু নিজের ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর হিন্দু জনপ্রিয়তা সংরক্ষণের মানসে সেই মীমাংসা স্থগিত রেখেছেন। স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু ও সনির্বন্ধ অনুরোধে ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর কংগ্রেসে হিন্দু মুসলমানে বিভেদ মীমাংসার জন্য সর্বান্তকরণে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১২১)

গান্ধীজির ওপর অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ও খুশি ছিলেন না। কারণ তাদের নেতা 'ছোট ঘরের ছেলে' বলে এত শিক্ষিত হয়েও সম্মান পাননি তাই অনুন্নতদের নেতা। ডক্টর আম্বেদকর ১৯৩১ সালে ১ জানুয়ারি লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে বলেন, প্রথম যে মন্তব্য রাখতে চায় তা হচ্ছে এই যে, আমরা নির্যাতিত শ্রেণীরা আমাদের ও হিন্দুদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিভক্তি চাই। এই হচ্ছে প্রথম জিনিস। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য আমাদের বলা হয়েছে হিন্দু। কিন্তু সামাজিকভাবে কখনো হিন্দুদের দ্বারা আমরা তাদের ভাই হিসেবে স্বীকৃত হইনি। (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ১২৩) গান্ধীজি আম্বেদকরকে বলেছিলেন, "আমাদের বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন বর্ণ হিন্দুদের। উত্তরে ডক্টর শ্রী আম্বেদকর বলেন, "আমরা আপনাদের বিশ্বাস করব না, কারণ আপনারা আমাদের বংশগত শত্রু।" (দ্রঃ ঐ পৃঃ ১২২) ঐ পরিস্থিতিতে ভারতীয় কোন্দল কলহকে সুযোগ মনে না করে মুহাম্মদ আলী বীরদর্পে অসুস্থ শরীরে বক্তৃতা দিচ্ছেন। আর ইংরেজদের কলিজাতে আগুন ধরিয়ে চলেছেন সেই সময়।

যখন ইংরেজের তরফ হতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ধর্ম আলাদা ও রাজনীতি আলাদা শিক্ষিত বিশ্ববরেণ্য মানুষরা তো তাই বলেন। আপনার মতামত কী? উত্তরে মুহাম্মদ আলী বলেছিলেন, "ধর্ম সম্বন্ধে আপনাদের যে ধারণা তা ভুল হবে যদি রাজনীতিকে এর বাইরে বাইরে রাখেন। এটা ইসলাম মতবাদের গোঁড়ামি নয়। নয় কোন ধর্মাচরণ পদ্ধতি। আমার মতে ধর্মের অর্থ জীবনের ব্যাখ্যা।... আল্লাহর নির্দেশই আমি প্রথমত একজন মুসলিম দ্বিতীয়ত একজন মুসলিম শেষত একজন মুসলিম এবং একজন মুসলিম ছাড়া আমি অন্য কিছুই নই।... কিন্তু ভারতবর্ষের কথা যেখানে, যেখানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িত, জড়িত যেখানে ভারতবর্ষের কল্যাণের প্রশ্ন, সেখানে প্রথমত আমি ভারতীয়, দ্বিতীয়ত আমি ভারতীয়, শেষত আমি একজন ভারতীয় এবং একজন ভারতীয় ছাড়া অন্য কিছু নই।...

যখন তাঁকে তাঁর অসুস্থতার কথা রক্তক্ষরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তখনও তিনি বলছেন... "বিদেশেও আমি মৃত্যুকে শ্রেয়তর মনে করব যতক্ষণ সেই বিদেশ থাকবে এক মুক্ত দেশ। আর যদি আপনারা আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা না দেন তাহলে আপনাদের এখানে দিতে হবে এক কবর।"

সেই বিরাট বক্তৃতা দিতে দিতেই তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর মৃত্যু সম্মুখে। তাই তিনি তাঁর মৃতদেহ ভারতে নিয়ে যেতে মৃত্যুর আগেই নিষেধ করেছিলেন। হলও তাই ১৯৩১ সালে ৩ জানুয়ারি ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসের সিংহ ভ্রাতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী প্রাণ ত্যাগ করলেন। ইন্নাল্লিাহি... রাজিউন।

তাঁর মৃতদেহ আর ভারতে এল না বহু নবীর জন্মস্থান জেরুজালেমে তাঁর কবর হয়। এ সংবাদ ভারতে যখন পৌঁছায় কোটি কোটি ভারতবাসী শোকাহত কান্নায় ভেঙে পড়ে। চিৎকার করে মুহাম্মদ আলী কী জয় স্লোগান দেয়। কংগ্রেসের পোশাক মোটা খদ্দর চোপত পাজামা শেরওয়ানি গলাবন্ধ করা কোটে এই ইসলামী পোশাক আজও মনে করিয়ে দেয় অতীতের মুসলমান নেতাদের পরিচ্ছদের প্রতীকের কথা।

কংগ্রেস ও লীগ সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে তা পুরনো ঘটনার ইতিহাসের ইতিহাস পরে বা আগামীতে তা ভিন্ন প্রকার ভিন্ন দৃশ্যে হয়েছে আরও হবে হয়ত। হয়ত আরও মন্দ কিংবা আরও ভাল।

শেষের কথা

আমরা শুধুমাত্র ভারতের ইতিহাসেই দেখলাম, যেখানে মুসলমানদের গভীর ধার্মিকতা; দাড়ি, টুপি, পোশাক পরিচ্ছদে ভাল মুসলমান, তাঁদের করা হয়েছে বিকৃত আর যাঁরা ইসলাম ধর্মকে অবজ্ঞা আর অনাদর করেছেন মুসলমান হয়েও অমুসলমানদের মত নিজেকে যত বেশি হারিয়েছেন তাঁরাই ইতিহাসে সম্মানের আসনে গৃহীত। মুসলমান জাতি এবং কমিউনিস্টদের বিপ্লবাত্মক ইতিহাসের বিকৃতি ঘটনো হয়েছে। আরও দেখলাম মুসলমান ছাত্ররা ভারতের বাইরে স্বাধীনতার জন্য গিয়ে তাঁরা বেশির ভাগ আর মুসলমান হয়ে ফিরে এলেন না, এলেন কমিউনিস্ট হয়ে।

তার কারণ হচ্ছে এই, শুধু ডিগ্রি, জ্ঞান বুদ্ধি আর ধর্মীয় যশই সব নয়, পবিত্র কুরআন আর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং তাতে রুচিশীল না হওয়া পর্যন্ত কাঁচা অবস্থায় শিক্ষা সংগ্রাম বা রাজনীতি সংগ্রামের গভীর জঙ্গলে কাউকে ছেড়ে দিলে তাকে ফিরে না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

ভারতে ধর্মের ভণ্ডামির রাজত্বে ভারতীয় মুসলমানদের মেরুদণ্ড সোজা করে যাঁরা দাঁড় করাতে চান তাঁদের কারো ধারণা জাতীর উচ্চ ইংরেজি শিক্ষা করা, রাজনীতি শিক্ষায় সচেতন হওয়া, ইতিহাসে সচেতন হওয়া, মাদরাসা মক্তব করে মওলুবী হাফেজ সৃষ্টি করা, পত্রিকার মারফত জনমত গঠন করা, অর্থনৈতিক উন্নতি করা সমিতি ও সংস্থা সৃষ্টি করা, ধর্মীয় ফাণ্ড তৈরি করা প্রভৃতি এক একটি অঙ্গ সতেজ করতেই তাঁরা বদ্ধ পরিকর। যদিও প্রত্যেকটির প্রয়োজন কিন্তু আমাদের মতে সবগুলোর দরকার স্বীকার করলেও সর্ব প্রথমে প্রয়োজন সর্ব প্রকার সর্ব শ্রেণীর মুসলমান সম্পূর্ণ জন-সাধারণকে যেমন করে হোক ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞান দান আর কুরআন ও হাদীসের আদেশের অনুকূলে জীবন গঠন করার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সেই কাজ শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বে এক সাথে প্রায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন তবলীগ জামাতের মুবাল্লিগগণ। তার ফলে একদিন আদর্শ রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, এমএল এ ব্যারিস্টার, ডাক্তার, অধ্যাপক, কেরানী শ্রমিক, ধনী ও দরিদ্র প্রত্যেকে নিখুঁত হয়ে উঠছে বা উঠবে বিন্দু বিন্দু মানুষ শুদ্ধ হয়ে একদিন মহা সিন্ধু ও সমুদ্রে পরিণত হবে, সেদিন সুদূরে নয় অদূরেই।

বিদায়বেলায় বলি। মানুষ প্রায় মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী ঐতিহাসিকদের ইতিহাসও মিথ্যাবাদী হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই সত্যবাদিতাই হচ্ছে ইতিহাস সৃষ্টির প্রাণ। ঐতিহাসিকগণ যা লিখে যান পরে তার পরিবর্তন ঘটায়। প্রকৃত সত্য ইতিহাস সত্যবাদীদের কাছ হতেই পাওয়া যায়। তাই পবিত্র কুরআনকেন্দ্রিক বই পুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে। তা আল্লাহর বাণী, তার

কথাই স্বতন্ত্র। যে কোন যুগের যে কোন জাতির জন্য যে সমস্ত স্রষ্টাবাণী গ্রন্থ হিসেবে হয়েছে সেগুলো সবই নির্ভেজাল। মানুষের সৃষ্টি করা বাণী সংকলনে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাণী "হাদীস যেভাবে সত্য ও নির্ভেজাল রাখা হয়েছে তা অত্যাশ্চর্যেরও ওপর।

হযরত ওসমান গনির (রাঃ) সময় কিছু শয়তান শ্রেণীর মানুষ হাদীসে ভেজাল প্রদান করতে চেষ্টা করে। সর্বপ্রথমে ঐ কর্মের কুখ্যাত কর্মী ছিল আবদুল্লাহ বিন সাবা। হযরত আলী (রাঃ) তার প্রাণদণ্ড দেন। তারপর মনছুর আব্বাসী তাঁর খেলাফতকালে মুহাম্মদ নামে হাদীস ভেজাল দেওয়ার কারণে তাকে ফাঁসি দিয়েছিলেন। তার বাবার নাম ছিল সাঈদ মাছলুম। এমনিভাবে গভর্নর খালেদ জুবাইকের কুপুত্র বয়ানকে হাদীসে মিথ্যা মেশানোর অপরাধে প্রাণদণ্ড দেন।

এমনিভাবে মুহাম্মদ বিন সুলাইমান আওয়াজের কুপুত্র আঃ করিমকে হাদিসে ভেজাল দেওয়ার অপচেষ্টার প্রমাণিত অপরাধে প্রাণদণ্ড দেন। যাঁর মধ্যে পূর্ণভাবে 'জবত' হাদীসাদি পূর্ণভাবে স্মরণ রাখার ক্ষমতা থাকে এবং পূর্ণভাবে সমীক্ষা শক্তি ন্যায়নীতি থাকে তাঁকে 'সেকাহ' বলে। যাতে ভবিষ্যতে হাদিসে কেউ ভেজাল দিতে না পারে, এ আর ভেজাল দেওয়া হাদীস চুম্বুকের মত ধরা যায় তার জন্য কিতাবুস সেকাত নামে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য চারটি গ্রন্থ আছে, লেখক যথাক্রমে আজালী হাফেজ, আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ ২৬১ আরবী সনে।

আবু হাতেম বুস্তি, মোহাম্মদ বিন হিব্বান ৩৫৪ আরবী সনে। ইবনে শাহীন, আবু হাফস ওমর ইবনে শাহনী ৩৮৫ আরবী সনে। জয়নুদ্দিন কাসেম বিন কোতলুবাগা ৮৭৯ আরবী সনে।

তাছাড়া ঐ রকম ধরনের গ্রন্থ "তাবাকাতুল হোফফাজ" একই নামে সাতখানি গ্রন্থ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৫৪৬ হিজরী সনে লিখেছেন ইবনে দাব্বাগ। ৬১৬ তে লিখেছেন ইবনে মোফাজ্জাল মাকদেসী। ৮৫২ তে লিখেছেন হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি। ৯১১ তে লিখেছেন জালালুদ্দিন সুয়তী তারপর আরও দুজন লেখক ঐ লিখেছেন প্রথমে তকীউদ্দিন ইবনে ফাহাদ ও দ্বিতীয় লেখক মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মদ হাশেমী। ৭৪৮ আরবী সনে লিখেছেন ইমাম জাহবী শামশুদ্দিন। অবশ্য এর গ্রন্থটি একই বিষয়ের ওপর হলেও নামটি হচ্ছে "তাজকেরাতুল হোফফাজ"।

এবার যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন অথচ তাঁদের বর্ণনা দুর্বল তাকে আরবীতে 'জয়ীফ' বলা হয়। ঐ জয়ীফ সম্বন্ধে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে দশটি যেমন–কিতাবুল জুআফা, লেখক ইমাম বুখারী। এই একই নামে আরও নয়টি গ্রন্থ নয়জন লেখক লিখেছেন যথাক্রমে ইমাম নাছায়ী, ওয়াকাইলী মোহাম্মদ বিন আমর, ইবনে হিব্বান বুস্তী, আবু আহমাদ, ইমাম দারা কুতনী, হাকেম আবু

>Goto List

আবদুল্লাহ, ইমাম ইবনুল জাওজী, ইমাম হাসান সাগানী, আর ঐ রকম আর একটি গ্রন্থ মিজানুল এ তেদাল লিখেছেন ইমাম জাহাবী (রাঃ) প্রমুখ প্রখ্যাত হাদীসবিদগণ।

হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) প্রাণপ্রিয় সঙ্গীদের সাহাবা বলা হয়। প্রত্যেক সাহাবীর এই বৈশিষ্ট্য ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে কোনদিন কোন প্রকারে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ মিথ্যা বলেননি। হাদীস সম্বন্ধে এত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে যে, একটি বর্ণ পর্যন্ত কেউ পরিবর্তন করার কল্পনা করেননি। কারণ হাদীসের মধ্যে আছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন যে, যে ইচ্ছা করে আমার নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করেছে সে যেন তার স্থান নরকেই তৈরি করেছে (ইসবাহ ৪/২০৬ পৃঃ)

মুসলমান সেজে মুসলমানের নাম নিয়ে যারা হাদীসে ভেজাল দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে তার কারণ হাদীসবিদদের অব্যর্থ তিক্ষ্ণ সংরক্ষণশীলতা।

যত নকল হাদীস প্রচলিত হতে গিয়েছিল তারও তালিকা তৈরি হয়ে বহু পুস্তক পুস্তিকাও তৈরি করা হয়েছে। যথা আল মওজুয়াত অর্থাৎ বাতিল বর্ণনামালা, আদদুররুল মুলতাকাত, অর্থাৎ (নির্বাচিত মতি)। কিতাবুল আবাতীল অর্থাৎ (বর্ণনা বর্জন পুস্তক) আলমাওজুয়াত (লেখক ইবনে আবদুল বার) অর্থাৎ বাতিল বর্ণনামালা। আলমুগনী অর্থাৎ (যথেষ্ট পুস্তক) আল-লায়ালিউল মাছনুআহ অর্থাৎ (নকল মতি) আদদুররুল মুনতাশেরাহ অর্থাৎ (ছড়ানো মতি) আলমাওজুয়াত (লেখক ইবনুল কিরানী) অর্থাৎ বাতিল বর্ণনামালা, আলমাকাসিদুল হাসানাহ অর্থাৎ (শুভ কামনা) আলমাওজুয়াত (লেখক মোল্লা আলী কারী) অর্থাৎ বাতিল বর্ণনা মালা, তামজীদুত তইয়েব অর্থাৎ (পবিত্র প্রকাশ), আলফাওয়ায়েদুল মাজমুআহ অর্থাৎ (কল্যাণ ভাণ্ডার) আল আসারুল মারফুআহ অর্থাৎ (প্রমাণিত হাদীসসমূহ) আল কালামুল মারফুয় অর্থাৎ (প্রমাণিত বাণী) ইত্যাদি। এমনিভাবে পৃথিবীর আর কোন ইতিহাস গ্রন্থ এভাবে সংরক্ষিত হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সব শেষে বলা যায় যে, কোন ইতিহাস মিথ্যা হতে পারে এই ইতিহাসের ইতিহাসও মিথ্যা হতে পারে কিন্তু হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) সহি হাদীসের একটি বর্ণও নকল নয়। অতএব প্রকৃত ইতিহাসের ইতিহাস ওটাই।

যেদিন ভারতে রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলে বিবেচিত হবে সেদিন চরম কর্তব্য পরায়ণতার নিদর্শনের বিকাশ প্রমাণ করবে মুসলমান জাতির প্রকৃত মর্যাদা। যেদিন ভারত হতে মিথ্যার কাসুন্দি তৈরির নামান্তর ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা আইন করে বন্ধ হবে, যেদিন শহরে গঞ্জে গ্রামে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিভেদ ও বিদ্বেষের বীজ বপক যাত্রা থিয়েটার বন্ধ হবে, সেদিন ভারতের চরম সীমায় উন্নতির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পরিলক্ষিত

হবে। যে মুসলমান জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্থাপত্যে ভাস্কর্য বীরত্বে, রসায়নে ভূগোলে খগোলে, চিকিৎসায়, সাহিত্য আবিষ্কার ও সৃষ্টিতে সারাবিশ্ব তথা ভারতকে পথ দেখিয়েছে তাদের সর্বমোট পরিচিতি শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বে আছে তার বিস্তার ও প্রমাণিত প্রকাশ।

ভারতের মুসলমান যদি কোন প্রকারে ধ্বংসই হয়ে যায় তবুও বহু রাষ্ট্রই রয়েছে যেগুলো মুসলিম রাষ্ট্র, যেখানে বেঁচে আছে কোটি কোটি মুসলমান যথা—ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, কুয়েত, সউদি আরব, ইয়ামেন, বাহরাইন, দক্ষিণ ইয়ামেন, কাতার, আবুধাবি, আজমান, দুবাই, ফুজাইয়য়া, বাস আলখিমা, সারজা, উমমাল কুইউন, মিসর, সুদান, লিবিয়া, তিউনেশিয়া, আল-জিরিয়া, মরক্কো, মৌরী তানিয়া, সেনেগাল, মালি, গিনি, নাইজার, নাইজিরিয়া, চাদ, সোমালিয়া, সেন্ট্রালআফ্রিকান রিপাবলিক, আইভরিকোস্ট, ডাহোমি, সিয়েরালিওন, গামিয়া, উগাণ্ডা, আল-বানিয়া, পূর্ব তুর্কীস্থান, ইথিওপিয়া, তানজানিয়া প্রভৃতি প্রচুর মুসলমান রাষ্ট্র বিদ্যমান। তাছাড়া যে রাষ্ট্র মুসলমান রাষ্ট্র নয়, সেখানে মুসলমান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান যেমন মরিসাস, ভারতবর্ষ, সাইপ্রাস, প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রেও অজস্র মুসলমান ছড়িয়ে আছে। তাছাড়াও ফিলিপাইন, বার্মা, রাশিয়া, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, ও সিংহল রাষ্ট্রেও মুসলমান কোথাও প্রচুর কোথাও অপ্রচুরভাবে বিদ্যমান। এই কথা মনে রেখে সমস্যার সমাধান প্রত্যেকে স্বস্ব স্বাতন্ত্র্য সংস্কৃতি বজায় রেখে শান্তিতে বাস করতে হয়েছে নতুবা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধামাচাপা দেয়া হয়েছে। তাই সব শেষে ভারত বিখ্যাত একজন নেতার উদ্ধৃতি দিয়েই তা প্রমাণ করা যায়।

(ক) "খিলাফত উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে, হিন্দু-মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজেদের বেড়া তুলে দিয়েছে।"

(খ) "...আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোন প্রমাণ দিতে পারি নাই। তাহারা আমাদের হিতৈষীতায় সন্দেহবোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না।... আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানে না। এবং আমাদের মনের মধ্যে যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত জাগরুক, আমাদের ব্যবহারে এখনও তাহার কোন প্রমাণ নেই। আমরাই দেশের সাধারণ লোককে দূরে রাখিয়াছি, অথচ প্রয়োজনের সময় তাহারা দূরে থাকে বলিয়া রাগ করি।"

(গ) হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে

একজন স্বদেশী প্রচারক একগ্লাস পানি খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন নাই। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হতে দিই নাই।"

বাং ১৩১৫ সালের শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'সদুপায়' প্রবন্ধ হতে 'ক' ইং ১৯১৪ সালে 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের লেখা ' লোকহিত' প্রবন্ধ হতে 'খ' উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে।

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কী? জানতে চেয়ে ডাঃ কালিদাস নাগ যে পত্র লিখেছেন তারই উত্তর হতে 'গ' উদ্ধৃতি, শ্রী সত্যের সেনের পনেরই আগস্ট পুস্তকের ১১২ পৃষ্ঠা ও ১২৩ পৃষ্ঠা হতে নেওয়া হয়েছে।

ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মিলন মৈত্রীর সেতু রচনায় স্বাধীন সত্য ইতিহাস প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে আর একটি ব্যাপক বস্তু প্রয়োজনীয়, যা মানুষের মেজাজ ও মানবতা গঠনে এবং প্রয়োজনীয় সত্য তথ্যের পরিবেশনায় আর অবান্তর অসত্য বা অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে অপরিহার্য, তা দৈনিক পত্রিকা। অবশ্য তা বাংলা ভাষায় একাধিক থাকলেও মুসলমানদের বড় তো দূরের কথা মাঝারি ধরনেরও নিরপেক্ষ নির্ভিক পত্রিকা নেই। অথচ আজকের দিনে শ্রমিক হতে মন্ত্রী পর্যন্ত প্রত্যেকের মগজ পরিচালিত হয় কাগজের নির্দেশ। তাই চাই পারস্পরিক সহযোগিতা, নিজে বেঁচেও অপরকে বাঁচতে দেওয়ার নীতিই হচ্ছে স্বচ্ছ ও সুন্দরতর পদ্ধতি।

সমাপ্ত

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান কাসেমী
গ্রাম-গোলাবাড়ি চাঁদপুর
পোঃ- গৌরীভোজ, ভায়া-গোপালপুর
থানা-বসিরহাট, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

বর্তমান বিশ্বের বিখ্যাত মনীষী মহাজেরে মদীনা হযরত মাওলানা জাকারিয়া সাহেবের পঃ বঙ্গীয় প্রতিনিধি (কোটি কোটি মানুষের নেতা) হযরত মাওলানা হাফেজ ক্বারী মুহাম্মদ মুসলিম সাহেব বলেন-

"ইতিহাসের ইতিহাস" বিখ্যাত বইটি শুধু আধুনিক শিক্ষিত সমাজে এবং আলেম সমাজের শুভেচ্ছা ও আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে আমিও শুভেচ্ছাসহ শুভাশিস দিই যে, গ্রন্থকার ও গ্রন্থকে আল্লাহু সুবহানাহু কবুল করুন। এই বই বহুল প্রচারিত হোক, মানুষ পড়ে উপকৃত হোক।

ইতি-
মুহাম্মদ মুসলিম
কাঁটাদীঘি, বাঁকুড়া।

বর্তমান বঙ্গের বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মাদরাসা মেমারী জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুমের সিনিয়র অধ্যাপক এবং ফতওয়া বিভাগের প্রধান মুফতি মাওলানা মুঃ আনসার সাহেব বলেনঃ-

"ইতিহাসের ইতিহাস" বইটি বহু প্রতীক্ষিত তথ্যসম্ভার। এটি পঃ বঙ্গে প্রত্যেক মানুষকে আকর্ষণ করবে বলে আশা করা যায়। অসতর্কতা হেতু অনেক অক্ষর বা শব্দ একের পরিবর্তে অন্য হয়ে গেছে। আগামী মুদ্রণে এটাকে আরও সুন্দরতর করে প্রকাশ করতে গ্রন্থকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আমিও সদিচ্ছা পোষণ করি। ইতি-মুহাম্মদ আনসার, হাওড়া।

মাদরাসা জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলুমের সাবেক অভিজ্ঞ ইংরেজি শিক্ষক জনাব মুহঃ আনোয়ার হোসেন সাহেব বলেনঃ-

ইতিহাস জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। অতীতে ফেলে আসা জাতির বিশেষ বিশেষ ঘটনা সংস্কৃতি ও সভ্যতা, মনীষীদের মনীষা শত শতাব্দীর বেড়া পেরিয়ে ভাবীদের প্রেরণা যোগায় নতুন জীবন গড়তে। যে জাতি নিজের আসল ইতিহাস সম্বন্ধে উদাসীন সে জাতি আত্মবিস্মৃত, সে জাতি মৃত।

শত রাজনৈতিক উত্থান-পতনে, কালাধারে, লালফিতার বাঁধনে গাঢ় রহস্যের অবগুণ্ঠনে আবৃত আছে আসল ঐতিহাসিকগণের ঐতিহাসিক তত্ত্ব। শুধু সাল-তারিখ দিয়ে সাজানো ঘটনা ইতিহাস নয়। জাতির মান মূল্যায়নে উত্তরসূরিদের সামনে এমন ইতিহাসের প্রয়োজন, যেখানে বিক্ষিপ্ত সভ্যতার কাহিনী পুতপ্রদীপ্ত শিখার মত জ্বলবে আর সেই দীপ শিখার আলোকে আলোকিত হবে সেই সব গাজী শহীদ অজ্ঞাত পরিচয় স্বাধীনতা প্রেমিকদের সাধনা, মরেও যাঁরা বেঁচে রইলেন এদেশের ধূলিকণায়। মানুষের ইতিহাস নতুন অনুসন্ধিৎসু চিন্তাধারায় লেখা হচ্ছে। তাই আজ চাই সত্যের তথ্যের ও তত্ত্বের ইতিহাস, চাই "ইতিহাসের ইতিহাস।"

লেখক ও সুবক্তা হিসেবে বক্তা জগতে গোলাম মোর্তজা সাহেবের আবির্ভাব ধুমকেতুর মত। তাঁর অনেক জনসমুদ্রের মত জনসভায় আমিও একজন জনবিন্দু হয়ে মর্মস্পর্শী ভাষণ শুনেছি। অভিনব যুক্তি দিয়ে নির্ভীকভাবে সত্য তথ্য প্রকাশের শিল্প চাতুর্যের জন্য তিনি জনসমাজের কাছে "বক্তা সম্রাট" 'শেরে বাংলা' নামে পরিচিত। মোর্তজা সাহেবের অতি নবীন বয়সের লেখা চাঞ্চল্যকর কবিতা "ইতিহাস কথা কও" নেদায়-ই-ইসলামে প্রকাশিত হয়েছিল। অনেকের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, পরিণত বয়সে তিনি এমন ইতিহাস লিখবেন, যা হবে জাতির পথপ্রদর্শক, হলও তাই। গোলাম মোর্তজা সাহেবের "ইতিহাসের ইতিহাস" গ্রন্থখানি মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। এই গ্রন্থটির মূলধারা প্রবাহিত হয়েছে সেইদিকে, যে দিকে একশ্রেণীর মানুষ শোষিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত। লেখক দালালীপনায় অভ্যস্ত ঐতিহাসিকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন

বাস্তবভিত্তিক ইতিহাস রচনা না করলে কালচক্রে তা কাল হয়ে দাঁড়াবে। আমি বিশ্বাস করি, গোলাম মোর্তজা সাহেবের "ইতিহাসের ইতিহাস"-এর প্রকাশ মানে সত্য, তথ্য ও তত্ত্বের প্রকাশ। আর জাল, মেকী ইতিহাসের আসল স্বরূপ ফাঁস। আমি এও আশা করি ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাব্রতীগণ ও বক্তাগণ নতুনভাবে সার্থক ইতিহাস শিক্ষার, গবেষণার খোরাক পাবেন। তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইতি-

আনোয়ার হোসেন, জাঙ্গালিয়া, ২৪ পরগনা।

প্রবীণ নেতা ও লেখক জনাব ডাঃ এম. এ. তোরাব (Medical College Calcutta) সাহেব বলেন-

স্নেহাস্পদ গোলাম আহমদ মোর্তজা প্রণীত 'ইতিহাসের ইতিহাস' বুদ্ধিজীবীদের জন্য এক পরিপূর্ণ পুরস্কার। সত্য কথা বললে ও লিখলে অনেক বাধা আছে। তাই পরাধীন ভারতে সকলে সহসা সাহস করতো না সত্য কথা লিখতে। আনন্দের বিষয়, এখন দেশ স্বাধীন, সমাজ অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত; সুতরাং এই বইটি সমাদৃত হবে সকলের কাছে এই আশা করি। লেখকের দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ইতি-

আশীর্বাদক, আবু তোরাব, মঙ্গলকোট।

মৌলভী কাজী আবদুল আজীজ সাহেব বলেন-

আমার পুত্র মোর্তজার লেখা সব বই-ই আমার পড়তে ভাল লাগে। হয়তো পিতা হিসেবেই এই দুর্বলতা। তবে 'ইতিহাসের ইতিহাস' আমার মত বৃদ্ধ মানুষকে পুরনো দিনের কৈশোর ও যৌবনের অনেক কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাপ আমাকেও অর্ধসিদ্ধ করেছিল। আমি তখন কলকাতার আরবী কলেজ বা আলিয়ায় পড়তাম। তখন আমাদের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ইংরেজ। ক্লাসের সেরা ছাত্র হিসেবে আমাকে স্কলারশিপ এবং নানাবৃত্তি দেওয়া হয়ে আসছিল। যখন আমিও আন্দোলনে যোগ দেই ইংরেজ আমার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেয়। সেই সময় আর্থিক স্বাচ্ছল্যও ছিল না। তাই পাঠ্যজীবনে বড় বাধা পেয়ে অনেক অত্যাচার সইতে হয়েছে। যখন মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মহাত্মা গান্ধীজি প্রমুখ নেতা ভাষণ দিতেন, সভায় বিলেতি কাপড় পোড়াতেন তখন তরুণ দেহ-মনে বিপ্লবের আগুন জ্বলতো। আজ বার্ধক্যের সঙ্গে লড়াই করে দুর্বল হয়ে পড়েছি। কিন্তু 'ইতিহাসের ইতিহাস' পড়ে মনে পড়ে যায় সেই পুরনো কথা আর যুবকসুলভ উন্মাদনা উঁকি মারে মনের কোণে। আমি দোয়া করি আল্লাহ মঙ্গল করুন এদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে।

ইতি-

আবদুল আজীজ

মিরেরডাঙ্গা, পোঃ ভিটা স্কুল, বর্ধমান।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'ইতিহাসের ইতিহাস' প্রণয়নে যাঁদের নিকট থেকে ও সহযোগিতা পেয়েছি-

১। মৌলভী মুহাম্মদ সোহরাব আলি। (ঝিলু বর্ধমান)
২। সৈয়দ আবদুল কাদের। (মঙ্গলকোট, বর্ধমান)
৩। মুহাম্মদ হারুন অল রশিদ। (মুর্শিদাবাদ)
৪। শ্রী প্রতাপ চন্দ্র (মেদনীপুর)
৫। মোঃ আইয়ুব আলি মণ্ডল। (২৪ পরগনা)
৬। কমরেড সৈয়দ আবু জাফর। (মীরেরডাঙ্গা, বর্ধমান প্রমুখ)

সমাপ্ত